সাধন-সমর

বা

দেবী-মাহাত্ম্য।

(শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)

তৃতীয় খণ্ড।

শুম্ভবধ—রুদ্রগ্রন্থিভেদ।

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৩৪ সাল।

মাতৃচরণাশ্রিত

শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সাধন-সমর আশ্রম বরাহনগর, কলিকাতা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।
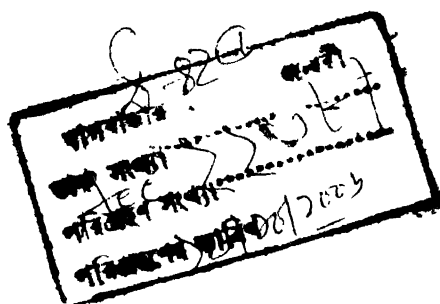
প্রকাশকের নিবেদন।

মা মা, মা! তোমার শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ মস্তক বিলুণ্ঠন ব্যতীত আর ত কিছুই খুঁজিয়া পাই না, যাহা দ্বারা তোমার অসীম করুণা কাহিনী ঘোষণা করিয়া অকৃতজ্ঞতার গুরুভার কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারি। তুমি আজ আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া এই "রুদ্র গ্রন্থিভেদ" রূপে জগতে যে কল্যাণ-আশীষ বর্ষণ করিলে, তাহাতে বড়ই আশা হয়—ত্রিতাপসন্তপ্ত সাধকের হৃদয়-মরু সচ্চিদানন্দ-রসে অভিষিক্ত হইয়া অচিরে ভোগাপবর্গ রূপ ফল উৎপাদনের যোগ্যতা লাভ করিবে। মা, এই "সাধন-সমর" তোমারই মূর্ত্তিমতী কৃপা। মাগো, আমরা যেন তোমার এই অযাচিত কৃপা সম্ভোগের যোগ্য অধিকার লাভ করিতে পারি। তুমি আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত গ্রহণ কর।

এইবার সাধনসমরের পাঠকবৃন্দের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি—আপনাদের হৃদয়ে মা নিত্যই নারায়ণী মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। ধন্য আপনারা। এই মস্তক আপনাদের চরণে সর্ব্বতোভাবে অবনত করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মাতৃকৃপা উপলব্ধির সামর্থ্য লাভ হয়।

সানুনয় প্রার্থনা—সহৃদয় পাঠকবৃন্দ আমাদের অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ দোষ মার্জ্জনা করিবেন। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১৩৩০ সালের শ্রীপঞ্চমী দিনে প্রকাশিত হইয়াছিল। চারিবৎসর পরে শ্রীশ্রীদোল-পূর্ণিমা দিনে ইহার এই বার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। ইতি—

সাধন-সমর আশ্রম।
বরাহনগর, কলিকাতা।
১৩৩৪।২৩ ফাল্গুন।

মাতৃচরণাশ্রিত—
শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী-সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণ-রহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥

গুরো! বহুরূপধারী নারায়ণমূর্ত্তি তোমার সেবার জন্য এ আয়োজন তোমারই। তোমার সেবায় তুমি পরিতৃপ্ত হও। এই দুঃখমিশ্রিত ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দ স্বরূপটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার ভূমারূপে—কেবলানন্দ স্বরূপে প্রকাশিত হও। সেবা সফল হউক! সেবক ধন্য হউক!

মাতৃ-স্নেহ।
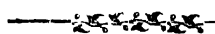
সাক্ষাৎকার-মিলন।

পশ্যন্তু সর্ব্বে অমৃতস্বরূপম্।
গচ্ছন্তু সর্ব্বে অমৃতং নিধানম্॥

হে আনন্দময় সন্তানগণ! তোমরা সত্যের মধুময় আহ্বানে প্রবুদ্ধ হইয়াছ! প্রাণের অমৃতময়-পরশে পুলক-কণ্টকিত শরীরে উত্থিত হইয়াছ! এইবার এস, আমার আনন্দময় সত্ত্বা প্রত্যক্ষ কর। দেখ, আমি মধুময়, আমি আনন্দময়, আমি অমৃত, আমি অভয়, আমি নিত্য-মুক্ত। দেখ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই আমার স্বরূপ। দেখ, একমাত্র পূর্ণ আনন্দময় সত্তা ব্যতীত কোথায়ও কিছুই নাই। দৃশ্যরূপে জগৎরূপে অনাত্মরূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, আনন্দই উহার নিমিত্ত, আনন্দই উহার উপাদান। অমৃতময় আমিই সর্ব্বত্র দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন-রূপে প্রকাশ পাইতেছি। দেখ, শোক দুঃখ মোহ অভাব আর্ত্তনাদ, এ সকলের মধ্যেও আমি—নিত্যানন্দময় পুরুষ নিতাই আনন্দপ্রবাহ ঢালিয়া দিতেছি।

যাহারা এই অভয় অমৃতস্বরূপ আমির চরণে স্বকীয় পৃথক্ সত্তাটী একেবারে ঢালিয়া দিতে পারিয়াছ, তাহারাই আমাকে বুঝিবে, তাহারাই আমাকে দেখিবে, এবং তাহারাই আমাতে মিলাইয়া যাইবে। সত্যের আহ্বান যাহাদের কর্ণে পৌঁছিয়াছে, প্রাণের পরশ যাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছে, এস, তাহারা দ্রুতপদে অগ্রসর হও, এই দেখ, তোমাদেরই,

জন্য আনন্দময় মাতৃ-বক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে। এস, দেখ, আত্মহারা হও! প্রবেশ কর! মিলাইয়া যাও!

এখানে আমি—বাক্য মনের অতীত—সত্তামাত্র নির্ব্বিশেষ কেবল আনন্দস্বরূপ; এখানে জীব নাই, জগৎ নাই, দৃশ্য নাই, কখনও ছিল না, কখনও থাকিবে না, অথচ অভাব বলিয়া কিছুই নাই; কেবল পূর্ণ! পূর্ণ! পূর্ণ!

তারপর দেখ—আমি বহুত্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় লীলার আনন্দরসে মগ্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভূতাধিবাস পরমেশ। আর একটু দৃষ্টি প্রসারিত কর, দেখ—সেই আমি, সেই পূর্ণ জ্ঞানময়, পূর্ণ আনন্দময় আমিই আবার অল্পজ্ঞান ও অল্প আনন্দ লইয়া—অজ্ঞান ও নিরানন্দ লইয়া, কেমন জীবত্বের অভিনয় করিতেছি! এই ত্রিবিধ স্বরূপে আমাকে পাইয়া যাহারা ধন্য হইবে, কৃতকৃত্য হইবে, তাহারা একবার সত্যদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠ—"অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য আত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।" তারপর আমার বিশ্বমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া উচ্চকণ্ঠে বল—"ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।"

পুত্রগণ! তোমরা সত্যে ও প্রাণে–চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, এইবার আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হও। মাতাপুত্রসম্বন্ধ-বিহীন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তত্ত্বে উপনীত হও। "অয়মস্মি" বলিয়া সাধ্য সাধনার পর-পারে চলিয়া যাও। শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ সফল হউক!

উত্তর চরিত।

ঋষিচ্ছন্দঃ—উপোদ্‌ঘাত।

উত্তরচরিতস্য রুদ্রঋষির্মহাসরস্বতী দেবতা
অনুষ্টুপ্‌ছন্দোভীমাশক্তির্ভ্রামরীবীজং
সূর্য্যস্তত্ত্বং সামবেদস্বরূপং
মহাসরস্বতীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

উত্তর চরিত—শুম্ভবধ। রুদ্র ইহার ঋষি। রুদ্র—প্রলয়ের দেবতা। যাবতীয় জগদ্ভাব অর্থাৎ যাবতীয় খণ্ডজ্ঞান এক অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রে বা বিজ্ঞানময় মহেশ্বরে বিলীন হয়। জীবত্বের শেষ গ্রন্থি বা অস্মিতারূপ শুম্ভাসুর অখণ্ড জ্ঞানেই নিঃশেষরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তাই প্রলয়ের দেবতা রুদ্র এই উত্তর-চরিতের ঋষি। মহাসরস্বতী ইহার দেবতা—জ্ঞানময়ী পরা প্রকৃতির শুভ্রা সত্ত্বগুণময়ী সরস্বতী মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়াই বিশুদ্ধ-বোধস্বরূপ আত্মসত্তার অববোধ ও জীবভাবের সম্যক্ অবসান হয়, তাই মহাসরস্বতী এই চরিত্রের দেবতা। ইহার ছন্দঃ অনুষ্টুপ্। মায়ের এই উত্তর চরিতে, যে সাধক অবগাহন করেন, তাঁহার প্রাণপ্রবাহ বা প্রাণায়াম অনুষ্টুপ্ নামক বৈদিক প্রশান্ত ছন্দের অনুরূপ স্পন্দনবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ভীমাশক্তি—ভয়ঙ্করী প্রলয়কারিণী মহাশক্তির অঙ্কেই জীবত্বের অবসান হয়; তাই ভীমা ইহার শক্তি। ভ্রামরী বীজ—অসংখ্য ষট্‌পদ-পরিবৃত মূর্ত্তির নাম ভ্রামরী; ইনি অরুণাখ্য অসুরকে নিহত করিয়া থাকেন। এই ভীমা ও ভ্রামরীতত্ত্ব এই চরিতেই পরে যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে।

সূর্য্য ইহার তত্ত্ব—সূর্য্য শব্দের অর্থ প্রকাশস্বরূপ বস্তু—জ্ঞান। যে বিমল বোধের উদয়ে অনাদি কালের অজ্ঞান-তিমির দূরীভূত হয়, সেই বোধই এই উত্তম চরিতের তত্ত্ব বা প্রতিপাদ্য বিষয়। সামবেদ—সমস্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ সম্যক্ সাম্যাবস্থাই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ। মহাসরস্বতী জ্ঞানময়ী দেবীর প্রীতির নিমিত্তই এই চরিতের বিনিয়োগ।

সাধন-সমর

বা

দেবীমাহাত্ম্য।

তৃতীয় খণ্ড।

রুদ্রগ্রন্থি ভেদ—শুম্ভবধ।

ঋষিরুবাচ।

পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—পুরাকালে শুম্ভ এবং নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় মদ ও বলের প্রভাবে, শচীপতির ত্রিলোক এবং যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর নিহত হইয়াছে। সাধকের সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার-জন্য চিত্তবিক্ষেপ নিবৃত্ত হইয়াছে। কামনার—বিষয় বাসনার উৎপীড়ন নাই; ভবিষ্যতে যে উৎপীড়ন আসিতে পারে, এরূপ আশঙ্কাও আর নাই। প্রাণময় গ্রন্থির উচ্ছেদ হইয়াছে। সাধক এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছে—অন্তরে প্রাণরূপে যাহার উপলব্ধি হয়, বাহিরে তাহাই ব্যক্ত বিশ্বরূপে উদ্‌ভাসিত। যে দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয়, সেই দিকে পরিপূর্ণ প্রাণময় সত্তা বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত। জড়ত্ববোধ অপনীতপ্রায়। একমাত্র পরম প্রিয়তম প্রাণ বা চৈতন্য ব্যতীত আর কোথাও কিছুই নাই। সাধারণের চক্ষুতে যাহা জড়রূপে প্রতিভাত হয়, তাহা যে বাস্তবিক জড় নহে, এ কথাটা এখন আর

বাক্যমাত্রে অর্থাৎ মাত্র বাচনিক জ্ঞানে পর্য্যবসিত নাই। গুরূপদিষ্ট উপায়ে বিশ্বময় প্রাণপ্রতিষ্ঠারূপ সাধনার সাহায্যে, জড়া প্রকৃতি এখন চিন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিরূপে প্রত্যক্ষীভূতা। জীবমাত্রই যে মাতৃঅঙ্কস্থিত নগ্নশিশু, এ কথা এখন আর বিচারের সাহায্যে, যুক্তির সাহায্যে বুঝিতে হয় না। স্মরণমাত্রেই প্রাণময় মাতৃস্বরূপ উদ্‌ভাসিত হয়। আর ভয় বলিয়া কিছু নাই। বিশ্বময় মাতৃ-কর্ত্তৃত্ব দর্শনে জীব-কর্ত্তৃত্ববোধ অস্তমিত-প্রায়। সাধক এখন সর্ব্ববিধ সংসারচিন্তা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইয়াছে। অহো! বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতি—অহৈতুক অপরিসীম গুরুকৃপাই জীবকে—সাধককে এইরূপ শান্তিময় অবস্থায় আনয়ন করে।

কিন্তু, এখনও প্রবল প্রারব্ধ সংস্কারসমূহ প্রক্ষীণ হয় নাই। "অনিচ্ছন্নপি বলাদিব নিয়োজিতঃ" কি যেন এক অজ্ঞেয় মহতী শক্তির প্রবল অনুপ্রেরণায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও কর্ম্মের আরম্ভ হইয়া পড়ে। সাধক বেশ জানে যে, "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ" তথাপি কর্ত্তৃত্ববোধ ক্ষণেকের তরে আসিয়া উপস্থিত হয় ও সমস্ত জ্ঞানকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এতদ্ব্যতীত যে মাতৃঅঙ্ক লাভ বা পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থান করিবার জন্য এত প্রয়াস, এত জন্মজন্মান্তরব্যাপী সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাত; কই ঠিক সে জিনিষটী ত এখনও উদ্ভাসিত হয় নাই! এই অবস্থায় সাধক মনে করে—সবই পাইয়াছি, সবই বুঝিয়াছি, তবু যেন কি পাই নাই, যেটুকু না পাইলে জীবনের যথার্থ পরিপূর্ণতা আসে না, সেই জিনিষটী এখনও ত সম্যক্ প্রকটিত হয় নাই। যাঁহাকে বুঝি অথবা বুঝিনা, কিছুই বলা যায় না, যাঁহাকে জানি অথবা জানিনা, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কই, সে জিনিষ ত এখনও সম্যক্ উদ্ভাসিত হয় নাই! যাঁহার কথা বলিতে গিয়া, উপনিষদের ঋষি প্রশান্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন—"নো ন বেদেতি বেদ চ" যে বলে আমি তাঁহাকে জানিয়াছি সে তাঁহাকে জানে না, কারণ—"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" যিনি স্বয়ংই বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কি প্রকারে বা কিসের দ্বারা

জানিবে ? আর যিনি বলেন—"আমি তাঁহাকে জানিনা" তিনিও তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ। ওগো ; যিনি আমার "আমি" সাজিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে জানিনা বলিলে যে মিথ্যা কথা বলা হয়। তবে কে তিনি ? যাঁহাকে জানি বলা যায় না, জানি নাও বলা যায় না, তিনি কে ? তিনি যতই অবাঙমনোগম্য হউন, যতই ভাবাতীত হউন, যতই দুরধিগম্য হউন, তবু কিন্তু তাঁহাকে চাই ! তাঁহাকে চাই ! হাঁ সত্যই কি তাঁহাকে পাওয়া যায় ? হ্যাঁ সত্যই পাওয়া যায় !

যতদিন এই পাওয়া না পাওয়া, জানা না জানার ধাঁধা সম্যক্ বিদূরিত না হয়, ততদিন সাধক হৃদয়ের দীনতা কিছুতেই সমূলে দূরীভূত হয় না ; অন্ততঃ হওয়া উচিত নহে, অথবা হইতেই পারে না। কারণ, জীব ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে, সুতরাং যতদিন সে পুনরায় ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে না পারিবে, ততদিন এ অতৃপ্তি দূর হইতেই পারে না। অতৃপ্তিই ত মায়ের আমার গতিমূর্ত্তি। মা ঐ মূর্ত্তিতে প্রতি জীব হৃদয়ে নিত্য বিরাজ করেন বলিয়াই ত আমরা দিনের পর দিন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মায়ের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। এই অতৃপ্তির প্রভাবেই ভবিষ্যৎ ও সঞ্চিত কর্ম্মে, ক্ষয় হইলেও, দুরপনেয় প্রারব্ধসংস্কার ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত জীব কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। প্রারব্ধটা যে দুঃখ নয়, উহা যে আনন্দেরই লীলা বিলাসমাত্র, ইহার সম্যক্ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্তই প্রারব্ধ সংস্কারগুলি দুঃখদায়ক বলিয়া বোধ হইতে থাকে। ইহাই রুদ্রগ্রন্থি বা জ্ঞানময় গ্রন্থি। পরে এ সকল কথা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

এই বিশ্ব যে আনন্দ ধাতু ! আনন্দ ইহার উপাদান, আনন্দ ইহার নিমিত্ত এবং আনন্দই ইহার গম্য বা লক্ষ্য ; এইরূপ উপলব্ধি সাধকের এখনও হয় নাই। সত্য-প্রতিষ্ঠার বলে সৎএর সন্ধান মিলিয়াছে, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে চিৎএর সন্ধান মিলিয়াছে, এইবার আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই বড় সাধের মনুষ্যজীবনের চরম চরিতার্থতা উপস্থিত হয়।

বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে দাঁড়াইলেই এই বিশ্ব, মাত্র বোধস্বরূপে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। ঐ বোধ যে আত্মাই, এইরূপ অনুভূতি যতদিন প্রকাশিত না হয়, ততদিন উহা—ঐ বোধস্বরূপ বস্তু যেন নীরস, যেন আনন্দহীন, এইরূপই প্রতীত হয়। বাস্তবিকই উহা যে রসহীন শুষ্ক বোধমাত্র নহে, উহা যে সত্য সত্যই আনন্দময়, চিদ্‌বস্তুই যে আনন্দঘন আত্মা, ইহা বুঝিতে পারিলেই জীবের রুদ্রগ্রন্থি বা জ্ঞানময় গ্রন্থি ভেদ হয়। তখন জীব প্রারব্ধ ভোগ করিয়াও উহাকে আর দুঃখদায়ক বলিয়া মনে করিতে পারে না। বিশ্বটা যেন আনন্দ দিয়া গড়া, স্থূল দেহটা যেন আনন্দময় পরমাণুসমষ্টি, এইরূপই মনে হইতে থাকে। এই অবস্থায় জীবের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য, প্রতি নিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত আনন্দময় আত্মারই স্ফুরণরূপে অনুভূত হইতে থাকে।

জীব কিরূপে এই তত্ত্বে, এই আনন্দময় আত্মক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারে, তাহাই বিজ্ঞানময় গুরু মহর্ষি মেধস শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ প্রসঙ্গে জীবাত্মরূপী সুরথকে শুনাইতেছেন বা দেখাইয়া দিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তি অধ্যায়ে মহিষাসুরবধের শেষে "তচ্ছৃণুষ ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে" বলিয়া ঋষি পরবর্ত্তী রহস্য বা উত্তম চরিত্র বর্ণনার আভাস দিয়াছিলেন, এইবার সেই প্রতিশ্রুত বিষয়ের উপদেশ আরম্ভ করিলেন। তাই অধ্যায়ের প্রথমেই "ঋষিরুবাচ" উক্ত হইয়াছে।

গুরুশিষ্যসম্বন্ধ ঠিক এইরূপই হইয়া থাকে। যতদিন শিষ্য যথার্থ আনন্দময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, ততদিন গুরু শিষ্যকে প্রশ্ন করিবার অবসর দেন না। যখন অধিকারী হয়, যখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখন বিনা জিজ্ঞাসায় শিষ্যহৃদয়ের সমস্ত সংশয় স্বয়ংই নিরাস করিয়া দেন। অনেক শিষ্য হয়ত শাস্ত্রোক্ত অধিকারী হইবার পূর্ব্বেই গুরুকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলেন ; যেন একদিনেই সমস্ত সংশয় দূর করিয়া লইবেন ; কিন্তু তাহা হয় না— এ সকল প্রাণের জিনিষ, ইহা গুহ্যতম রহস্য, ইহা সুদুর্ল্লভ, সুতরাং শুধু উপদেশে বা কেবল পুস্তকপাঠে কখনও এই আত্মবস্তুলাভ হয় না।

আরে, সন্তানের কখন যে যথার্থ ক্ষুধা পায়, এবং কিরূপ খাদ্য কোন্ সন্তানের পক্ষে উপযোগী, ইহা সন্তান্ অপেক্ষা মা ই যে বেশী বুঝিতে পারেন! মাতৃরূপী গুরুর প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার না দিয়া যদি কেহ স্বয়ংই সে দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে যে অভিমান রহিয়া গেল! অভিমান থাকিতে গুরুকৃপার উপলব্ধি হয় না, গুরুকৃপা ব্যতীত মোক্ষলাভ একান্ত অসম্ভব।

দেখ, সাধক-প্রবর অর্জ্জুন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার গুরু, তিনি গীতার বিভূতিযোগ পর্য্যন্ত উপদেশ পাইয়াও কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন "হে যোগেশ্বর! হে প্রভো! যদি তুমি আমাকে বিশ্বরূপ-দর্শনের যোগ্য বলিয়া মনে কর, তবে তোমার সেই অব্যয় স্বরূপটী দয়া করিয়া একবার আমাকে দেখাও"। কি সুন্দর! ভাব দেখি কেমন নিরভিমান, কত বিনীত, কত শ্রদ্ধাবানের ভাবটী অর্জ্জুনের এই কথাটির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! শিষ্য যখন ঠিক এইরূপ আত্মকর্ত্তৃত্ব-বোধ সম্যক্ ভাবে গুরুর চরণে অর্পণ করিতে পারে, তখনই দেখিতে পাই—তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে হয় না, গুরু স্বয়ংই যখন যাহা আবশ্যক, তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। শিষ্যকে কিছুই করিতে হয় না, গুরু স্বয়ংই শিষ্যের যাহা করণীয় তাহা করাইয়া লয়েন; সুতরাং অধীরতা কিংবা হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চস্তরীয় সাধনা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, ফললাভে যে একটু বিলম্ব হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু সে অন্য কথা—

এই শুম্ভবধ বা মায়ের উত্তম চরিত্র অতিশয় গহন ও বৈচিত্র্য পূর্ণ, উচ্চাধিকারী ব্যতীত, নির্ম্মল বুদ্ধি ব্যতীত এ রহস্যে প্রবেশ করা দুরূহ ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। তাই এস সাধক, আমরা সর্ব্বাগ্রে আমাদের একান্ত আশ্রয় মাতৃচরণে প্রণত হইয়া মায়ের কৃপা ভিক্ষা করি, তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ নির্ম্মল করিয়া দিবেন, তাহা হইলেই আমরা এ অপূর্ব্ব রহস্য যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

মা গো! শুনিয়াছি গুরুকৃপা শাস্ত্রকৃপা ও আত্মকৃপা, এই ত্রিবিধ কৃপা ব্যতীত কেহই মোক্ষরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আবার

এই ত্রিবিধ কৃপারূপে একমাত্র তুমিই আবির্ভূত হও। তুমিই গুরু, তুমিই শাস্ত্র, আবার তুমিই কৃপা! শাস্ত্রবাক্যগুলি যে জড়লিপিমাত্র নহে, উহা যে প্রাণময়, চৈতন্যময়, নিত্য চৈতন্যময়ী মা, তুমিই যে শাস্ত্রবাক্যরূপে প্রকটিত হইয়া আমাদের মত অজ্ঞানান্ধ জীবের নয়ন জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মীলন করিয়া দিয়া থাক! ইহা বুঝিতে পারিয়াই মা তোমার করুণা স্মরণ করিতেছি, করুণাই তোমার মূর্ত্তি, তুমি সন্তানবৎসলা জননী। তুমিই আমাদিগকে দুর্গম পরমাত্মতত্ত্বে উপনীত কর। যতদিন তুমি জীবকে বিশিষ্টভাবে শাস্ত্রবাক্য সমূহের চৈতন্যময়ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা প্রদান না কর, ততদিন বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও জীবের অজ্ঞান দূরীভূত হয় না। তাই মা, তুমি ধীরূপে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদিগকে এই অতি গহন তত্ত্বে অবগাহন করিবার সামর্থ্য প্রদান কর, আমরা সমস্ত সংশয়ের—অজ্ঞানের পরপারে চলিয়া যাই। মা মা মা!

শুম্ভ—অস্মিতা। শোভার্থক শুন্ভধাতু হইতে শুম্ভ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই বিচিত্র বিশ্ব, এই স্ত্রীপুত্রাদি সংসার, এই ধন যশঃ খ্যাতি, এই স্থূল সূক্ষ্ম দেহ, এ সকলই অস্মিতায় অবস্থিত। জাগতিক পদার্থ-সমূহ অস্মিতারই এক একটি ব্যূহমাত্র। অস্মিতা কি? অস্মি শব্দের উত্তর, ভাবার্থে তা প্রত্যয় করিয়া অস্মিতাশব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'আমি আমি' এই ভাবটির নাম অস্মিতা। জীব যাহা কিছু করে, যাহা কিছু ভাবে, তাহার প্রত্যেকটীর সঙ্গে একটী—"আমি" ভাব একান্ত বিজড়িত; ঐ আমি ভাবটির উপরেই এই সংসার বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। মনে রাখিও—ইহা দেহাত্মবোধের অহঙ্কারস্বরূপ "আমি" নহে। উহা বিজ্ঞানময় কোষের আমিত্ব। সাধক যখন বুদ্ধিতে বা বিজ্ঞানময় কোষে আমিত্বকে উপসংহৃত করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ আমি বলিলেই সাধারণ লোকের যেরূপ স্থূল দেহ বা মাংসপিণ্ডটা মনে পড়িয়া যায়, সাধক যখন সেইরূপ "আমি" বলা মাত্র তাহার বিজ্ঞানময় আমিকে ধরিতে পারে, অর্থাৎ দেহাত্মবোধের ন্যায় বিজ্ঞানাত্মবোধ সুদৃঢ় হয়, তখনই এই

অস্মিতার স্বরূপ উপলব্ধিযোগ্য হয়। সাধন-সমর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে যে স্থানে যাইবার জন্য, যে কেন্দ্রে অবস্থান করিবার জন্য সাধকগণ ভূয়োভূয় উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রটী যখন তাঁহাদের আয়ত্ত্বীভূত হয়, অর্থাৎ ইচ্ছা মাত্রেই বিজ্ঞানে অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তখনই এই অস্মিতার সন্ধান পাইয়া থাকেন। অস্মিতার স্বরূপ আরও স্পষ্টরূপে বলা যাইতেছে।

পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে—দৃক্‌শক্তি পুরুষ এবং দর্শন-শক্তি বুদ্ধি। এতদুভয়ের যে অভিন্নত্ব প্রতীতি, তাহারই নাম অস্মিতা। অর্থাৎ যখন বুদ্ধিই আত্মারূপে প্রতিভাত হয়, তখন তাহাকে অস্মিতা বলা যায়। ইহাও এক প্রকার ক্লেশ। অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ ক্লেশের ইহা অন্যতম। স্থূল কথায় বুদ্ধি এবং আত্মার যে অভিন্নত্ব প্রতীতি, তাহাই অস্মিতা নামক ক্লেশ। ইহাই দেবীমাহাত্ম্যের ভাষায় মহাসুর শুম্ভ। বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং মন, এই সকলই বুদ্ধিপর্য্যবসানা। রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ এবং মন, ইহাদের যত কিছু চাঞ্চল্য বা ক্রিয়াশক্তি, সে সকলই বুদ্ধিতে গিয়া পরিসমাপ্ত হয়। বুদ্ধির উপরে আর বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই। এই বুদ্ধি ও অস্মিতা অভিন্ন, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি ও আমিত্ববোধ সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ। নিশ্চয়ত্ব এবং আমিত্ব প্রতীতির কোনও বিশেষ ভেদ নাই। ফলগত বা কার্য্যগত বিভিন্নতাকে লক্ষ্য করিয়াই বুদ্ধি ও অস্মিতারূপ বিভিন্ন ব্যপদেশ হইয়া থাকে।

সাধকগণ সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার ফলে যখন এই বুদ্ধিতত্ত্বে আত্মবোধ উপসংহৃত করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে সমর্থ হন, সেই সময় কিছুদিন এই বুদ্ধি বা অস্মিতাকেই আত্মা বলিয়া বোধ করিতে থাকেন। যদিও মাতৃচরণাশ্রিত সাধকগণের এরূপ ভ্রান্তি বা বিপর্য্যয়-জ্ঞান খুব বেশী দিন থাকে না, মা স্বয়ংই এই সূক্ষ্মতম ক্লেশরূপী মহাসুরকে নিধন করিয়া আপনার যথার্থ স্বরূপটি উদ্ভাসিত করিয়া দেন, তথাপি যতদিন সেই শুভ সুযোগ উপস্থিত না হয়, ততদিন সাধককে এখানেও বেশ

একটু উৎপীড়িত হইতে হয়। অবশ্য এই উৎপীড়ন বাহিরে কেহ বুঝিতে বা লক্ষ্য করিতে পারে না; মাত্র সাধক নিজে প্রাণেই এই অস্মিতাক্লেশের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়া থাকেন। এই অস্মিতাক্ষেত্রে উপনীত হইলে সাধকের মনে হয়, সবই পাইয়াছি, সবই বুঝিয়াছি, বহুকাল ব্যাপী জন্মমৃত্যুর ধাঁধাঁ কাটিয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা নিজের একটা বিশিষ্টতাও লাভ হইয়াছে। এ সকলই সত্য, কিন্তু যেখানে উপস্থিত হইলে সর্ব্ব বলিয়া কিছু থাকে না, সকল ক্লেশ চিরতরে বিদূরিত হয়, সকল অজ্ঞান চিরতরে বিলয়প্রাপ্ত হয়, কই সে স্থানে ত এখনও যাওয়া হয় নাই! সে যে আমার মায়ের স্নেহশীতল অঙ্ক, সে যে আমার সর্ব্বভাবাতীত ত্রিগুণ-রহিত আনন্দময় মাতৃবক্ষ; সে যে আমার সর্ব্বভয় নাশক অমৃতময় অভয়পদ, যেখানে একবার গেলে এই জগৎ-ধাঁধা চিরতরে অবসিত হয়। জগৎ বলিতে, জীব বলিতে, আমি বলিতে কিছুই থাকে না, কখনও ছিল কিংবা থাকিবে, এরূপ ধারণাও করা যায় না, সেই যে আমার মাতৃবক্ষ। ওঃ! সে কি সুখময় মধুময়, আনন্দময়, রসময় স্থান! সে যে আমি-বর্জ্জিত আমি গো! সাধক, যতদিন তুমি সেখানে যাইতে না পারিবে, যতদিন এই জগৎসত্তার পরপারে ত্রিগুণাতীত মাতৃবক্ষে তোমার ব্যষ্টি আমিটাকে চিরতরে মিলাইয়া দিতে না পারিবে, ততদিন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তৃত্ব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যলাভ করিলেও তোমার বুকের অতৃপ্তি মিটিবে না, হৃদয় জুড়াইবে না, ক্লেশের অবসান হইবে না। ততদিন তোমাকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অসুর-অত্যাচার সহ্য করিতেই হইবে।

সে যাহা হউক, ব্রহ্ম ও বিষ্ণুগ্রন্থিভেদের প্রসঙ্গে সাধককে যে স্থানে উপনীত হইবার জন্য বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যে আমিত্বকে লাভ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এখানে—এই উত্তম চরিত্রে কিন্তু তাহাই অসুররূপে বর্ণিত, উহাকেও নিধন করিতে হইবে। পূর্ব্বে যাহা উপাদেয়রূপে সাধ্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছিল, এখানে তাহাই—

হেয়রূপে বর্জ্জনীয়রূপে ব্যাখ্যাত হইবে। সাধনারাজ্যে এইরূপই হইয়া থাকে। আজ যাহা একান্ত আশ্রয়নীয়, কিছুদিন পরে তাহাই সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় হইয়া পড়ে। আর দিন দিন যদি এইরূপ বর্জ্জনের ভাবটাই না আসে, তবে আর সাধনা কি? সর্ব্বত্বের পরিত্যাগ ও একত্বের লাভ, ইহাই ত সাধনা। যতদিন সেই অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হইতে না পারিবে, ততদিন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক বর্জ্জন হইবেই। মাতৃচরণে সম্যক্ আত্মসমর্পণকারী সন্তানগণের এইরূপ বর্জ্জন, হঠকারিতা পূর্ব্বক ইচ্ছা পূর্ব্বক করিতে হয় না, মায়ের কৃপায় আপনা হইতে হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ক্রমে এই অস্মিতা বা মহাসুর শুম্ভের স্বরূপ আরও বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে, এবং তখন ইহা বুঝিবার পক্ষে আরও সুবিধা হইবে।

নিশুম্ভ—মমতা। "আমার আমার" এই ভাবটীর নাম মমতা। সাধারণ কথায় মমতা বলিলে যাহা বুঝায়, ইহা কিন্তু সে মমতা নহে। ইহা বিজ্ঞানময় কোষের মমতা। সে সূক্ষ্মতত্ত্বে যে মমত্ববোধ ফোটে তাহাই নিশুম্ভ। যাঁহারা বিজ্ঞানময় কোষের সন্ধান পান নাই, তাঁহারা এ মমতার স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না; কারণ শুধু মস্তিষ্ক ধর্ম্ম দিয়া বুঝিলে ইহার কিছুই বুঝা হয় না। ইহার উপলব্ধি আছে। "আমার জ্ঞান" "আমার বোধ" বলিলে যে মমতার আভাস পাওয়া যায়, ইহা সেই মমতা। অস্মিতা যেরূপ অহংএর সূক্ষ্মতম অবস্থা, মমতা ও সেইরূপ সূক্ষ্মতম একটী ভাববিশেষ। ইহারা পরস্পর সহোদর। যেখানে অস্মিতা সেইখানেই মমতা। তাই শুম্ভ ও নিশুম্ভ উভয়ের প্রায় একত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শচীপতি—মায়োপহিত চৈতন্য। যদিও সাধারণতঃ শচীপতি শব্দে দেবরাজ ইন্দ্রকেই বুঝায়, তথাপি এখানে ঐ শব্দটী ব্রহ্ম বা পরমাত্মার বোধকরূপে উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন—"ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইন্দ্র অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়াদ্বারা বহুরূপ হইলেন। শচী শব্দের অর্থ মায়া; তাঁহার পতি, অর্থাৎ মায়োপহিত চৈতন্য। মন্ত্রে শচীপতি শব্দের

প্রয়োগ না করিয়া ইন্দ্র শব্দের প্রয়োগ করিলে, পাছে মায়োপহিত ব্রহ্ম না বুঝাইয়া নির্গুণ ব্রহ্ম বুঝাইতে পারে, এই আশঙ্কায়ই মহর্ষি মেধস এস্থলে শচীপতি শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। শচীপতি শব্দে সাংখ্যের ভাষায় মহত্তত্ত্ব-প্রতিবিম্বিত পুরুষ, ভগবদ্গীতার ভাষায় অক্ষর পুরুষ এবং বেদান্তের ভাষায় কূটস্থ চৈতন্য বুঝা যায়। শচীপতি শব্দের এইরূপ অর্থ করাতে, অনেকের মনে সংশয় আসিতে পারে যে, উহা কাল্পনিক অর্থমাত্র। কিন্তু উপরের লিখিত শ্রুতিপ্রমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রশব্দ ব্রহ্মবাচক। শ্রুতি অনেক স্থলে ব্রহ্ম অর্থেই ইন্দ্র শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত "শচীপতেঃ ত্রৈলোক্যম্" শচী-পতির ত্রিলোক বলিলে, কোন রূপেই উহার দেবরাজ অর্থ করা চলে না; যেহেতু দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিলোকপতি নহেন, মাত্র স্বর্গাধিপতি। ত্রিলোক-পতি স্বয়ং পরমেশ্বর। ত্রিলোক শব্দের যথার্থ তাৎপর্য্য ত্রিবিধ প্রকাশ। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, এই ত্রিবিধ প্রকাশকেই ত্রিলোক বলা হয়। এই ত্রিবিধ প্রকাশের অধীশ্বর একমাত্র মায়োপহিত চৈতন্য বা সগুণ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু হইতেই পারে না।

যাহা হউক, মন্ত্রে দেখিতে পাইতেছি—শুম্ভ নিশুম্ভ উভয়ই অসুর অর্থাৎ সুরভাবের বিরোধী। ইহারা "মদবলাশ্রয়াৎ" মদ এবং বলের আশ্রয় পূর্ব্বক শচীপতির ত্রিলোক এবং যাবতীয় যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছিল। মদ—গর্ব্ব, বল—সামর্থ্য। অস্মিতা ও মমতার ধর্ম্মই মদ বা গর্ব্ব। এই সমস্ত জগৎ আমাতেই অবস্থান করিতেছে, এইরূপ গর্ব্বভাব শুম্ভ নিশুম্ভের একান্ত স্বাভাবিক। তারপর বল বা সামর্থ্য—যাহারা বুঝিতে পারে যে, আমিই সমস্ত জগতের ধর্ত্তা পাতা সংহর্ত্তা, তাহাদের সামর্থ্য যে কত বেশী, তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না।

এখন শচীপতির ত্রিলোক এবং যজ্ঞভাগহরণ কথাটা বুঝিতে পারিলেই এই প্রথম মন্ত্রের অর্থ একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম হইবে। কথাটা একটু কঠিন, তাই আর একটু বিশদরূপে উহার আলোচনা করা যাইতেছে। স্থূল সূক্ষ্ম

কারণাত্মক ত্রিলোকের যথার্থ অধিপতি শচীপতি অর্থাৎ মায়োপহিত চৈতন্য, অস্মিতা নহে। অস্মিতা বুদ্ধিতত্ত্ব, উহাও দৃশ্য জড় বা মায়িক। চৈতন্যের সত্তায়ই উহার সত্তা, নতুবা অস্মিতা বলিয়া কোন পৃথক্ সত্তাই নাই বা থাকিতে পারে না। কিন্তু অস্মিতা অসুর ; সে আপনাকে সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে দেখিতে পায়। আমাতেই ত জগৎ অবস্থিত, আমিই ত সর্ব্বভাবের একমাত্র অধিষ্ঠাতা, আমার আবার একজন প্রকাশক আছেন, ইহা সে কিছুতেই ভাবিতে পারে না, তাই অজ্ঞানবশতঃ ত্রিলোকের আধিপত্য স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে, যজ্ঞভাগও হরণ করে। এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড-যজ্ঞাগারে কর্ম্মরূপে প্রতিনিয়ত যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইতেছে, সে সমস্ত কর্ম্ম এবং তাহার ফল সে আপনাতেই দর্শন করে। "ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি" বলিয়া সমস্ত জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয়, যাবতীয় কর্ম্ম ও তাহার ফল আপনাতেই দর্শন করে ; কিন্তু সে বুঝিতে পারে না যে, এই আমি শব্দে আমি-বর্জ্জিত অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ আত্মরূপী আমিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমি বলিলে যথার্থ যাঁহাকে বুঝা যায়, সেই পরমাত্মাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অর্থাৎ যথার্থ পরমাত্মস্বরূপ পরিগৃহীত না হওয়া হেতু, অস্মিতাই আত্মরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। ইহাই শুম্ভ অসুরের যথার্থ রহস্য। যজ্ঞভাগ শব্দের অর্থ—হবিঃ বা অমৃত। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের ভাষ্যে "লোকাঃ কর্ম্মসূচামৃতম্" ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অমৃত শব্দের অর্থ করিয়াছেন "কর্ম্মফল।" যাবতীয় কর্ম্মফলরূপ যজ্ঞভাগ বা অমৃত অস্মিতা রূপ অসুর আপনাতেই অবস্থিত দেখিতে পায় ; তাই মন্ত্রে "ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতাঃ" বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তিমন্ত্রে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

তাবেব সূর্য্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥২॥
তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্নিকর্ম্ম চ ॥৩॥

অনুবাদ। সেই উভয় অসুর সূর্য্য চন্দ্র কুবের যম বরুণ পবন এবং বহ্নির আধিপত্য নিজেরাই অধিকার করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। সাধক যখন অস্মিতায় উপনীত হয়, তখন দেখিতে পায়, বেশ উপলব্ধি করিতে পারে—সূর্য্য চন্দ্র যম বরুণ প্রভৃতি দেবতাবর্গ আমারই বিশেষ বিশেষ প্রকাশ মাত্র (দেবতাতত্ত্ব দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে) বিষয়গ্রহণের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়বর্গ এবং তদধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ, সকলই অস্মিতার এক একটি ব্যূহমাত্র। বাহ্য পদার্থে সত্তা ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে সাধক এমনই একটা সত্তায় আসিয়া উপস্থিত হয়, যেখান হইতে আর রূপরসাদি বিষয়, কিংবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অথবা স্মৃতি, কল্পনা নিশ্চযাদি বৃত্তিগুলিকে আর আমি হইতে পৃথক্ কোন পদার্থরূপে মনেই করিতে পারে না! এ সকল যে আমারই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। ঐ দূরবর্ত্তী সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পর্য্যন্ত আমাতেই অবস্থিত; এই স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন এই স্থূলদেহ, সকলই আমার সত্তায় সত্তাবান্। আমিই এই বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছি। আমি উহাদিগকে বোধ করিতেছি, তাই উহারা আছে। আমার বোধ ব্যতীত উহাদের পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই। সুতরাং আমি উহাদের প্রভু, ধাতা ও সংহর্ত্তা। বহু সুকৃতিবলে, কঠোর সাধনার ফলে, সাধক এইরূপ ঈশ্বর-ক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারে; কিন্তু হায়! উহাও আসুরভাব বা অজ্ঞানমাত্র: কারণ সমগ্র জগৎ যাহা হইতে জাত, যাহাতে পরিধৃত এবং যাহাতে লীন হয়; সে বস্তু আমি নহে, অস্মিতা নহে, আত্মা—মা আমার। অস্মিতাও দৃশ্যমাত্র উহা আত্মারই সত্তায় সত্তাবান্, কিন্তু সে যথার্থ সত্তার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আপনাকেই জগৎকর্ত্তা বলিয়া বুঝিয়া লয়—তাইত সে অসুর।

এই অবস্থাটা ক্ষণিক-বিজ্ঞান-বাদের অবস্থার সহিত কতকটা তুল্য বলিয়াই মনে হয়। বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন—"জগৎ বলিয়া, দৃশ্য বলিয়া বা ভোগ্য বলিয়া পৃথক্ কিছুই নাই, আমাদের ক্ষণ-পরিণামী বিজ্ঞান সমূহ পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে।" সে যাহা হউক, সাধক

যতদিন ঠিক "আমি" বস্তুটিকে ধরিতে না পারে, ততদিন ঐরূপ ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। অধিকাংশ সাধকেরই এইরূপ হইয়া থাকে।

শুন, খুলিয়া বলিতেছি—আমি শব্দের দুইটি অর্থ। একটি বাচ্যার্থ, অপরটি লক্ষ্যার্থ। আমি বলিলে, বোধময় বিজ্ঞানময় সর্ব্বভাবের সহিত একান্ত অন্বিত যে আমিটি লক্ষিত হয়, উহাই আমির বাচ্যার্থ। আমরা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত অবস্থায় যাহা কিছু করি, যাহা কিছু ভাবি, তাহার প্রত্যেকটির সঙ্গে আমি আমি ভাব প্রকাশ পায়! সর্ব্বভাবের সহিত অন্বিত অর্থাৎ একান্ত মাখামাখি ঐ যে আমিটি, উহাই আমি শব্দের বাচ্যার্থ। আশঙ্কা হইতে পারে যে, সুষুপ্ত অবস্থায় ত আমরা কিছু করি না, কিছু ভাবিও না। সুতরাং তখন আমিত্ববোধও থাকে না। বাস্তবিক তাহা নহে, সুষুপ্ত অবস্থায়ও "আমরা কিছু জানি না" এইরূপ ভাবিয়া থাকি। সুতরাং তখনও "আমি অজ্ঞান" এইরূপ জ্ঞান থাকে। সে যাহা হউক, এই ত্রিবিধ অবস্থায় সর্ব্বভাবের সহিত একান্ত অন্বিত যে আমিটীকে পাওয়া যায়, উহাই আমি শব্দের বাচ্যার্থ।

আমির আর একটি অর্থ আছে, উহাকে লক্ষ্যার্থ কহে। সেইটি সর্ব্বভাবের অতীত। সর্ব্বভাবের সহিত তাহার যে কোনও সম্বন্ধ আছে, ছিল বা থাকিবে, এরূপ প্রতীতিই হয় না। সেই ভাবাতীত, বাক্যমনের অগোচর আত্মরূপী আমি যে আছেন, তাহা ঐ সর্ব্বভাবের সহিত অন্বিত আমিটিতেই বুঝাইয়া দেয়। সুতরাং আমি বলিলে এই বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ পরমাত্মবস্তুটিই লক্ষিত হয়। মনে রাখিও—এই যে আমিত্ব প্রতীতি, তাহাও সেখানে নাই; কারণ, যেখানে তুমি নাই, সে নাই অর্থাৎ দৃশ্য বা জ্ঞেয়বস্তুর সম্পূর্ণ অভাব, সেইখানে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বরূপতঃ আমি হইলেও, আমি শব্দটির প্রয়োগ সেখানে কিছুতেই করা যায় না। এইজন্যই পূর্ব্বে আমি বর্জ্জিত আমি বলিয়া আত্মবস্তুর ব্যাখ্যা করিয়াছি।

এস, একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এই বিষয়টি আরও সরলভাবে, বুঝিতে চেষ্টা করি। একজন বলিল, "অঙ্গুল্যগ্রে করিশতম্," অর্থাৎ

অঙ্গুলির অগ্রভাবে একশত হস্তী আছে! এস্থলে অঙ্গুলির অগ্রভাগে শত হস্তী থাকা একান্ত অসম্ভব বলিয়া, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশিত ভূখণ্ডে শত হস্তীর অবস্থান প্রতীতি হয়। ঠিক এইরূপ আমিশব্দ-প্রতিপাদ্য আপাতপ্রতীয়মান অস্মিতারূপ বস্তুটি যথার্থ আত্মা নহে। আত্মা যিনি, তিনি উহারও প্রকাশক। ইহা না বুঝিয়া সাধক যখন অস্মিতাকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তখনই উহা শুম্ভনামক অসুররূপে আত্মমহত্ত্ব—আত্মবিভূতি-সমূহ অপহরণ করিয়া বসে। সে অবস্থায় সাধকের মনে হয়—আত্মা ত নির্গুণ, সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত; তাহাকে লাভ করা না করা উভয়ই তুল্য; কিন্তু এই যে অস্মিতা, ইহাই ত যথার্থ ঈশ্বর; যাবতীয় ঈশ্বরধর্ম্ম এইখানেই ত প্রতিভাত; সুতরাং সর্ব্বভাবাতীত জড়বৎ প্রতীয়মান আত্মার সন্ধানে কি ফল? এইরূপ অজ্ঞান দ্বারা অসুর-ভাবের দ্বারা সাধক প্রতারিত হয়। হয়ত বা কখনও অস্মিতাকে ছাড়িয়া দিয়া, নির্গুণ আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি করিবার জন্য অবধান প্রয়োগ করিতে যত্ন করিয়া ভাবাতীত স্বরূপের একটা অস্ফুট সন্ধানও পায়। তখন ঐ অস্ফুট জড়বৎ বোধকেই বাক্যমনের অতীত ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বুঝিয়া লয়, এবং মনে করে—আমার বুঝিবার বা দেখিবার আর কিছু বাকী নাই! কিন্তু হায়! তখনও সাধক ঠিক বুঝিতে পারে না যে, ইহাও অসুরভাবমাত্র।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে বিজ্ঞানময়-কোষ বা বুদ্ধিতত্ত্বকে একান্ত আশ্রয়ণীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে মহর্ষি মেধস তাঁহাকেই অসুররূপে পরিব্যক্ত করিলেন। নিশুম্ভ প্রভৃতি পরিকরবৃন্দসহ এই মহাসুর শুম্ভ নিহত হইলেই জীবত্বের যথার্থ অবসান হয়—জীবমহীরুহের শেষ মূল বিচ্ছিন্ন হয়। এই বিজ্ঞানগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলেই জীব আনন্দনিকেতনে উপনীত হয়। একমাত্র গুরুকৃপা বা আত্মকৃপা ব্যতীত অপর কোনরূপ সাধনার বলে যে এই বিজ্ঞানগ্রন্থির ভেদ হইতে পারে, তাহা মনে হয় না। সর্ব্ববিধ সাধনা এখানে কেবল মায়ের করুণ কটাক্ষ বা তীব্র স্নেহাকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইবার আমরা শুম্ভাসুরের দেবাধিপত্য অপহরণের বিষয় আলোচনা করিব। মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—সূর্য্য চন্দ্র কুবের যম বরুণ পবন এবং বহ্নি প্রভৃতি দেবতাবৃন্দের আধিপত্য শুম্ভকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—চৈতন্যের যে বিশেষ বিশেষ ভাব, তাহাই দেবতা-নামে অভিহিত হয়। কিন্তু এখানে যখন অস্মিতাই আত্মরূপে বা ঈশ্বররূপে পরিগৃহীত, তখন দেবতাদিগের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্য অথবা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দের স্ব স্ব চিদ্‌ভাব অস্মিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত বা আচ্ছন্ন থাকে। দেবগণ স্বকীয় চিদ্‌ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া একান্ত জড় ও দৃশ্য অস্মিতার অংশরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। মনে কর সূর্য্য—ইনি প্রাণের অধিপতি দেবতা, আত্মার যে অংশে প্রাণময় বিশিষ্ট বোধ প্রকাশ পায়, তাহাই সূর্য্যদেব। আত্মার ঐ বিশিষ্ট বোধটিই সূর্য্যের সূর্য্যত্ব। শুম্ভ—অস্মিতা সেই আত্মবোধকে সম্যক্ তিরস্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং সূর্য্যদেবও স্বকীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। অন্যান্য দেবতার সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। একান্ত জড় অস্মিতা যখন আপনাকেই আত্মা বা চৈতন্য বলিয়া বুঝিয়া লয়, তখন প্রাণ মন প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা চৈতন্যরূপী সূর্য্য চন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ জড়ত্ব দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। শুম্ভ কর্ত্তৃক দেবতাগণের আধিপত্য হরণের ইহাই তাৎপর্য্য!

তত‍ো দেবা বিনির্দ্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ।
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ॥
মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম॥ ৪॥
তয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ॥ ৫॥

অনুবাদ। অনন্তর সেই মহাসুরদ্বয় কর্ত্তৃক বিতাড়িত রাজ্যভ্রষ্ট পরাজিত এবং সম্যক্ নির্জ্জিত ত্রিদশবৃন্দ স্ব স্ব অধিকার হইতে

বিচ্যুত হইয়া অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। (যেহেতু মহিষাসুরযুদ্ধের অবসানে) সেই অপরাজিতা দেবী তাহাদিগকে বর দিয়াছিলেন যে, তোমাদের যখনই কোন বিপদ্ উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিলেই তোমাদের অখিল পরমাপৎ বিনাশ করিব!

ব্যাখ্যা। শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচারে দেবতাবৃন্দ উৎপীড়িত পরাজিত ভ্রষ্টরাজ্য ভয়কম্পিত এবং অধিকারহীন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেবতা চৈতন্যেরই বিশিষ্ট অভিব্যক্তিমাত্র। চৈতন্য—চিতিশক্তি বা মা। দেবতাগণ জানেন, আমরা সর্ব্বতোভাবে মাতৃঅঙ্কে বা চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত। স্ব স্ব বিশিষ্টতামাত্র অবলম্বন করিয়া চিতিক্ষেত্রে বা স্বর্গরাজ্যে অবস্থান করাই দেবতাগণের প্রকৃতি; কিন্তু এখন অস্মিতা আপনাকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে; সুতরাং দেবতাগণ যখন স্ব স্ব অধিকারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখনই দেখিতে পান যে, তাঁহারা চৈতন্যের বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হইতে না পারিয়া, অস্মিতার বিশেষ ব্যূহরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। অস্মিতা ত আর যথার্থ চিদ্বস্তু নহে; সুতরাং সে দেবতাদিগকে চিদ্বস্তুর আস্বাদ প্রদান করিতে পারে না। যে অমৃতরস পান করিয়া দেবতাগণ অমরনামে অভিহিত, সে অমৃত এখন জড় অস্মিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত; তাই তাঁহারা দেবতা হইয়াও স্বর্গরাজ্য বা চিৎক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত।

আর একটু খুলিয়া বলিতেছি—এই দেখ, আমাদের দর্শন শ্রবণাদি যে কোন ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়, সকলের সঙ্গে সঙ্গেই অহংভাবটী ফুটিয়া উঠে। ঐ অহং বা আমিরূপী শুম্ভাসুরকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ ক্ষণকালের জন্যও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।

দেখ সাধক! তুমি যেখানে যে অবস্থায়ই থাক না কেন, সেইখানেই তোমার প্রতি, তোমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গের প্রতি, আমিরূপী শুম্ভাসুরের কি অসহনীয় সূক্ষ্ম অত্যাচার! "একমাত্র মা ব্যতীত আর কোথায়ও কিছু নাই" ইহা সহস্রবার বুঝিয়া লইলেও, কি

জানি, কোথা হইতে বুকের মধ্যে ঐ আমিটী ফুটিয়া উঠে ; তখন মা ও আমি, এই উভয়ের মধ্যে একটা সুদৃঢ় ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। তুমি ধ্যান ধারণাই কর কিংবা সমাহিত অবস্থায়ই থাক, তোমার ঐ সূক্ষ্ম আমিটী নির্ম্মল মাতৃবক্ষ হইতে তোমাকে অনেক দূরে রাখিয়া দিতেছে। তুমি শত চেষ্টায়ও সে ব্যবধানকে দূর করিতে পারিতেছ না। এ অত্যাচার কেবল আজ নয়, কোন্ অনাদিকাল হইতে তোমার হৃদয়-সিংহাসনে এই অস্মিতারূপী শুম্ভাসুর অধিষ্ঠিত হইয়া, তোমাকে আত্ম-রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, তাহার সন্ধান কে করিবে ? এ অত্যাচার জীব-হৃদয়ে চিরকালই বর্ত্তমান রহিয়াছে ; তবে যতদিন মধুকৈটভ, মহিষাসুর অর্থাৎ কামনা, বাসনা কিংবা কাম ক্রোধাদি রিপু-দলের অত্যাচার দূর করিবার জন্য সাধক ব্যাপৃত থাকে, ততদিন আর এ দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর থাকে না, সামর্থ্যও থাকে না। দেবতাবৃন্দ যে কেবল মধুকৈটভ ও মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত, এতদিন সাধক ইহাই বুঝিয়াছিল ; কিন্তু এখন মায়ের কৃপায়, শ্রীগুরুর অহৈতুক আশীর্ব্বাদে, বহিঃশত্রুর বা স্থূল ইন্দ্রিয়াদির অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছে, স্বরূপের দিকে তাকাইবার সামর্থ্য আসিয়াছে, তাই প্রশান্তচিত্তে একবার নিজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

এইবার দেবতাবৃন্দ স্ব স্ব অধিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন—আমরা এতদিন যে সকল অসুরভাব কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিলাম, ইহারা অতি স্থূল ; কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ যে আরও সূক্ষ্মতর উপদ্রব, এ যে বুদ্ধি বা অস্মিতার অত্যাচার। অস্মিতা কর্ত্তৃক আমাদের যথার্থ অধিকার অপহৃত হইয়াছে, আমরা সর্ব্বতোভাবে আত্মা বা অখণ্ড চিতিশক্তির আশ্রয়ে অবস্থিত ; কিন্তু হায় ! এখন এ কি দেখিতেছি—জড় আমিত্বই এখন আমাদের একান্ত আশ্রয়রূপে প্রতিভাত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পরে !

যথার্থই এই সূক্ষ্ম আমিত্ব বড় ভয়ানক জিনিষ। "মরিয়া না মরে

হায় এ কেমন বৈরী"। প্রথমে স্থূল দেহাভিমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে আমিত্ব বা স্থূল অহঙ্কার, তাহা শ্রীগুরুচরণে প্রণতি বা সম্যক্ শরণাগতির সাহায্যে শীর্ণ হইয়া যায়। তখন উহা মনোময় দেহে বা সূক্ষ্ম শরীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থায় নানারূপ সাধন ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, ক্রমে "আমি ভগবৎসাধনায় নিরত," "আমি একজন সাধক" এইরূপে অহংবোধ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। যদি বা শ্রীগুরুর অহৈতুক কৃপাবশে সাধকের অতুলনীয় সাহসের প্রভাবে সেখান হইতে উহাকে বিতাড়িত করা যায়, তারপরও কিন্তু দেখা যায় যে, তিনি—সেই "আমি" মহাশয় যথাপূর্ব্বভাবেই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী শক্তিমান্ হইয়াই, বুদ্ধি-ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া বসিয়া আছেন, ইনিই মহাসুর শুম্ভ। ইহাকে নিধন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার।

প্রথমে যে বুদ্ধি বা বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সাধন চলিতেছিল, পরে দেখা যায়, তাহাও আমিত্বদোষে দুষ্ট। সাধক প্রথম হইতে শিখিয়াছে—"আমি না গেলে মা আসেন না," তাই প্রাণপণে আমিত্বকে বিতাড়িত করিতে যত্নবান হয়। প্রথমে স্থূলদেহ হইতে তাড়া দিতে আরম্ভ করে, ক্রমে উহা ইন্দ্রিয় ও মনের গণ্ডী পার হইয়া আসিয়া বুদ্ধি-ক্ষেত্রে দাঁড়ায়। এখানে আসিয়া সাধক দেখিতে পায়—এই বিজ্ঞানময় কোষের আমিত্ব—মহান্, বিশাল, প্রায় ঈশ্বরতুল্য—যাবতীয় দেবাধিকার ইহারই করতলগত। ইহাকে বিতাড়িত করা সহজসাধ্য নহে। অথচ এই আমিত্ব দ্বারাই আত্মরাজ্য সম্যক্ তিরস্কৃত। স্থূলকথা এই যে, বুদ্ধি বা বিজ্ঞান বস্তুও যে জড় বা দৃশ্যমাত্র, এই অনুভব প্রথম প্রবিষ্ট সাধক-গণের লভ্য নহে, যাহাদের বিষ্ণু গ্রন্থিভেদ হইয়াছে, মাত্র তাহারাই বুদ্ধির জড়ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ। সে যাহা হউক, এই অবস্থায় সাধকের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গ নিরুপায় হইয়া কাতর প্রাণে অপরাজিতা দেবীকে—স্নেহময়ী মাকে স্মরণ করিতে থাকে। যাঁহাকে স্মরণ করিলে আর কখনও কাহারও নিকট পরাজিত হইতে হইবে না, তাঁহাকে স্মরণ করে।

একদিন ত এই মা-ই আমাদিগকে দুর্জ্জয় দৈত্য মহিষাসুরের হাত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন; সুতরাং এবারও এই অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাঁহার শরণাগত হইলে, তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে এই শুম্ভাসুরের হাত হইতে পরিত্রাণ করিবেন। শুধু তাহাই নহে, আমাদের এই অপরাজিতা-মা স্নেহপরবশ হইয়া পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, না না, বর দিয়াছিলেন—যখনই তোমাদের কোন আপদ্ উপস্থিত হইবে, তখনই আমাকে স্মরণ করিও, আমি তোমাদের অখিল পরমাপদ্ বিনাশ করিব। তবে আর আমাদের ভয় কি? সাধক! এস, আমরাও দেবতাগণের ন্যায় আবার মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠি। আমাদের সে কাতর ক্রন্দন নিশ্চয়ই মাতৃহৃদয়ে স্নেহের বন্যা লইয়া আসিবে, স্নেহবিহ্বলা মা, সেই বাক্য-মনের অতীত ক্ষেত্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে এই দুর্জয় আমিত্বের হাত হইতে পরিত্রাণ করিবেন। আমরা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেই মা আসিবেন। মা আমাদের এই বিপদের বিষয় পূর্ব্বেই জানিতেন, তাই ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে পরিত্রাণেরও সূচনা করিয়াছিলেন। আমাদের যে পরমাপদ উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ আমাদের পরম অবস্থাটি যে আপদ্‌গ্রস্ত হইবে, আমরা যে পরমাত্মস্বরূপ হইতে দূরে থাকিব, তাহা জানিয়াই মা আমাদিগকে সেই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। সুতরাং এস, সকলে সমাহিত-চিত্তে মাকে স্মরণ করিতে চেষ্টা করি।

ইতি কৃত্বা মতিন্দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।

জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। দেবতাগণ পূর্ব্বোক্তরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়া নগাধিপতি হিমালয়ে গমন করিলেন এবং সেখানে দেবী বিষ্ণুমায়াকে স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা দেবতাগণের হিমালয় গমনের আধ্যাত্মিক রহস্য দেহাত্ম-

বোধে অবতরণ। হিমালয়—দেহাত্মবোধ। (দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয় বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। সূক্ষ্ম বিজ্ঞানময় কোষে অসুরের অত্যাচার উপলব্ধি করিয়া, দেবতাবর্গ স্থূলে—দেহাত্মবোধে অবতরণ করিলেন। দেহাত্মবোধে অবতরণ না করিলে, মাকে বিশেষভাবে ডাকা অর্থাৎ স্তব করা চলে না। স্তব বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য: সুতরাং স্থূল দেহাত্মবোধ ব্যতীত স্তবাদিরূপ বিশেষ উপাসনা হইতেই পারে না!

এই স্থানে একটী বিষয় বলিয়া রাখিতেছি—স্থূল দেহই কর্ম্মক্ষেত্র, যাবতীয় কর্ম্ম স্থূলদেহকে আশ্রয় করিয়াই নিষ্পন্ন হয়। এই জন্য ইহা ধর্ম্মক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। সূক্ষ্ম দেহে কোন কর্ম্ম হয় না, হইতে পারে না; সুতরাং এই স্থূল দেহ হইতেই কর্ম্মের সাহায্যে এরূপ তীব্র বেগ অবলম্বন করিতে হয় যেন, তাহারই ফলে সূক্ষ্ম-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া, বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ পরমাত্মক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারা যায়। স্থূল দেহে অবস্থান করিয়া, যাঁহারা কর্ম্মহীনতার ভাণ করেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক ঊর্দ্ধগতিলাভের বেগ হইতে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইয়া থাকেন। সে যাহা হউক, এখানে দেখ, দেবতাগণকেও অপরাজিতার স্মরণ অর্থাৎ মায়ের স্তুতিমঙ্গল পাঠ করিবার জন্য স্থূল দেহবোধে অবতরণ করিতে হইল। স্তবই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহা পূর্ব্বে দ্বিতীয় খণ্ডে শক্রাদি স্তোত্রে পরিব্যাক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুমায়া শব্দের অর্থ পরে পাওয়া যাইবে।

দেবা ঊচুঃ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। দেবতাগণ বলিলেন—দেবীকে প্রণাম। মহাদেবী শিবাকে সতত প্রণাম। ভদ্রা প্রকৃতিকে প্রণাম। আমরা সংযত হইয়া তাঁহাকে (অবাঙ্‌মনোগম্যাকে) প্রণাম করি।

ব্যাখ্যা। দেখ সাধক! দেবতাগণ যাঁকে স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই "নমঃ" বলিয়া—আমিত্ববোধকে সর্ব্বতোভাবে বিনত করিয়া ফেলিলেন। আমরা সকলেই অল্প বিস্তর প্রণাম করিয়া থাকি। হিন্দুর ঘরের সন্তান আমরা আশৈশব প্রণামেই অভ্যস্ত। প্রথমে মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে, ক্রমে দেববিগ্রহ দেবায়তন প্রভৃতিকে প্রণাম করিতে শিক্ষা করিয়াছি। করকপাল-সংযোগ অথবা ভূমিতে মস্তকস্পর্শরূপ অনুষ্ঠান, কিংবা সমগ্র দেহটী ভূমিতলে নিপাতিত করিতে পারিলেই মনে করি, প্রণাম সিদ্ধ হইল। বাস্তবিক কি তাহাই? প্রণাম যে কত উচ্চ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ তত্ত্ব কি আমরা কখনও আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি? আমিত্বের উন্নত শির অবনত করিবার পক্ষে, প্রণামের মত সহজ উপায় কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেহাত্মবোধের গর্ব্বিত মস্তক কিছুতেই অবনত হয় না; তাই আমরা দিবারাত্রি সংসারের দাস হইয়া, রোগে শোকে অনুতাপে দারিদ্র্যে প্রপীড়িত হইতেছি। প্রণামরহস্য ভুলিয়া গিয়াই আজ এ দেশের লোক সকলের পদতলে বিলুণ্ঠিত। যাহারা প্রণাম করিতে জানে, তাহারা কখনও মানুষের দ্বারে মস্তক অবনত করে না! "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া মানুষের দ্বারে উপস্থিত হয় না।

প্রকৃষ্টরূপে অবনত হওয়ার নাম প্রণাম। "আমি" বলিয়া, যে অজ্ঞানের বোঝা লইয়া জ্ঞানের গর্ব্বে আমরা মাথা উন্নত করি, ঐ আমিত্ববোধটাকে—ঐ অজ্ঞানের ভারটাকে জ্ঞানের সমীপে সম্যক্ অবনত করার নামই যথার্থ প্রণাম। ঐ অজ্ঞান, আর তাহার সহিত একান্তভাবে অবস্থিত অক্ষমতা দীনতা দুর্ব্বলতাগুলিকে যে ব্যক্তি জ্ঞানময় সর্ব্বনিয়ন্তার পদতলে অবনত করিতে না পারে, তাহার প্রণামই হয় না। এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"। প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন এবং সেবা, এই ত্রিবিধ উপায়ে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করিতে হয়। সর্ব্বপ্রথমেই প্রণিপাত। অহংকর্তৃত্বজ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে নিপাতিত করার নামই যথার্থ

প্রণিপাত। যতদিন উহা না হয়, ততদিন বুঝিবে—এখনও প্রণাম শিক্ষা হয় নাই। তাই বলি সাধক, ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা, জগৎতত্ত্ববিশ্লেষণ, আত্মসাক্ষাৎকারলাভ প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলি উচ্চারণের অধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বে, কিছুদিন শুধু প্রণাম করিতে অভ্যাস কর। সমুদয় জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার ফলে যদি একটীবারও প্রণাম করিতে পার, বেশী নয়, জীবনে মাত্র একবার, এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি প্রণাম করিতে পার, তাহা হইলেই জীবন সফলতাময় হইবে; মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

কিন্তু কই পার কি? যতই মস্তক অবনত করিতে চেষ্টা কর না কেন, আমিত্বের উচ্চশির কিছুতেই অবনত হইতে চায় না। চেষ্টা কর—এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই তোমার গুরু, সকলেই তোমার মা, সকলেই তোমার পূজ্য। এইরূপে সহস্র-ভাবে সহস্রশীর্ষে মাকে প্রণাম করিতে থাক। ভয় নাই! প্রণাম করিতে গিয়া তোমাকে দীন হীন কাঙ্গাল সাজিতে হইবে না; বরং জগৎপতিকে এইরূপে প্রণাম করিতে পারিলে, আর কোন দিন কাহারও কাছে মস্তক অবনত করিতে হইবে না। শুধু জগৎপতিকে প্রণাম কর না বলিয়াই মানুষের দ্বারে, বিষয়ের দ্বারে কপাল ঠুকিতে হয়; অথচ অভাব বোধ বিদূরিত হয় না।

সে যাহা হউক, প্রণাম করিতে পারিলে, জীব কিরূপে উন্নতি লাভ করে, তাহা একটু ধীরচিত্তে ভাবিয়া, দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। যে মুহূর্ত্তে তুমি কাহাকেও প্রণাম কর, (অবশ্য শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত প্রণামের কথাই এ স্থলে বলা হইতেছে, কেবল ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে যে প্রণাম করা হয়, তাহা এ স্থলে আলোচ্য নয়) ঠিক সেই সময় তোমারই অন্তরে একটা গুরুত্বভাব ফুটিয়া উঠে। "যাঁহাকে প্রণাম করিতেছি, তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" এইরূপ একটা শ্রেষ্ঠত্বভাব অন্তরের একদিকে ফুটিয়া উঠে; আবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যদিকে স্বাপকর্ষ-বোধ অর্থাৎ "আমি উঁহা অপেক্ষা অপকৃষ্ট" এইরূপ একটা ভাব অন্তরে

বিকাশ পায়। ফলতঃ কি হয়? দেখ সাধক, প্রণাম করিতে গিয়া তুমিই লাভবান হও, তোমার চিত্তের একদিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্বভাব প্রকাশ পায়, আবার অন্যদিকে অহংবোধটা একটু অবনত হইয়া পড়ে। এইরূপে যাঁহাকে তুমি প্রণাম করিতেছ, তোমার সেই প্রণামের দ্বারা তাঁহার বিশেষ কিছু লাভ হউক বা না হউক, তুমি যে তদপেক্ষা বেশী লাভবান্ হও ইহা সুনিশ্চিত। কারণ, ঐরূপ প্রণাম করিতে করিতে চিত্ত উন্নতভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যায় ও অহঙ্কাররূপী মহাশত্রু নিপাতিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ আর একটী কথা এখানে বলিয়া রাখিতেছি—অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী কেহ কেহ মনে করেন যে, একজন মানুষকে গুরু বলিয়া—ঈশ্বর বলিয়া প্রণাম করা মূর্খতামাত্র। হায়! তাঁহারা জানেন না—যাঁহারা যথার্থ ই ঈশ্বর লাভের প্রয়াসী, তাহাদিগকে কোনও না কোন মনুষ্যশরীরকে গুরু বা ঈশ্বররূপে পরিগ্রহ করিতেই হইবে। এবং প্রত্যক্ষ ঈশ্বরবোধে প্রণাম করিয়া পূজা করিয়া আমিত্ববোধকে অবনত করিতেই হইবে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিবার উহাই প্রথম প্রবেশ-দ্বার। বর্ণপরিচয় শিক্ষাকালে বালকগণ যে প্রকার শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশগুলি নির্ব্বিচারে মানিয়া লয়, সেইরূপই আত্মরাজ্যে বিচরণেচ্ছু সাধক নিশ্চয়ই কোন মনুষ্যদেহকেই ঈশ্বররূপে নির্ব্বিচারে স্বীকার করিয়া লইবেন এবং তাঁহার চরণে অনাদিজন্মসঞ্চিত স্বকীয় আমিত্বের মহাভারটী সম্যক্ অর্পণ করিবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিবেন। ইহাই ভগবৎলাভের একমাত্র উপায়। শ্রুতি বলেন,—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" যিনি গুরুলাভ করিয়াছেন, তিনিই আত্মাকে জানিতে পারেন। আবার এ কথাও এখানে বলা আবশ্যক যে, কোনও তত্ত্বদর্শী পুরুষের নিকট হইতে কোনও বিশিষ্ট উপদেশ বা দীক্ষা গ্রহণ করিলেই গুরুলাভ হয় না। গুরুতে ঈশ্বরত্ববোধ এবং তিনিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও বাঞ্ছনীয় বস্তু, এইরূপ ভাব যাঁহার প্রাণে সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে, তিনিই যথার্থ সদ্‌গুরুলাভে ধন্য হইয়া থাকেন। সত্যই যিনি সদ্‌গুরুলাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা

থাকে না, বা থাকিতে পারে না। এইরূপ গুরুলাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রণতি শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

যাঁহার প্রণাম যত সত্য, যাঁহার প্রণাম যত সরলতাময়, যাঁহার প্রণাম যত কৃত্রিমতাহীন, তিনিই তত সহজে ও তত শীঘ্র অভীষ্টলাভে চরিতার্থ হইয়া থাকেন। ইহাই প্রণামের রহস্য; এমনই প্রণামের মাহাত্ম্য। তাই বলি সাধক, তোমরা খুব বড় বড় তত্ত্বকথা শুনিবার পূর্ব্বে, শুধু সরল প্রাণে প্রণাম করিতে অভ্যাস কর, আপনার আমিত্ব ভার গুরুর চরণে অর্পণ করিতে চেষ্টিত হও, তোমার জীবন নিশ্চয়ই আনন্দময় হইবে।

সে যাহা হউক, এইবার এস, আমরাও দেবতাগণের ন্যায় "নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ" বলিয়া মায়ের স্তুতি মঙ্গল পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাভিমানবোধ মাতৃচরণে উপহার দিতে প্রয়াস পাই।

নমো দেব্যৈ—দেবীকে প্রণাম। যিনি দ্যোতনশীলা, যিনি ক্রীড়াশীলা—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়লীলার অভিনয়নিরতা, যিনি জীব-জগদাকারে বিশ্বমূর্ত্তিতে সতত প্রকাশিতা, সেই নিত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপা মায়ের স্থূলমূর্ত্তিকে প্রণাম।

মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ—মহাদেবী শিবাকে সতত প্রণাম। এই প্রকট বিশ্বমূর্ত্তি অপেক্ষা যাহা সূক্ষ্ম, যে অনির্দ্দেশ্য সূক্ষ্ম মহতী শক্তিতে এই জগৎ বিধৃত প্রকাশিত ও অবস্থিত, সেই শিবা মঙ্গলময়ী মহাদেবী মাকে সর্ব্বদা প্রণাম।

স্থূলমূর্ত্তিকে প্রণাম করিতে করকপালাদি সংযোগরূপ বাহ্যানুষ্ঠান আবশ্যক; সুতরাং সতত প্রণাম সম্ভব নহে। কিন্তু মায়ের যে সূক্ষ্ম মহতী জগদাধারমূর্ত্তি, সে মূর্ত্তিকে সকল জীবই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বিনা চেষ্টায় সর্ব্বদাই প্রণাম করিয়া থাকে। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থায় জীব যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, তাহা দ্বারা একমাত্র সেই মহতী শক্তিরই পূজা বা প্রণাম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাই তিনি সতত প্রণামযোগ্যা। আজ আমরা সেই নিত্য-প্রণামযোগ্যা মঙ্গলময়ী

মহাদেবীর চরণে জ্ঞানতঃ প্রণত হইতেছি। মা! তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ। ভদ্রা—মঙ্গলময়ী প্রকৃতিকে প্রণাম। পূর্ব্বোক্ত স্থূল সূক্ষ্মের যিনি কারণ, সেই মূল প্রকৃতিরূপিণী জননীই ভদ্রা—সন্তানের মঙ্গলবিধায়িনী। জীব তাঁহারই কৃপায় প্রকৃতির পরপারে, স্থূল সূক্ষ্মের অতীত ক্ষেত্রে, মুক্তির মহাপ্রাঙ্গণে উপনীত হয়। এই ভদ্রা প্রকৃতিকে সতত প্রণাম করা যায় না; কারণ, ইনি অব্যক্ত, কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান্ সাধক ইহাঁর সন্ধান পাইয়া ইহাঁর চরণে অবনত হইতে পারেন।

নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্—আমরা নিয়ত হইয়া "তাঁহাকে" প্রণাম করি। ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে সম্যক্ নিয়মিত অর্থাৎ সংযত করিয়া, যিনি তৎপদগম্য—বাক্য মনের অগোচর তাঁহাকে প্রণাম করি। তিনি যে কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, মনে ধারণা করা যায় না, বুদ্ধিদ্বারাও সম্যক্ পরিগ্রহ করা যায় না। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণের অতীত সেই "তাঁহাকে"—সেই অজ্ঞেয়া জ্ঞস্বরূপা নিত্যসত্যস্বরূপা জননীকে প্রণাম।

এই মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতাগণ প্রথমে "নমো দেব্যৈ" বলিয়া মায়ের স্থূল মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন; "মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ" বলিয়া মায়ের সূক্ষ্ম স্বরূপকে প্রণাম করিলেন; "নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ" বলিয়া কারণরূপিণী মাকে প্রণাম করিয়া, "নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্" বাক্যে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণাতীত একমাত্র তৎপদগম্যা নির্গুণস্বরূপাকে প্রণাম করিলেন। ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসমূহ সম্যক্ নিয়মিত না হইলে, সেই নিরঞ্জন সত্তার কিঞ্চিন্মাত্র আভাসও পাওয়া যায় না; তাই তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়মিত করিয়া লইতে হয় বলিয়াই মন্ত্রে "নিয়তাঃ" পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই অধ্যায়টী প্রণতিপ্রধান। কেবল প্রণাম—কেবল প্রণাম।

সাধক, এস—আমরাও ঠিক এমনই করিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতে অভ্যাস করি, আমাদের জীবন ধন্য হইবে।

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। রৌদ্রাকে প্রণাম। নিত্যা গৌরী ধাত্রীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। জ্যোৎস্না ও ইন্দুরূপিণী মাকে এবং সুখস্বরূপাকে সতত প্রণাম।

ব্যাখ্যা। রৌদ্রা—রুদ্রশক্তি সংহারিণী মহাশক্তি। পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত ত্রিগুণাতীতা ভাবাতীতা তৎপদগম্যা নিরঞ্জনা মাকে আমার প্রণাম করিতে গিয়া বেশীক্ষণ অবস্থান করা যায় না, মুহূর্ত্তমধ্যে আবার জগদ্‌ভাবে অবতরণ করিতে হয়। সেই নিরঞ্জনক্ষেত্র হইতে জগদ্‌ভাবে অবতরণ করিবার সময়ে মায়ের রৌদ্রা বা সংহারিণী তামসী মূর্ত্তির কথাই প্রথমে মনে পড়িয়া যায়; কারণ, ঐ সংহারিণী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই জগদতীত সত্তায় উপনীত হইতে হয়। তাই দেবতাগণ এই মন্ত্রের প্রথমে "রৌদ্রায়ৈ নমঃ" বলিয়া প্রলয়কারিণী রুদ্রশক্তিকে প্রণাম করিতেছেন। অর্থাৎ প্রলয়-কুক্ষিগত সর্ব্বভাবের অন্তরালে যে বস্তুটীর উপলব্ধি হয়, তাহা নিত্য। তাহার হ্রাস বৃদ্ধি ক্ষয় উদয় কিছুই নাই। তারপর ঐ নিত্য বস্তুতে শুভ্র সত্ত্বগুণের অবভাস হইতে থাকে। সে স্বরূপটী অতীব রমণীয়। তাই মা এখানে গৌরীনামে অভিহিতা। তারপরই সর্ব্বজগদ্‌বিধৃতিভাবটী ফুটিয়া উঠে; তাই মা এখানে ধাত্রী। এইরূপে ধাত্রী পর্য্যন্তকে প্রণাম করিয়া জ্যোৎস্না ও ইন্দুরূপিণী মাকে প্রণাম করা হইয়াছে। ইন্দু—মন, আর জ্যোৎস্না তাঁহার ব্যাপ্তি বা দিক্‌সত্তা, অর্থাৎ সর্ব্বতঃ উদ্ভাসিত বিষয়সমূহ। (মন ও বিষয় যে অভিন্ন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) এইরূপ সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবের ভিতর

দিয়া যাঁহারা মাকে, আত্মাকে প্রণাম করিতে বা দর্শন করিতে সমর্থ, তাঁহাদের নিকট সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই মায়ের সুখময়ী মূর্ত্তির বিকাশ হয়; তাই—সুখায়ৈ সততং নমঃ।

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" যাহা মহান্, তাহাই সুখ। মা যখন মনোরূপে দিক্ কালরূপে বিষয়রূপে আপনাকে কল্পনা করেন, অর্থাৎ ইন্দুরূপে জ্যোৎস্নারূপে প্রকাশিত হন, তখনই তাঁহার সুখস্বরূপটী বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। মহত্ত্বের উপলব্ধিই সুখ। পক্ষান্তরে যাহা অণুও নহে, মহৎও নহে, তাহা পরমার্থতঃ সুখ-স্বরূপ হইলেও, সে সুখ বিশিষ্ট-ভাবে ভোগ্য নহে; কারণ, সেখানে ভোগ্য ভোক্তৃভাব থাকে না। তাই বিশিষ্টভাবে সুখের ভোগ করিতে হইলে মহত্ত্বের উপলব্ধি চাই। মা যখন বিরাট্ মনোরূপে আপনাকে কল্পনা করেন, অন্য কথায় জীব যখন ঈশ্বরত্বে উপনীত হয়, তখনই এই মহৎস্বরূপের বা ভূমা সুখের আস্বাদ পায়। আর সাধারণ জীব, বিষয়ভোগের মধ্য দিয়া—ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থসমূহের মধ্য দিয়া অতি অল্পমাত্র সুখের আভাস পায়। সুতরাং জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলে সুখেরই অন্বেষণ করে, সুখেরই সেবা করে; তাই সকল জীব সতত ইহাঁকেই প্রণাম করে। এই তত্ত্বটী লক্ষ্য করিয়াই দেবতাগণ "সুখায়ৈ সততং নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিলেন। এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, সাধকগণও ঠিক পূর্ব্বোক্ত ভাবেই স্তরে স্তরে মায়ের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ স্থূল বিশ্বরূপে, পরে সূক্ষ্মে মহতী শক্তিরূপে, তারপর অব্যক্ত বীজ বা কারণরূপে, সর্ব্বশেষে গুণাতীত বা নিরঞ্জনস্বরূপে। আবার গুণাতীতস্বরূপ হইতে সাধকগণ কি ভাবে অবতরণ করেন, তাহাও এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে,—গুণাতীতস্বরূপ হইতে প্রথমে রৌদ্রা বা সংহারিণী শক্তিতে অবতরণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে নিত্যত্বের উপলব্ধি ও সত্ত্বগুণের উদ্বোধ হয় (ইহাই গৌরীমূর্ত্তি); ক্রমে জগদ্বীজের বিধৃতিভাবে (ইহা ধাত্রীমূর্ত্তি), পরে মনে ও বিষয়ে (ইহাই ইন্দু ও জ্যোৎস্নারূপ) অর্থাৎ জগদ্ভাবে

নামিয়া আসেন। তখন কি জগদ্ভাবে, কি জগদতীত ভাবে, সর্ব্বত্র অখণ্ড সুখময় সত্তার সন্ধান পাইয়া অন্তরে বাহিরে, ব্যক্তে অব্যক্তে স্থূলে সূক্ষ্মে সর্ব্বত্র আনন্দময় সত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া, "সুখায়ৈ সততং নমঃ" বলিয়া সাধক ধন্য হয়।

জীব! মনুষ্য! তুমি নিয়ত সুখের অন্বেষণ করিতেছ, কাম কাঞ্চন ব্যতীত সুখ নাই, এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে স্থির বিশ্বাসবান্ হইয়া তৃষিত মৃগের মত সুখের আশায় ধাবিত হইতেছ। কামকাঞ্চনের সেবা ও সঞ্চয় করিতে গিয়া, কতই না ক্ষত বিক্ষত হইতেছ, কিন্তু সুখ কি পাইয়াছ? না, পাও নাই। এখনও সুখ বলিয়া বস্তুটী বুঝিতেই পার নাই। আগে সুখস্বরূপাকে দেখ; তারপর জগতের কেবল কামিনীকাঞ্চনে কেন, ধূলিমুষ্টিসম্ভোগেও অতুল সুখের আস্বাদ পাইবে। আর কতকাল ভ্রান্তির বশে থাকিবে? এস, সুখের সন্ধান লও। যথার্থ সুখী হইবে। তুমিও আনন্দে দেবতাগণের মত বলিতে পারিবে—"সুখায়ৈ সততং নমঃ"। দেখ, দেবতাগণ স্বর্গভ্রষ্ট পরাজিত হৃতসর্ব্বস্ব; তবু বলিতেছেন—"সুখায়ৈ সততং নমঃ"। তোমারও এইরূপ হইবে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইলেও বলিবে—"সুখায়ৈ সততং নমঃ"। আবার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্তৃত্ব পাইলেও বলিবে—"সুখায়ৈ সততং নমঃ"। কারণ, সুখ ভিন্ন যে কোথাও কিছুই নাই। যাহাকে অসুখ বলিয়া বুঝিতেছ, উহাও যে সুখমাত্র, এইটী বুঝিতে পার না বলিয়াই অসুখের ভয়ে পলায়মান হইয়া, কোথায় সুখ বলিয়া, অন্ধের মত ধাবিত হও। এস, সুখের সন্ধান মিলিবে; নিত্য সুখ, অপরিণামী সুখ, যাহার ভোগে বিতৃষ্ণা নাই, অথচ পূর্ণ পরিতৃপ্তি আছে। তুমি চাও কি?

কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমোনমঃ।
নৈঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ সর্ব্বাণ্যৈ তে নমোনমঃ॥ ৯॥

অনুবাদ। কল্যাণীকে প্রণাম, বৃদ্ধি ও সিদ্ধিরূপিণী মাকে প্রণাম, তুমি নৈঋ'তী, ভূভৃৎদিগের লক্ষ্মী ও সর্ব্বাণী, তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি।

ব্যাখ্যা। কল্যাণী—মঙ্গলদায়িনী। সুখময়ী মাকে একবার প্রণাম করিতে পারিলে, আর অকল্যাণ বলিয়া কিছু থাকে না; তখন সাধক যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, কেবল কল্যাণমাত্রই দেখিতে পায়। মা যাহার নিকট কল্যাণী মূর্ত্তিতে নিত্য প্রকটিতা, তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ অভ্যুদয় এবং সিদ্ধি অর্থাৎ সফলতা—অভীষ্টপূরণ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে, কি সংসারক্ষেত্রে, কি সাধনারাজ্যে, সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি ও সিদ্ধিরূপে মাতৃপ্রকাশ হইয়া থাকে। তাই, সাধক তাহাকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারে না। সাধারণ মানুষের যখন জাগতিক অভ্যুদয় অথবা অভীষ্টসিদ্ধি হইতে থাকে, তখন তাহারা লক্ষ্য করে না, অথবা লক্ষ্য করিতে পারে না যে, একমাত্র মা ই ঐ বৃদ্ধিসিদ্ধিপ্রভৃতি-রূপে আবির্ভূ'ত হইয়া থাকেন; তাই, তাহারা ঐ সকল অভ্যুদয়াদি হইতে অচিরেই বঞ্চিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ মা তখন সন্তানকে জ্ঞানালোক প্রদান করিবার জন্য, ধীরে ধীরে সন্তানের নিকট প্রতিকূলা শাসনময়ী মূর্ত্তিতে আবিভূ'ত হইতে থাকেন। তখন মায়ের নাম হয় নৈঋ'তী—রাক্ষসী। মা যখন সন্তানকে রাক্ষসী প্রকৃতিরূপে কোলে লইয়া বসিয়া থাকেন, তখনই তাহাদের কার্য্যপ্রণালী আচার ব্যবহার রাক্ষসোচিত হইতে থাকে। রাক্ষসীমূর্ত্তি মায়ের অঙ্কে অবস্থিত সন্তানের স্থূল বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। মাত্র আহার নিদ্রা ভয় প্রভৃতি পশু-বৃত্তির অনুশীলন করিয়াই তাঁহারা পরম তৃপ্তিলাভ করে। গীতায়ও উক্ত হইয়াছে—"মনুষ্যদেহ-আশ্রিত আমাকে যাহারা অবজ্ঞা করে, তাহারা রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি লাভ করে"। তাই, আমরা দেখিতে পাই,

একদিকে যেমন মায়ের কল্যাণী মূর্ত্তিপ্রকটিত হইয়া মানুষকে বৃদ্ধি সিদ্ধি প্রভৃতি সফলতা প্রদান করে; অন্যদিকে তেমনই নৈঋ্র্তী মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া মানুষকে রাক্ষসরূপে পরিণত করে। অনির্ব্বচনীয়া মা তুমি- একমাত্র তোমাতেই এই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের যুগপৎ অবস্থান সম্ভব। মা, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ—অনেকে ভূভৃৎলক্ষ্মী শব্দের রাজলক্ষ্মী অর্থ করিয়াছেন; তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই; কারণ রাজশ্রীরূপেও একমাত্র মা ই ত প্রকটিত হইয়া থাকেন। আমরা কিন্তু মা, তোমার কৃপায় ভূভৃৎলক্ষ্মী শব্দের অন্য অর্থও দেখিতে পাই। ভূশব্দের অর্থ ক্ষিতিতত্ত্ব, ভৃৎশব্দের অর্থ ধারণকারী। যাহারা ক্ষিতিতত্ত্বকে ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত আমিত্ববোধের সহিত জড়াইয়া রাখে, তাহারাই ভূভৃৎ; সুতরাং ভূভৃৎশব্দের অর্থ জড়দেহাভিমানী জীব, তাহাদের লক্ষ্মী অর্থাৎ তদধিষ্ঠাতৃচৈতন্য। লক্ষ্মীশব্দের অর্থ শোভা বা সম্পৎ: চিদ্‌বস্তুই যথার্থ শোভা। যতক্ষণ জীবদেহে চৈতন্যসত্তার অভিব্যক্তি থাকে, ততক্ষণই তাহা শোভাবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। পক্ষান্তরে, শবদেহকে নানারূপ বসন-ভূষণ দ্বারা সজ্জিত করিলেও তাহা শোভাময় হয় না। তাই, জীবিত মনুষ্যের নামের পূর্ব্বেই লক্ষ্মীশব্দবাচক শ্রীশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম—মা! তুমি জড়ত্বাভিমানী জীবদিগের নিকট চৈতন্যরূপে প্রাণরূপে লক্ষ্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক। মাগো ইহাই তোমার ভূভৃৎলক্ষ্মীমূর্ত্তি। আবার সর্ব্বাণী বা প্রলয়ের দেবতা শিবের শক্তিরূপেও তুমিই সকলকে প্রলয়কবলে গ্রহণ করিয়া থাক। মা, এইরূপ একদিকে তুমি ভূভৃৎলক্ষ্মী অর্থাৎ জীবচৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া কত শত জন্ম পরিগ্রহ কর, আবার সর্ব্বাণীরূপে সকলকে মৃত্যুর করাল কবলে প্রেরণ কর। মা! একদিকে তোমার কল্যাণীমূর্ত্তি, বৃদ্ধি-সিদ্ধিদায়িনী; অন্যদিকে তোমার নৈঋতীমূর্ত্তি জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারধর্ম্মরূপিণী। তোমার এই পরস্পর একান্তবিরুদ্ধ মূর্ত্তিদ্বয়কে প্রণাম।

এই মন্ত্রস্থ 'তে' পদটির অর্থ তোমাকে। সম্মুখে মাকে দেখিতে না পাইলে "তুমি" শব্দের ব্যবহার করা চলে না। তাই আশঙ্কা হয়, যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠ নহে, তাঁহারা এ সকল তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারিবেন কি ?

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। দুর্গা দুর্গপারা সারা সর্ব্বকারিণী খ্যাতি কৃষ্ণা এবং ধূম্রাকে সতত প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, তুমি দুর্গা—দুর্জ্ঞেয়তত্ত্বস্বরূপা; কারণ, যতক্ষণ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিবোধ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। তুমি দুর্গপারা। দুর্গ হইতে—এই সংসার হইতে তুমিই পার করিয়া থাক। যতদিন সর্ব্বভাবাতীতা তোমাকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করা না যায়, ততদিন দুর্গম সংসার হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। আবার এই সংসারক্ষেত্রে সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়া তোমার যে স্বরূপটি ফুটিয়া উঠে, উহা চঞ্চলতাময়—পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং অসার। কিন্তু তুমি সারা—স্থিরাংশরূপিণী। এত বড় বৈচিত্র্যময় চঞ্চল জগৎ যে স্থির সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও তুমি। তাই মা, তুমিই সারা অর্থাৎ নিত্যা। সচ্চিদানন্দরূপিণী।

মা, তুমি সর্ব্বকারিণী। এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ সর্ব্বভাব তুমি প্রকাশ করিয়া থাক; তাই সর্ব্বকারিণী বলিলে একমাত্র তোমারই পরমেশ্বরীমূর্ত্তির কথা মনে পড়িয়া যায়। যাঁহারা বলেন, চিতিশক্তিরূপিণী তুমি স্বরূপতঃ নির্গুণা; সুতরাং তুমি কখনও সর্ব্বকারিণী হইতে পার না; মায়া বা প্রকৃতিই সর্ব্বকারিণী, তাঁহারা মায়াকে বা প্রকৃতিকে তোমা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া ফেলেন। কার্য্যতঃ অদ্বিতীয়ত্ব ভঙ্গ হয়। যদিও মায়াকে সত্তাহীন অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অদ্বিতীয়ত্ব

রক্ষা করিতে চেষ্টা করা যায় বটে, কিন্তু উহাতেই কি সকলে নিঃসংশয় হইতে পারেন! বর্ত্তমান জগৎ যুক্তির অন্বেষী। যাহা যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে স্বীকার করা যায় না, এরূপ বিষয় বেদবাক্য হইলেও এ যুগে তাহা সাদরে পরিগৃহীত হয় না। তাই আমাদের এই পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির মাপ কাঠি দিয়া, আজ তোমাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মাগো, পূর্ব্বে (দ্বিতীয় খণ্ডে) বলিয়াছি—তোমার কথা আলোচনা করিতে গিয়া যে, তোমাকে বুঝিয়া ফেলিব, অথবা অন্যকে বুঝাইতে পারিব, এরূপ ধৃষ্টতার আশা কখনও করি না। তোমাকে পাওয়া—বুঝিতে পারা, সে তোমার কৃপা ব্যতীত আর কিছুতেই হয় না, হইতে পারে না। তবু কেন আলোচনা করি? একটা পরম লাভ আছে, অন্ততঃ জিহ্বার জড়তা বুদ্ধির মলিনতা দূর হইবেই।

এস সাধক! এইবার আমরা আমাদের মাকে একটু বুঝিতে চেষ্টা করি—মা কি বস্তু। একমাত্র আনন্দই মায়ের স্বরূপ। শ্রুতি বলেন "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌বিভেতি কুতশ্চন", আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। আনন্দ বস্তুটির অনুভব জীবমাত্রেরই অল্পাধিক আছে। জগতে কাম্য-বিষয় অধিগত হইলে ক্ষণকালের তরে একটা আনন্দভাব বুকে ফুটিয়া উঠে। একবার ঐ ভাবটা স্মরণ করিতে চেষ্টা কর। ঐ যে ক্ষণিক আনন্দের আভাস, উহা "জন্য আনন্দ", অর্থাৎ বিষয়-ইন্দ্রিয়ের সংযোগজন্য এক প্রকার চিত্তবিকার মাত্র। বিষয়ানন্দ যে স্বরূপানন্দেরই আভাস মাত্র, একথা পূর্ব্বে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সে যাহা হউক, যদি তোমাকে এমন একটা অবস্থায় লইয়া যাওয়া যায়, সেখানে কোনরূপ বিষয়সংস্পর্শ নাই, কোন চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, ত্যাগ নাই, গ্রহণ নাই, দর্শনশ্রবণাদি ব্যাপার নাই, অথচ কেবল আনন্দই আছে, তা হ'লে তুমি যে স্বরূপে উপনীত হইবে, উহাই মায়ের স্বরূপ বলিয়া বুঝিয়া লও। এইবার ধীরভাবে অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর। আনন্দ একপ্রকার অনুভব বা বোধ। যখন আমাদের বোধ আনন্দমাত্রস্বরূপে প্রকাশ পায়, তখনই আমরা আনন্দ

বস্তুটির উপলব্ধি করিতে পারি। উহা কেবল অনুভবানন্দস্বরূপ। ঐ কেবলানন্দস্বরূপ বস্তুটিতে কোনরূপ ভেদ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ উহার সজাতীয় অপর কোন আনন্দ নামক বস্তু নাই। ঐ আনন্দের বিজাতীয় কোন কিছু আছে বা থাকিতে পারে, এরূপ কোন উপলব্ধিও সেখানে উদ্বুদ্ধ হয় না। তারপর উহার স্বগত ভেদও নাই, অর্থাৎ উহাতে কোনরূপ অঙ্গাঙ্গীভাব অথবা ভোক্তৃ-ভোগ্যাদিভাব নাই। কেবল আনন্দ! কেবল আনন্দ! বিশুদ্ধ আনন্দ! ইহাকেই শ্রুতি "একমেবাদ্বিতীয়ম" বলিয়াছেন। এই আনন্দেরই অপর নাম প্রেম বা রস। বেদসমূহ ইহাকেই "রসো বৈ সঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমের আধার বলিয়া কোন ভেদ নাই। রসিক, রস ও রস্য বলিয়া কোন বিভিন্নতা নাই, কেবল প্রেম—কেবল রস। কি ভাষায় প্রকাশ করিব? ওগো, সে যে ভাষার বাহিরে! কেমন করিয়া বুঝাইব? সে যে বুঝিবার বাহিরে। তবু কিন্তু বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়। আবহমানকাল হইতেই এইরূপ বুঝিবার বুঝাইবার চেষ্টা চলিতেছে ও চলিবে। বেদসমূহ ইঁহাকে "অশব্দমস্পর্শমরূপ-মব্যয়ম্" "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্" ইত্যাদি নেতি নেতিমুখে বুঝাইতে, কতই না চেষ্টা করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, ইহাই মায়ের আমার নির্গুণস্বরূপ। এখানে একমাত্র আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনরূপ বিশিষ্টতা বা ভাবরঞ্জনা নাই; তাই এখানে মা আমার নিত্যা শুদ্ধা নিরঞ্জনা।

এই নির্গুণ নিরঞ্জনস্বরূপের উপরেই মায়ের দ্বিবিধ মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। একটি ঈশ্বরত্ব অন্যটি জীবত্ব। এই উভয়ের মধ্যে প্রথমে আমরা ঈশ্বরত্বরূপ মাতৃমহত্ত্বের আলোচনা করিব। উপনিষৎ বলেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি। আনন্দ হইতেই এই ভূতসমূহের উৎপত্তি, আনন্দেই উহাদের অবস্থান এবং একমাত্র আনন্দই জীবের প্রলয়স্থান। এখানে একটি সংশয় উপস্থিত হয়—পূর্ব্বে যে আনন্দকে কেবলানন্দ বা সর্ব্বভাব-বর্জ্জিত নির্গুণ বলা হইয়াছে, আর এই যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতুস্বরূপ আনন্দ, এই উভয়

আনন্দই এক অথবা বিভিন্ন? এই আশঙ্কার উত্তরে একদল বলেন যে, তুমি যাহাকে নির্গুণ আনন্দ বলিতেছ, উহা বাক্যমাত্র; কারণ আনন্দ কখনও নির্গুণ হইতে পারে না। নির্গুণ শব্দের অর্থ নির্ব্বিশেষ গুণ। আনন্দ একটি গুণ বা ধর্ম্মবিশেষ, উহা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সূর্য্য হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই। আর একদল বলেন—আনন্দ হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তি যাঁহার তিনিই (অর্থাৎ যিনি এই হ্লাদিনীশক্তিমান্, তিনিই) ঈশ্বর। সুতরাং কেবল আনন্দ কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না ইত্যাদি। এইরূপ বহু মতবাদ প্রচলিত আছে। এই সকল বিভিন্ন মতের মীমাংসা অতি সহজ। যিনি যাহা বলেন, তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে আর কোন গোলই থাকে না; কাবণ ব্রহ্মবস্তু যে কি নয়, তাহা বলা যায় না। ব্রহ্ম পূর্ণ; তাহাতে কোনরূপ অভাবকল্পনা হয় না; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলেন, তাহাই সত্য। যাহার নিকট ব্রহ্ম যেরূপভাবে প্রকাশ পান, তাহার মুখ দিয়া সেইরূপ ভাষাই নির্গত হয়। এমন কি, যদি কেহ বলেন—ব্রহ্ম নাই, তাহাও সত্য; কারণ, সেখানে তিনি ঐ "নাস্তি" রূপেই প্রতিভাত হইতেছেন। কেহ কোনপ্রকারে তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারে না, ইহাই ব্রহ্মের বিশেষত্ব। তিনি যে কেবল এইরূপ অশক্য-প্রতিষেধ, তাহা নহে; আবার আলোক অন্ধকার, জ্ঞান অজ্ঞান, বিদ্যা অবিদ্যা, সগুণ নির্গুণ, সুখ দুঃখ ইত্যাদি পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহেরও একমাত্র আধার; এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-সমূহ একমাত্র ব্রহ্মেই যুগপৎ অবস্থিত। এ বিষয়ে আরও বিশেষত্ব এই যে, পূর্ব্বোক্ত অত্যন্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্মরূপ আধারে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইলেও, তাঁহার নিরঞ্জনস্বরূপটীর কিছুই ব্যাঘাত হয় না। কেবলানন্দরূপ ব্রহ্ম স্বকীয় নিরঞ্জনস্বরূপটী সর্ব্বথা অক্ষুন্ন রাখিয়াও যুগপৎ ঈশ্বর ও জীবরূপে প্রকটিত হইতে পারেন, ইহাই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব।

এই নির্গুণ আনন্দস্বরূপ বস্তু কিরূপে ঈশ্বর বা সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়া প্রকাশ পান, এইবার আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। আচ্ছা, ঐ যে নির্গুণ আনন্দ, উহাতে অনুভব বলিয়া একটা কিছু নাই বা

থাকিতে পারে না, ইহা বলিতে পার কি ? আনন্দ আছে, অথচ অনুভব-শক্তি নাই ; এমন হয় কি ? যদি বল নির্গুণ বস্তুতে এরূপ একটা শক্তি স্বীকার করিলেই ত আনন্দের স্বগত ভেদ হইয়া পড়ে এবং দ্বৈতাপত্তি হয়। না, তাহা হয় না। আনন্দ যখন স্বয়ং স্ব কে প্রকাশ বা অনুভব করেন, অর্থাৎ একমাত্র আনন্দবস্তুই যখন নিজে নিজেকে ভোগ করেন, তখন এই ভোগ্যভোক্ত্রাদিরূপ যে ভেদ, তাহা কিছুতেই প্রতীতিযোগ্য হয় না। সুতরাং সে অবস্থায় এই বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ বস্তুতে ভোগ্য ভোক্তা প্রভৃতি ভাব কিছুই নাই ; ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

একটী কথা এখানে বলিয়া রাখি, যদিও ইহাতে কোন সংশয় থাকে তথাপি এখন স্বীকার করিয়া লও, মানিয়া লও যে, নির্গুণ বিশুদ্ধ আনন্দনামক এক বস্তু আছে, উহাতে কোনপ্রকার ভেদ নাই। আচার্য্য শঙ্করকেও এই নির্গুণ সগুণের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া, একটা "অনির্ব্বচনীয়" শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ঐ অনির্ব্বচনীয় মানেই "স্বীকার করিয়া লওয়া"। আবার মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবও "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" কথাটি বলিয়া, এই স্বীকার করিয়া লওয়াই, প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন। হ্যাঁ, তবে এ কথা সত্য যে, যদি এখন ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পার এবং শাস্ত্র ও গুরূপদিষ্ট উপায়ে তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তাঁহার কৃপায় একদিন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে যে, আনন্দ বস্তু নির্গুণ হইতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে—অখণ্ড জ্ঞান ও অসীম শক্তি উহারা অভিন্ন বস্তু। জ্ঞানই শক্তি অথবা শক্তিই জ্ঞান। যাঁহারা এই কথাটি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই কিংবা অনুশীলনের সাহায্যে একটুও অনুভব করেন নাই, তাঁহারা এই আনন্দতত্ত্ব ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবেন কি ?

আচ্ছা, পূর্ব্বে বিশুদ্ধ জ্ঞান বলিয়া যাহা বুঝিয়াছ, তাহা শুধু জ্ঞান নয়, এইবার উহাকে আনন্দ বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। চিদ্‌বস্তু কেবল

চিৎ নহে, আনন্দই উহার স্বরূপ। আনন্দ বলিলেই আনন্দের অনুভব ও সত্তা একান্তভাবে প্রতীতি গোচর হইতে থাকে। ঐ অনুভবেরই নাম চিৎ এবং সত্তাই সৎ। সুতরাং আনন্দ শব্দের অর্থ করিলেই সৎ চিৎ ও আনন্দ বস্তু পাওয়া যায়। এই তিনটী বস্তু বাস্তবিক তিনটী নহে, একটীই। সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ; একটি বস্তুরই তিনটী নাম। ইহা পূর্ব্বেও অনেকবার বলা হইয়াছে। এই আনন্দ যেখানে স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ, সেখানেও উহাতে চিৎ বা অনুভবশক্তি এবং সত্তা আছে। যে অনুভবশক্তি বা চৈতন্যের অভিব্যক্তি না থাকিলে আনন্দ যে আছে, তাহার প্রতীতি হয় না, সেই অনুভবশক্তিটী যখন বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন উহার উভয় পার্শ্বে কর্ত্তা ও কর্ম্মরূপ দুইটী ভাবও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ অনুভব, অনুভবের কর্ত্তা এবং অনুভাব্য বিষয়, এই তিনটী ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আনন্দ বস্তুতে এইরূপ ত্রিবিধ ভাব প্রকাশ পাইলেও স্বরূপতঃ কোনই ভেদ হয় না। এক আনন্দ বস্তুই স্বয়ং স্বকে অনুভব করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আনন্দ যেখানে আনন্দকে বিশেষভাবে অনুভব করেন, সেইখানেই অদ্বিতীয় বস্তুতে স্বগতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইহাই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ নামে আখ্যাত হয়। সচ্চিদানন্দের প্রথম স্পন্দনে সৎ বা সত্ত্বগুণ অর্থাৎ আনন্দের ভোক্তৃভাব, দ্বিতীয় স্পন্দনে চিৎ বা রজোগুণ অর্থাৎ আনন্দের অনুভবশক্তি এবং তৃতীয় স্পন্দনে আনন্দ বা তমোগুণ অর্থাৎ অনুভাব্য আনন্দরূপ ভোগ্যভাব প্রকাশ পায়। মনে রাখিও, এইরূপ বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইলেও বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপটী কিন্তু বিশুদ্ধই আছে।

উহাঁর নাম দাও "আমি"—না, আমি বলা যায় না; আত্মা বল। পঞ্চদশীকার বলেন,—"ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।" এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা পরম-প্রেমের আস্পদ। পরম-প্রেমাস্পদ বলিয়াই আত্মা আনন্দস্বরূপ। যিনি পরম-প্রেমাস্পদ, যাঁহাকে সব চাইতে বেশী ভালবাসি, যাঁহার প্রীতিসাধনের জন্য এই

জীবত্বের নিগড় অনাদিকাল হইতে বহন করিতেছি,, যাঁহার রক্ষার জন্য সমগ্র পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারি (আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ), সেই আত্মা যে কতটা ঘন আনন্দস্বরূপ, তাহা ভাষায় কি করিয়া বুঝাইব ?

সে যাহা হউক, আত্মা যখন পূর্ব্বোক্তবৎ বিশেষ ভাবে আপনাকে আপনি অনুভব করেন, তখনই তিনি সগুণ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাকে দার্শনিকগণের ভাষায় বিকার পরিণাম বিবর্ত্ত ভ্রান্তি কল্পনা অধ্যাস, যাহা ইচ্ছা বলিতে পার, ক্ষতি নাই। শুধু, বুঝিয়া রাখ —সগুণ নিগুর্ণ, উভয়ই সত্য এবং নিগুর্ণ বস্তু এইরূপেই সগুণ হইয়া থাকেন। আসল কথা ঐটী যে, সহস্র বার সগুণ হইলেও নিগুর্ণত্বে বিন্দুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় না; তাহা যথাপূর্ব্ব অক্ষুণ্ণই থাকে। তুলা যখন সূত্র বস্ত্র প্রভৃতি নামে ও আকারে পরিণত হয়, তখন তুলাত্বের কিছুই ব্যত্যয় হয় না। সুবর্ণ যখন বলয় কুণ্ডলাদিনামে ও আকারে আকারিত হয়, তখন সুবর্ণত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে। জল যখন সমুদ্র নদী জলাশয় প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ও আকারে আকারিত হয়, তখন জলত্বের বিন্দুমাত্র অন্যথা হয় না। সর্প যখন কুণ্ডলিত হয়, তখন কুণ্ডল নামে অভিহিত হইলেও সর্প সর্পই থাকে কুণ্ডল হইয়া যায় না। শুক্তি যখন রজত আকারে প্রতীয়মান হয়, তখনও সে শুক্তিই থাকে, রজত হয় না। আকাশ যখন ঘটকুড্যাদি বিশেষণবিশিষ্ট হয়, তখনও আকাশ নির্ব্বিশেষই থাকে।

এখন দেখ—আনন্দ বস্তু যখন আপনি আপনাকে বিশেষরূপে অনুভব বা দর্শন করেন, তখনই তিনি সগুণ। বেদান্ত ইহাকেই মায়ার অধ্যাস বলেন। সাংখ্য ইহাকে প্রকৃতির সম্বন্ধ বলেন। উপনিষৎ কিন্তু এই সগুণ স্বরূপকেও আত্মা বা ব্রহ্ম শব্দেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার ঐ যে সগুণ আনন্দ, তাহাতে বহুত্বের অনুভবও প্রকাশ পায়। কেন পায়, কেমন করিয়া পায়, এরূপ প্রশ্ন করিও না। লীলা বা ইচ্ছা বুঝিয়া লও। আমি আনন্দস্বরূপ। একরূপে আমাকে ভোগ করিয়া—অনুভব করিয়া যে আনন্দ পাই, তাহাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ভোগ করিব, যখন আমার

এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তখনই আমার ঈশ্বর আখ্যা হয়। "একোহং বহু স্যাম্" এইরূপ অনুভব বা বোধের নাম ঈশ্বর। একই আনন্দস্বরূপ আত্মাতে যখন বহুভাবের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়, তখনই আত্মা ঈশ্বর। বলিতে পার—তবে কি ব্রহ্ম আনন্দহীন? নতুবা বহুত্বভোগ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন কেন? না, তাহা নহে, ব্রহ্মবস্তু স্বরূপতঃই আনন্দ, তাঁহাতে আনন্দের অভাব কোন কালেই নাই। তবে তাঁহার একত্ব—অদ্বিতীয়ত্ব যেরূপ সত্য ও স্বাভাবিক, বহুত্ব বা ঈশ্বরত্বও জগদ্দর্শনকালে সেইরূপ সত্য ও স্বাভাবিক। জগদতীত অবস্থায় যেরূপ ব্রহ্ম নির্গুণ, জগদ্দর্শন সমকালে সেইরূপই তিনি সগুণ। তিনি গুণাতীত এবং গুণময়—একাধারে এই উভয় ভাবই যুগপৎ বিদ্যমান। অথচ একের দ্বারা অন্যের কোনও হানি বা পরিবর্ত্তন হয় না। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত-রূপে পরমপ্রেমাস্পদ আনন্দময় আত্মা যখন স্বয়ং স্বকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ভোগ করেন, তখনই তিনি ঈশ্বর। এই কথাটী স্মরণ রাখিলেই আত্মার ঈশ্বরত্বরূপ মহত্ত্ব যে কি, তাহা বুঝিতে পারিবে।

আত্মার আর একটী মহত্ত্ব আছে—জীবত্ব। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, আত্মৈবেদং, সর্ব্বং, স এব সর্ব্বং, পুরুষ এবেদং সর্ব্বং, যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জীব যে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব কি? ঐ যে ঈশ্বরানন্দ অর্থাৎ বহুধা প্রকাশমান সমষ্টি আনন্দ, তাঁহারই ব্যষ্টি-রূপ—সেই বহুর যে প্রত্যেকটী, তাহাই জীব। সুতরাং জীবও স্বরূপতঃ আনন্দই। এইখানে আবার পূর্ব্বকথিত জল তুলা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্মরণ কর। যেমন সমুদ্রস্থ জলের তরঙ্গগুলি জল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রগুলি তুলা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ঠিক এইরূপই জীব অর্থাৎ বিভিন্ন নাম ও রূপগুলি স্বরূপত আনন্দ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এইরূপে চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ প্রাণিবৃন্দ ঈশ্বরানন্দ হইতেই উৎপন্ন, ঈশ্বরানন্দেই স্থিত এবং ঈশ্বরানন্দেই ইহাদের অবসান; সুতরাং আনন্দই জীবের স্বরূপ। এখন ভাবিয়া

দেখ—আত্মা মা আমার কেবলানন্দময়ী, আবার সর্ব্বকারিণী ঈশ্বরানন্দময়ী, আবার সর্ব্বরূপিণী জীবানন্দময়ী।

সাধক! এইরূপ লক্ষ্য কর—ধীরে ধীরে তুমি কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। প্রথম খণ্ডে যাহা কেবল সৎ বা সত্যরূপে বুঝিয়াছিলে, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহাই প্রাণ বা চিদ্‌রূপে বুঝিয়াছ। আর এখন দেখিতে পাইতেছ—যাহা প্রাণ, তাহাই পরমপ্রেমাস্পদ পরম আনন্দস্বরূপ আত্মা। তুমি আনন্দ হইতেই আসিয়াছ, তোমার প্রত্যেক ইঙ্গিতটি আনন্দময়, দেখ—তোমার দেহের প্রত্যেক পরমাণুটি আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নয়; আনন্দই তোমার উপাদান, আনন্দই তোমার স্বরূপ, আনন্দেই তুমি অবস্থিত। দেখ—তোমার চতুর্দ্দিকে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, সর্ব্বত্র আনন্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। দেখ, তোমার অন্তরের প্রত্যেক চিন্তাটী আনন্দময়, দেখ—তোমার জন্ম মৃত্যু আনন্দময়। দেখ—তোমার রোগ শোক আনন্দময়, দেখ—তোমার দুঃখ দারিদ্র্য আনন্দময়। দেখ—তোমার সম্মুখে যে বৃক্ষটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহা আনন্দ দ্বারা গঠিত,—একটা ঘন আনন্দসত্তা বৃক্ষের আকারে আকারিত হইয়া রহিয়াছে। জড় প্রস্তরখণ্ডে দেখ—তোমারই আনন্দময় আত্মা, জড় প্রস্তর আকারে প্রতিভাত হইতেছে। ঐ যে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনগণ যাহাদিগকে তুমি তোমা হইতে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাক, দেখ—উহারা তোমারই বহুত্ববিষয়ক আনন্দময় ঘন সত্তা। তোমারই আনন্দের উল্লাসগুলি মূর্ত্তিমান্‌রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এইরূপ যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু গ্রহণ করিবে, উহা সকলই আনন্দময়; ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, তোমারই পরমপ্রেমাস্পদ পরমানন্দময় আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। ওগো! এই আনন্দময় আত্মস্বরূপের আস্বাদ না পাইলে, তোমার জীবনটী অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। ওগো! তুমি আনন্দসমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছ, দিবা রাত্রি আনন্দের সেবা করিতেছ, অথচ কোথায় আনন্দ বলিয়া অন্ধের মত অন্বেষণ

করিতেছ! একবার তাকাও আমার দিকে, দেখিবে—তোমার আনন্দের অভাব কোনকালেই নাই, ছিল না, থাকিবে না। যে মুহূর্ত্তে তুমি আনন্দময় আমাকে পাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তোমার নিকট এই সংসার আনন্দময়রূপে প্রতিভাত হইবে। তখন হইতেই তোমার এই বিশিষ্টভাবে জগদ্ভোগের বাসনা সম্যক্ অন্তর্হিত হইবে।

খুলিয়া বলি—আনন্দই যে তোমার স্বরূপ, ইহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলে, আর কি কাম্য বস্তুসংগ্রহ কিংবা ভোগ করিয়া আনন্দের সন্ধান লইতে হয়? কখনই নয়। তখন স্বভাবতঃই তোমার বৈরাগ্য আসিবে। "আনন্দময় আমিই যে সর্ব্বত্র বিষয়-আকারে প্রতিভাত" ইহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলে, আর ত্যাগ বা গ্রহণ বলিয়া কিছুই থাকে না। তখন নির্ব্বিচারে বিষয়ানন্দে বিচরণ করিবার সামর্থ্য হয়। গীতার সেই কথাটী স্মরণ কর—"রাগদ্বেষ বিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্"। যাহা হউক, আমরা আনন্দতত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে প্রস্তাবিত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এস! আবার আমরা দেবতাদিগের সুরে সুর মিলাইয়া, "সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ নমঃ" বলিয়া আনন্দময়ী মায়ের চরণে প্রণত হই। আত্মা আনন্দময়ী মা আমার সারা অর্থাৎ নির্গুণ চৈতন্যরূপিণী হইয়াও সর্ব্বকারিণীরূপে ঈশ্বরীমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া থাকেন।

"খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ"—যশঃ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অর্থ ব্যতীত খ্যাতি শব্দের আর একটী অর্থ হয়—বিবেক-খ্যাতি। প্রকৃতি-পুরুষ বা জড় চৈতন্যের পৃথক্‌ত্ববিষয়ক যে সুদৃঢ় প্রতীতি, সাংখ্যদর্শন তাহাকে বিবেক-খ্যাতি বলিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—সাংখ্যকার প্রকৃতিকে জড় বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক, প্রকৃতি জড় নহে; চৈতন্যের জড়ত্বপ্রতীতি মাত্র। জড়ত্ব এক প্রকার বোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বোধ-বস্তু জড় নহে, চেতন। কেবল চেতন নহে, আনন্দই উহার স্বরূপ। নির্গুণ আনন্দ বস্তু কিরূপে সগুণ ভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমোগুণময় হইয়া প্রকাশ পায়,

তাহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। গুণত্রয়ই প্রকৃতির স্বরূপ। আনন্দই যে ত্রিগুণ আকারে আকারিত, ইহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হওয়ার নামই প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ববিবেক বা বিবেক-খ্যাতি।

মা! এই খ্যাতিরূপে তুমিই আত্মপ্রকাশ কর। বিশুদ্ধ আনন্দময় পুরুষ তুমি যখন আপনাকে আপনি বিশেষভাবে অনুভব করিতে থাক, তখনই তোমার নাম হয় প্রকৃতি। এই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের যাথার্থ্য উপলব্ধিরূপেও তুমি। এই উপলব্ধির নাম খ্যাতি বা বিবেকখ্যাতি। মা, বিবেকখ্যাতিরূপিণী তোমাকে প্রণাম। আবার এই খ্যাতির বিপরীত অজ্ঞানময়ী কৃষ্ণা মূর্ত্তিতেও তুমি। যেখানে দেখিতে পাই—কোনরূপেই বোধের বিকাশ হয় না, শত সাধনাতেও অনুভব ফুটিয়া উঠে না, কেবলানন্দস্বরূপ আত্মবোধটী প্রকটিত হয় না, সেইখানেই বুঝিতে পারি—মা, তুমি অজ্ঞানময়ী কৃষ্ণামূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছ। মা, তোমার এই অজ্ঞানময়ী কৃষ্ণামূর্ত্তিকে প্রণাম, আবার এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ খ্যাতি ও কৃষ্ণামূর্ত্তির অন্তরালবর্ত্তী তোমার আর একটী মূর্ত্তি আছে, উহার নাম "ধূম্রা"। এই ধূম্রামূর্ত্তিতে জ্ঞানের ঈষৎ আভাসযুক্ত অজ্ঞানরূপটী প্রকাশ পায়। যখন দেখিতে পাই, মা! তোমার কোন কোন সন্তান বেদাদিশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য তোমার স্বরূপব্যাখ্যানে নিপুণ, সগুণ নির্গুণাদি তত্ত্ববিশ্লেষণে দক্ষ, মোক্ষশাস্ত্র-অধ্যয়ন-অধ্যাপনে পটু, অথচ তোমার এই আনন্দময় স্বরূপের অনুভব হইতে একান্ত বঞ্চিত, তখনই বুঝিতে পারি—মা, তুমি ধূম্রামূর্ত্তিতে—জ্ঞানের ঈষদ্ আভাসযুক্ত জ্ঞানময়ী মূর্ত্তিতে তাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, তোমার এই অপূর্ব্ব ধূম্রামূর্ত্তিকে আমরা প্রণাম করি।

আবার অন্যদিক্ দিয়াও দেখিতে পাই—মা! তুমি প্রতিনিয়ত খ্যাতি, কৃষ্ণা ও ধূম্রামূর্ত্তিতে সকল জীবকেই অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ। আমরা যখন বিষয় গ্রহণ করি, তখনই তোমার এই ত্রিমূর্ত্তি বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। "আমি ইহা জানিতেছি" ইহাই বিষয়গ্রহণের স্বরূপ। এই তিনটীর মধ্যে "আমি" এইটি খ্যাতি-মূর্ত্তি, "জানিতেছি"—ধূম্রামূর্ত্তি

এবং "ইহা"—কৃষ্ণামূর্ত্তি। এইরূপ সর্ব্বত্র। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিরূপে মা! তোমার এই ত্রিমূর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রতিভাত। আমরা ভক্তির সহিত তোমার এই মূর্ত্তিত্রয়কে প্রণাম করিতেছি।

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ ॥১১॥

অনুবাদ। অতিসৌম্যা ও অতিরৌদ্রাকে প্রণাম। এতদ উভয়ের অতীত তৎশব্দলক্ষিত বাক্যমনের অতীতস্বরূপকে প্রণাম। জগৎপ্রতিষ্ঠারূপিণী মাকে এবং কৃতিদেবীকে বারংবার প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, ইতিপূর্ব্বে খ্যাতি ও কৃষ্ণারূপে তোমার অত্যন্ত-বিরুদ্ধ মূর্ত্তিদ্বয় দেখিয়া আসিয়াছি, উহাই আবার এ স্থলে অতিসৌম্যা এবং অতিরৌদ্রা নামে অভিহিত হইয়া দেবতাবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইতেছে। মা গো, একদিকে যেমন তুমি অতিসৌম্যা—স্নেহময়া আনন্দময়ী দয়াময়ী মাতৃমূর্ত্তি। অন্যদিকে আবার তেমনি অতিরৌদ্রা—ভয়ঙ্করী কৃষ্ণামূর্ত্তিতে নিত্য প্রকটিতা। মা, এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতেও আমরা তোমার এই উভয়বিধ মূর্ত্তির লীলা প্রায়ই দেখিতে পাই। কি দেখি—একদিকে তুমি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন প্রভৃতিরূপে অতিরৌদ্রামূর্ত্তিতে, তোমারই সন্তানদিগকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে নিপাতিত কর। আবার অন্যদিকে দয়ারূপে সহস্র সহস্র জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া অতিসৌম্যা স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে সাহায্য সম্ভার বহন করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য উপস্থিত হও। মাগো, যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই ত তোমার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাই। সন্তানের নাস্তিকতায়, উচ্ছৃঙ্খল আচরণে ব্যথিত হইয়া, মা! একদিকে যেমন শাসনরূপে—দণ্ডরূপে প্রকাশিত হও, অন্য দিকে আবার তখনই ব্যথাহারিণী মূর্ত্তিতে

আত্মপ্রকাশ করিয়া সন্তানের অশ্রু স্বহস্তে মুছাইয়া দেও। এই ত মাতৃত্ব! বিশ্বময় সর্ব্বত্র তোমার এই মাতৃলীলা সুপ্রকট।

জীব! তুমি কোথায় মাকে অন্বেষণ করিতে যাও? মাকে দেখিবার জন্য কি সাধন ভজন যোগ তপস্যা করিবে? ওরে, অত কষ্ট করিয়া মাকে দেখিতে হইলে যে মাতৃনাম কলঙ্কিত হয়! যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই ত মাতৃমূর্ত্তি সম্যক্ উদ্ভাসিত একটী আত্মসম্বেদন আছে,—"যো হি পশ্যতি নাত্মানং দৃষ্টিসম্পাত-মাত্রতঃ। কদাপি নেক্ষিতুং শক্যো দৃক্সহস্রধরোঽপি সঃ॥" যে চক্ষু চাহিয়াই মাকে দেখিতে না পায়, হাজার চক্ষু হইলেও সে কখনও মাকে দেখিতে পাইবে না। সত্যই মা এত সরল ও সহজ। জীব! সত্যই যদি এমনি করিয়া দেবতাদিগের মত মাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাও, এবং যথার্থ ই ভক্তিপ্রণত হইতে পার, তবেই মায়ের নির্ব্বিশেষ স্বরূপটীর আভাস পাইবে এবং তখনই দেবতাদিগের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারিবে—"তস্যৈ নমো নমঃ"—বাক্য ও মনের অতীত কেবলানন্দস্বরূপকে প্রণাম। আপত্তি করিও না—অতিরৌদ্রামূর্ত্তির মধ্যে আবার আনন্দ কোথায়? একটু চক্ষুষ্মান্ হইলেই দেখিতে পাইবে—আনন্দ কোথায়। আরে, আনন্দই ত সত্তা! আনন্দ বস্তুই ত সুখ দুঃখাদি আকারে প্রকাশ পাইতেছে! আচ্ছা, জীবের দিক্ দিয়া দেখ। জীব যখন কাঁদে, তখন ঐ কান্নার মধ্যেই একটা আনন্দের আভাস পায়, তাই কাঁদে। দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়াই আনন্দের আভাস পায়, তাই দুঃখ ভোগ করে। এ সকল কথা "শোক-শান্তি" নামক পুস্তকে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। মনে রাখিও, জীবের হাসিতে যেরূপ আনন্দময় আত্মসত্তার অভিব্যক্তি, কান্নাতেও ঠিক সেইরূপই আছে। তবে কান্নার ভিতরের আনন্দকে দেখিতে বা বুঝিতে হইলে, একটু যোগচক্ষু বা মাতৃকৃপার আবশ্যক। কিন্তু সে অন্য কথা—

মায়ের এই সৌম্য, রৌদ্র এবং ভাবাতীত স্বরূপটী বুঝিতে হইলে, কি ভাবে কোন্ কোন্ স্তরের ভিতর দিয়া আসিতে হয়, তাহাই মন্ত্রের

অপর অর্দ্ধাংশে উক্ত হইয়াছে—"নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ"। প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ আশ্রয়; জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিমিত্ত এবং উপাদানরূপে যে আনন্দময় চৈতন্যসত্তা রহিয়াছে, প্রথমে তাহাকে প্রণাম করিতে হয়, বুঝিতে হয়, উপলব্ধি করিতে হয়। তারপর কৃতিদেবীকে অর্থাৎ যে ক্রিয়াশক্তি অখণ্ড আনন্দ-বস্তুকে এই খণ্ড জগদাকারে আকারিত করে, তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। এস, আমরাও "নমোজগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ" বলিয়া অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ-রূপিণী মাকে প্রণাম করি। তারপর "দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ" বলিয়া কৃতিদেবীর—সেই সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ঙ্করী মহতী ক্রিয়াশক্তির চরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রণত হই।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥১২॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়ানামে অভিহিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। বিষ্ণুমায়া—জগদ্ব্যাপিনী মহতী স্থিতিশক্তি। দেবী শব্দের অর্থ দ্যোতনশীলা স্বপ্রকাশস্বরূপা মহতী চিতিশক্তি। পূর্ব্বে যে অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় আনন্দময়স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তিনি যখন সর্ব্বভূতাকারে আকারিত হন, সর্ব্বভূতরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, ঈক্ষণ করেন, বোধ করেন, অনুভব করেন, তখনই তিনি বিষ্ণুমায়া নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই বিষ্ণুমায়া মা আমার, যিনি স্থূলে সর্ব্বভূতরূপে আধিভৌতিক মূর্ত্তিতে প্রকটিতা, তাঁহাকে প্রণাম। অনন্তর সেই বিষ্ণুমায়া মা আমার, যিনি সূক্ষ্মে—আধিদৈবিক মূর্ত্তিতে মহতী শক্তিরূপে প্রকটিতা, তাঁহাকে প্রণাম। তারপর মায়ের

যে মূর্ত্তি স্থূল সূক্ষ্মের অতীত, সেই কারণরূপিণী বিষ্ণুমায়া মূর্ত্তিকে প্রণাম। অবশেষে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণের অতীত বাক্যমনের অগোচর তৎপদলক্ষিত মাকে লক্ষ্য করিয়া নমোনমঃ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

এখান হইতে এই স্তুতির প্রত্যেক মন্ত্রেই তিনবার নমস্তস্যৈ শব্দ আছে। এতদ্ভিন্ন একটি নমোনমঃ পদেরও প্রয়োগ আছে। প্রথম নমস্তস্যৈ পদের দ্বারা স্থূলের প্রণাম অভিব্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মায়ের আধিভৌতিক স্থূলরূপটী অবলম্বন করিয়াই প্রথম প্রণাম বিহিত হইয়াছে। আবার এ স্থলে প্রণামরূপ কার্য্যটিও কিন্তু কায়িক ও বাচনিক-রূপে স্থূলেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তারপর দ্বিতীয় নমস্তস্যৈ; ইহা মায়ের সূক্ষ্ম স্বরূপটিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। যে সূক্ষ্ম চৈতন্য-শক্তি স্থূলে আসিয়া বিশিষ্ট নাম ও আকার লইয়া অভিব্যক্ত হন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া—উপলব্ধি করিয়া যে প্রণাম করা হয়, তাহাই প্রণামের দ্বিতীয় বা সূক্ষ্ম অবস্থা। ইহাকে মানসিক প্রণাম বলা হয়। তারপর তৃতীয় নমস্তস্যৈ; ইহা কারণ-স্বরূপের প্রণাম। যে আদি কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয়ই অভিব্যক্ত হয়, মায়ের আমার সেই কারণস্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া, উপলব্ধি করিয়া যে প্রণাম করা হয়, তাহাই তৃতীয় প্রণাম। এই প্রণাম কারণশরীরেই অভিব্যক্ত হয়। যদিও কারণ-স্বরূপটি বুদ্ধিতত্ত্বেরও উপরে অবস্থিত, তথাপি এই প্রণাম সেই বিজ্ঞানাতীত কারণকে লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধিতত্ত্বেই অভিব্যক্ত হয়। তাই ইহাকে বৌদ্ধ প্রণাম বলা যায়।

"নমোনমঃ," এইটি চতুর্থ প্রণাম। ইহা স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণের অতীত বিশুদ্ধ বোধময় ক্ষেত্রে বা পরমপ্রিয়তম পরমাত্মায়ই প্রকটিত হইয়া থাকে। যদিও এখানে প্রণম্য, প্রণাম ও প্রণামকর্ত্তা বলিয়া ত্রিবিধ স্ফুরণ নাই, তথাপি যাঁহারা প্রথম হইতেই শরণাগতভাবের সাধক, তাঁহারা এই অদ্বৈত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার সময়েও "নমোনমঃ" বলিয়া, শুধু শরণাগতভাবের সাহায্যেই পরমপ্রেমাস্পদ পরমানন্দস্বরূপ

পরমাত্মায় আত্মহারা হইয়া যান, মিলাইয়া যান। ইহাই তুরীয় অবস্থা বা চতুর্থ প্রণাম।

এইরূপে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এবং কারণাতীত অর্থাৎ তুরীয়, এই চারিটি অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা প্রণাম করিতে সমর্থ, তাঁহারাই যথার্থ দেবতা। শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতাবৃন্দ এইরূপভাবে প্রণাম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বুঝি, মা আমার অচিরে স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অসুর-কুল ধ্বংস করিয়া তাঁহাদিগকে নিঃশঙ্ক করিয়াছিলেন। সাধক! তুমিও ঐরূপ করিতে অভ্যাস কর। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এবং কারণাতীত স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রণাম করিতে অভ্যস্ত হও। সাধনশক্তি ঐ লক্ষ্যে পরিচালিত কর, তুমিও দেবতাদিগের ন্যায় সর্ব্ববিধ আসুরিক অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হইবে।

পুরাণাদি শাস্ত্রে মুক্তির চারিটি স্তর বর্ণিত আছে। যথা—সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য। জড়ত্বকে ভেদ করিয়া চৈতন্যলোকে উপনীত হওয়াই সালোক্য; যে সমষ্টি চৈতন্যে উহা অবস্থিত, তাহার সমীপস্থ হওয়াই সামীপ্য। যে সূক্ষ্ম কারণরূপকেন্দ্র হইতে উহা প্রকাশিত, তথায় উপনীত হওয়ার নাম সারূপ্য; এখানে উপস্থিত হইলেই সাধক তৎস্বরূপ হইয়া যায়, তাই এই অবস্থার নাম সারূপ্য। এখানেও বিশিষ্টতা থাকে। তারপর সাযুজ্য; এ অবস্থায় আর কোনও বিশিষ্টতা থাকে না, জীব নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপে উপনীত হয়; ইহারই অন্য নাম নির্ব্বাণ। সাধক! তোমার দৈনন্দিন সাধনার মধ্য দিয়াই যেন ঐ চারিটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য থাকে। চারিটি প্রণামে চারিটি স্বরূপের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিবার জন্য ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহারা সম্পূর্ণ চারিটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে অসমর্থ, তাহারা অন্ততঃ দুইটি বা তিনটীর দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিও, উহাই যথার্থ সাধনা। প্রতিদিনই অল্পাধিক মুক্তির আস্বাদ লইতে হয় এবং এইরূপ করিলেই জীবন্মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সে অন্য কথা।

পরবর্ত্তী মন্ত্র গুলিতে এই নমস্তস্যৈ অংশের আর ব্যাখ্যা করার অবশ্যক হইবে না। ধীমান্ পাঠক উহা অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবেন। যদিও সপ্তশতী মন্ত্রবিভাগে এই মন্ত্রের শেষ অংশ অর্থাৎ "নমস্তস্যৈ নমোনমঃ" এই অংশ একটী পৃথক মন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি শেষের "নমোনমঃ" অংশটীকে তৃতীয় নমস্তস্যৈ হইতে পৃথক করিয়া চতুর্থ প্রণাম রূপে ব্যাখ্যা করায় কিছুই হানি হয় নাই। তৃতীয় প্রণামটী কারণ ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত হইয়াছে। কোন সাধক কারণ স্বরূপে উপনীত হইতে পারিলে, তাহার পক্ষে কারণাতীত ক্ষেত্রে প্রবেশ করা অনায়াস-সাধ্য হইয়া থাকে ; তাই কারণের প্রণাম করিতে করিতেই নমোনমঃ বলিয়া কারণাতীত ক্ষেত্রে উপনীত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥১৩॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনা নামে অভিহিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম। তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। চেতনা স্থূলে নামরূপ আকারে পরিব্যক্ত। সূক্ষ্মে প্রাণশক্তিরূপে এবং কারণে অব্যক্ত বীজরূপে অবস্থিত। স্থূলাভিমানী চৈতন্য বিশ্ব ; সূক্ষ্মাভিমানী চৈতন্য তৈজস এবং কারণাভিমানী চৈতন্য প্রাজ্ঞনামে অভিহিত।

চৈতন্যরূপিণী মা! তুমি বিশ্ব-চৈতন্য নামে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে, নাম ও আকার পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত প্রকটিত হইয়া রহিয়াছ। তোমার এই আধিভৌতিক চেতনাময়ী মূর্ত্তিকে আমরা কায়িক ও বাচনিক প্রণাম করিতেছি। তারপর তৈজসচেতন নামে

তোমার যে মহতী শক্তি এই প্রকট বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়-কার্য্যে নিরত, তোমার সেই সূক্ষ্ম আধিদৈবিক-চেতনারূপিণী শক্তিময়ী মূর্ত্তিকে আমরা মানসিক প্রণাম করিতেছি। অনন্তর প্রাজ্ঞচেতনা নামে যাহা এই স্থূল ও সূক্ষ্মের বীজরূপে—কারণরূপে নিত্য অবস্থিত, তোমার সেই আধ্যাত্মিক-চেতনারূপিণী অব্যক্ত-কারণমূর্ত্তিকে বুদ্ধির সাহায্যে প্রণাম করিতেছি। সর্ব্বশেষে এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অতীত বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ অবাঙ্‌মনোগোচর তোমার সেই নিত্য নিরঞ্জনস্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'নমো নমঃ' বলিতে বলিতে পরম প্রেমাস্পদ প্রিয়তম মধুময় আত্মস্বরূপে মিলাইয়া যাই।

সাধক! এইবার তুমিও দেখ, তোমার চেতনারূপে অন্তরে যিনি প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন—ঐ উনিই ত মা। যাঁহাকে সতত অবজ্ঞা করিতেছ—দেখ, সর্ব্বভূতে চেতনারূপে অবস্থিত সেই মাকে লক্ষ্য করিয়াই দেবতাগণ প্রণাম করিতেছেন। তুমিও দেবতাদিগের সুরে সুর মিলাইয়া, আত্মচৈতন্যের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া "নমস্তস্যৈ" বলিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর। কায়িক ও বাচনিক প্রণাম সার্থক হউক। ঐ হৃদয়ানুভূত চৈতন্যই যে স্থূলদেহরূপে, দেহাত্ম-বোধরূপে প্রতিভাত হইতেছে, ইহা বুঝিয়া প্রথম প্রণাম কর। তারপর যে চেতনা সর্ব্বভাবের অধিষ্ঠাত্রীরূপে অবস্থিত, তাঁহাকে —সেই সর্ব্বব্যাপিণী চিন্ময়ী মাকে অনুভব করিয়া বোধ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া "নমস্তস্যৈ" বলিয়া দ্বিতীয় প্রণাম বা মানসিক প্রণাম কর। অনন্তর অব্যক্ত কারণরূপিণী চেতনার দিকে লক্ষ্য করিয়া যেখানে এই বহু বৈচিত্র্য বহুনামরূপ কিছুই ব্যাকৃত হয় নাই, সেই অতি সূক্ষ্ম অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তৃতীয় প্রণাম বা বৌদ্ধ প্রণাম কর। এইরূপে কারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে রাখিতেই মায়ের কৃপায় কারণাতীত স্বরূপের সন্ধান পাইবে, তখন সেই অজ্ঞেয় নিরঞ্জনসত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া "নমোনমঃ" বলিতে বলিতে মধুময় পরমাত্মসত্তায় মিলাইয়া যাও।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৪॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। "যা দেবী" শব্দের পুনঃ পুনঃ অর্থ করা নিষ্প্রয়োজন। "যিনি" বলিলে, বাক্যমনের অতীত অথচ সত্যস্বরূপ বস্তুকেই বুঝায়; যাঁহার সত্তায়, যাঁহার প্রকাশসম্বন্ধে কোনরূপ সংশয় বা অবিশ্বাস নাই, থাকিতে পারে না, যিনি আছেন বলিয়া এই জগৎ আছে, আমি আছি, তিনি যে কিরূপ, তাহা ঠিক ঠিক প্রকাশ করা যায় না বলিয়াই "যা দেবী" এবং "তস্যৈ" এই পরোক্ষবাচক শব্দদ্বয় মন্ত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর "সর্ব্ব ভূতেষু" কথাটী বলিবার সময় যেন সাধক নিজের দিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিয়া না যান্। এ সকল কথা বারংবার বলা বাহুল্য মাত্র।

মা! তুমি বুদ্ধিরূপিণী। ব্যষ্টি বুদ্ধিরূপে প্রতিজীবে, সমষ্টি বুদ্ধি-রূপে মহত্তত্ত্বরূপে এবং বুদ্ধির বীজরূপে অব্যক্তক্ষেত্রে তুমিই অবস্থিত। তোমার এই ত্রিবিধ স্বরূপকে কায়িক বাচনিক মানসিক ও বৌদ্ধ প্রণাম করিতেছি। তারপর তোমার নিরঞ্জন সত্তা; যেখানে বুদ্ধি বলিয়া কিছু নাই, অথচ বুদ্ধি যাহাতে অবস্থিত, বুদ্ধির যিনি প্রকাশক, সেই যে তোমার নিরঞ্জন স্বরূপ, তাহাই যথার্থ আমারও স্বরূপ, 'নমোনমঃ' বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। মা, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। আমরা আত্মস্বরূপে উপনীত হই।

সাধক! তুমিও এই মন্ত্র পড়িয়া সর্ব্বপ্রথমে নিজ বুদ্ধিকে প্রণাম কর। ঐ বুদ্ধিরূপেই যে মা! ব্রাহ্মণগণ "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" বলিয়া যে ধীকে লাভ করিবার জন্য ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীমন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া থাকেন—দেখ, ঐ ধীরূপেই মা। উহাকে ঠিক ঠিক প্রণাম করিতে পারিলেই—যে মহতী বুদ্ধিতে তোমার ব্যষ্টি বুদ্ধি অবস্থিতা, তাঁহার

অর্থাৎ মহদাত্মার সন্ধান পাইবে। উহাঁকে দ্বিতীয় প্রণাম কর। তারপর এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি, উভয় বুদ্ধির যে অব্যক্ত বীজ, যাহা মূলা প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়, তাঁহাকে প্রাণাম্ করিতে করিতে নিরঞ্জন-স্বরূপে চলিয়া যাও; সেই ভাবাতীত ত্রিগুণরহিত গুরুস্বরূপে বা আত্মস্বরূপে মিলাইয়া যাও। 'নমোনমঃ' বলিবার সঙ্গে সঙ্গে আমিত্বের গুরুভার চিরতরে বিলয়প্রাপ্ত হউক।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে নিদ্রারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা তুমি নিদ্রারূপিণী। আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-ব্যাপার এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি যখন সম্যক্ নিরুদ্ধ থাকে, তখন জ্ঞানময়ী মা তুমি "কিছুই জানি না" রূপ অজ্ঞানটীকে বুকে করিয়া অবস্থান কর; ইহাইত তোমার নিদ্রামূর্ত্তির স্বরূপ। সর্ব্বভাবের নিরোধ বিষয়ক বোধরূপে তুমিইত প্রকাশিত হও; তাই পাতঞ্জলদর্শন তোমার এই মূর্ত্তিটীকে অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিকই ত তুমি যখন অভাব মাত্রের প্রত্যয়রূপিণী হইয়া আত্মপ্রকাশ কর, তখনই আমরা তোমার স্নেহময়ী প্রেমময়ী রসময়ী মধুময়ী সুষুপ্তিমূর্ত্তির অঙ্কে সম্যক আলিঙ্গিত হইয়া ইন্দ্রিয় ব্যাপারজনিত কর্ম্ম-ক্লান্তি হইতে বিশ্রাম লাভ করি—পরমাতৃপ্তি প্রাপ্ত হই। ওগো, এত স্নেহ তোর বুকে, তোর আদরের সন্তান আমরা যখন এই দুঃখময় ত্রিতাপময় জগতে বিচরণ করিতে করিতে ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ি, তখনই তুমি নিদ্রামূর্ত্তিতে আমাদিগকে বুকে জড়াইয়া ধর, তোমার সেই সোহাগ জড়িত স্নেহময় আলিঙ্গনের অমৃতময় পরশে আমরা সকল জ্বালা সকল বিক্ষেপ সকল চঞ্চলতা একেবারে ভুলিয়া

যাই। ওগো মাতৃ-অন্বেষি সাধকবৃন্দ, তোমরা আমার মাকে খুঁজিতে কোথায় ছুটিয়া যাও! ঐ দেখ, দেবী-মাহাত্ম্যের ঋষি মাকে আমার কত নিকটে আনিয়া দিয়াছেন, প্রতিদিনই মাকে আমরা নিদ্রারূপে পাইয়া থাকি। মা যে আমার স্ব, এই স্বকে প্রাপ্ত হই বলিয়াই নিদ্রার একটি নাম স্বপিতি। যাঁহাকে একবার স্পর্শ করিলে সকল জ্বালার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই মা প্রতিদিনই ত আসিয়া স্নেহের পীড়নে আমাদিগকে জড়াইয়া ধরেন।

এস মা আমার, এস সুষুপ্তিরূপিণী জননী আমার, তোমার চরণে প্রণত হই—নমস্তস্যৈ। আমাদের কায়িক ও বাচনিকরূপে স্থূলের প্রণাম গ্রহণ কর। তারপর তোমার কৃপায় দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিতে পাই—এক মহতী সমষ্টি নিদ্রামূর্ত্তি সর্ব্বভূতকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। সেই যে মা, তোমার সুষুপ্তিময়ী ঈশ্বরী মূর্ত্তি, যে মহতী অজ্ঞানমূর্ত্তি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, মা! তোমার সেই মহতী মূর্ত্তিকে প্রণাম করিতেছি। মা গো, তোমার এ মূর্ত্তি দেখিলে শরীর ও ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হইয়া যায়। কি ঘন! কি নিবিড় সেই কৃষ্ণা সুষুপ্তিমূর্ত্তি! 'নমস্তস্যৈ' তোমার চরণে কোটি প্রণাম। অনন্তর এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিদ্রার যাহা কারণ, সেই সুষুপ্তিবীজরূপিণী অব্যক্ত কারণ-মূর্ত্তিকে তৃতীয় প্রণাম করিয়া নিদ্রাতীত নিরঞ্জনস্বরূপের উদ্দেশ্যে চলিয়া যাই, যেখানে নিদ্রা বলিয়া কিছু নাই, অথচ যাঁহার সত্তায় নিদ্রার সত্তা, যিনি নিদ্রার প্রকাশক, সেই যে নিত্য জাগরণময় নিত্য বোধময় তোমার নিরঞ্জনস্বরূপ, তাঁহাকে 'নমোনমঃ' বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতেছি। মা! আমাদের প্রণাম সফল হউক।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৬॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা! তুমি ক্ষুধারূপে—ভোজনেচ্ছারূপে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। আমাদের স্থূল শরীরের রস রক্তাদি ধাতুর অপচয়জন্য যে অবসাদ উপস্থিত হয়, ঐ অবসাদ দূর করিবার জন্য আহার গ্রহণের যে আবশ্যকতাবোধ হয়, ইহাই ত মা, তোমার ক্ষুধামূর্ত্তি! কেবল স্থূলশরীরে —অন্নময় কোষেই যে তোমার এই বুভুক্ষামূর্ত্তির প্রকাশ হয়, তাহা নহে; প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়কোষেও তোমার এই ক্ষুধামূর্ত্তির অভিব্যক্তি প্রতিনিয়ত আমরা দেখিতে পাই; সুতরাং আমাদের এই পঞ্চকোষেরই বুভুক্ষা বা আহারে ইচ্ছা আছে। প্রাণময়কোষের আহার জীবনীশক্তি, মনোময়কোষের আহার চিন্তা, বিজ্ঞানময়কোষের আহার জ্ঞান এবং আনন্দময়কোষের আহার প্রীতি হর্ষ ইত্যাদি। মা! এইরূপে ক্ষুধামূর্ত্তিতে পঞ্চকোষের আহার গ্রহণের ইচ্ছারূপে প্রকাশিত হও বলিয়াই ত আমরা দিনের পর দিন, জন্মের পর জন্ম ধরিয়া এই ক্ষুধানিবৃত্তির ব্যপদেশে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তোমারই দিকে অগ্রসর হইতেছি। ধন্য তোমার অপূর্ব্ব আকর্ষণময় এই ক্ষুধাস্বরূপের অভিব্যক্তি! মাগো প্রথমে আমাদের সেই নিত্য-অনুভূতা অন্ন-বুভুক্ষা অর্থাৎ তোমার স্থূল ব্যষ্টিক্ষুধামূর্ত্তিকে নমস্তস্যৈ বলিয়া প্রণাম করি। তারপর তোমারই কৃপায় দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিতে পাই—এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী এক মহতী ক্ষুধাময়ী মূর্ত্তি; যাহা সর্ব্ব জীবে ব্যষ্টিরূপে অবস্থিত, তাহারই সমষ্টি অখণ্ডবুভুক্ষামূর্ত্তি। তোমার এই মূর্ত্তি যে কেবল পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ আহার গ্রহণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হয়, তাহা নহে। ওগো, এই সমগ্র বিশ্বই যে তোমার সেই মহতী ক্ষুধামূর্ত্তির তৃপ্তিবিধানের জন্য অন্নরূপে— আহাররূপে অবস্থিত। কোন্ অনাদিকাল হইতে তুমি এই

বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা-মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া রহিয়াছ, তাহা তুমি ব্যতীত আর কে বলিবে? মা! আমরা তোমার চরণে প্রণত হইতেছি। মাগো, শুনিয়াছি—যে তোমার এই ক্ষুধামূর্ত্তির চরণে সত্য সত্যই প্রণত হইতে পারে, তাহার ভবক্ষুধা চিরতরে বিদূরিত হয়। মা! কত কাল কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া এই জগৎ ভোগ করিতেছি, কত শোক দুঃখ, ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া আসিতেছি, তবু ত মা,—আমাদের এ বিষয়ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না! মা, একবার তুমি আমাদের এই ক্ষুধা মিটাইয়া দাও। তুমি যে মা! সন্তানের ক্ষুধা বুঝিয়া আহার দেওয়াই ত মাতৃত্ব! সন্তান পুতুল খেলায় ব্যস্ত, ক্ষুধার কথা মনেই নাই! মা স্বয়ংই আসিয়া আহার দিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়া দেন। এই না মাতৃত্ব? তবে এস, আমাদের ক্ষুধা দূর কর! আর যে অন্নের অন্বেষণ করিতে পারি না মা! কত কাল ধরিয়া কেবল অন্বেষণই করিতেছি, আহার করিতে পারি না, তাই ক্ষুধারও নিবৃত্তি হয় না; কিন্তু এবার যখন বুঝিতে পারিয়াছি,—এই ক্ষুধামূর্ত্তিও তুমি, তখন আমাদের এ ক্ষুধা তোমাকেই দূর করিতে হইবে। মাগো, সন্তান ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে দেখিয়াও কি তুই অন্নপূর্ণা হইয়া নীরবে থাকিবি? তা কি হয় মা? তুই অন্নপূর্ণা, আর আমরা ক্ষুধিত পুত্র! এ দৃশ্য কিরূপে সহ্য করিবি! আয় মা, এবার প্রণাম গ্রহণ করিয়া আমাদের বিষয়-ক্ষুধানল চিরতরে নির্ব্বাপিত করিয়া দে। ক্ষুধারূপিণী মা আমার, এতদিন তোমায় মা বলিয়া চিনিতে পারি নাই, কত অবজ্ঞা করিয়াছি, ঘৃণার কুটিল কটাক্ষে জর্জ্জরিত করিয়াছি, কিন্তু আর নয়—আজ তোমায় মা বলিয়া চিনিয়াছি, এস মা, সন্তানের স্থূল সূক্ষ্ম কারণের প্রণাম গ্রহণ কর, সন্তান ধন্য হউক! তারপর আমরা "নমোনমঃ" বলিতে বলিতে তোর নিরঞ্জন স্বরূপে চলিয়া যাই। যেখানে ক্ষুধা বলিয়া কিছু নাই, আহার বলিয়া কিছু নাই, অথচ যাহার সত্তায় ক্ষুধার সত্তা, যিনি ক্ষুধার প্রকাশক, যাঁহাকে পাইলে সকল ক্ষুধা চিরতরে অবসিত হইয়া যায়, সেই ত মা তোমার নিরঞ্জনস্বরূপ! মা, তুমি আমাদের শেষ প্রণাম গ্রহণ কর!

তোমার মাতৃত্বের উজ্জ্বল গৌরব-আলোকে জগৎ আলোকিত হউক ! কোটি কোটি জীব মা মা বলিয়া তোমারই দিকে অগ্রসর হউক !

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চ্ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥১৭॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে ছায়ারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। ছায়া শব্দের অর্থ জীব। উপনিষৎ বলেন,—"ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।" আচার্য্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ছায়া শব্দের জীবাত্মা অর্থই করিয়াছেন। ছায়ার তিনটী অবস্থা আছে—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। দেহভেদে ছায়ারও এই ত্রিবিধ ভেদ কল্পিত হয়। ছায়া—প্রতিবিম্ব। চিৎপ্রতিবিম্বই জীব। স্থূলদেহে যে ছায়া বা চিৎপ্রতিবিম্ব, তাহা ছায়ার স্থূল মূর্ত্তি। সূক্ষ্মদেহে (পঞ্চ জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশাত্মক শরীরে) যে ছায়া বা চিৎপ্রতিবিম্ব আছে, তাহা ছায়ার সূক্ষ্মমূর্ত্তি। এইরূপ কারণ-দেহে অবিদ্যার যে চিৎপ্রতিবিম্ব, তাহা ছায়ার কারণমূর্ত্তি। এই তিন মূর্ত্তিকে প্রণাম করিবার জন্যই মন্ত্রে বিশেষভাবে তিনবার প্রণামের উল্লেখ আছে। আর চতুর্থ প্রণাম ছায়াতীত স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত হইয়াছে।

ছায়া সম্বন্ধে এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। সাধারণ ছায়া যেমন প্রকাশের আবরক হয়, এ জীবচ্ছায়াও যেন সেইরূপই পরমাত্ম-স্বরূপের আচ্ছাদক হইয়া থাকে। এই আবরণ দূর করিবার জন্যই এত প্রণাম, এত শরণাগতভাব। প্রণাম করিতে করিতেই মিথ্যাভিমান দূরীভূত হয়। অভিমান দূর হইলেই, ছায়াকে অর্থাৎ জীবভাবকে আর একটা পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া অনুভব হয় না।

প্রতিবিম্বের যে কোনও স্বতন্ত্রতা নাই, বিম্বের সত্তায়ই যে প্রতিবিম্বের সত্তা, ইহা তখনই ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারা যায়। একমাত্র আত্মাই যে আছেন, ইহা উপলব্ধি করিবার অতি সহজ উপায়—সর্ব্ব-ভূতে ছায়াদর্শন। যাঁহাদের বুদ্ধিতত্ত্ব সম্যক্ উন্মেষিত হইয়াছে, তাঁহারা এই জীবজগৎকে যথার্থ ই ছায়ারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মহানগরীর ন্যায় এই নামরূপবিশিষ্ট স্থূল বিশ্ব যথার্থই ছায়াবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে। আধুনিক বেদান্তবাদিগণ মিথ্যা ভ্রান্তি কিংবা অধ্যাস বলিয়া এই চিচ্ছায়াকে উড়াইয়া দিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, যতদিন তাঁহাদের স্থূলদেহ আছে, ততদিন সহস্র চেষ্টাতেও সহস্রবার মিথ্যা বলিলেও ইহা দূরীভূত হয় না।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান-পূর্ব্বক জীবগণকে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত করিতেছেন।" জীব যে ছায়ামাত্র, তাহা এই ভগবদ্‌বাক্যদ্বারাও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। কোনও স্বচ্ছ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেরূপভাবে অঙ্গভঙ্গী করা যায়, দর্পণ-প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তিটীও ঠিক সেইরূপ ভাবে অঙ্গভঙ্গী করিয়া থাকে। জীবরূপী চিৎপ্রতিবিম্বও সেইরূপ হৃদয়াবস্থিত ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, বিভিন্নভাবের অভিনয় করিয়া থাকে। একটি গানেও শুনিয়াছি —"তুমি যেমন বলাও, তেমনি বলি, তুমি যেমন হাসাও, তেমনি হাসি" কথাগুলি খুবই সত্য।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে—জীব যদি ঈশ্বরের প্রতিবিম্বই হয়, অর্থাৎ জীবানুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ যদি ঈশ্বরকর্ত্তৃকই সম্যক্‌ভাবে নিয়মিত হয়, তবে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য বলিয়া কোনও বিচার থাকিতে পারে না। হাঁ, সত্যই যাঁহারা এইরূপ জ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছেন, যাঁহারা আপনাকে পরমেশ্বরের ছায়ামাত্র বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট যথার্থ ই পাপপুণ্য বলিয়া কিছু থাকে না। কিন্তু এইরূপ দর্শন বা অনুভূতি লাভের পূর্ব্বে অর্থাৎ অহংকর্ত্তৃত্বাভিমান বিদ্যমান থাকিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার থাকিবেই। সহস্রবার নাই

বলিলেও অন্তরে পাপপুণ্যের সংস্কার ফুটিয়া উঠিবেই। কিন্তু সে অন্য কথা—

আমরা কিন্তু জানি মা! তুমিই আমাদের বিম্ব, আবার তুমিই প্রতিবিম্ব। তুমিই পরমাত্মরূপে বিম্ব হইয়া বুদ্ধিতে চিচ্ছায়াসম্পাত দ্বারা স্বয়ং জীব বা ছায়া সাজিয়া রহিয়াছ। তাই দেবতাগণের ন্যায় আমরাও তোমার এই ছায়াস্বরূপটীকে প্রণাম করিতেছি। মা, তুমি স্বয়ং চিন্ময়ী, তাই তোমার প্রতিচ্ছায়া যাহাতে সংক্রামিত হয়, তাহাও চৈতন্যময় হইয়া উঠে। জড়বস্তুর ছায়া জড়বস্তুতে নিপতিত হইলে, তাহাতে চেতনবদ্ ব্যবহার হয় না বটে, কিন্তু চৈতন্যরূপিণী মা, তোমার ছায়াসম্পাতে জড়দেহ, জড়বুদ্ধি জড়ইন্দ্রিয় সকলই চৈতন্যময় হইয়া উঠে। মা, তুমি স্বয়ং আমিরূপিণী; তাই তোমার ছায়াসম্পাতে, এই জড় দেহ প্রভৃতিও "আমি" বলিয়া অভিমান করে।

মা! প্রথমে নমস্তস্যৈ বলিয়া আমাদের ব্যষ্টিবুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত তোমার চিচ্ছায়ামূর্ত্তিকে প্রণাম করি। ক্রমে সমষ্টিবুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বে যে ছায়ামূর্ত্তি আছে, যাহাকে শাস্ত্রকারগণ হিরণ্যগর্ভ আখ্যা দিয়া থাকেন, সেই মহতী ছায়ামূর্ত্তিকে দ্বিতীয় প্রণাম করিয়া কারণ-ক্ষেত্রে চলিয়া যাই। সেখানে তোমার অব্যক্ত ছায়াকে পুনরায় নমস্তস্যৈ বলিয়া প্রণাম করি। সর্ব্বশেষে সেই নিরঞ্জন-ক্ষেত্র, যেখানে ছায়া বলিয়া কিছু নাই, অথচ যাহার সত্তায় ছায়ার সত্তা, যিনি ছায়ার প্রকাশক, তাঁহার উদ্দেশ্যে নমোনমঃ বলিয়া বারংবার প্রণত হই, ছায়া বা মায়া চিরতরে মিলাইয়া যাউক।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥১৮॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা! শক্তি বলিলে সর্ব্বপ্রথমে নিজের দেহটার দিকেই লক্ষ্য হয়। একটু ধীরভাবে অনুধাবন করিলে বেশ প্রতীতি হয়—এ দেহটা শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। দৃক্‌শক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে দেখিতে দেখিতে, ক্রমে রক্ত মাংসের পিণ্ডময় এই স্থূল অংশটার দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয়; তখন দেখিতে পাই—কতকগুলি অণুপরমাণু এক অজ্ঞেয় ধৃতিশক্তিকর্ত্তৃক পরিধৃত হইয়া দেহ-আকারে প্রতিভাত হইতেছে। তারপর অণুগুলির দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাই—অণুগুলিও বাস্তবিক জীবাণু বা শক্তিব্যূহ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এইরূপে এই স্থূলদেহটা কতকগুলি শক্তির সমষ্টিরূপে প্রতীতিযোগ্য হইতে থাকে। মা, প্রথমে তোমার এই স্থূলশক্তিমূর্ত্তিকে প্রণাম করি।

মা গো, আধুনিক জড়বাদিগণ তোমার এই স্থূলাকারে প্রকাশিত শক্তিমূর্ত্তিকে জড়রূপেই প্রত্যক্ষ করেন। সর্ব্বভূতে স্থূলদেহে ভৌতিক পদার্থে আলোক তাপে তড়িতে চন্দ্রে সূর্য্যে, সর্ব্বত্র যে শক্তিরূপের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা যে তোমারই জড় নামীয় চিন্ময়ী ইচ্ছা-শক্তিমাত্র, ইহা তাঁহারা অনুধাবন করেন না। শক্তি যে চেতনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন না। মা, তুমি তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দাও। ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহ যে কতকগুলি চৈতন্যময়শক্তি প্রবাহমাত্র, ইহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও।

এ কি মা! শক্তি ত কতকগুলি নয়! দৃক্‌শক্তি শ্রবণশক্তি প্রভৃতি শক্তিসমূহের প্রত্যেকটীকে আর ত পৃথক্ বলিয়া মনে হয় না! একই মহতী শক্তি বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়া বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। ইহা যে কেবল স্ব স্ব দেহ বা কোনও একটী বিশেষ পদার্থেই প্রতীত হয়, তাহা নহে; অনন্ত বিশ্ব বলিলে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি যতদূর প্রসারতা লাভ করে, তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, সে সকলকে আর ত পদার্থ বলিয়া মনে করিতে

পারি না! এ যে একা অদ্বিতীয়া মহতী শক্তি গো! কি বিশালতা! কি মহত্ত্ব! মন বুদ্ধি যে স্তব্ধ হইয়া যায় মা! ঐ যে সর্ব্বভূতরূপে অনন্তব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিতা একা অদ্বিতীয়া মহতী শক্তি, যাঁহার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে, সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ ত্রিবিধ স্পন্দনমাত্র পরিলক্ষিত হয়, সেই সমষ্টিরূপিণী মহাশক্তিরূপিণী মা তুমি! ওগো, এই দুরধিগম্য মহাশক্তিসিন্ধুরই এক একটী তরঙ্গ বিভিন্ন জীবজগৎ আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার ক্ষণকাল পরেই মিলাইয়া যাইতেছে। তোমার এই ঈশ্বরী শক্তিমূর্ত্তির চরণে আমরা একান্ত প্রণত হইতেছি। মা মহাশক্তি! তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

তার পর ব্যষ্টি ও সমষ্টি শক্তির যাহা বীজ, যে অব্যক্তক্ষেত্র হইতে এই মহতীশক্তির বিকাশ, সেই মহাকারণরূপিণী শক্তিমূর্ত্তিকে প্রণাম করিতে করিতে নিরঞ্জনস্বরূপে চলিয়া যাই। যেখানে শক্তি বলিয়া কিছু প্রতীত হয় না; অথচ যিনি না থাকিলে শক্তির সত্তাই থাকে না, এই শক্তিরূপে প্রকটিত হইয়াও যাঁহার স্বরূপের কোনও ব্যত্যয় হয় না, বাক্যমনের অতীত সেই স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিয়া "নমোনমঃ" বলিয়া বারংবার প্রণাম করি।

মা গো, শুনিতে পাই—তোমার কোন কোন জ্ঞানী সন্তান নাকি তোমার পরমাত্মস্বরূপটীকে শক্তিহীন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং নানারূপ যুক্তিতর্কের সাহায্যে উহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। তুমি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদের নিকট তোমার আত্মস্বরূপটী উন্মেষিত কর। তাঁহারাও দেখুন—পরমাত্মা শক্তিহীন রসহীন আনন্দহীন একটা জড়বৎ বস্তু নহেন। তিনি সর্ব্বশক্তির আধার; তিনি রসময়, তিনি আনন্দময়।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৯॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে তৃষ্ণারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা! তৃষ্ণা—পিপাসা বা জলপানেচ্ছারূপে তুমিই সর্ব্বভূতে সতত প্রকাশিতা। এই সর্ব্বভূতের তৃষ্ণার বিষয় স্মরণ করিতে গিয়া, সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় তৃষ্ণার প্রতি লক্ষ্য পড়ে। মা! তুমি যে কেবল জলপানেচ্ছারূপিণী তৃষ্ণা, তাহা নহে; একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা-রূপেও বুকের ভিতর তুমিই ত সদা জাগ্রত রহিয়াছ। কত জন্ম ধরিয়া তোমার এই তৃষ্ণামূর্ত্তিকে পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু পারি নাই। ওগো সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য পাইলেও যে এ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। এতদিন এ তৃষ্ণাও যে তুমি, তাহা বুঝিতে পারি নাই, মা বলিয়া আদর করি নাই; কিন্তু আজ তোমারই কৃপায় দেখিতে পাইতেছি—আমার মধ্যে তৃষ্ণারূপে, আকুল-আকাঙ্ক্ষারূপে তোমারই নিয়ত প্রকাশ। এস মা তৃষ্ণারূপিণী, অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষারূপিণী, নিত্যতরুণা আশা আমার, বুকজোড়া ভরসা আমার, এস, তোমাকে একটা সত্যের প্রণাম করিয়া সকল তৃষ্ণার পরপারে চলিয়া যাই।

মা গো, এইরূপে তোমার ব্যষ্টি-তৃষ্ণামূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সর্ব্বভূতে বিরাজিত সমষ্টি তৃষ্ণার দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয়। ওঃ, সে কি মহতী! এই জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যে মা তোমার অতৃপ্ত-লালসাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই! এ কি মা! সর্ব্বভূতকে এ কি মূর্ত্তিতে কোলে করিয়া রাখিয়াছিস্? এ যে মা তোর ঈশ্বরীমূর্ত্তি! যে মহতী তৃষ্ণার বিন্দুমাত্র পাইয়া জীব উন্মত্ত হয়, আত্মহারা হয়, কতকাল ধরিয়া জন্ম মৃত্যুর পেষণ সহ্য করে, সেই সমষ্টি-তৃষ্ণাময়ী মূর্ত্তি তুমি! মা, যে তৃষ্ণারূপে অভিব্যক্ত হইতে গিয়া, এক অদ্বিতীয় আনন্দময়-স্বরূপ হইতে এই বহুত্বের লীলায় আত্মনিয়োগ করিয়াছ, তোমার সেই মহত তৃষ্ণার স্বরূপটী আমরা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব?

বুঝি বা না বুঝি—নমস্তস্যৈ। এস মা! প্রণাম করি— আমাদের নিকট আর বিষয়তৃষ্ণামূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিও না। রসময়ী মা কেবল তোমাকে লাভ করিবার প্রবল পিপাসা রূপে প্রকাশিত হও, আমাদিগকে ধন্য করিয়া দাও।

তারপর যে অব্যক্ত কারণ হইতে এই মহতী তৃষ্ণা প্রাদুর্ভূত হয়, সেখানেও তোমাকে প্রণাম। অবশেষে তোমার তৃষ্ণাতীত ভাবাতীত নির্ম্মল বোধমাত্রস্বরূপের উদ্দেশ্যে "নমোনমঃ" বলিয়া অসংখ্য প্রণাম করি। সেখানে তৃষ্ণা বলিতে কিছু থাকে না, তাঁহারই সত্তায় তৃষ্ণার সত্তা, তৃষ্ণারূপে প্রকাশিত হইয়াও তাঁহার বিন্দুমাত্র বিকার বা মলিনতা হয় না। সেই যে মা তোমার নিরঞ্জন স্বরূপ, চল মা সেইখানে আমাদিগকে লইয়া চল।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে ক্ষমারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা! প্রতি জীবহৃদয়ে অল্লাধিক পরিমাণে ক্ষমারূপে তুমিই অধিষ্ঠিতা। অন্যকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, তাহার প্রতীকার করার সামর্থ্য থাকাসত্বেও, সেই অপকার নীরবে সহ্য করিবার ক্ষমতাই ক্ষমা। কোন প্রিয়জনকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে যেরূপ আমরা সে উৎপীড়ন অনায়াসে সহ্য করিতে পারি, ঠিক সেইরূপ যখন সর্ব্বপ্রকার পরাপকার সহ্য করিবার সামর্থ্য আসে, তখনই বুঝিতে পারি—তুমি ক্ষমামূর্ত্তিতে আমাদিগকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ। যে প্রবৃত্তির উদয় হইলে আমাদের এই পরাপকার-সহিষ্ণুতা ফুটিয়া উঠে, তাহাই তোমার ক্ষমামূর্ত্তি। মা, তোমার এই ব্যষ্টি ক্ষমামূর্ত্তিকে প্রণাম।

মাগো তোমার এই ক্ষমামূর্ত্তির প্রকাশ হইলেই আমরা যথার্থ শান্তিলাভ করিতে পারি।

তারপর যখন ঐ ক্ষমামূর্ত্তির সর্ব্বভূত পরিব্যাপক সমষ্টি-স্বরূপটী বোধে ফুটিয়া উঠে, তখন আহ্লাদে উৎসাহে হৃদয়ে শত গুণ সাহসের সঞ্চার হয়। মা, সেই বিশ্বব্যাপিনী ক্ষমামূর্ত্তিও তোমার। তোমায় কোটি প্রণাম। তুমি মা, ক্ষমাই তোমার মূর্ত্তি। যেখানে অপরাধ বলিয়া কিছু নাই, যেখানে অন্যায় বলিয়া কিছু নাই, যেখানে স্বেচ্ছাচারিতাই স্নেহের বহির্বিকাশ, সেই ক্ষমাময়ী মূর্ত্তি তুমি। অন্য জীবনের কথা ছাড়িয়া দিয়া, শুধু বর্ত্তমান জীবনের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাই, তোমাকে কত অবহেলা করিয়াছি—করিতেছি; তোমার নীরব সত্য আদেশ, তোমার অব্যক্ত স্নেহাশীর্ব্বাদ কত উপেক্ষা করিয়াছি—করিতেছি; কিন্তু মা! তুমি ত একদিনের তরে আমাদের প্রতি বিরক্তির কটাক্ষপাতও কর নাই! তুমি চিরহাস্যময়ী, চির-ক্ষমাময়ী মা, নির্নিমেষ নয়নে শুধু আমাদের পানে তাকাইয়া রহিয়াছ; কবে আমাদের এ ভুল ভাঙ্গিবে, কবে আমরা তোমার কথা শুনিব, কবে আমরা সত্য সত্যই তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া উঠিব। মা, তুমি ক্ষমাময়ী মূর্ত্তিতে এই জীব-জগৎকে অনাদিকাল হইতে বুকে করিয়া রাখিয়াছ, তাই আমরা আছি; নতুবা এমন অকৃতজ্ঞ জীব-জগতের অস্তিত্বই থাকিত না। যে জীব-জগৎ মায়ের সত্তাই স্বীকার করিতে পারে না, সেই জীব-জগৎ যে বর্ত্তমান আছে, তাহাই তোমার ক্ষমামূর্ত্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন। তোমার এই সমষ্টি মহতী ক্ষমাময়ী মূর্ত্তিকে অসংখ্য প্রণাম।

তারপর ক্ষমার বীজরূপিণী অব্যক্ত কারুণ্যমূর্ত্তিকে তৃতীয় প্রণাম করিয়া নিরঞ্জনক্ষেত্রে চলিয়া যাই। যেখানে ক্ষমা অথবা অক্ষমা বলিয়া কিছু নাই, যাঁহার সত্তায় ক্ষমার সত্তা, ক্ষমারূপে প্রকটিত হইয়াও যাঁহার নির্গুণ সত্তার বিন্দুমাত্রও অন্যথা হয় নাই, সেই গুণাতীত মূর্ত্তিকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে জাতিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, যাহা নিত্য হইয়াও বহু পদার্থে সমবেত, তাহাই তোমার জাতিমূর্ত্তি। জন্ম হইতেই জাতির অভিব্যক্তি। ব্রাহ্মণত্ব; ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি জাতিরূপে, অথবা মনুষ্যত্ব, দেবত্ব; পশুত্ব প্রভৃতি জাতি-রূপে, তুমিই সমস্ত জীবকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ। অল্পবয়স্ক বালক মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া যেরূপ "আমি মায়ের ছেলে" বলিয়া অভিমান করে, ঠিক সেইরূপই এই জগতে যখন কেহ, "আমি ব্রাহ্মণ" "আমি ক্ষত্রিয়"ইত্যাদিরূপে কিংবা "আমি মানুষ", "আমি দেবতা" ইত্যাদিরূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করে, তখন দেখিতে পাই—মা, তুমিই জাতিমূর্ত্তিতে তাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ। মা, তোমার এই ব্যষ্টি জাতিমূর্ত্তিকে প্রণাম।

মাগো, তোমার যে সকল সন্তান বর্ত্তমানে জাতিভেদ তুলিয়া দিবার জন্য প্রবল প্রয়াস করিতেছে, তাহারা জানে না যে জাতিরূপে তোমারই বিকাশ। নিত্যা তুমি, তোমার এই জাতিমূর্ত্তিও নিত্যাই, যতদিন জীবজগৎ আছে, সৃষ্টি আছে, ততদিন জাতিভেদ থাকিবেই। শত চেষ্টায়ও তাহা বিনষ্ট হইতে পারে না। তবে কালভেদে অবস্থাভেদে দেশভেদে জাতিভেদের রূপান্তর মাত্র হইতে পারে। মা তুমি বলিয়া দাও, তুমি বুঝাইয়া দাও—জাতি স্বরূপটী নিত্য, উহার বিলয় জগৎ থাকিতে হইতে পারে না।

সে যাহা হউক মা! তোমার এই ব্যষ্টি জাতিমূর্ত্তিকে প্রণাম করিতে গিয়া সমষ্টি মহতী জাতি স্বরূপের দিকে দৃষ্টি নিপতিত হয়। তখন দেখিতে পাই—ব্যষ্টি জাতিসমূহ সেই অদ্বিতীয়জাতির তরঙ্গমাত্র, তোমার সেই সর্ব্বভূত-মহেশ্বররূপিণী মহতী জাতিমূর্ত্তিকে প্রণাম।

অনন্তর এই উভয়ের বীজরূপিণী কারণস্বরূপা জাতিমূর্ত্তিকে প্রণাম। প্রলয়কালে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিলয় হইয়া যায় বটে, কিন্তু বীজরূপে যে জাতিটী থাকিয়া যায়, তাহাই তোমার জাতিরূপিণী কারণমূর্ত্তি। সর্ব্বশেষে যেখানে জাতি নাই, মূর্ত্তি নাই, প্রলয় নাই, অথচ যাহাতে এই সকল অবস্থিত, জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও যাহাতে বিন্দুমাত্র বিকার বা পরিণাম হয় নাই, সেই বাক্য-মনের অতীত-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছি। মা! তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, তুমি প্রতি জীবহৃদয়ে লজ্জামূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ কর বলিয়াই তোমার সন্তানগণ অনেক সময় নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হয়। ওগো! ভাবিলেও দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে, যদি জীবহৃদয়ে তোমার এই লজ্জামূর্ত্তিটীর অভিব্যক্তি না থাকিত, তাহা হইলে এই জগৎ যথার্থ ই পশুরাজ্যে পরিণত হইত। একদিকে যেমন তুমি অতুলনীয়া ক্ষমামূর্ত্তিতে জীবকে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ দিয়াছ, অন্যদিকে তেমনই লজ্জামূর্ত্তিতে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে সংযত করিয়া রাখিতেছ। ধন্য তোমার কৃপা! মা তোমার এই ব্যষ্টি লজ্জামূর্ত্তিকে প্রণাম। অনন্তর যখন এই লজ্জাকে ঈশ্বরীমূর্ত্তিতে বিশ্ব-ব্যাপিনীরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিতা সমষ্টি লজ্জাস্বরূপে দেখিতে পাই, তখন মনে হয়—মা! তুমিই সংযমের মূর্ত্তি ধরিয়া সহস্রবাহুতে স্বেচ্ছাচারী জীব-সন্তানগণকে বক্ষে টানিয়া রাখিতেছ। এই লজ্জামূর্ত্তির ভিতর দিয়াই

তোমার মাতৃভাব পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত ও স্নেহের পরাকাষ্ঠা পূর্ণভাবে প্রদর্শিত হইতেছে। মা, তোমার এই সমষ্টি লজ্জামূর্ত্তিকে প্রণাম। অতঃপর এই স্থূল সূক্ষ্ম বা ব্যষ্টি সমষ্টি লজ্জামূর্ত্তির যাহা বীজ বা কারণ, তাঁহাকে তৃতীয় প্রণাম করিতেছি।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে আমাদের স্মরণ করিবার যোগ্য যে, যদিও মা, তুমি এই লজ্জামূর্ত্তিতে সর্ব্বভূতকে সংযত করিয়া রাখিয়াছ, যদি কোন সন্তান প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন জুগুপ্সিত কর্ম্ম করে, তবে তাহা সাধারণের নিকট গোপন রাখিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকে, কিন্তু মা তোমার কাছে কাহারও কোন লজ্জা নাই। তোমার কাছে কোন কথাই গোপন করিতে ইচ্ছা হয় না। যে কথা জগতের কাহাকেও বলিতে পারা যায় না, যাহা সকলের নিকটই একান্ত গোপনীয়, সেই কথাও নির্ব্বিচারে অকপট হৃদয়ে তোমার কাছে খুলিয়া বলিতে পারা যায়। তুমি স্বয়ং লজ্জারূপিণী; কিন্তু সন্তান তোমার কাছে আসিতে, তোমার কাছে প্রাণের গোপনকথা খুলিয়া বলিতে কোনই লজ্জা বা সঙ্কোচবোধ করে না, ইহাই তোমার বিশেষত্ব। মা, আর একটা কথা সত্যি বল্‌ছি, আমরা সব চাইতে তোকেই যে বেশী ভালবাসি, ইহাই তাহার বহির্লক্ষণ। যতই সংসারমুগ্ধ হই না কেন, স্ত্রী পুত্র, ধন যশ প্রভৃতিকে যতই ভালবাসি না কেন, তোকে কিন্তু সে সবার চাইতেই বেশী ভালবাসি মা, বেশী ভালবাসি। নতুবা তোর কাছে কোন কথা গোপন করিতে পারি না, অথবা গোপন করিতে ইচ্ছা হয় না কেন? মা, তুমিই যে আমাদের যথার্থ প্রিয়তম বস্তু, যতদিন জীব এই কথাটা ঠিক ঠিক বুঝিতে না পারে, ততদিনই সংসারের মোহে আচ্ছন্ন থাকে। আর যে দিন হইতে তুমি দয়া করিয়া জীবহৃদয়ে এই তত্ত্বটী উদ্ভাসিত করিয়া দাও, সেই দিন হইতেই তাহার সংসারাসক্তি কমিতে থাকে; কিন্তু সে অন্য কথা—

যেখানে লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, স্বেচ্ছাচারিতা নাই, সংযম নাই, অথচ যাঁহার সত্তায় এই সকলের সত্তা, আবার এই সকল রূপে প্রকাশ

হইতে গিয়াও যাঁহার স্বরূপের কোনই ব্যত্যয় হয় না, সেই "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" তত্ত্বরূপিণী মা তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

আর একটী কথা এখানেই বলা আবশ্যক মনে হয়—অনেক শিষ্য নিজ নিজ দুর্ব্বলতা গুলিকে স্ব স্ব গুরুদেবের নিকটে প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন। ইহা উন্নতির অন্তরায়। শাস্ত্রে আছে গুরুর নিকট লজ্জা করিবে না, নিঃসঙ্কোচে সকল পাপ সকল দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিবে। যতদিন সেরূপ ইচ্ছা না জাগে, ততদিন বুঝিতে হইবে—হয় গুরুলাভ যথার্থ ভাবে হয় নাই, অথবা গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধির অভাব আছে। সে যাহা হউক, আমরা এইবার স্থূল সূক্ষ্ম কারণের অতীত স্বরূপকে নমোনমঃ বলিয়া চতুর্থ প্রণাম করি।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৩॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, যদিও বিষয় সম্ভোগে যথার্থ শান্তি নাই, শান্তির আভাসমাত্র আছে; যদিও চিত্তের পূর্ণপ্রশান্তভাব না আসিলে শান্তির সন্ধানই পাওয়া যায় না, তথাপি এই বিষয়সংগ্রহ ও সম্ভোগজনিত অস্বাভাবিক চিত্তবিক্ষেপের ভিতর দিয়া যে কণামাত্র শান্তি কদাচিৎ আমাদের হৃদয়টাকে ক্ষণকালের জন্য পবিত্র করিয়া দিয়া যায়, সেই শান্তিমূর্ত্তি তোমারই। সর্ব্বভূতেই তোমার ঐ মূর্ত্তির অল্পাধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; উহাই তোমার ব্যষ্টি-শান্তিমূর্ত্তি। মাগো তুমি যখন শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে আমাদিগকে কোলে করিয়া বস, তখনই ত আমরা শান্তির স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হই, যদিও ক্ষণকালমাত্র, তথাপি উহাই অপূর্ব্ব। মা তোমার যে সকল সন্তান শান্তির আশায়

বাহিরে ছুটিয়া বেড়ায়, তাহাদের বুঝাইয়া দেও, শান্তি বাহিরে নহে—অন্তরে। এস মা শান্তিরূপিণী তোমাকে প্রণাম করি। তারপর চল মা, দেখি—যেখানে তোমার মহতী শান্তিমূর্ত্তি, যেখানে গেলে একটা অসীম শান্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না, যেখানে গেলে এই সংসারতাপসন্তপ্ত বক্ষঃস্থল চিরতরে জুড়াইয়া যায়, চল মা চল, একবার সেইখানে যাই। সে কি মধুময়ী অবস্থা। আঃ! সে যে অনির্ব্বচনীয়। কেবল শান্তি! কেবল শান্তি!! শোক নাই, তাপ নাই, জ্বালা নাই, কেবল বুকজোড়া শান্তি। সে শান্তিসমুদ্রকে ধরিয়া রাখিবার মত সামর্থ্য এ ক্ষুদ্রবক্ষে নাই। মা, তোমার সেই সমষ্টি মহতী শান্তি-মূর্ত্তিকে অসংখ্য প্রণাম। তুমি আমাদিগকে ক্ষণকালের তরেও তোমার এই মহতী শান্তিমূর্ত্তির অঙ্কচ্যুত করিও না। যতদিন বিষয়-ভোগের আসক্তি বিদূরিত না হয়, ততদিন তোমার এই অনির্ব্বচনীয় কেবল-শান্তিমূর্ত্তির সন্ধানই পাওয়া যায় না। তোমার এই মহতী শান্তিমূর্ত্তিকে প্রণাম করিতে করিতে আমরা ক্রমে এমন এক অব্যক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত হই, যেখানে শান্তির ঐরূপ মহত্ত্ব, ঐরূপ ব্যাপকতা কিংবা বিশিষ্টতা নাই, কেবল অব্যক্তরূপে শান্তির বীজ অবস্থিত আছে, যাহা হইতে এই ব্যষ্টি সমষ্টি শান্তিমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে, মাগো! তোমার সেই কারণরূপিণী শান্তিমূর্ত্তিকে তৃতীয় প্রণাম। তারপর যেখানে কিছু নাই, অথচ কিছুর অভাবও নাই, যেখানে শান্তি বলিয়া বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা যায় না, অথচ অশান্তিরও লেশমাত্র নাই, সেই যে তোমার ত্রিগুণাতীত বাক্যমনের অগোচর নিরঞ্জনস্বরূপ, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নমোনমঃ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। তুমি আমাদিগকে নিত্যশান্তিময় অবস্থায় লইয়া চল।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৪॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা! শ্রদ্ধা বলিলে প্রথমেই তোমার ব্যষ্টি শ্রদ্ধা-মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিপতিত হয়। যদিও গুরু এবং বেদান্তবাক্যে দৃঢ় প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা নামে অভিহিত হয়, তথাপি নিরুক্তকার যাস্ক শ্রদ্ধা শব্দের যে নিরুক্তি করিয়াছেন, তাহাও আমাদের জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। "শ্রৎ সত্যম্ ধীয়ত ইতি শ্রদ্ধা।" যে প্রত্যয় অর্থাৎ যে প্রতীতি নিয়ত সত্যকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই যথার্থ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য। মা, যাহাদিগকে তুমি এই কল্পিত মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত কর, তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমেই তোমার শ্রদ্ধামূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাহারা গুরুবাক্যে, বেদান্তবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসবান্ হয়, সত্যের প্রতিষ্ঠাই তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়। এই সব বহির্লক্ষণ দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি—মা, তুমি ঐরূপ জীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধামূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছ। অল্প হউক, বেশী হউক, সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ব্যষ্টি শ্রদ্ধামূর্ত্তিতে তুমি নিয়তই প্রকাশিত রহিয়াছ। মা, তোমাকে প্রণাম।

গীতায় উক্ত হইয়াছে "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" শ্রদ্ধা আত্মস্বরূপ জ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। যতদিন শ্রদ্ধা লাভ না হয়, ততদিন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের আশা বৃথা। শ্রদ্ধা ও নিশ্চয় জ্ঞান প্রায় একই কথা, সংশয় থাকিতে নিশ্চয় জ্ঞান হয় না, তাই বুঝিতে হয় যতদিন সংশয় থাকে, ততদিন মা আমার শ্রদ্ধামূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন নাই, শ্রদ্ধা একবার লাভ হইলে তাহা নষ্ট হয় না। সাধারণতঃ মনে হয়—আমরা অপর কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করি, বাস্তবিক তাহা নহে, শ্রদ্ধা আমাদের জ্ঞানেরই একটী অপূর্ব্ব অবস্থা, উহা সত্যরূপে নিসংশয়রূপে প্রকাশ পায়, যতকিছু সাধন ভজন

এই শ্রদ্ধালাভের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাঁহার শ্রদ্ধালাভ হইয়াছে তিনি ধন্য। সে যাহা হউক, মা তোমার ব্যষ্টিশ্রদ্ধামূর্ত্তিকে প্রণাম করিতে করিতে সমষ্টি শ্রদ্ধামূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য করিতে গিয়া দেখিতে পাই—সুবিশাল শুভ্র আকাশরূপে নিস্তরঙ্গ মহোদধিকল্পা মহতী শ্রদ্ধামূর্ত্তিতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অবস্থিত, তোমার এই মহেশ্বরী শ্রদ্ধামূর্ত্তির অঙ্কেই সমগ্র জীবজগৎ পরিশোভিত। মা! তোমার এই সমষ্টি ঈশ্বরী শ্রদ্ধামূর্ত্তির চরণে প্রণাম।

অনন্তর এই ব্যষ্টি সমষ্টি শ্রদ্ধার যাহা বীজ, সেই অব্যক্ত কারণ-রূপিণী শ্রদ্ধাকে "নমস্তস্যৈ" বলিয়া তৃতীয় প্রণাম করিয়া একেবারে গুণাতীত-স্বরূপে উপনীত হই। যেখানে শ্রদ্ধা কিংবা অশ্রদ্ধা বলিয়া কিছু নাই, যাঁহার সত্তায় শ্রদ্ধার সত্তা, শ্রদ্ধারূপে প্রকাশিত হইয়াও যাঁহার স্বরূপের কোন ব্যাঘাত হয় নাই, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, নমোনমঃ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। মাগো তুমি আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা মূর্ত্তিতে প্রকটিত হও। আমরা জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হই।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৫॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে কান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা! কান্তি বা সৌন্দর্য্যরূপে তুমিই সর্ব্বত্র সর্ব্ব-বস্তুতে নিত্য উদ্‌ভাসিতা। জীব যতই কুৎসিৎ বা কদাকার হউক না কেন, প্রত্যেকের মধ্যেই কান্তি নামক একটা পদার্থ আছে। প্রত্যেক মানুষই ঐ কান্তির কিয়দংশ উপলব্ধি করিতে পারে। তদ্ভিন্ন পুষ্পে, পদ্মে, চন্দ্রে, শিশু এবং কামিনীর কমনীয় মুখমণ্ডলে একটা কি যেন জিনিষ আছে, তাহা দর্শনমাত্র আমাদের চিত্ত প্রফুল্ল হয়, উহাও মা,

তোমার ঐ কান্তি-মূর্ত্তিরই অভিব্যক্তি। যতদিন তুমি জীবদেহে চেতনা-রূপে অধিষ্ঠিতা থাক ততদিনই তোমার এই কান্তিমূর্ত্তি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কেবল প্রাণীদেহে নয়, বৃক্ষ লতা পর্ব্বত নদনদী গ্রহনক্ষত্র সর্ব্বত্রই তোমার এই বিশিষ্ট কান্তিমূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মা, ইহাই তোমার কান্তিমূর্ত্তির ব্যষ্টিরূপ। এই ব্যষ্টি কান্তিরূপিণী তোমাকে প্রণাম।

ক্রমে ব্যষ্টি বস্তু ছাড়িয়া দিয়া, যখন সর্ব্বভূতমহেশ্বরী মহতী কান্তি-মূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয়, তখনই এই সমগ্র জগৎ কান্তিময় সৌন্দর্য্যময়, সুতরাং মধুময় হইয়া উঠে। মা গো, তখন এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণাশক্তি যতদূর প্রসারিত হয়, ততদূর কেবল তোমারই কমনীয় কান্তি—আকাশবৎ সর্ব্বতঃপ্রসৃত রূপহীন কমনীয় রূপ দেখিয়া, উপলব্ধি করিয়া, ভোগ করিয়া আমরা কেমন হইয়া পড়ি! মা গো, তখন আমার আমিত্বটা কান্তিসমুদ্রে ডুবিয়া যায়। সেই অরূপ রূপ-সাগরে ডুবিয়া গিয়া আমিটা যে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবময় হইয়া পড়ে, তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব? ওগো যে রূপ দেখিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ আত্মহারা হইয়া ছুটিত, যে রূপ দেখিয়া গাভীদল অর্দ্ধভুক্ত তৃণ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পানে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকিত, যে রূপ দেখিয়া জড় যমুনা প্রাণময়ী হইয়া উজান বহিয়া যাইত, এ যে সেই রূপ গো সেই রূপ। এ যে যথার্থই কুলমজান রূপ! মন-প্রাণহরা রূপ! একবার এ কমনীয় কান্তি যাহার নেত্রপথে নিপতিত হয়, এ সংসারে—ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছুই নাই, যাহার প্রয়োজনে সেই লোভনীয় কান্তির স্মৃতি হইতে জীব বিচ্যুত হইতে পারে। মা, সেই বিশ্বব্যাপিনী অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী তোমার কান্তিমূর্ত্তিকে প্রণাম।

অনন্তর যে অব্যক্ত বীজ হইতে এই ব্যষ্টি সমষ্টি কান্তির প্রাদুর্ভাব, সেই কারণরূপিণী কান্তিমূর্ত্তিকে প্রণাম। অবশেষে তোমার নিরঞ্জন-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া নমোনমঃ বলিয়া বারংবার প্রণাম করি। যেখানে কান্তি বলিয়া কিছু নাই, অথচ কান্তি যাহার প্রকাশে প্রকাশিত,

কান্তিরূপে প্রকাশিত হইতে গিয়া যাহার অব্যয় স্বরূপের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই, সেই পরম কমনীয় পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্ম-স্বরূপকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৬॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—লক্ষ্মী শব্দের অর্থ প্রাণ। জীবদেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণই সে লক্ষ্মী বা শ্রীযুক্ত থাকে। লক্ষ্মী শব্দের অর্থ শোভা সম্পৎ—সৌন্দর্য্য, যাহা কিছু কর, প্রাণই ঐ সকলের একমাত্র আধার।

মাগো, সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে তুমিই লক্ষ্মীমূর্ত্তিতে বিরাজিত রহিয়াছ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও এই মূর্ত্তি আমাদের নিয়তই অনুভব যোগ্য হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তি কখনও প্রাণের অভাব অনুভব করে না। এই যে প্রতি জীবের নিয়ত অনুভবযোগ্য প্রাণস্বরূপ, ইহাই মা তোমার ব্যষ্টিলক্ষ্মীমূর্ত্তি। এস প্রাণরূপিণী মা, তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম করি।

সাধক! তোমার অন্তরে অন্তরে প্রাণরূপে যাহার প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করিতেছ, উহাই মায়ের ব্যষ্টি লক্ষ্মী-মূর্ত্তি। প্রথমে ঐ ব্যষ্টি প্রাণরূপিণী মাকে "নমস্তস্যৈ" বলিয়া প্রণাম কর। তারপর বিশ্বব্যাপী মহাপ্রাণরূপে অবস্থিত সমষ্টি প্রাণময়ী মাতৃমূর্ত্তিকে দর্শন কর। দেখ—একই প্রাণসমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গগুলি জীবরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহুদিন ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছ, আজ আর অবজ্ঞা করিও না, আজ সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত "নমস্তস্যৈ" বলিয়া প্রণাম করিতে গিয়া,

আপনার ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটুকু সেই মহাপ্রাণসমুদ্রে ঢালিয়া দাও, তোমার জীবত্বের অবসান হউক। অনন্তর এই ব্যষ্টি সমষ্টি প্রাণের যাহা কেন্দ্র, সেই সূক্ষ্মকারণরূপী অব্যক্ত প্রাণসত্তাকে প্রণাম করিয়া নিরঞ্জনক্ষেত্রে উপনীত হও, নমোনমঃ বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া যাও, আত্মলাভ কর।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৭॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে বৃত্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। বৃত্তি শব্দের অর্থ জীবিকা অথবা চিত্তবৃত্তি। অব্যক্ত চৈতন্য যখন কোন কিছুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমানবৎ প্রকাশিত হন, অর্থাৎ ব্যক্তভাবাপন্ন হন, তখনই তিনি বৃত্তিনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জীবিকারূপ বৃত্তিও চৈতন্যের এই বিশিষ্ট অভিব্যক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

মা, আমরা প্রতিনিয়ত তোমার এই বৃত্তিস্বরূপটীর উপলব্ধি করিয়া থাকি। কি ইন্দ্রিয়বৃত্তি, কি অন্তঃকরণবৃত্তি, সর্ব্বরূপেই তুমি নিয়ত প্রকাশিত। একদিনও তোমার এই মূর্ত্তিকে আদর করি নাই, একদিনও ইহাকে মা বলিয়া বুঝি নাই; আজ তুমি কৃপা করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছ; বৃত্তিরূপে তুমিই যে প্রকাশিত, ইহা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা দিয়াছ; আজ সেই চির অকৃতজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়া 'নমস্তস্যৈ' বলিয়া একটী ক্ষুদ্র প্রণাম করিতেছি। ব্যষ্টিবৃত্তিরূপিণী মা তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

তারপর সমষ্টির দিকে—সূক্ষ্মের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, বিশ্বময় এক অখণ্ড বৃত্তিনামক বস্তুই আছে, সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়রূপে

প্রকাশিতা সেই মহতী বৃত্তিরূপিণী ঈশ্বরী মূর্ত্তিরই এক একটী স্ফুরণ প্রতি জীবের ভিতর দিয়া ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই মহতী বৃত্তিরূপিণী ঈশ্বরী মা তোমার চরণে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম!

অনন্তর যে সূক্ষ্মতম অব্যক্ত কারণ হইতে এই ব্যষ্টি সমষ্টি বৃত্তির প্রকাশ এবং যে কেন্দ্রে পুনরায় ইহার বিলয় হয়; মা! তোমার সেই অব্যক্ত কারণমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া, সর্ব্বশেষে নিরঞ্জনতত্ত্বে প্রবিষ্ট হই। যেখানে বৃত্তি বলিয়া কিছু নাই, কেবল বিশুদ্ধ চিৎ; যেখানে উপস্থিত হইলে সর্ব্ববৃত্তি সম্যক্ বিলয়প্রাপ্ত হয়, সেই গুণাতীত স্বরূপকে নমোনমঃ বলিয়া প্রণাম করিতেছি। মা! কবে তুমি আমাদের এই প্রণাম সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিবে? বৃত্তিরূপিণী মা আমার, তুমি যখন স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বোধাকারা অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে, তখনই আমাদের এই প্রণাম সার্থক হইবে।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৮॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা গো, বৃত্তির পরেই তোমার স্মৃতিমূর্ত্তিটী উদ্ভাসিত হয়; কারণ, প্রথমে বৃত্তিরূপে যে ভাবটী প্রকাশিত হয়, পরে তাহাই সংস্কাররূপে চিত্তে আহিত হয়। সেই আহিত ভাবটী যখন পুনরায় চিত্তক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই উহা স্মৃতিনামে অভিহিত হয়। মা, স্মৃতিরূপেই ত তুমি জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু জ্ঞানসমষ্টিকে ধরিয়া রাখিয়াছ! এক একটা মৃত্যুর সঙ্গেই যদি সেইজন্মের লব্ধজ্ঞানগুলি

হারাইয়া যাইত, তবে আর আমাদের পূর্ণজ্ঞান লাভের আশাই থাকিত না, মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যাইত না, অনন্তকাল অজ্ঞাননরকে পচ্যমান হইতে হইত ; কিন্তু স্নেহময়ী মা আমার ! তুমি এই অনাদি অজ্ঞান হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য স্মৃতিরূপে প্রতি জীবহৃদয়ে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছ ; তাই আমরা স্মৃতিরূপিণী তোমার স্নেহময় অঙ্কে অবস্থান করিয়া জন্মের পর জন্ম ধরিয়া কেবল জ্ঞানরাশিই সঞ্চয় করিতেছি। তাহার ফলে একদিন "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ চরমস্মৃতিতে উপনীত হইব। জীবত্বের ধাঁধা চিরতরে অবসিত হইয়া যাইবে। এস ব্যষ্টি স্মৃতিরূপিণী কেবল আমার মা, এস তোমায় প্রণাম করি। তারপর তোমারই কৃপায় তোমার সেই সর্ব্বভূতমহেশ্বরী সমষ্টি-স্মৃতিমূর্ত্তির সমীপে উপনীত হইয়া দেখিতে পাই—এক মহতী স্মৃতিমূর্ত্তি এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বভূতে যে বিভিন্ন স্মৃতির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ঐ সমষ্টি-স্মৃতি-সমুদ্রেরই ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গমাত্র। মা ! তোমার এই ঈশ্বরী স্মৃতিমূর্ত্তিকে প্রণাম। অনন্তর সর্ব্বস্মৃতিবীজরূপিণী অব্যক্ত-কারণমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া নিরঞ্জনস্বরূপে উপনীত হই। যখন আমাদের জীবত্ব-স্মৃতি বিলুপ্ত হয় ; "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ স্মৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবুদ্ধ থাকে, তখনই আমরা তোমার নির্গুণ স্বরূপের সন্ধান পাই। যেখানে স্মৃতি বলিয়া কিছু নাই, যাঁহার সত্তায় স্মৃতির-সত্তা, স্মৃতিরূপে প্রকাশিত হইয়াও যাঁহার নির্গুণত্বের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৯॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে দয়ারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, জীবের দুঃখ দর্শন করিলে, সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য যে ইচ্ছা জাগে, উহাই তোমার দয়ামূর্ত্তি। প্রত্যেক জীবহৃদয়েই অল্পাধিক পরিমাণে তোমার এই ব্যষ্টি-দয়ামূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মা! তোমার এই মূর্ত্তিকে আমরা প্রণাম করিতেছি। মাগো, তোমার প্রিয়তম সন্তানবৃন্দকে বলিয়া দাও,—যখন তাঁহারা কাহারও দুঃখে দুঃখিত হইয়া কিছু দান করিতে উদ্যত হন, অথবা অন্য কোন প্রকার উপকার করিতে চেষ্টা করেন, তখন যেন তাঁহারা "দুঃখীর প্রতি করুণা করিলাম" "পরের উপকার করিলাম" এরূপ জ্ঞানে দান বা উপকার না করেন; কারণ, উপকার অন্যের করা হয় না; বাস্তবিক উপকার নিজেরই হইয়া থাকে। যখন কোন অন্ধ, খঞ্জ অথবা দরিদ্র আর্ত্তব্যক্তি কিছু প্রাপ্তির আশায় কাহারও নিকট প্রার্থনা করে, তখন কার্য্যতঃ তাহার সেই কাতরভাব দর্শনে দাতার হৃদয়ে দয়াবৃত্তির উদ্বোধ হইয়া থাকে; হয়ত দাতা তখন সংসারের ধাঁধায় ব্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ ঐরূপ কোন দরিদ্র বা বিকলাঙ্গ ব্যক্তির কাতরভাব দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়। এই যে দয়া, ইহা তোমারই মূর্ত্তি। তুমিই ত মা দয়ামূর্ত্তিতে তখন তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছ! দাতা যদি ইহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন এবং 'নমস্তস্যৈ' বলিয়া তোমাকে প্রণাম করিতে পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই দরিদ্রের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া পড়িবেন। যে দরিদ্র ব্যক্তি দাতাকে দয়ারূপিণী মাতৃমূর্ত্তি দেখাইয়া দিল, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকা যায় কি? সেই কৃতজ্ঞতার প্রতিদান স্বরূপ যাহা কিছু দান করা যায়, যাহা লাভ হইয়াছে তাহার তুলনায় উহা অকিঞ্চিৎকর হইবেই; সুতরাং এইরূপ দানের ফলে গ্রহীতা যত উপকৃত হন, দাতা তদপেক্ষা সহস্রগুণে উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দয়া সাত্ত্বিকী বৃত্তি। ইহার যত বেশী অনুশীলন হয়, মানুষ ততই সুখী হয়। যে ব্যক্তি আমাদিগকে এই-সাত্ত্বিকী বৃত্তির অনুশীলনের সুযোগ করিয়া দেয়, সে যত দীন দরিদ্রই হউক না কেন, আমরা যে তাহার নিকট বিশেষভাবে উপকৃত এ বিষয়ে কোন

সংশয়ই নাই। সেই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ যতই অধিক দান করা হউক না কেন, লব্ধ উপকারের তুলনায় উহা অতি সামান্য মাত্রই হইয়া থাকে।

সাধক! তুমি দরিদ্রকে দান করিতে গিয়া দেখিও—একদিকে মা স্বয়ং দরিদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে কিছু প্রার্থনা করিতেছেন, অন্যদিকে ঐ কাতরভাবই তোমার হৃদয়ে মায়ের দয়ামূর্ত্তিতে আবির্ভাবের হেতু হইতেছে। তুমি বিষয়চিন্তায় ব্যস্ত ছিলে, মুহূর্ত্তমধ্যে সে বিষয়চিন্তা দূরীভূত করিয়া যে তোমাকে দয়ারূপিণী মাতৃ-মূর্ত্তি দেখাইয়া দিল, তুমি তাহার নিকট কত ঋণী! তোমার সর্ব্বস্ব দিলেও তাহার প্রতিদান হয় কি? এইভাবে দান বা উপকার করিতে পারিলেই, দানের সার্থকতা হয়। মনে রাখিও—যখনই তোমার অন্তরে পরের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা আবির্ভূত হয়, তখন ঐ ইচ্ছাটীকে চিত্তের একটা সামান্য বৃত্তিমাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না, তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ মা বলিয়া বুঝিয়া লইও। দেবতাদের মত তুমিও উঁহার চরণে—এই দয়ারূপিণী মায়ের চরণে অসংখ্য প্রণিপাত করিও; পরমানন্দ পাইবে।

এইবার আমরা দয়ার ব্যষ্টিমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া সমষ্টিমূর্ত্তির সমীপস্থ হইব। সে মূর্ত্তির সমীপস্থ হইলে বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দয়া ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। এই অগণিত জীববৃন্দ এই মহতী দয়ামূর্ত্তির বক্ষেই অবস্থিত। জন্ম মৃত্যু জীবনযাত্রা শোক সুখ প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থায় জীব একমাত্র মহতী দয়ার বক্ষেই অবস্থিত। ওগো! যে দয়ার দান আমার প্রাণ, যিনি দয়া করিয়া, ভালবাসিয়া আমাকে প্রাণনামক বস্তুটী দিতে পারেন, সে দয়ার সীমা যে কোথায়, তাহা কে বলিবে? মা তোমার এই মহতী ঈশ্বরী দয়ামূর্ত্তিকে শত শত প্রণাম। যাহারা তোমার এই দয়ামূর্ত্তি না দেখিয়া রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে উৎপীড়িত হইয়া তোমার নিষ্ঠুরতাই দেখিতে পায়, তাহারা নিশ্চয়ই অন্ধ। শুন, একটী সত্য ঘটনা বলিতেছি:—

কোনও গভীর অরণ্যে জনৈক মুসলমান গলিতকুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া

নিপতিত ছিল। তাহার সমুদয় শরীরে ক্ষত, তাহাতে অসংখ্য কৃমি, দুর্গন্ধে কেহ নিকটে যাইতে পারে না; একজন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় দিনান্তে কিছু আহার্য্য অতি কষ্টে তাহার মুখের কাছে রাখিয়া যাইত। উহাদ্বারাই কোনরূপে সে জীবিত ছিল। তাহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে মৃত্যুই তাহার একান্ত বাঞ্ছনীয় ও শান্তিপ্রদ বলিয়া মনে হইত, এমনই ভাবে সে দিনপাত করিতেছিল। দৈববশে এক ফকির সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বলিলেন—হায়! পরমেশ্বর কি নিষ্ঠুর! তিনি তোমায় কত কষ্টই দিতেছেন। তোমার শরীরে এমন একটুও স্থান নাই, যে স্থানটী অক্ষত। উঃ! কি যাতনাই তুমি ভোগ করিতেছ! তাহা শুনিয়া রোগী সরল হাস্যপূর্ণমুখে বলিল "না ফকির সাহেব, তুমি খোদাকে নিষ্ঠুর বলিও না, তিনি পরম দয়াময়, এই দেখ—আমার কণ্ঠ এখনও অক্ষত আছে, এখনও আমি প্রাণ ভরিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও নাম গান করিতে পারি; ধন্য দয়া তাঁর, যাঁহার কৃপায় আমি এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়াও তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি"। এইরূপ উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া ফকির অচিরাৎ তাহাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন।

সত্যই এইরূপ যাহারা সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের দয়া ব্যতীত নিষ্ঠুরতার কথা ভাবিতেও পারে না, তাহারা কখনও কোনরূপ দুঃখেই একান্ত ক্লিষ্ট বা উৎপীড়িত হয় না, হইতে পারে না। কিন্তু সে অন্য কথা :—

মা! এই বিশ্বের যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই ত তোমার ঘনীভূত দয়ামূর্ত্তি দেখিতে পাই। প্রত্যেক পদার্থ, প্রতি জীব ঘনীভূত দয়ার বিকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। পূর্ব্বে যে ক্ষমারূপে তোমাকে দেখিয়া আসিতেছি, তাহা এই দয়মূর্ত্তিরই অন্যতম বিকাশ মাত্র। এইরূপে যে অসীম দয়া-সমুদ্রে আমরা নিয়ত অবস্থিত, তোমারই সেই পরমেশ্বরী মহতী দয়ামূর্ত্তির চরণে অসংখ্য প্রণাম। তারপর যে অব্যক্ত-কেন্দ্র হইতে এই ব্যষ্টি-সমষ্টি দয়ার স্ফুরণ হয়, সেই কারণরূপিণী দয়ামূর্ত্তিকে প্রণাম

করিয়া একেবারে নিরঞ্জনক্ষেত্রে চলিয়া যাই। যেখানে দয়া বলিয়া কিছু নাই, যাঁহার সত্তায় দয়ার সত্তা, যিনি দয়ারূপে প্রকাশিত হইয়াও নিত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমোনমঃ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৩০॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে তুষ্টিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা তুমি তুষ্টিরূপিণী। ইষ্টপ্রাপ্তি কিংবা অনিষ্টনিবৃত্তিতে ক্ষণকালের তরে অন্তঃকরণে যে ভাবের উদয় হয়, উহাই তোমার তুষ্টি-মূর্ত্তি। ব্যষ্টিরূপে প্রতি জীবে তুমি এই মূর্ত্তিতে বিদ্যমান রহিয়াছ। তোমাকে প্রণাম। তারপর যখন তোমার সমষ্টি-তুষ্টিমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই—বিশ্বময় এক অখণ্ড তুষ্টিসমুদ্র। জীবগণ তাহারই মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। শোকার্ত্তের কাতর ক্রন্দন, রোগার্ত্তের রোগযন্ত্রণা, ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধার জ্বালা, এসকলের মধ্যেও তোমার তুষ্টিমূর্ত্তি অব্যাহত ভাবেই বিরাজিত রহিয়াছে। জীব যদি কাঁদিয়াও তুষ্টির সন্ধান না পাইত, তবে কাঁদিত না। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকল জীবই তুষ্টির পূজা করে, তুষ্টির সেবা করে, তুষ্টিরই সন্ধানে অসংখ্য জন্ম মৃত্যুর পেষণ সহ্য করে। মা, তোমার এই মহতী পরমেশ্বরী তুষ্টিমূর্ত্তিকে প্রণাম। মাগো, গীতাশাস্ত্রে তুমি বলিয়াছ,—যে ব্যক্তি "সতত সন্তুষ্ট" সেই তোমার প্রিয় ভক্ত; কিন্তু মা যাহারা তোমার এই মহতী সর্ব্ব-ব্যাপিনী তুষ্টিমূর্ত্তির সন্ধান পায় নাই, তাহারা কি সতত সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? এ জগতে যে প্রায় সর্ব্বত্রই একটা তুষ্টির অভাব পরিলক্ষিত হয় তাহার একমাত্র হেতু—প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল অপেক্ষা বেশী বা অন্যরূপ ফল লাভের ইচ্ছা। এবং যখন যে ফল লাভ হইবে, তাহার পূর্ব্বেই

সেই ফল লাভের জন্য ব্যাকুলতা। এই দুইটীই যত অতৃপ্তির মূল। প্রারব্ধে যাহা আছে, তাহার অন্যথা হইতে পারে না। এবং যখন যে ফল পাওয়ার জন্য যে সময়টী নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার পূর্ব্বে কিছুতেই পাওয়া যাইতে পারে না। ইহা যদি মানুষ বুঝিতে পারে, তবে আর কোন অবস্থায়ই মানুষের তুষ্টির অভাব হয় না—হইতে পারে না। মাগো, তুমি যতদিন জীব হৃদয়ে অতৃপ্তি মূর্ত্তিতে প্রকাশিত থাক, ততদিন কি করিয়া জীব তৃপ্তির—তুষ্টির সন্ধান পাইবে? তাই বলি মা, তুই তোর মহতা তুষ্টি স্বরূপটী প্রকটিত করিয়া জীবের পূর্ব্বোক্তরূপ মিথ্যা দুরাশা জনিত অতৃপ্তি দূর করিয়া দে, এ দুঃখময় জগৎ তোর তুষ্টিমূর্ত্তিতে অবস্থান করিয়া ধন্য হউক। আমাদের এই ব্যষ্টি সমষ্টি প্রণাম সার্থক হউক! তারপর আমরা কারণ তত্ত্বে প্রবেশ করি।

যে অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে এই তুষ্টির আবির্ভাব, তোমার সেই কারণ-মূর্ত্তিকে প্রণাম পূর্ব্বক নিরঞ্জনসত্তায় উপনীত হই, যেখানে তুষ্টি অতুষ্টি কিছু নাই, যাহার সত্তায় তুষ্টির সত্তা, তুষ্টিরূপে প্রকাশিত হইতে গিয়াও যাঁহার স্বরূপের কোন বিকার হয় না, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নমোনমঃ বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৩১॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মাতৃরূপিণী মা গো, তোমাকে প্রণাম। তুমি সকল জীবকে বীজরূপে গর্ভে ধারণ করিয়া থাক। তারপর উহাকে ব্যক্ত অবস্থায় আনিবার জন্য তপঃক্লেশ বা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ কর। তখন জীব নামে একটা পৃথক্ সত্তা পরিলক্ষিত হয়; এইরূপে অব্যক্ত হইতে

ব্যক্ত অবস্থায় আনিয়া অর্থাৎ গর্ভ হইতে প্রসব করিয়া, স্তন্যদানে—খণ্ড খণ্ড বিষয়-জ্ঞানের সাহায্যে পরিপুষ্ট করিতে থাক। অসংখ্য জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়া তুমি স্নেহময়ী মা নির্ণিমেষ নয়নে সন্তানের মুখের পানে তাকাইয়া থাক। জীবের—সন্তানের মিথ্যা আমিত্বের কল্পিত অভাব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে থাক। এইরূপ জ্ঞান-স্তন্য-পরিপুষ্ট সন্তান ক্রমে মাতৃসত্তায় বিশ্বাসবান্ হয়, জীবকর্তৃত্ব ভুলিয়া যায়, সর্ব্বতোভাবে তোমাকেই জড়াইয়া ধরে, আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তখন তুমিই তাহাকে আবার আপনাতে মিলাইয়া মাতাপুত্র-সম্বন্ধহীন এক অজ্ঞেয়তত্ত্বে উপনীত হও। মা, ইহাই ত তোমার সুপ্রকট মাতৃমূর্ত্তি! এইরূপে তোমার স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ও নিরঞ্জনস্বরূপে তোমার মাতৃত্বের সম্যক্ অভিব্যক্তি দেখিয়া, আত্মা মা আমার! তোমার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

সাধক! এইরূপ অভয়বাণী আর কোথাও পাইয়াছ কি? গীতার সে অভয়বাণী মনে আছে? "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।" সেখানেও ভজনা করিবার উপদেশ আছে। আর এখানে—এই দেবী-মাহাত্ম্যে আমরা কি দেখিতে পাই? দেবতাগণ মায়ের স্তব করিতে করিতে এমনই একটা কথা বলিয়া ফেলিলেন, যাহা আর কোথাও এমন স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। "আত্মাই আমার মা" ইহা অপেক্ষা আশ্বাসবাণী আর কি থাকিতে পারে? আমি যে কোনও অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমার মায়ের কোলেই রহিয়াছি। যতদিন আমি আমাকে একটা পৃথক্ জীবরূপে মনে করিব, যতদিন আমি সর্ব্বত্বে—বহুত্বে মুগ্ধ থাকিব, ততদিনও আমি মায়েরই কোলে। ধন্য আমি! ধন্য আমার জীবন! আমার আর অন্বেষণ করিবার কিছু নাই, আমার আর অভাব বলিয়া কিছু নাই, আমার আর হিতাহিত বিচার করিবার কিছু নাই। আরে, আমি যে আমার মায়ের কোলে রহিয়াছি! কেবল আমি নই—সর্ব্বভূত, এই জগৎটা, এই ব্রহ্মাণ্ডটা, মায়ের কোলে! ওগো! তোমরা মায়া বল, জড়া প্রকৃতি বল,

মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দাও, ক্ষতি নাই, আমি জানি—আমি মায়ের কোলে, এ ব্রহ্মাণ্ডটা মায়ের কোলে। আবার যেখানে আমি নাই, ব্রহ্মাণ্ড নাই, সেখানেও মা আছেন,—অব্যক্তরূপে কারণরূপে। আর তারপর ? তারপর কি আছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব। সে যে ভাবিতেও পারি না! তবে—"অস্তি অস্তি অস্তি," "আনন্দ আনন্দ আনন্দ" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়া, তাঁহাকে যে বুঝি নাই, তাঁহাকে যে পাই নাই, তাহাই পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করিয়া থাকি।

মা, স্থূলে বা ব্যষ্টিতে তুমি কেবল আমার একার মা, সূক্ষ্মে বা সমষ্টিতে তুমি আমাদের সকলের—বিশ্বের মা, কারণে তুমি আমার এবং বিশ্বের গর্ভধারিণী মা, আর তুরীয়ে তুমি আমি এবং বিশ্ব বলিয়া কোন ভেদ নাই, সেখানে তুমি কেবল মা—আত্মা—ব্রহ্ম। এইরূপে স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে এবং কারণাতীত স্বরূপে তোমাকে নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমোনমঃ, বলিয়া প্রণাম করিতেছি। তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৩২॥

অনুবাদ। যে দেবী সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। এমন সত্যবাণী বোধ হয় আর কোন শাস্ত্র কিংবা কোন দর্শনকার প্রচার করিতে সাহস করেন নাই। দেবী মাহাত্ম্যের আর সকল অংশ পরিত্যাগ করিয়া মাত্র এই দুইটী মন্ত্র (মাতৃরূপ এবং ভ্রান্তিরূপ) জগতে যে সত্য ও সামর্থ্য আনয়ন করিয়াছে, বাস্তবিকই তাহা অতুলনীয়। ভ্রান্তি বলিয়া যাহাকে উড়াইয়া দিতে চাও, ঐ ভ্রান্তিরূপেই যে মা! ওগো, আমার একটী মাত্র মুখ, একটী মাত্র

লেখনী, একটী মাত্র মন, এ সকলই আবার অতিশয় ক্ষুদ্র ; এতক্ষুদ্র সাধন লইয়া, এই দুইটী মন্ত্র জগৎকে যে কি দিয়া গিয়াছে, তাহা কিরূপে ব্যাখ্যা করিব। কেন যে দেবী-মাহাত্ম্য ভারতের প্রতি গৃহে পঠিত হয়, তাহা এই দুইটী মন্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এমন দুর্ব্বলের বল, এমন হতাশের আশ্রয়, এমন অভয়বাণী জীবের মর্ম্মে মর্ম্মে এমন করিয়া আর কেহ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন কিনা জানিনা। বেদে উপনিষদে যে সত্যটী ভাষার আবরণে প্রচ্ছন্ন আছে, দেবীমাহাত্ম্য তাহাই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

শুন, ভ্রান্তিও কিরূপে মা হয়—তোমাদের সেই প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তই ধর। রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তির ন্যায় নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্মে জগদ্-ভ্রান্তি হইতেছে। আচ্ছা বেশ, রজ্জু যেরূপ কখনও সর্প নহে, কিংবা রজ্জুতে যেরূপ কোনকালেই সর্প নাই, ঠিক সেইরূপ ব্রহ্ম জগৎ নহে, কিংবা ব্রহ্মে কোনকালেই জগৎ নাই। এস্থলে যদি জিজ্ঞাসা করি, ভ্রান্তি কাহার? তদুত্তরে বলিবে—যেতুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাঁহার! ব্রহ্মে ভ্রান্তি নাই, তিনি নির্ম্মল চিৎস্বরূপ, জীবই ভ্রান্ত। ভাল, রজ্জুটা জড় পদার্থ ; তাহাতে যখন সর্পের অধ্যাস হয়, তখনও রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান নাই, ইহা খুবই ঠিক ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ—রজ্জুটা যদি চেতন অর্থাৎ বোধস্বরূপ বস্তু হইত, তবে ঐ যে সর্পের অধ্যাস, উহাও সেই বোধে প্রতিভাত হইত নাকি? নিশ্চয়ই হইত ; কারণ, বোধের নিকট যাহা ধরিবে, তাহাই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, ইহাই বোধের স্বরূপ। সুতরাং রজ্জুস্থানীয় ব্রহ্মের চিদ্‌রূপত্ব নিবন্ধন, তাহাতে যে সর্প-স্থানীয় জগতের অধ্যাস হয়, তাহাও ব্রহ্মের প্রকাশেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর বাস্তবিক মনুষ্যমাত্রেরই অনুভবও সেইরূপ। আধুনিক কোন কোন মায়াবাদী এই কথাটী স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন—ব্রহ্মের মাত্র অস্তিত্ব-অংশ এবং মায়ার জড়ত্ব-অংশ, এতদু-ভয়েরই অধ্যাস হয়। আচ্ছা, তাঁহাদের কথা স্বীকার করিয়াই জিজ্ঞাসা করি—চৈতন্যশূন্য অস্তিত্বের ভাণ হয় কি? কখনই হয় না। অস্তিত্ব

এবং চৈতন্য অভিন্ন বস্তু। সুতরাং জগদ্‌রূপে যাহা পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে সহস্রবার ভ্রান্তি বলিলেও ঐ ভ্রান্তি ব্রহ্মের অর্থাৎ চৈতন্যের প্রকাশেই প্রকাশিত। ব্রহ্মে কোন না কোন অবস্থায় যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; অতএব ভ্রান্তিও ব্রহ্ম। যাক্, এ সব বিচারের কথা; এ সব মস্তিষ্কধর্ম্মের বিচার। আচার্য্য ভাষ্যকার যে ভাবে বা যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, কোন কোন মায়াবাদীর হাতে পড়িয়া আচার্য্যের সেই অনাক্ষিপ্ত দিগ্বিজয়ী বাণীও আজকাল আক্ষেপযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। আমরা ভগবান্ ভাষ্যকারকে অসংখ্য প্রণাম করি। তিনি যথার্থই জগদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, আমরা জানি—মা, যতদিন জগৎ আছে, দেহ আছে, ততদিন তোমার এই অনির্ব্বচনীয় ভ্রান্তিমূর্ত্তি থাকিবেই, ওগো ভ্রান্তি না হইলে যে এই জগৎ খেলাই থাকে না। জ্ঞানময়ী তুমি ভ্রান্তিময়ী হইয়াই ত এই অচিন্তনীয় জগৎলীলা সম্পাদন করিতেছ, আমরা ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাই, তাই ত ভ্রান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাই না। মাগো, এই যে দিন রাত তোকে ভুলিয়া, আমাকে ভুলিয়া, বিনশ্বর বিষয় নিয়া ব্যস্ত থাকি, এই যে ভুল, এই যে ভ্রান্তি, ইহাও তুমি। যতদিন তুমি ভ্রান্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিবে, ততদিন কাহারও সাধ্য নাই যে তোমার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত করে। আবার যেদিন তুমি তোমার আত্মস্বরূপটী প্রকটিত করিবে, সেই দিন তোমার এই ভ্রান্তিমূর্ত্তিই আমাদের জগৎ-জ্ঞান—ভেদজ্ঞান ভুলাইয়া দিবে। ভ্রান্তি না থাকিলে ওগো কি করিয়া জগৎ ভুলিব! এই যে খেলা ধূলা, এই যে মলিনতা, এই যে তোমার আমার মধ্যে এক অচ্ছেদ্য ব্যবধান, আশা আছে—এ সকলই একদিন তুমি ভ্রান্তিরূপে মুছাইয়া দিবে। মা, তুমি যখন হৃদয়ে ভ্রান্তিমূর্ত্তিতে নিয়তই অবস্থান করিতেছ, তখন একদিন তোমার কৃপায় নিশ্চয়ই সব ভুলিয়া,

সব ছাড়িয়া, মাত্র তোমাকে বা আমাকে লইয়াই থাকিব। মা, কত দিনে—সে দিনের কত দেরী ?

প্রতিদিনই ত মা, তুমি তিন অবস্থায় বিশেষ ভাবে ভ্রান্তিমূর্ত্তিতে প্রকটিত হও, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। জাগ্রত অবস্থায় যাহা কিছু আমিত্ব মমত্ব, স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশকালে সে সকলই ত ভুলিয়া যাই! সেখানে গিয়া নূতন জগতে নূতন আমিত্ব মমত্ব লইয়া বিচরণ করিতে থাকি। আবার যখন সুষুপ্তিতে প্রবেশ করি, তখন এই জাগ্রত ও স্বপ্নরাজ্যের সকল কথা ভুলিয়া যাই, তখন একা আমি—উলঙ্গ আমি, কোথায় কোন্ অব্যক্ত ক্ষেত্রে চলিয়া যাই। এইরূপে ভ্রান্তি-মূর্ত্তিতে প্রত্যহই তুমি দেখা দাও মা! তাই আশা আছে, তাই বড় আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছি, এক দিন সব ভুলিয়া তোমায় পাইব। এখন যেমন তোমাকে ভুলিয়া সব লইয়া—জগদ্ভাব লইয়া ব্যস্ত আছি, ঠিক তেমনই এক দিন জগৎ ভুলিয়া কেবল তোমায় নিয়াই থাকিব—কেবল তোমায় নিয়া থাকিব।

ওগো প্রিয়তম সাধকবৃন্দ, তোমরা মাকে খুঁজিতে কোথায় ছুটিতেছ ? এই যে মা! দেখ—এই যে মা! তোমারই বুকের ভিতর ভ্রান্তিরূপে অজ্ঞানরূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, জাগরণ হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি, আবার সুষুপ্তি হইতে জাগরণ, এই সকল অবস্থার মধ্য দিয়াই ত মাকে প্রত্যক্ষ করিতেছ, ভোগ করিতেছ! উহাকে ভ্রান্তি বলিয়া তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিও না। মা বলিয়া আদর কর, সরল প্রাণ শিশুর মত মা বলিয়া ডাক, আত্মনিবেদন কর, ভ্রান্তি-মূর্ত্তিই আত্মমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া তোমাকে সকল ভ্রান্তির পরপারে লইয়া যাইবে।

বেদান্তমতে ভ্রম দুই প্রকার। সংবাদী ও বিসংবাদী। যে ভ্রম অভিলষিত বস্তু লাভের ব্যাঘাতক হয় না, তাহাকে সংবাদী ভ্রম বলে। যেরূপ মণিপ্রভা দেখিয়া যদি কাহারও মণিভ্রম হয়, তবে সে ঐ প্রভা লক্ষ্যে ধাবিত হইলেও পরিণামে মণিই লাভ করিতে সমর্থ হয়।

সংবাদি-ভ্রমের ইহাই দৃষ্টান্ত। আর জবাপুষ্পে পদ্মরাগমণি-ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া যদি কেহ পদ্মরাগমণির অন্বেষণ করিতে যায়, তবে তাহার কখনও পদ্মরাগমণি লাভ হয় না, জবাপুষ্পই লাভ হয়। ইহাই বিসংবাদি-ভ্রমের দৃষ্টান্ত স্থল। এই জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন ভ্রম হইলেও, ঐ ভ্রমই জীবকে ব্রহ্মত্বে উপনীত করায়, কারণ ইহা সংবাদি-ভ্রম। জানিনা কি অজ্ঞেয় কারণে বহুদিন হইতে জগতে বিসংবাদী ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। মা আমার বিসংবাদী ভ্রান্তি-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া, বহুদিন যাবৎ জীব-জগৎকে অভীষ্ট বস্তু হইতে দূরে রাখিতেন, কিন্তু এবার মায়ের হৃদয়ে স্নেহের বন্যা আসিয়াছে, এবার মা আমার অভীষ্ট বস্তু লাভের পক্ষে একান্ত অনুকূল সংবাদি-ভ্রান্তিমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতেছেন। সেই জন্যই এই আয়োজন, সেই জন্যই আজ সত্যপ্রতিষ্ঠার বিজয়ধ্বনি বিসংবাদি-ভ্রান্তিকে বিদূরিত করিয়া, নিদ্রিত দেশকে জাগরিত করিয়া, ধীরে ধীরে ভ্রান্তির পরপারে—সত্যের সমীপে লইয়া যাইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু সে অন্য কথা—

ভ্রান্তিরূপিণী মা! তোমার চরণে প্রণত হইতে পারিলেই আমাদের ভ্রান্তি দূর হইবে? আমরা যে সর্ব্বাবস্থায়ই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মা, তাহা বুঝিতে পারিব; তাই প্রথমে তোমার ব্যষ্টি-রূপটীকে প্রণাম করি। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে তোমার বিশিষ্ট ভ্রান্তিমূর্ত্তিটী রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে আমরা তোমাকে ভুলিয়া থাকি, তোমার সেই মূর্ত্তির চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম, মা পুনঃ পুনঃ প্রণাম। তারপর তোমার পরমেশ্বরী সমষ্টি-ভ্রান্তিমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া, অব্যক্ত ক্ষেত্রে উপনীত হই। সেখানে ভ্রান্তির বীজ-রূপকে প্রণাম করিয়া, একবারে নিরঞ্জন-ক্ষেত্রে চলিয়া যাই। যেখানে ভ্রান্তি বলিয়া কিছু নাই, যাঁহার আশ্রয়ে ভ্রান্তি অবস্থিত, ভ্রান্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াও যিনি স্বয়ং ভ্রান্ত হন না, তোমার সেই বিশুদ্ধ বোধময়-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য প্রণাম করি। তুমি আমাদের ভ্রান্তি দূর কর।

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।

ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ ॥৩৩॥

অনুবাদ। যিনি সর্ব্বজীবে ইন্দ্রিয় ও ভূতসমূহের অধিষ্ঠাত্রী রূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই ব্যাপ্তিদেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

ব্যাখ্যা। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাত্রীরূপে এবং ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি ভূতাধিষ্ঠাত্রীরূপে একমাত্র মায়েরই প্রকাশ। যদিও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তথাপি উহা একই চৈতন্যরূপে সাধকের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গের নাম বলা হইতেছে। শ্রোত্রের দিক্, ত্বক্এর বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, রসনার বরুণ, ঘ্রাণের অশ্বিনী-কুমার, বাক্এর অগ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, পায়ুর মৈত্র, উপস্থের প্রজাপতি ; মনের চন্দ্র, বুদ্ধির অচ্যুত, অহঙ্কারের চতুর্ম্মুখ এবং চিত্তের শঙ্কর। যে চৈতন্যশক্তি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ পায়, তাহাই পূর্ব্বোক্ত দিক্ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে যে চৈতন্যশক্তি ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই ভূতাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যদিও এই ভূত ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানচৈতন্য বিভিন্ন উপাধির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তথাপি বস্তুতঃ উহারা এক অখণ্ড চৈতন্যসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহাই মায়ের আমার ব্যাপ্তিমূর্ত্তি বা সর্ব্বব্যাপিনী চিন্ময়ীমূর্ত্তি।

মা! এই বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই তোমার এই মহতী ঈশ্বরী ব্যাপ্তিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। এক অখণ্ড ঘন চৈতন্যসত্তা সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। আমরা তাহারই গর্ভে জাত স্থিত ও লীন হইতেছি। মা, যে সাধক তোমার এই ব্যাপ্তিমূর্ত্তি অহরহঃ দেখিতে পায়, তাহার প্রাণের সঙ্কোচ, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা নিশ্চয়ই দূরীভূত হইয়া যায়। আত্মপ্রাণের মহান্ প্রসার দেখিতে পাইলে সকলেরই প্রাণের প্রসার হইয়া থাকে। ইহাই

তোমার ব্যাপ্তিমূর্ত্তি দর্শনের বিশেষ সার্থকতা। মা, তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম।

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৩৪॥

অনুবাদ। যিনি চিতিশক্তিরূপে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে যে 'চেতনারূপে' মাকে প্রণাম করা হইয়াছে, তাহা বিশিষ্ট চেতনা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গদ্বারা যে চৈতন্য অনুভূত হয়, তাহা। আর এই মন্ত্রে নির্গুণ চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া চিতি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। চিতি শব্দে সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম, উপনিষদের আত্মা এবং আমাদের মাকে বুঝা যায়। এস্থলে একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে, চিতি যদি নির্গুণা, তবে "এতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ" কথাটী কিরূপে সঙ্গত হয়? জগদ্ব্যাপিত্ব-ধর্ম্ম থাকিলে, "চিতির" নির্গুণত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা উচিত যে, চিতিবস্তু শক্তিমাত্র। পাতঞ্জল দর্শনও ইহা বুঝাইবার জন্য "চিতিশক্তি" এই শব্দটীরই প্রয়োগ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যদিও সাংখ্যশাস্ত্র জড়াপ্রকৃতির পরিণামের হেতু বলিতে গিয়া পুরুষকে সান্নিধ্যমাত্রে উপকারক বলিয়াছেন, তথাপি কার্য্যতঃ ঐ নির্গুণ পুরুষকে শক্তি-স্বরূপই বলা হইয়াছে। ধীমান্ পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন—যাহার সান্নিধ্যবশতঃ জড়া প্রকৃতি চেতনবৎ ক্রিয়াশীলা হয়, সে বস্তুটী শক্তি না হইয়া অন্য কিছুই হইতে পারে কি? আচ্ছা, এইবার বেদান্তশাস্ত্র দেখ, সেখানেও 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' বলিয়া চিদ্বস্তুর শক্তিরূপত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে।

হউক জগৎ মিথ্যা, হউক সৃষ্টি কল্পনা মাত্র, তাহার আশ্রয় ত ব্রহ্ম! যাহা অন্যকে আশ্রয় দিতে পারে, অথবা অন্যের আশ্রয়-স্বরূপ হয়, তাহা শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

বলিতে পার—আত্মবস্তু যদি যথার্থতঃ শক্তিস্বরূপই হয়, তাহা হইলে উহার নির্গুণত্ব থাকে না। তাহার উত্তরে বলিতে হয়—যখন চিদ্‌বস্তুতে কোনরূপ ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য হয় না, তখনই উহাকে নির্গুণ বলা যায়। যদি বল যাহাতে কোনরূপ ক্রিয়ার বিকাশ নাই, তাহাকে শক্তি কিরূপে বলা যায়; কারণ, ক্রিয়াশীলতাই শক্তির স্বরূপ। সত্য, নির্গুণস্বরূপেও অব্যক্তভাবে সূক্ষ্মতম ক্রিয়াশক্তি থাকে। ব্রহ্ম নির্গুণ অবস্থায়ও স্বপ্রকাশ অর্থাৎ আপনি আপনাকে প্রকাশ করেন বা আপনি আত্মরস সম্ভোগ করেন। ইহাও শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আর ইহা বলাই বাহুল্য যে অনুভবসম্পন্ন সাধকগণ যতক্ষণ বুদ্ধির ভিতর দিয়া পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন বা করিতে চেষ্টা করেন, ততক্ষণ আত্মা বুদ্ধির প্রকাশকরূপে শক্তিরই পরিচয় প্রদান করেন, যাহা হউক, আমরা জানি আত্মা শক্তিমাত্র। জড় জগতে শক্তি হইতে শক্তিমান্ পৃথক দেখা যায় বটে, কিন্তু আত্মক্ষেত্রে শক্তি ও শক্তিমান্ সম্যক্ অভিন্ন বস্তু। শুধু ভাষায় বিভিন্নতার পরিচয় দেয় মাত্র, সুতরাং এই চিতিশক্তির আবার কোন আশ্রয়ান্তর আবশ্যক হয় না। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, কোন শ্রুতিবাক্য, কোন দর্শন, কোন পুরাণ কিংবা অন্য কোনও শাস্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় না। বরং নিঃসন্দিগ্ধরূপে যুগপৎ সগুণ নির্গুণের বিরোধ মীমাংসা হইয়া যায়। কিরূপে নির্গুণস্বরূপ হইতে জগৎসৃষ্টি হয়, এ সকল আশঙ্কাও অতি সহজে অপনীত হইয়া যায়।

আর শক্তিহীন কোনও একটী অবস্থা আছে, ইহা যদি প্রমাণ করিতে চাও, তবে তাহাকে নির্গুণেরও উপরে স্থান দাও। তাহা বাক্য এবং মনের অতীত; সুতরাং তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বেদ বেদান্ত সকলেই মূক। তবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রভৃতি শব্দে কিংবা

নেতি নেতি মুখে যাহাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হয়, তাহা কিন্তু ঐ নির্গুণ পর্য্যন্ত ; সুতরাং স্বীকার করিয়া লও—বাক্য মনের অগোচর একটী সত্তা আছে, তাহা নির্গুণও নয়, সগুণও নয়। সেই অজ্ঞেয় তত্ত্বের দুই প্রকার মহত্ব বা বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী নির্গুণ, অপরটি সগুণ। সগুণ-স্বরূপের আবার দুই প্রকার মহত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—একটী ঈশ্বরত্ব অপরটী জীবত্ব।

স্বরূপতঃ নির্গুণ চিতিশক্তি কিরূপে সগুণ ভাবাপন্ন হন, এবং সগুণভাবে পরিব্যক্ত হইলেও তাঁহার নির্গুণত্বের যে কোনই ব্যাঘাত হয় না, এ সকল তত্ত্ব পূর্ব্বে আনন্দতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি নিস্প্রয়োজন।

জগৎ যে একটা শক্তিমাত্র, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। নাম আকার ও ব্যবহার গত অনন্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ইহাকে একটি মাত্র শক্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। যে ব্যক্তি জলবস্তুকে বিশেষরূপে জানে, সে বরফ দেখিলেও উহাকে জল ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করে না। কুণ্ডলদর্শনে যেমন স্বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই প্রতীত হয় না, কিংবা ঘট দর্শনে যেরূপ মৃত্তিকা ব্যতিরিক্ত অপর কিছুই লক্ষিত হয় না, ঠিক সেইরূপ এই বহু-নামরূপাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নিকট একটা অখণ্ড চিতিশক্তিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই বিশ্ব চিতিশক্তিদ্বারা গঠিত এবং চিতিশক্তিতেই অবস্থিত। চিতিবস্তু বোধ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বোধ এবং আনন্দ অভিন্ন, সুতরাং জগৎ আনন্দময়। অনেকবার বলিয়াছি, আবার বলি—আনন্দ দ্বারাই এ জগৎ গঠিত, আনন্দেই স্থিত আবার আনন্দেই ইহার লয়। শুধু দর্শনের তারতম্য। মায়ের কৃপায় জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেলে সকলেই দেখিতে পায়—এ জগৎ আনন্দময়।

সে যাহা হউক, মা ! যে তুমি স্থূলে ব্যষ্টি চিতিশক্তিরূপে নামরূপ-বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছ, সেই তোমাকে প্রণাম। আবার যে তুমি মহতী চিতিশক্তিরূপে জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপে প্রকাশ পাইতেছ,

তোমার সেই চিন্ময়ী ঈশ্বরী মূর্ত্তিকে প্রণাম। অনন্তর স্থূল সূক্ষ্মের অতীত অব্যক্ত কারণরূপিণী চিতিশক্তিকে প্রণাম। সর্ব্বশেষে বাক্য মনের অতীত, নিরঞ্জনস্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া নমোনমঃ বলিয়া প্রণাম করি। মা আমাদের প্রণাম সার্থক হউক।

সাধক! একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ—মা আমার চিতিরূপে এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মা ছাড়া কোথাও কিছু নাই। যাহা দেখ, যাহা ভাব, সকলই আমার চিতিরূপিণী মা।

স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়া-
ত্তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ ॥ ৩৫ ॥
যা সাম্প্রতঞ্চোদ্ধত-দৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশাচ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদোভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। যে দেবীকে ইতিপূর্ব্বে (মহিষাসুরবধপ্রসঙ্গে) ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ অভীষ্ট লাভের আশায় স্তব এবং অনেকদিন সেবা (অর্চ্চনা) করিয়াছিলেন, সম্প্রতি যে মদগর্ব্বিত অসুরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত আমরা (দেবতাবৃন্দ) ভক্তি-বিনত-শরীরে পরমেশ্বরীকে এই প্রণাম করিতেছি, আর যাঁহাকে স্মরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ আমাদের সকল আপদ্ দূর করিয়া থাকেন; সেই শুভহেতুস্বরূপা পরমেশ্বরী আমাদের মঙ্গল বিধান করুন এবং সকল আপদ্ বিনাশ করুন।

ব্যাখ্যা। সাধক দেখ, দেবতাবর্গের বিশ্বাস কত! "যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ সর্ব্বাপদঃ"—যাহাকে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ

তিনি আমাদের সমুদয় আপদ্ দূর করেন। সত্যই এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে, জীব কখনও বিপদে মুহ্যমান হয় না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় না। "আমার সর্ব্বশক্তিময়ী মা আছেন," এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলে, জীব যতই কেন বিপদাপন্ন হউক না, অন্তরে অন্তরে এমনই একটা বিশ্বাস ও ভরসা থাকে যে, তাহার ফলে বিপদ্গুলি অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। যিনি আমার আত্মা, যিনি আমার আমিত্বের প্রকাশক, এক কথায় যিনি আমাকে সুখ-দুঃখ-অনুভবের জন্য প্রাণ দান করিয়াছেন, তাঁহাকে যথার্থ স্মরণ করিতে পারিলে যে, তৎক্ষণাৎ সকল বিপদ্ দূরীভূত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু ঐ একটি কথা আছে— "ভক্তি-বিনম্র-মূর্ত্তিভিঃ" ভক্তির প্রভাবে যেন মূর্ত্তিটী নত হইয়া পড়ে; অর্থাৎ আমিত্ববোধটী সম্যক্ অবনত হওয়া আবশ্যক। যে পরিমাণে আমিত্ববোধটী বিনম্র হইয়া পড়িবে, দেহাত্মবোধ শিথিল হইবে, সেই পরিমাণেই মা আমার ঈশা অর্থাৎ ঈশ্বরীমূর্ত্তিতে প্রকটিতা হইবেন, ইহা ধ্রুব সত্য। জীব যদি সত্যসত্যই মায়ের ঈশ্বরীমূর্ত্তির উপলব্ধি করিতে পারে, তবে তাহার জীবভাবীয় আপদ্ বিপদ্ অতি অল্পক্ষণেই দূরীভূত হইয়া যায়।

এরূপ দৃষ্টান্ত অনেকেই দেখিয়াছেন যে, ঘোর বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তি কাতরপ্রাণে ভগবান্কে স্মরণ করিয়া বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোক ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া রোগমুক্ত হইয়া থাকেন। এ সকলের মূল রহস্য এই যে—ঐ ভক্তি-বিনম্র-মূর্ত্তিতে প্রণামের ফলে জীবভাবীয় আমিত্ব ক্ষীণ হয়, এবং ঈশ্বরভাবীয় আমিত্বের বিকাশ হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারিলেই অল্পাধিক পরিমাণে ঐশী শক্তি জীবশরীরে সংক্রামিত হয়। তাহারই ফলে জীবের সকল বিপদ্ কাটিয়া যায়। স্বপ্নে বা দেবমন্দিরে হত্যা দিবার ফলে যে ঔষধাদি লাভ হয়, তাহারও রহস্য ইহাই।

"সর্ব্বাপদঃ" শব্দের আর একটী বিশেষ অর্থ আছে। সর্ব্বই

আপদ্ অর্থাৎ, যতক্ষণ সর্ব্বত্বের—বহুত্বের প্রতীতি থাকে, ততক্ষণই সাধক আপদ্‌গ্রস্ত। এই সর্ব্বরূপ আপদ্ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সকলেরই ভক্তি-বিনম্র-মূর্ত্তিতে ঈশ্বরীচরণে সম্যক্ প্রণত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যতক্ষণ সর্ব্বত্বের বিলয় এবং একত্বের প্রতীতি না হয়, ততক্ষণ জীব মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞই থাকিয়া যায়। গীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ও সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক এক অখণ্ড বস্তুর শরণাগত হইবার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। একমাত্র শরণাগতভাবে অর্থাৎ ভক্তি-বিনম্র-মূর্ত্তিতে প্রণামদ্বারাই উহা সুলভ হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে মধুকৈটভ-বধপ্রসঙ্গে ব্রহ্মস্তোত্র এবং মহিষাসুর-বধাবসানে শক্রাদিস্তোত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই উভয় স্তোত্রাপেক্ষা এই স্তোত্রের বিশেষত্ব অনেক। পূর্ব্বোক্ত স্তোত্রদ্বয়ে মাতৃমহত্ত্ব মাতৃকরুণা মায়ের সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। আর এই স্তোত্রটী প্রণতিপ্রধান; এখানে মাকে একেবারে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ভ্রান্তি প্রভৃতি সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়া দর্শন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করা হইয়াছে। যে পরিমাণে জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই জীব বুঝিতে পারে যে, "আমি" একটা দুরপনেয় অজ্ঞানমাত্র; সুতরাং এই অজ্ঞান হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য সৎ অসৎ যাহা কিছু উপস্থিত হয়, সাধক তাহাকেই মাতৃবোধে দর্শন করিতে থাকে এবং আমিত্বকে তাঁহার চরণে অবনত করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে যে সাধক জ্ঞানের যত উচ্চস্তরে আরোহণ করেন, তিনি ততই অবনত হইয়া পড়েন। জ্ঞান লাভ হওয়া মানেই অজ্ঞান যে কত বেশী, তাহা বুঝিতে পারা। অজ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, তাহাকে জ্ঞানের চরণে অবনত করিতে আর কোনরূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধা উপস্থিত হয় না; তাই দেবতাগণ পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া অভীষ্টলাভের পথ সুগম করিয়া তুলিতেছেন। ইহার পরে শুম্ভবধের অবসানে আমরা যে নারায়ণীস্তুতি পাইব, তাহাও এইরূপ প্রণতিপ্রধান। প্রণতিই সাধনার রহস্য। ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইতে পারিলেই সব লাভ হয়। দেবতাগণ

মাতৃবক্ষঃস্থিত জ্ঞানস্তন্য-পরিপুষ্ট সন্তান; তাই তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রণত। আর আমরা দেহাত্মবোধবিশিষ্ট জীব—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম কীটাণু; কিন্তু আমাদের মস্তক কিছুতেই অবনত হইতে চায় না। আমরা আমাদের এই মিথ্যা আমিকে যতই গৌরব দিতে চাই, ততই যে উহাকে অপমানিত করা হয়, এ কথা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। এই আমিটী যদি ঈশ্বরীর চরণতলে অবনত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যে ঈশ্বরীয় গৌরব লাভ হয়, ইহা বুঝি না বলিয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা। এখনও এদেশের ব্রাহ্মণগণকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুসন্তানগণ দর্শনমাত্র মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করে। কেন করে? একদিন এই ব্রাহ্মণ তাঁহার আমিত্বকে বিশ্বেশ্বরীর চরণতলে যথার্থই নত করিতে পারিয়াছিল; তাহারই ফলে আজ পর্য্যন্তও তাঁহাদেরই কুলপাংশুল সন্তানগণ সমগ্র হিন্দুজাতির নিকট হইতে প্রণাম পাইতেছে। ওগো! একথা ভাবিলেও নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয়! মাতৃচরণে প্রণত ব্রাহ্মণ একদিন এমনই বীর্য্যবান্ ও শক্তিমান্ ছিলেন যে, বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত করিতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। মাতৃসত্তায় এমনই বিশ্বাসবান্ ছিলেন যে, তাঁহারা বিষ্ণুত্ব পর্য্যন্ত অতিশয় তুচ্ছ মনে করিতেন। আর আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণ—কিন্তু হায়, সে অন্য কথা।

এই স্তবে মায়ের যে সকল মূর্ত্তির উল্লেখ আছে, এস্থলে সংক্ষেপে একবার তাহার আলোচনা করা যাউক। দেবতাগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই সর্ব্বভূতে অবস্থিতা মায়ের বিষ্ণুমায়া মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন। ক্রমে—চেতনা বুদ্ধি নিদ্রা ক্ষুধা ছায়া শক্তি তৃষ্ণা ক্ষান্তি জাতি লজ্জা শান্তি শ্রদ্ধা কান্তি লক্ষ্মী বৃত্তি দয়া তুষ্টি মাতৃ ও ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন। সাধক! তুমিও ঐ সকল স্বরূপে প্রতিনিয়তই মাকে প্রত্যক্ষ করিতেছ। কিন্তু সত্যই যে উনি মা, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না। অবিশ্বাস আছে বলিয়াই উঁহার চরণে প্রণত হইতে সমর্থ হইতেছ না। প্রণাম করিলেও সত্য প্রণাম করিতে পার না। তাই মাতৃপ্রসন্নতা

বা মাতৃকৃপার উপলব্ধি হইতে দূরে রহিয়াছ। ঐ যে চেতনা বুদ্ধি নিদ্রা ক্ষুধা প্রভৃতিরূপে মা তোমারই অন্তরে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত রহিয়াছেন, ঐ উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম কর। প্রথম খণ্ডে যে সত্য-প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে উপদিষ্ট প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে প্রাণময় হইয়া, এখানে আসিয়া প্রত্যক্ষ আনন্দস্বরূপে উদ্‌ভাসিত হইয়াছে। এক অখণ্ড আনন্দময় বোধ বা অনুভবই যে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি নিদ্রা প্রভৃতিরূপে আমাদিগকে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলেই অজ্ঞান দূর হয়—রুদ্রগ্রন্থি অর্থাৎ জ্ঞানময়গ্রন্থি ভেদ হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রণামগুলি শুধু প্রণাম নহে, উহা উচ্চ স্তরের সাধনা। যেরূপভাবে প্রণাম করিবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সেইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এবং কারণাতীত অর্থাৎ ব্যষ্টি সমষ্টি অব্যক্ত এবং নিরঞ্জন সত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রণাম করিতে পারিলেই জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হয়। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। পূর্ব্বে দ্বিতীয়খণ্ডে ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ প্রভৃতি তত্ত্বগুলিকে প্রাণরূপে উপলব্ধি করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে সাধনা আর একটু সূক্ষ্মে অগ্রসর হইয়াছে; তাই প্রত্যেক বৃত্তিকে ধরিয়া ধরিয়া প্রণতির সাহায্যে অখণ্ড বোধসমুদ্রে অবগাহন করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। যে অখণ্ড আনন্দ অর্থাৎ আনন্দময় অনুভূতির কথা "সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ" মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, সেই অনুভূতিই ব্যষ্টি বুদ্ধি নিদ্রা প্রভৃতিরূপে অভিব্যক্ত, ইহা বুঝিয়া,—উপলব্ধি করিয়া প্রথম প্রণাম করিতে হয়। অর্থাৎ প্রথম "নমস্তস্যৈ" মন্ত্রের তাৎপর্য্যই—স্ব স্ব ব্যষ্টি প্রকৃতির বিভিন্ন বৃত্তিগুলিকে আনন্দস্বরূপে উপলব্ধি করা। তারপর ঐ ব্যষ্টি বৃত্তিকে সূক্ষ্মে সমষ্টিতত্ত্বে লইয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে উপনীত হইয়া দ্বিতীয় প্রণাম করিতে হয়। ঈশ্বরত্বের—মহত্ত্বের উপলব্ধিই এই দ্বিতীয় "নমস্তস্যৈ" মন্ত্রের রহস্য। অনন্তর কারণ বা অব্যক্ত ক্ষেত্রের সন্ধান এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বভাবাতীত স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য; ইহাই তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রণামের

রহস্য। ঠিক এইরূপ প্রণাম করিতে পারিলেই, এ স্তবের সার্থকতা হয়। অনুভূতিহীন সাধকগণের নিকট ইহা প্রহেলিকার মত মনে হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা গুরুকৃপায় অনুভূতির সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ তত্ত্ব যে একান্ত উপাদেয় হইবে, তদ্‌বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ঋষিরুবাচ।

এবংস্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্ব্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—হে নৃপনন্দন! দেবতাগণ যখন এইরূপ স্তব করিতেছিলেন, তখন পার্ব্বতী দেবী জাহ্নবীজলে স্নান করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাখ্যা। দেবতাদিগের স্তব শেষ হইয়াছে। তাই আবার এখানে "ঋষিরুবাচ" বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে। মহর্ষি মেধস্ এখানে মহারাজ সুরথকে নৃপনন্দন বলিয়া সম্বোধন করিলেন। "নৄন্ পাতি ইতি নৃপঃ" যিনি মনুষ্যকুলের রক্ষক বা পালক, তিনিই নৃপ। সাধক মহাপুরুষগণই যথার্থ নৃপশব্দ-বাচ্য। জগতে মধ্যে মধ্যে সুরথের ন্যায় সাধক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় বলিয়াই মনুষ্যসমাজ স্থির আছে। ধর্ম্মপ্রাণ ব্রহ্মনিষ্ঠ আদর্শ সাধকগণই বিরাট্ মনুষ্য-জাতির মেরুদণ্ড। ইহাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই এখনও মানুষ সত্যের দিকে, ধর্ম্মের দিকে লালসনেত্রে লক্ষ্য রাখে। নতুবা মনুষ্য-সমাজ এতদিনে পশু-সমাজে পরিণত হইত। যে দেশে সাধকের সংখ্যা যত কম, সেই দেশের লোক তত স্থূলে আসক্ত, তত দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট; সুতরাং তত বেশী পশুধর্ম্মী। যাক্, সে অন্যকথা। যাঁহারা এ জগতে সত্যের আলোক দেখাইয়া যান লোকস্থিতি রক্ষা করেন, তাঁহারাই যথার্থ নৃপ বা

নররক্ষক। এখনও পশ্চিমভারতীয় জনগণ সাধু মহাপুরুষদিগকে নৃপ শব্দের সমানার্থবোধক মহারাজ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকে। যিনি আবার সেই নৃপগণের অর্থাৎ সাধক মহাপুরুষদিগেরও আনন্দবর্দ্ধন করেন, তিনিই নৃপনন্দন। এখানে মহর্ষি মেধস্ আনন্দতত্ত্ব বিশ্লেষণে উদ্যত; তাই সুরথকেও নৃপনন্দন অর্থাৎ সাধকানন্দবর্দ্ধন বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

দেবতাগণ যখন পূর্ব্বোক্তরূপ মায়ের স্তব করিতেছিলেন, তখন মা আমার পার্ব্বতীমূর্ত্তিতে জাহ্নবীজলে স্নান করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। স্তবাদি পাঠকালে সত্যসম্বেদনযুক্ত দেবতাবৃন্দের হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার ফলে চিত্ত আর্দ্র ও নয়নে প্রেমাশ্রু নির্গত হইয়াছিল, উহাই জাহ্নবী-তোয়। পুনঃ পুনঃ মাতৃনাম স্মরণ, সর্ব্বতোভাবে মাতৃবিভূতি দর্শন, কাতরকণ্ঠে মা মা বলিয়া রোদন, এবং বারংবার ভক্তি-বিনম্র-মূর্ত্তিতে প্রণাম, এই সকল কর্ম্মের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহাই পূত জাহ্নবীবারি। উহাতে স্নান করিবার অর্থাৎ অভিষিক্ত হইবার জন্যই মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথার্থ ই সন্তান যখন আকুলপ্রাণে মা মা বলিয়া ডাকে, তখন এমনই করিয়া মা আমার সন্তানের দুঃখ দূর করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকেন। সন্তানের ভক্তি-অশ্রু, উহা পরম পবিত্র! উহা স্বর্গগঙ্গার নির্ম্মল বারি, ঐ জল ব্যতীত মায়ের আমার স্নান বা অভিষেক হয় না। ত্রিতাপ-সন্তপ্ত সন্তানগণের আকুল আর্ত্তনাদে বিক্ষোভিত মাতৃবক্ষকে শান্ত শীতল করিতে হইলে, অকপটপ্রেমাশ্রুরই প্রয়োজন। আজ দেবতাগণ স্তবের সাহায্যে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন; তাই মা আমার অচিরাৎ আবির্ভূত হইলেন।

পার্ব্বতী-মূর্ত্তিতে মাতৃ-আবির্ভাব। পূর্ব্বে দেবতাগণ স্তব করিবার জন্য হিমালয়ে বা স্থূলদেহাভিমানে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাই মা আমার পার্ব্বতীমূর্ত্তিতে স্থূলেই প্রকটিত হইলেন। অর্থাৎ এই

স্থূল বিশ্বেই বিশেষভাবে মাতৃ-আবির্ভাব—আনন্দময় মাতৃসত্তা প্রকটিত হইয়া উঠিল। দেবতাগণ দেখিতে পাইলেন—পরিদৃশ্যমান বিশ্ব শুধু জড়পদার্থ নহে, ইহা আনন্দময়ী মাতৃমূর্ত্তি। জগতের প্রতি-পরমাণু আনন্দেরই অভিব্যক্তি। সেই আনন্দময় পরমাণু-পুঞ্জ আবার আনন্দময়ী ধৃতিশক্তিকর্ত্তৃক গঠিত হইয়া, জগদ্ আকারে দৃশ্য হইতেছে। পদার্থ পদার্থ নহে, আনন্দময় ঘনসত্তা। পর্ব্বত পর্ব্বত নহে, পার্ব্বতীর আনন্দঘন মূর্ত্তি। রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয় আনন্দময় আত্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে! ঊর্দ্ধে নিম্নে দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাদ্‌ভাগে যেদিকে দৃষ্টি নিপতিত হয়, যতদূর বোধ-প্রসারিত হয়, সর্ব্বত্র এক ঘন আনন্দময়সত্তা মাত্র। দেবতাগণ এইরূপ অনুভূতিতে আসিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন, এবং অচিরাৎ যে তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবে, তাহাও নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলেন।

সাঽব্রবীৎ তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্‌ভিস্তূয়তেঽত্র কা ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। সেই সুভ্রূ দেবী দেবতাদিগকে বলিলেন, আপনারা কাহাকে স্তব করিতেছেন ?

ব্যাখ্যা ঠিক যেন "ন্যাকা" মেয়েটি! কিছুই জানেন না! জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কাহার স্তুতি করিতেছেন ?" মা আমার এমনই বটে। সরল শিশু গৌরী কন্যা উমা মা আমার এমনই বটে। সন্তান বিপদে পড়িয়া, অসুর-অত্যাচারে বিব্রত হইয়া, ব্যাকুলপ্রাণে কত ব্যস্ততার সহিত মাকে ডাকিতেছেন; কিন্তু মায়ের আমার প্রশান্ত সরল নির্ম্মল মুখখানিতে কোনরূপ আকুলতার চিহ্নমাত্র নাই। যেন কিছুই হয় নাই! তাই ধীরে স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে ?

ওগো, তোমরা এই কথাগুলিতে হয়ত কবিত্বের লক্ষণ দেখিয়া ফেলিবে; বাস্তবিক তাহা নহে। ইহার মধ্যে কবিত্বের লেশমাত্র নাই। সত্যই সে আত্মক্ষেত্র ধীর, স্তব্ধ, শান্ত। কোনরূপ বৈষয়িক স্পন্দন সেখানে পৌঁছায় না। "বুদ্ধিপর্য্যবসানা বিষয়াঃ" বিষয়সমূহ বুদ্ধিতে গিয়াই পর্য্যবসিত হয়; উহারা বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত সে আনন্দময় আত্মক্ষেত্রে যাইতে পারে না। যেখানে জড় বস্তু পর্য্যন্ত আনন্দময় অনুভবসত্তারূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেখানে আর বৈষয়িক স্পন্দন কিরূপে থাকিবে? বাস্তবিকই ত সেখানে কিছুই হয় নাই। সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই সে যে আমার নিত্যা নির্ম্মলা অব্যাকুলা স্থিরা মা! তাই মায়ের আমার পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন—"কি হইয়াছে বাবা, তোমরা কাহাকে স্তব করিতেছ?"

শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাব্রবীচ্ছিবা।
স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ।
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ ॥৩৯॥

অনুবাদ। তাঁহার (পার্ব্বতীর) শরীর-কোষ হইতে শিবা—মঙ্গলময়ী এক দেবীমূর্ত্তি সমুদ্ভূত হইয়া বলিলেন—শুম্ভদৈত্যকর্ত্তৃক নির্জ্জিত এবং নিশুম্ভকর্ত্তৃক সমরে পরাজিত দেবতাবর্গ সমবেত হইয়া আমারই স্তব করিতেছেন।

ব্যাখ্যা। পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে এক শিবা—মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আবির্ভূত হইলেন। দেবতাগণ স্তব করিতে করিতে যে আনন্দময়ী পার্ব্বতী-মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়াছিলেন, তাঁহারই শরীর-কোষ হইতে এই শিবাদেবীর আবির্ভাব। স্থূল বিশ্বকে অবলম্বন করিয়াই আনন্দময়ী পার্ব্বতীমূর্ত্তির প্রকাশ হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ আনন্দঘন সত্তাটী যখন স্থূল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রকাশ

করে, তখনই উহাকে শরীরকোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবামূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন বলা যায়। যে আনন্দকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব প্রকাশিত সেই নির্গুণ গুণভোক্তা গুণের প্রকাশক অধিষ্ঠান-স্বরূপকেই এখানে শিবামূর্ত্তি বলা হইয়াছে। ইনিই এই উত্তম চরিত্রের দেবতা সরস্বতী—বাগ্‌ভব বীজস্বরূপা গৌরীমূর্ত্তি। সরস্বতী বলিতে এখানে যেন কেহ বীণাপাণি-মূর্ত্তি মনে না করেন। "সরস্বান্ সাগরোঽর্ণবঃ," সরস্বান্ শব্দের অর্থ—অর্ণব অর্থাৎ কারণ। অর্ণব শব্দে যে কারণসমুদ্র বুঝা যায়, ইহা ঋগ্‌বেদীয় সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। সেই সরস্বানের যে শক্তি, তাহাই সরস্বতী। যে শক্তি কারণরূপে প্রকটিত হয়, তাহাকেই সরস্বতী কহে। এই উত্তম চরিত্রেই জীব-জগতের যথার্থ কারণস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবের চরম মিলন অর্থাৎ অভিন্নতা ব্যাখ্যাত হইবে। ঋষিছন্দঃ বা উপোদ্‌ঘাত সূত্রেও ইহা বলা হইয়াছে। ইহা—এই সরস্বতী—জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি। ইহারই অঙ্কে সর্ব্বভাব বিলয় প্রাপ্ত হয়। সে যাহা হউক, পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে বিনির্গতা এই দেবীই অচিরকাল মধ্যে শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরনিকরকে নিহত করিয়া "একৈবাহং" রূপে অদ্বয়স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এখন হইতেই তাহার সূচনা হইতেছে। ইনি এতদিন শরীরকোষকে আশ্রয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্থূলে জড়াকারে পার্ব্বতী-মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতে-ছিলেন ; কিন্তু আজ দেবতাদিগের স্তোত্রে—কাতর প্রার্থনায়, করুণায়, স্নেহে উদ্বেলিত হইয়া শরীরকোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক—জড়ত্বের সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধা চিতিশক্তিরূপে প্রকটিত হইলেন।

তিনি চিন্ময়ী স্বপ্রকাশস্বরূপা। সর্ব্বভাব তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত, তাঁহার নিকট অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই ; তাই তিনি স্বয়ংই দেবতাবৃন্দের উপাসনার হেতু এবং স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। "স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ" "শুম্ভদৈত্যকর্ত্তৃক নির্জ্জিত দেবতা-বৃন্দ আমারই স্তব করিতেছে"। সত্যই তাই। একমাত্র আমি ছাড়া কোথায়ও কিছুই যখন নাই, তখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে যাহাই করুক,

আমারই পূজা করিয়া থাকে। গীতায় রাজগুহ্যযোগে ভগবান্ যে কথা বলিয়াছেন, (অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেবচ) এখানে—এই দেবীমাহাত্ম্যে তাহারই কার্য্যকরী অবস্থাটী প্রকাশ পাইতেছে। তাই মা আমার "স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে" বলিয়া যথার্থ স্বরূপটী উদ্ভাসিত করিলেন। গীতায় অন্য দেবতার পূজাচ্ছলেও আমারই অবিধিপূর্ব্বক পূজার কথাই উক্ত হইয়াছে; কিন্তু এখানে দেবতাবর্গ সাক্ষাৎ চিতিশক্তির বা আত্মারই স্তব করিয়াছেন; সুতরাং অন্য দেবতার প্রসঙ্গই নাই।

সাধক! মনে রাখিও—কেবল সাধনা নহে, তোমার যাবতীয় কার্য্য যতদিন এই বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ "আমি"র দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, ততদিনই উহা অবিধিপূর্ব্বক হইবে, ততদিনই উহা জন্মমৃত্যুরূপ সংসারগতির হেতু হইবে। দুরত্যয়া মায়ার হাত হইতে যথার্থ পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে, দেবতাবৃন্দের ন্যায় "আমির"ই শরণাপন্ন হইতে হইবে। সর্ব্বভাবের সাহায্যে সর্ব্বদা আমারই সেবা করিতে হইবে। সকল কার্য্যই আমির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে। যদি পার (মানুষ মাত্রের ইহাতে অধিকার আছে) তবে উভয় লোককেই জয় করিতে পারিবে; ইহা নিঃসংশয়।

"মামেকং শরণং ব্রজ" এই চরম অমূল্য উপদেশটী কি প্রকারে সাধক জীবনে সার্থকতাময় অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাই যে এই দেবী মাহাত্ম্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই এ সকল কথা বলিতে হইল। ক্রমে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে। আর একটী কথা বলিয়া রাখি—এস্থলে যে আমি এবং আমার শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ করিয়াছি, উহা অস্মিতা মমতা বা শুম্ভনিশুম্ভ নহে। উহাই আত্মা—মা—গুরু। এতদুভয়ের ভেদ অনুভব-সম্পন্ন সাধকগণ নশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন।

শরীরকোষাদ্‌যত্তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥৪০॥

অনুবাদ। এই অম্বিকা দেবী, পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া সমস্ত লোকে কৌষিকী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। দেবী—দ্যোতনশীলা স্বপ্রকাশরূপিণী চিতিশক্তি। সাধারণতঃ ইনি অন্নময়াদি স্থূল কোষগুলিকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হন। কখনও কখনও সাধকের বিশুদ্ধ ভক্তি-হিমে আর্দ্র হইয়া স্থূল কোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক, কেবল চিতিরূপেই আত্ম-স্বরূপটী প্রকাশিত করেন। এই আশ্রয় বা ত্যাগ, যে কোন রূপেই হউক, কোষের সহিত সম্বন্ধ আছে; তাই মা আমার কৌষিকী নামে প্রসিদ্ধা। সমস্ত লোকে মায়ের এই নামটি বিশেষভাবে গীত হইয়া থাকে। সাধক! স্মরণ রাখিও যতদিন মা আমার পঞ্চকোষ-প্রাবৃতা রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, ততদিন মা আমার পার্ব্বতী, আবার যখন কোষের সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল চিন্ময়ীরূপে প্রকাশিত হন, তখন মা আমার কৌষিকী নামে পরিচিত হন।

তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥৪১॥

অনুবাদ। তিনি (কৌষিকীদেবী) এইরূপ শরীরকোষ হইতে বিনির্গত হইলে পার্ব্বতী দেবী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া হিমাচলাশ্রিতা কালিকা নামে আখ্যাত হইলেন।

ব্যাখ্যা। পঞ্চকোষের সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মা চিতিশক্তি মা আমার যখন বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপটী প্রকটিত করেন, তখন পঞ্চকোষের

অবস্থা কৃষ্ণা অর্থাৎ অজ্ঞানস্বরূপ হইয়া পড়ে। অজ্ঞানস্বরূপিণী কৃষ্ণামূর্ত্তি বলিয়াই তখন উহার নাম কালিকা এবং অত্যন্ত জড়রূপে—দৃশ্যমাত্ররূপে অবস্থান করে বলিয়াই ঐ কালিকা মূর্ত্তি তখন 'হিমাচলকৃতাশ্রয়া' হয়।

খুলিয়া বলিতেছি—সাধক! যখন তুমি বিশুদ্ধা চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে মায়ের দেখা পাও, তখনই দেহাদি-জড়-ভাবের সম্যক্ বিস্মৃতি হয়। উহাদের যে তখন একেবারেই অভাব হইয়া যায়, তাহা নহে; মাত্র তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। এই দেহাদি-বিষয়ক অজ্ঞানই এস্থলে কৃষ্ণা—কালিকামূর্ত্তি। এই অবস্থায় অর্থাৎ যখন তুমি বিশুদ্ধবোধে অবস্থান কর, তখন তোমার জড়ত্বপ্রতীতি সম্যক্ বিলুপ্ত হইলেও অন্যের দৃষ্টিতে তোমার দেহাদির জড়পদার্থ-রূপেই ভাণ হইতে থাকে। পার্ব্বতীর হিমাচলকৃতাশ্রয়া কালিকামূর্ত্তি প্রকাশের ইহাই রহস্য। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে অর্থাৎ রজস্তমোগুণ অভিভূত হইলে ধীরে ধীরে বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত পরমাত্মার সন্ধান পাওয়া যায়, আভাস আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে, তখন জড় চৈতন্যের ভেদ বেশ স্পষ্ট ভাবে প্রতীতিগোচর হইতে আরম্ভ হয়। একদিকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ-এবং অন্যদিকে স্বপ্রকাশ-রূপা চিতিশক্তি। বহু পুণ্যফলে সাধক এ ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করে।

ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরং।
দদর্শ চণ্ডমুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৪২॥

অনুবাদ। অনন্তর শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ডমুণ্ডনামক অসুরদ্বয় সুমনোহর পরম রূপধারিণী অম্বিকাকে দেখিতে পাইল।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে যে কৌষিকী-মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাই এখানে অম্বিকামূর্ত্তিতে প্রকাশিতা। পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে

বিনির্গতা মূর্ত্তিই বিশুদ্ধা চিতিশক্তিরূপিণী অম্বিকা। জড়ত্বের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া চিতিশক্তি যখন স্বরূপে প্রকটিতা হন, তখন জড়ত্ব তমসাচ্ছন্ন কৃষ্ণামূর্ত্তিতে পরিণত হয়, ইহাই পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে কালিকা নামে অভিহিত হইয়াছে। চৈতন্য বা চিতিশক্তি যখন জড়াকারে প্রকাশিত হন, তখন তাঁহার নাম হয় পার্ব্বতী। এই পার্ব্বতীর শরীর হইতে যখন বিশুদ্ধ চিদ্‌অংশ পৃথক্‌ভূত হইয়া প্রকাশ পায়, তখনই তাঁহার নাম হয় কৌষিকী বা অম্বিকা। আর অবশিষ্ট জড়-অংশ কৃষ্ণা বা কালিকা নামে অভিহিত হয়।

অম্বিকা—মাতা, বিশ্বপ্রসবিনী জননীমূর্ত্তি। "সুমনোহর" অতিশয় নির্ম্মল—বিষয়কলুষিত নহে। অথবা যাহা মনকে সম্যক্‌রূপে হরণ বা বিলোপ করিতে সমর্থ, তাহাই সুমনোহর। অথবা সুমনা শব্দের অর্থ দেবতা; যাহা সুমনাদিগকেও হরণ করিতে সমর্থ, তাহাই সুমনোহর। মা আমার এমনই পরম-রূপ—শ্রেষ্ঠ-স্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন যে, মন এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত-চৈতন্যরূপী দেবতাবৃন্দ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত-প্রকাশ হইয়াছিল। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্।"

যথার্থ ই অম্বিকা মা আমার সুমনোহরা, পরমরূপময়ী। যেখানে সর্ব্বভাব বিলুপ্ত অথচ যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ববস্তু প্রকাশিত, তাহা যথার্থ ই পরম-রূপ। মনকে হরণ করিতে না পারিলে পরমরূপের প্রকাশ হয় না। আবার পরমরূপের প্রকাশ না হইলেও মনের বিলোপ হয় না। পরমরূপটী উদ্ভাসিত হইলে, মন আপনা হইতেই অপহৃত হইয়া যায়। ঐ যে জীবন্ত বৃক্ষলতা দেখিতেছ, একটি প্রাণ আছে বলিয়াই উহাতে একটি বিশিষ্ট রূপের উপলব্ধি হয়। মৃত শুষ্ক বৃক্ষলতা ও জীবন্ত বৃক্ষলতার মধ্যে যে পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, মৃত দেহে ও জীবন্ত দেহে যে পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, ঐ পার্থক্যটুকু যাঁহার, তাঁহাই যে পরমরূপ —যে জিনিষটী বিশেষভাবে প্রকাশ পায় বলিয়াই জগৎ এত সুন্দর, এত মোহন। সাধক! অন্ততঃ কল্পনার চক্ষেও দেখিতে চেষ্টা কর—

সেই জিনিষটী, মাত্র সেই রূপটী জড়ত্ব-সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার সম্মুখে প্রকাশিত। উহাই পরমরূপ। ঐ রূপটী দেখিতে পাইলে, মন কি স্বয়ং অপহৃত না হইয়া থাকিতে পারে? তাই ত অনেকবার বলিয়া আসিয়াছি, মনকে স্থির করিবার জন্য সাধনা করিও না, পরম-রূপকে দেখ—মন আপনা হইতে স্থির অর্থাৎ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। মন অপহৃত হইলে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিতচৈতন্যরূপী দেবতাবৃন্দ আপনা হইতেই সেই পরমরূপে মিলাইয়া যাইবে, তাই সুমনা শব্দের দেবতা অর্থও করা হইয়াছে।

প্রথমেই শুম্ভনিশুম্ভের ভৃত্যদ্বয় চণ্ডমুণ্ড এই পরমরূপের সন্ধান পায়। চণ্ড—প্রবৃত্তি, মুণ্ড—নিবৃত্তি। চণ্ড শব্দটি কোপন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোপ, প্রবৃত্তিরই একপ্রকার উদ্বেলনমাত্র। আমরা যত অগ্রসর হইব, ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বে প্রবেশ করিব। পূর্ব্বে যাহা কামক্রোধাদি স্থূল বৃত্তিরূপে দেখিয়া আসিয়াছি, এখানে আসিয়া সেই সকলের মূলীভূত প্রবৃত্তিনামক একটি সূক্ষ্মতর শক্তিপ্রবাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তিনামক আর একটি সূক্ষ্ম শক্তিপ্রবাহ দেখিতে পাইতেছি। এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়ই অস্মিতা ও মমতার আশ্রয়ে প্রকাশিত; তাই ঋষি ইহাদিগকে শুম্ভনিশুম্ভের ভৃত্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শুম্ভনিশুম্ভ যেমন সহভাবাপন্ন, এই চণ্ডমুণ্ডও ঠিক সেইরূপ। যেখানে প্রবৃত্তি, সেইখানেই নিবৃত্তি।

সাধক! সাধারণতঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বলিলে যাহা বুঝায়, এখানে তাহা বুঝিও না। এখানে চণ্ডমুণ্ড-শব্দে পরমাত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি এবং অহংবিরতিরূপ নিবৃত্তি বুঝিও। এইরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি লাভ করিবার জন্য এতদিন বহু সাধনা করিয়া আসিয়াছ। বহু সুকৃতিবলে, বহু সাধনার ফলে আজ তোমার প্রবৃত্তি একমাত্র পরমাত্মাকেই চায় এবং নিবৃত্তি যথার্থই অহংরূপ-বিষয়বিরতি চায়। ইহা বহু সৌভাগ্যের ফল; কিন্তু ইহারাও অসুর। ইহাদিগকেও নিহত করিতে হইবে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বলিয়া কিছুই থাকিবে না। অস্মিতা মমতা

বলিয়া কিছুই থাকিবে না। একমাত্র সুমনোহর পরমরূপময়ী মা—পরমাত্মাই থাকিবেন।

ইহা বলাই বাহুল্য যে বিষয়বাসনারূপ প্রবৃত্তির কথা এখানে হইতেই পারে না। তারপর উভয়তোমুখী প্রবৃত্তির অর্থাৎ বিষয় এবং পরমাত্মা, উভয় দিকেই যে প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়, তাহার কথাও এখানে হইতে পারে না; কেবল পরমাত্মাভিমুখী প্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই চণ্ডমুণ্ড অসুরের কথা বলা হইতেছে। আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি থাকিলে বিষয়াভিমুখী বিরতি থাকিবেই। ইহাও অসুরভাব অর্থাৎ অনাত্মবোধের পরিচায়ক। পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু থাকিলেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি থাকে। বাস্তবিক পক্ষে এক অদ্বয় আত্মা ব্যতীত আর কোথায়ও কিছুই নাই; সুতরাং যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধক পরমাত্মাকে চায় অথবা বিষয়বিরতি চায়, ততক্ষণই বুঝিতে হইবে, সাধকের অনাত্মবোধ রহিয়াছে। উহাদিগকেও নিহত করিতে হইবে। সে জন্য সাধকের কোন বিশিষ্ট আয়োজন করিতে হইবে না। মা আমার পরম-রূপটি প্রকটিত করিয়াছেন, একে একে চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি অসুরকুল সেই অদ্বয় জ্ঞানরূপ পরমরূপানলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া সাধকের অনাদিসঞ্চিত অনাত্ম-সংস্কার বিলয় করিয়া দিবে; এইবার তাহারই আয়োজন হইতেছে। শুম্ভ-নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ডমুণ্ড পরমরূপময়ী অম্বিকামূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে; সুতরাং আর বিলম্ব নাই, অচিরকালমধ্যেই উহারা বিলয় প্রাপ্ত হইবে।

প্রথমেই আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি পরমাত্মস্বরূপের আভাস পায়। তাই শুম্ভের অম্বিকা দর্শনের পূর্ব্বেই শুম্ভের ভৃত্য চণ্ডমুণ্ড অম্বিকামূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল।

তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা অতীবস্থমনোহরা।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্ ॥৪৩॥

অনুবাদ। তাহারা (চণ্ডমুণ্ড) শুম্ভের নিকট আসিয়া বলিল মহারাজ! অতীব সুমনোহরা, অনির্ব্বচনীয়া এক স্ত্রীমূর্ত্তি হিমাচল সমুদ্ভাসিত করিয়া অবস্থান করিতেছে।

ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সাহায্যেই অস্মিতা পরমাত্ম-স্বরূপের সন্ধান পায়। সর্ব্বভাবের অধিষ্ঠাতা বলিয়াই চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিল। তারপর স্ত্রীমূর্ত্তির বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া প্রথমেই অতীব সুমনোহরা বলিয়া অম্বিকার স্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিল। মাকে দেখিবামাত্র ক্ষণকালের জন্যও প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আত্মহারা হইয়াছিল; তাই সুমনোহরা বলিয়া উল্লেখ করিল। মায়ের স্বরূপ প্রকাশ পাইলে অতি অল্প সময়ের জন্যও মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রভৃতি যাবতীয় অনাত্মভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়; তাই মা আমার যথার্থ ই সুমনোহরা। চণ্ডমুণ্ড আর একটী কথা বলিল,—"ভাসয়ন্তী হিমাচলম্" হিমাচলকে অর্থাৎ জড়ত্বকে উদ্ভাসিত করিয়া সে মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে।

সাধক! একদিন যে প্রবৃত্তি তোমাকে বিষয়ের পঙ্কিলতাময় ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়া রাখিত, একদিন যে প্রবৃত্তিকে দমন করিবার জন্য কতই না আয়োজন করিয়াছিলে, একদিন যে প্রবৃত্তিকে তোমার যাবতীয় দুঃখের হেতুস্বরূপ বুঝিয়াছিলে, আজ দেখ—সেই প্রবৃত্তিই সর্ব্বাগ্রে অতীব সুমনোহর পরম রূপের সন্ধান আনিয়া দিল। যে প্রবৃত্তি একদিন কেবল বন্ধনের দিকে লইয়া যাইত, সেই প্রবৃত্তিই আজ মুক্তি মন্দিরের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া দিল। ওগো! প্রবৃত্তির দোষ কি? সে যতদিন পরম-রূপের সন্ধান্ পায় নাই, ততদিন বিষয়ের দিকে ছুটিয়াছিল। নিবৃত্তির দোষ কি? সে এতদিন পরমাত্মস্বরূপের সন্ধান পায় নাই, তাই কেবল বিষয়-বিরতি সাধন করিতেই অর্থাৎ

ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি অবলম্বনের চেষ্টায়ই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আজ তাহারা অম্বিকাকে দেখিতে পাইয়াছে, আজ বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত পরম-রূপের সন্ধান পাইয়াছে, তাই সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিয়া অস্মিতাকে খবর দিল, "এক অনির্ব্বচনীয়া স্ত্রীমূর্ত্তি হিমাচল উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছে।"

এতদিন সাধক শুধু হিমাচলকে অর্থাৎ জড়ত্বকে চৈতন্যের বিকাশ-স্থান বলিয়া বুঝিয়াছিল, চৈতন্যই যে জড়ের আকারে প্রকাশিত, ইহাই উপলব্ধি করিয়াছিল, কিন্তু আজ একি দেখিতে পাইল! চৈতন্য যে স্বরাট্; জড় সম্বন্ধ ব্যতীতও তাঁহাকে নির্ব্বিশেষরূপে দেখা যায়, ভোগ করা যায়। জড়ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, অথচ জড়ত্বের প্রকাশক চৈতন্য আজ স্বতন্ত্ররূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে। তাই চণ্ডমুণ্ড বলিল— হিমাচল হইতে স্বতন্ত্র অথচ হিমাচলের উদ্ভাসক সে পরমরূপ। উপনিষৎ ঠিক এই কথাই বলেন,—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

সাধক! পূর্ব্বে মাকে কেবল পার্ব্বতীমূর্ত্তিতে দেখিতে, অর্থাৎ সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যক্ত বিশ্বরূপে চৈতন্য-সত্তার উপলব্ধি করিতে; কিন্তু আজ তাঁহাকে বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধি করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ওগো! সে যে কি, তাহা কিরূপে লিখিব? কতবার বলিয়া আসিয়াছি,—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" যাঁহা হইতে আমরা জন্মিয়াছি, যাঁহাতে নিয়ত অবস্থান করিতেছি, আবার যাঁহাতে মিলাইয়া যাইব, অথচ, যাঁহাতে জন্ম স্থিতি লয় বলিয়া কিছুই নাই; তাঁহার প্রত্যক্ষ, তাঁহার সাক্ষাৎকার, সে যে কি আনন্দ, তাহা কি বলিয়া বুঝাইব? ইঁহার স্বরূপ বলা যায় না বলিয়াই মন্ত্রে অনির্ব্বচনীয়-অর্থ-বোধক "কাপি" শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, এবং বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা যে শক্তিস্বরূপ ইহা বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রে স্ত্রী শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। শক্তি-বস্তু চিরকালই অনির্ব্বচনীয়। কার্য্যকে অবলম্বন করিয়াই শক্তি নির্ব্বচনীয় হইয়া থাকে। কার্য্যসম্বন্ধ-

বিহীন এই শক্তির আভাসমাত্র পাইলেও সাধক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

নৈব তাদৃক্ ক্বচিদ্‌রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর ॥৪৪॥

অনুবাদ। তেমন উত্তম রূপ কেহ কোথায়ও দেখে নাই। হে অসুরেশ্বর! আপনি একবার জানুন, ঐ দেবী কে? আপনি উঁহাকে গ্রহণ করুন।

ব্যাখ্যা। চণ্ডমুণ্ডের কথাগুলি কি সুন্দর! সত্যই তেমন রূপ কে কোথায় দেখিয়াছে? যে তাঁহাকে দেখিবে সে যে তাই হইয়া যাইবে! পৃথক্ থাকিয়া ত দেখিবার উপায় নাই। তাই চণ্ডমুণ্ড বলিল —"তাদৃক্‌রূপং কেনচিৎ নৈব দৃষ্টং" সে যে অনুচ্ছিষ্ট বস্তু। সে স্বরূপ কাহারও নিকট ব্যক্ত করা যায় না—মূকাস্বাদনবৎ।

উহারা শুম্ভকে আরও বলিল,—"জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর।" আপনি জানুন—তিনি কে; তারপর গ্রহণ করুন। গীতায়ও উক্ত আছে,—"জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।" আগে তাঁহার স্বরূপ জানিতে হয়, তারপর দেখিতে হয়, তারপর প্রবেশ করিতে হয়। উপনিষৎ ইহাকেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বলিয়াছেন।

মন্ত্রে যে 'গৃহ্যতাম্' পদটীর উল্লেখ আছে, উহার অর্থ—গ্রহণ করুন। ঐ গ্রহণ এবং প্রবেশ একই কথা; কারণ, মাকে গ্রহণ করিতে গেলেই তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতে হয়। মাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না! স্বয়ংই গৃহীত হইতে হয়। মা ত আর গ্রাহ্য বা জ্ঞেয় নয়! মা স্বয়ংই যে জ্ঞাতৃস্বরূপ। বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে—গ্রহণ করিবে? তাঁহাকে জানিতে গেলেই জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদির পরপারে চলিয়া যাইতে হয়।

স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা।
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি ॥৪৪॥

অনুবাদ। হে দৈত্যেন্দ্র! তিনি স্ত্রীরত্ন; তাঁহার অবয়ব অতিশয় মনোজ্ঞ; তাঁহার দেহকান্তিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত। তাঁহাকে আপনার একবার দেখা উচিত।

ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তির ইহা প্রলোভন-বাক্য হইলেও, ইহাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যার সংশ্রব নাই। যথার্থ ই তিনি স্ত্রীরত্ন—অনন্ত শক্তির নির্ব্বিশেষ-কেন্দ্র। রত্ন শব্দে জ্ঞানকেও বুঝায়, সুতরাং স্ত্রীরত্ন শব্দে জ্ঞানময়ী শক্তি স্বরূপ বস্তুই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে চিতিশক্তি বা চিন্ময়ী মহতী শক্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এস্থলে স্ত্রীরত্ন শব্দটীর প্রয়োগ করিয়া চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে আভাসে তাহাই বুঝাইয়া দিল। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতিশয় চারু। তিনি সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ। সত্যই তাঁহাকে দেখিয়া—"মদন মূরছা যায়।" তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর। তিনি পরম প্রেমময়, পরম প্রিয়তম আত্মা; তিনি এমনই মনোহর, এমনই চারু যে, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" এমনই সে রূপ যে, "সদা হেরি তবু থাকি তৃষিত নয়নে।" সে যে অরূপের রূপ! অপূর্ব্ব সুষমা! কি ভাষা আছে যে, তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করিব? ওগো! জগতের সকল রূপ সমষ্টিভূত করিয়া, জগতের সকল সুখ সমবেত করিয়া যদি এক জায়গায় রাখা যায়, তাহা হইলে যাহা হয়—যদি কল্পনা-চক্ষেও সাধক সেই ভাবটি বুঝিতে পার, তবেই সেই অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ, সেই ভূমা সুখের কথঞ্চিৎ আভাস পাইতে পার। সে যে মধু! সে যে অমৃতম! সে যে অভয়ম্! সে যে কি! সে যে কি গো!

"দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা" স্বকীয় দেহ-কান্তিতে সমগ্র দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত। উপনিষৎ বলেন,—"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" এই জগৎ, এই বহুত্ব, এই আমি, সকলই যাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত;

যিনি সকল প্রকাশ করিয়াও স্বয়ং নির্ব্বিশেষ কেবলানন্দরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই অম্বিকা, আত্মা, মা আমার। মা যে আমার কেবলানন্দময়ী চিতিশক্তিরূপিণী, এইটী বুঝাইবার জন্যই চণ্ডমুণ্ড চার্ব্বঙ্গী স্ত্রীরত্ন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিতেছে। ঐ সকল শব্দ ব্যতীত অসুর আর কি শব্দ দ্বারা মায়ের আনন্দস্বরূপটী ব্যক্ত করিবে? আনন্দের ত কোনও বিশিষ্ট রূপ নাই! উহা যে কেবলানুভবস্বরূপ।

এই মন্ত্রের আরও একটু বিশেষত্ব আছে। চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে বলিল—"তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি"—তাঁহাকে দেখিবার যোগ্যতা আপনার আছে। জীব যতদিন অস্মিতার সন্ধান না পায়, ততদিন এই "রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য স্বরূপম্" বুঝিতেই পারে না; কিন্তু গুরুকৃপায় সাধক এতদিনে সত্য ও প্রাণের সন্ধান পাইয়া, আমিত্ব-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং এইবার তাহার পরমানন্দ-স্বরূপের উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আসিয়াছে। ঠিক এমনই করিয়া প্রবৃত্তি অস্মিতাকে প্রলুব্ধ করে।

দেখ সাধক! প্রবৃত্তি যতদিন বিষয়াভিমুখী থাকে, ততদিন জীবকে নরকের পথে লইয়া যায়। কিন্তু এই প্রবৃত্তিই আবার পরমাত্মাভিমুখী হইয়া মুক্তি-মন্দিরের অর্গলাবদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। তাই বলি—প্রবৃত্তিকে নিন্দা করিও না। প্রবৃত্তি যথার্থ ই হিতৈষী বন্ধু।

যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো।
ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে ॥৪৬॥

অনুবাদ। হে প্রভো! ত্রিলোকে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ মণি, এবং হস্তী অশ্ব প্রভৃতি আছে, সম্প্রতি সে সকলই আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে।

ব্যাখ্যা। চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। হে প্রভো! ত্রিলোকের যাহা কিছু ভাল জিনিষ, সে সকলই আপনার গৃহে বর্ত্তমান।

যদিও অস্মিতাকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বভাব প্রকাশ পায়, যদিও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সকল বস্তুই শুম্ভের গৃহে থাকা উচিত, তথাপি শুম্ভের মহিমা খ্যাপন উদ্দেশ্যে চণ্ডমুণ্ড এখানে কেবল মণিরত্নাদি শ্রেষ্ঠ বস্তু-গুলিরই উল্লেখ করিল। আধিভৌতিক ভাবে বাস্তবিকই ত্রিলোকের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু, হস্তী অশ্ব মণি রত্ন প্রভৃতি, সে সকল ত শুম্ভের গৃহেই অবস্থিত, তদ্ব্যতীত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও দেখা যায়—রত্ন শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ বস্তু অর্থাৎ জ্ঞান। গীতায়ও উক্ত হইয়াছে, "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" এইরূপ গজ শব্দের অর্থ—বন্ধন এবং অশ্ব শব্দের অর্থ—গতি। (এ সকল অর্থ পূর্ব্বেও বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে) জ্ঞানরূপ মণিরত্ন, গজরূপ কর্ম্মফল-বন্ধন এবং অশ্বরূপ স্বর্গ-নরকাদি সংসার-গতি, সকলই অস্মিতার আশ্রয়ে অবস্থিত। মন্ত্রের শেষার্দ্ধে উক্ত হইয়াছে—"সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে।" এই 'সাম্প্রতং' কথাটীরও একটু রহস্য আছে। সম্প্রতি অর্থাৎ এখন পর্য্যন্ত ত্রিলোকের সমস্তই অস্মিতার। পরে ইহা আত্মারই হইবে। জ্ঞানের উদয়ে দেখা যায়—একমাত্র ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ; অস্মিতা জগৎকারণ নহে। অস্মিতার জগৎকারণত্ব সম্প্রতিমাত্র, পরে আর এরূপ অজ্ঞান থাকিবে না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপী ভৃত্যের এই গূঢ়-রহস্য-পূর্ণ সত্য-বাক্যগুলি শুম্ভ ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল কি না, তাহা সাধকগণই বিচার করিবেন।

ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ।
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবাহয়ঃ ॥৪৭॥

অনুবাদ। গজরত্ন ঐরাবত পারিজাত তরু এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, আপনি ইন্দ্রের নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা। ক্রমে ছয়টী মন্ত্রে চণ্ডমুণ্ড পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়টী বিশেষভাবে সমর্থন করিতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছিল—ত্রিলোকের সকল ধন-রত্ন আপনার গৃহে। এখন তাহাই বিশেষভাবে দেখাইতেছে। তাই শুম্ভকে বলিল,—"এই দেখুন না কেন, ইন্দ্রের যাহা কিছু ভাল জিনিষ—ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, পারিজাত, এ সকলই আপনি গ্রহণ করিয়াছেন।

ইন্দ্র, ঐরাবত প্রভৃতি দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পারিজাত—কল্পতরু! সঙ্কল্পমাত্রেই যখন সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, তাহার গৃহে পারিজাত তরু অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ বিরাজিত। উচ্চৈঃশ্রবাঃ—দিব্য শ্রবণ-শক্তি। অতিদূরস্থিত অথবা অতি সূক্ষ্মতম শব্দ শ্রবণ করিবার ক্ষমতাকে উচ্চৈঃশ্রবা কহে।

শুন—সত্ত্বগুণ যত নির্ম্মল হয়, ততই অস্মিতার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন সাধক দেখিতে পায়—সর্ব্বভাবের সহিত একান্ত অন্বিত যে 'আমিত্ব', উহাই ত সর্ব্বভাবের একান্ত আশ্রয়। যেখানে যাহা কিছু আছে, সকলই ত আমিত্বরূপ আধারে অবস্থিত। সুতরাং কি সূক্ষ্ম জগতে, কি স্থূল জগতে, যেখানে যতপ্রকার ভাব বা পদার্থ আছে, সে সকলেরই একমাত্র অধীশ্বর অস্মিতা। তাই ঐরাবতাদি যদিও যথার্থতঃ ইন্দ্রের অর্থাৎ পরমাত্মারই শক্তি মাত্র, তথাপি এখন উহাদিগকে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রভৃতি অনুচরগণ অস্মিতারই বিশেষ বিশেষ স্ফুরণ বলিয়া বুঝিয়া থাকে। ইহাই অসুরভাব। আসল কথা এই যে, একমাত্র স্বপ্রকাশ চিতিশক্তিই সর্ব্ব বস্তুর

অধিষ্ঠান, তাহা না জানিয়া চিদাভাসকে সর্ব্ব বস্তুর অধিষ্ঠান মনে করাই অসুর ভাব।

বিমানং হংসসংযুক্তমেতত্তিষ্ঠতি তেহঙ্গনে।
রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্ বেধসোঽদ্ভুতম্ ॥৪৮॥

অনুবাদ। ব্রহ্মার রত্নস্বরূপ হংসযুক্ত অদ্ভুত বিমান সমানীত হইয়া, এখানে—আপনার অঙ্গনে অবস্থান করিতেছে।

ব্যাখ্যা। বেধা—ব্রহ্মা, বিরাট্ মন। হংস—জীব। বিমান—ব্যোমযান। হংসযুক্ত বিমান—জীবভাবীয় মন। জীবের মন ব্যোমকে বা আকাশতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া বিচরণ করে; তাই মনকে ব্যোমচারী বা বিমান বলা হয়। যে বিরাট্ মনের সঙ্কল্প এই বিশ্ব, তিনিই বেধা বা ব্রহ্মা। আমাদের এ ব্যষ্টি মনও তাঁহারই অন্যতম বিশিষ্ট সঙ্কল্পমাত্র। এইটী—ব্যষ্টি মনটীই ব্রহ্মার অদ্ভুত বিমান। সমষ্টি মন ও ব্যষ্টি মন কি ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলেই ব্রহ্মার হংসযুক্ত বিমানের রহস্য বুঝিতে পারা যায়। ব্যষ্টি মনে অর্থাৎ হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া সমষ্টি মন বা প্রজাপতি যে ভাবে বিচরণ করেন, অর্থাৎ যেরূপ ভাবে সৃষ্টিব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। এবং ইহাই ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ রত্ন বা শক্তি। যদিও পূর্ব্বে ইহার আলোচনা হইয়াছে, তথাপি এ স্থানে পুনরায় আলোচনা করিতে হইল।

শুন—একটী বৃক্ষ দেখিতেছ। যে বৃক্ষটী বিরাট্ মনের সঙ্কল্প ঠিক সেইটী তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সে বৃক্ষটী সঙ্কল্পময়, ভাবময় বা আনন্দময়; কারণ, আনন্দময় পরমেশ্বরের কল্পনাই বৃক্ষরূপে অভিব্যক্ত হয়; আনন্দ-ধাতুদ্বারাই উহা গঠিত। সেই চিন্ময় আনন্দময় বৃক্ষটী তোমার পক্ষে অজ্ঞেয়। তবে তুমি কোন্ বৃক্ষ দেখিতেছ?

ঐ চিদানন্দময় বৃক্ষ হইতে একপ্রকার স্পন্দন ইন্দ্রিয় পথে আসিয়া তোমার মনকে অর্থাৎ ব্রহ্মার হংসযুক্ত বিমানকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেয়, তোমার মনটী বৃক্ষের আকারে আকারিত হয়; এইরূপে তুমি যে বৃক্ষটী দেখিতে পাও, উহা তোমার সংস্কারানুরূপ একটী স্থূল ভৌতিক বৃক্ষ মাত্র। আনন্দধাতুদ্বারা গঠিত বৃক্ষটী তোমার ভৌতিক সংস্কাররূপ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহাই ব্রহ্মার অদ্ভুত বিমান অথবা অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টিবৈচিত্র্য। এইরূপ ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থসমূহ স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইলেও জীবের নিকট উহা ভৌতিক সংস্কাররূপ আবরণে আবৃত হইয়া প্রকাশ পায়। ব্রহ্মা স্বয়ং চিন্মাত্রস্বরূপ হইয়াও, স্বকীয় কল্পনাগুলি জড়াকারে—ভৌতিক আকারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন; হংসযুক্ত বিমান অর্থাৎ জীবভাবীয় মনই ঐরূপ পরিবর্ত্তনের সহায়ক; তাই ব্রহ্মা হংসবাহন। কোন্ অনাদি কাল হইতে আমরা আমাদের এই ব্যষ্টি মনকে কেবল ভৌতিক রূপরসাদি গ্রহণের যোগ্য করিয়া রাখিয়াছি। তাই আমরা চিদানন্দময় জগৎ ভোগ করিবার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই প্রজাপতি ব্রহ্মার আমাদের উপর এই আধিপত্য, আমরা জীব—আমরাই ব্রহ্মার বাহন হংস। আমাদের ব্যষ্টি মনগুলি ভৌতিক বস্তু গ্রহণে নিপুণ জানিয়াই তিনি এই অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিদ্বারা প্রতিনিয়ত আমাদিগকে ভৌতিক লীলা দেখাইতেছেন। কিন্তু সে অন্যকথা :—

শুম্ভ ব্রহ্মার এই বিমানটী হরণ করিয়াছে, অর্থাৎ এই অদ্ভুত সৃষ্টি ব্যাপারটী এখন আর ব্রহ্মার নহে শুম্ভের। অস্মিতা-স্বরূপে উপনীত হইয়া সাধক সত্য সত্যই দেখিতে পায়—আমিই ত ব্যষ্টি সমষ্টি মনের যাবতীয় সঙ্কল্প ও স্পন্দন ধরিয়া রাখিয়াছি। আমা হইতেই ব্যষ্টি সমষ্টি মনের বিকাশ, আমি না থাকিলে ত মনের সত্তাই থাকে না। ইহাই শুম্ভের ব্রহ্ম-বিমান হরণের রহস্য। বাস্তবিকপক্ষে মন বস্তুটাও যে অস্মিতারই একপ্রকার ব্যূহমাত্র, ইহা সাধকগণ গুরূপদিষ্ট উপায়ে তত্ত্বের সাধনাকালে বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন।

নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্ ॥৪৯॥

অনুবাদ। আপনি ধনাধিপতি কুবেরের নিকট হইতে এই মহাপদ্ম নামক নিধি গ্রহণ করিয়াছেন। এবং সমুদ্র আপনাকে কিঞ্জল্কিনী নামক অম্লান-পঙ্কজের মালা দান করিয়াছে।

ব্যাখ্যা। মহাপদ্মনামক নিধি শব্দের অর্থ নির্ম্মল সত্ত্বগুণ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"সত্ত্বাধারোনিধিশ্চান্যোমহাপদ্ম ইতি স্মৃতঃ। সত্ত্বপ্রধানোভবতি তেন চাধিষ্ঠিতোনরঃ॥" অর্থাৎ মহাপদ্মনামক নিধি সত্ত্বগুণের আধার; সুতরাং সত্ত্বগুণ-প্রধান মনুষ্যই এই নিধি লাভের যোগ্য। রজস্তমোগুণ অভিভূত হইলেই সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ হয়। এস্থলে ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকেই মহাপদ্মনামক নিধি বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেও বলিয়াছি—যাবতীয় নিধি বা বিভূতি বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। আরে, রজস্তমোগুণ অভিভূত না হইলে—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থান করিতে না পারিলে ত সাধক অস্মিতার স্বরূপই উপলব্ধি করিতে পারে না; সুতরাং মহাপদ্ম নিধি ত শুম্ভের গৃহেই থাকিবে!

ধনেশ্বর—কুবের, প্রাণই যথার্থ ধনাধিপতি; তাই ধনেশ্বর শব্দের অর্থ প্রাণ। বিশ্বময় যে প্রাণসত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা অনুভব করিতে পারিলেই সত্ত্বগুণ নির্ম্মল হয়। তাই মহাপদ্ম বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে প্রাণেরই আশ্রিত বলা যায়। অস্মিতায় উপনীত সাধক ইতিপূর্ব্বে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন করিয়া সর্ব্বত্র প্রাণসত্তার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে; সুতরাং বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ মহাপদ্ম নিধির অধিকারী হইয়াছে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে বিশুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয় বলিয়াই ধনেশ্বরের নিকট হইতে এই নিধি গ্রহণের কথা বলা হইল।

এতদ্ভিন্ন শুম্ভ সমুদ্রের নিকট হইতে কিঞ্জল্কিনী নামক এক অম্লান-পঙ্কজের মালা গ্রহণ করিয়াছিল। সমুদ্র—কর্ম্মাশয়। যদিও

অস্মিতায় উপনীত সাধকের সঞ্চিত এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মসংস্কার না থাকা হেতু কর্ম্মাশয় ক্ষীণ হইয়া যায়, তথাপি যতদিন প্রবল প্রারব্ধ-সংস্কার-সমূহ সম্যক্ ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, ততদিন (ক্ষীণ হইলেও) কর্ম্মাশয় থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। যদিও এরূপ সাধকের আর বন্ধ-জনক সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি যতদিন দেহ থাকে, ততদিনই প্রারব্ধ-কর্ম্ম-সংস্কার থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; সুতরাং কর্ম্মাশয় বলিতে এস্থানে কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মাশয় বুঝিতে হইবে। সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পরে ইহাই চণ্ডমুণ্ডের চতুরঙ্গ সেনার অন্যতম অঙ্গরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। অম্লান-পঙ্কজমালা শব্দে একান্ত ফলোম্মুখ প্রারব্ধ-কর্ম্ম-সংস্কারশ্রেণী বুঝিতে হইবে। এখন পর্য্যন্ত উহারা প্রক্ষীণ হয় নাই, তাই অম্লান। পঙ্ক শব্দের অর্থ পাপ অর্থাৎ অজ্ঞান। অজ্ঞান-রূপী পঙ্ক হইতেই উহাদের জন্ম, তাই পঙ্কজ বলা হয়। কিঞ্জল্ক শব্দের অর্থ কেশর। যাহার কিঞ্জল্ক আছে, তাহার নাম কিঞ্জল্কিনী। পূর্ব্বোক্ত ফলোম্মুখ প্রারব্ধকর্ম্ম-সংস্কারশ্রেণীরূপ অম্লানপঙ্কজ-মালাটীরই নাম কিঞ্জল্কিনী। পদ্মগর্ভস্থিত পীতবর্ণ কেশরসমূহের ন্যায় প্রবল প্রারব্ধ-বীজগুলি সাধককে যথার্থ আত্মস্বরূপে অবস্থান হইতে দূরে রাখিয়া দেয়। প্রবল প্রতিকূল প্রারব্ধ-সংস্কারগুলির ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। সাধক! যতদিন দেখিবে মা আমার পরমার্থ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন না, ততদিনই বুঝিবে—ঐ কিঞ্জল্কিনী নামক অম্লান-পঙ্কজের মালাটীই প্রতিবন্ধক স্বরূপ অবস্থান করিতেছে। ঐ প্রতিকূল প্রারব্ধসংস্কার ক্ষয়ের জন্য ধীর-ভাবে প্রতীক্ষা করিতে হইবে, অধীর হইলে আরও বিলম্ব হইবে। একমাত্র মাতৃকরুণার উপর নির্ভর করিয়া কাতরপ্রাণে কাঁদিতে হইবে।

সে যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বে এই কর্ম্মাশয়কে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া মনে হইত। এখন উহাকে অস্মিতারই একপ্রকার স্ফুরণরূপে

দেখিতে পাওয়া যায়, তাই চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে বলিল—যে পঙ্কজমালা ইতিপূর্ব্বে সমুদ্রের ছিল, তাহা এখন তুমি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছ।

দ্বিতীয় খণ্ডে সমুদ্র শব্দের যে গুণত্রয়ের সংযোগ-তারতম্যরূপ অর্থ করা হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান অর্থের কোনও বিরোধ নাই। ধীমান্ পাঠক ইহা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥৫০॥

অনুবাদ। বরুণ-প্রদত্ত সুবর্ণস্রাবি ছত্র, এবং যাহা পূর্ব্বে প্রজাপতির ছিল—সেই শ্রেষ্ঠ স্যন্দনও (রথ) আপনার গৃহেই রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা। ছত্র—আচ্ছাদনকারক। কাঞ্চনস্রাবি—ঐশ্বর্য্যদায়ক। অস্মিতায় আত্মবোধ উপসংহৃত হইলে, একদিকে যথার্থ আত্মস্বরূপটী আচ্ছন্ন থাকে, অন্যদিকে সর্ব্বভাবের অধিষ্ঠাতৃত্বরূপ ঈশ্বরধর্ম্ম প্রকাশ পায়, অর্থাৎ নানারূপ ঐশ্বর্য্য বা বিভূতির বিকাশ হইতে থাকে, ইহাই কাঞ্চনস্রাবি ছত্র। পরমাত্মস্বরূপের আবরক বলিয়াই ইহাকে ছত্র বলা হয়। এই ছত্রটী পূর্ব্বে বরুণের—রসাধিপতি দেবতার ছিল। এক্ষণে ইহা শুম্ভের গৃহে অবস্থিত। পূর্ব্বে সাধক ভোগ-স্পৃহাকে ঐশ্বর্য্য বিভূতি প্রভৃতিকে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিত, কিন্তু এখন উহাদিগকে নিজেরই একপ্রকার বিশিষ্ট-প্রকাশ-রূপে দেখিতে পায়। তাই চণ্ডমুণ্ড বলিল—পূর্ব্বে যাহা বরুণের ছিল, এখন তাহা আপনারই হইয়াছে। সাধকগণের অতিশয় সূক্ষ্মরূপে ঈশ্বরত্বাদি আত্মমহত্ব ভোগের স্পৃহা থাকে বলিয়াই, উহা কাঞ্চনস্রাবি ছত্ররূপে পরমাত্মস্বরূপের আচ্ছাদক হয়।

প্রজাপতির স্যন্দনবর—চিত্তবৃত্তি। বৃত্তিগুলিকে অবলম্বন করিয়াই মনোরূপী প্রজাপতি ইতস্ততঃ যাতায়াত বা প্রতিনিয়ত সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন

করিয়া থাকেন; তাই চিত্তবৃত্তিই স্যন্দন বা রথ। পূর্ব্বে উহা প্রজাপতিরই ছিল। এখন কিন্তু শুম্ভ-গৃহে অবস্থিত। সাধক ইতি-পূর্ব্বে বৃত্তিগুলিকে মনের ধর্ম্ম বলিয়া জানিত, এখন দেখিতে পায়—উহারা নিজেরই (অস্মিতারই) বিভিন্ন স্ফুরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। স্যন্দন শব্দটীর ক্ষরণ অর্থেও প্রয়োগ হইয়া থাকে। নিশ্চল পরমাত্মভাবের ক্ষরণ হয় বলিয়াও বৃত্তিগুলিকে স্যন্দন বলা যায়। প্রথম অবস্থায় সাধক মনে করিত, বৃত্তিগুলিই আত্মলাভের অন্তরায়, এখন কিন্তু সে ভাবটী আর নাই, সকলই সে আত্ম-স্ফুরণরূপে দেখিতে পায়। যতদিন বৃত্তিগুলি নিজস্বরূপ হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হয়, ততদিনই উহাদিগকে সংযত করিবার প্রয়াস থাকে। কিন্তু বৃত্তিসমূহ "আমারই একপ্রকার বিকাশ মাত্র" এইরূপ জ্ঞানে উপনীত হইলে আর উহাদের প্রতি প্রতিকূল ভাব থাকিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে বৃত্তিসমূহ অনুকূলও নহে, প্রতিকূলও নহে। উহারা যাহার সত্তায় সত্তাবান, তাঁহার দিকে লক্ষ্য পড়িলেই উহাদের অনিষ্টকারিতার উপশম হয়।

মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥৫১॥
নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ।
বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী ॥৫২॥

অনুবাদ। হে ঈশ! আপনি মৃত্যুর উৎক্রান্তিদা নামক শক্তি হরণ করিয়াছেন। জলাধিপতির পাশ এবং সমুদ্রজাত যাবতীয় রত্ন আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভের অধিকারে অবস্থিত। এতদ্‌ব্যতীত বহ্নিদেবতাও আপনাকে হিরণ্ময় বস্ত্রযুগল প্রদান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা। মৃত্যুর শক্তি—উৎক্রান্তিদা। প্রাণকে দেহ হইতে

উৎক্রামণ করানই মৃত্যুর কার্য্য। ইহাই তাহার শক্তি বা সামর্থ্য। অস্মিতায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে সাধক মনে করিত, মৃত্যু একটা আগন্তুক ব্যাপার-বিশেষ, যম যেন বলপূর্ব্বক প্রাণকে দেহ হইতে উৎক্রমণ করাইয়া থাকে। কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই। এখন সে দেখিতে পায়—মৃত্যু বলিয়া পৃথক্ কিছু নাই। আমি যখন ইচ্ছা করিয়া দেহ হইতে উৎক্রান্ত হই, তখনই মৃত্যু নামে একটা ব্যাপার সংঘটিত হয়। মৃত্যুর উৎক্রান্তি-শক্তি-হরণের ইহাই তাৎপর্য্য।

উপনিষদে এই প্রাণের উৎক্রমণ-বিষয়ে একটী সুন্দর উপাখ্যান আছে—চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ ও প্রাণ, এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহা স্থির করিবার জন্য উৎক্রমণ ব্যবস্থা হইল। প্রথমে এক একটী করিয়া ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে প্রাণের বিশেষ কিছুই অনিষ্ট হয় নাই, কেবল সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অভাব-জনিত একপ্রকার কষ্ট বোধ হইতেছিল। সর্ব্বশেষে প্রাণ উৎক্রান্ত হইতে আরম্ভ করিবামাত্র ইন্দ্রিয়বর্গ স্বকীয় সত্তার বিনাশ-আশঙ্কায় অস্থির হইয়া পড়িল, এবং প্রাণেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া স্তবস্তুতি করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ প্রাণের উৎক্রমণ যে "আমারই ইচ্ছামাত্র", ইহা বুঝিতে পারিলে, সাধকের মৃত্যুভয় সম্যক্ অপনীত হয়। যাঁহারা অস্মিতায় গিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই সকল জ্ঞান অতি সহজ ও স্বাভাবিক।

জলাধিপতির পাশ এবং সমুদ্রজাত যাবতীয় রত্ননিচয় নিশুম্ভ গ্রহণ করিয়াছে। পাশ শব্দের অর্থ অনুরাগ। বরুণের পাশ কি, তাহা দ্বিতীয়খণ্ডে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। এখানে অনুরাগ শব্দে কেহ বিষয়ানুরাগ বুঝিবেন না; এ অনুরাগ—নিশুম্ভের অর্থাৎ অস্মিতার সহিত একান্ত সহভাবী যে মমতা, তাহারই। যেখানে মমতা সেইখানেই অনুরাগ। সাধারণতঃ বিষয়ানুরাগ স্থলে ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোক্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্-সত্তা-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়; সুতরাং উহাদের প্রতি একটা আসক্তি থাকে; কিন্তু এ অস্মিতাক্ষেত্রের

অনুরাগ সেরূপ নহে। এখানে যতই বহুভাব ফুটুক না কেন, সকলই অস্মিতার বিভিন্ন স্ফুরণরূপে প্রকাশ পায়; সুতরাং আমারই বহুভাবের প্রতি আমার যে আসক্তি, তাহাই এস্থলে অনুরাগপদবাচ্য। নিশুম্ভ-অসুরের জলাধিপতির নিকট হইতে পাশ-গ্রহণের ইহাই রহস্য। অস্মিতায় উপনীত হইতে না পারিলে, সাধক ইহা ঠিক বুঝিতে পারিবেন কি ?

সমুদ্রজাত রত্ননিচয় শব্দে যাবতীয় যোগ-বিভূতি বুঝায়। ইতিপূর্ব্বে ঐ সকল যেন একটা পৃথক্ বস্তু বা শক্তিরূপে প্রতীত হইত, কিন্তু এখন মায়ের কৃপায় সাধক বেশ বুঝিতে পারে—ঐ যোগশক্তিসমূহ আমারই বিভিন্নরূপ প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অস্মিতার ঐ বহুভাবাত্মক স্ফুরণসমূহের সঙ্গে সঙ্গেই মমত্বের অভিব্যক্তি আছে, ইহাই নিশুম্ভের সমুদ্রজাত রত্ননিচয়-গ্রহণের রহস্য।

চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য, যে সকল ঐশ্বর্য্যের কথা বলিল, সে সকলই শুম্ভের আয়ত্ত, কেবল এই দুইটী (বরুণের পাশ এবং সমুদ্র-জাত রত্ননিচয়) নিশুম্ভের। সাধক ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন—অনুরাগ এবং বিভূতি অস্মিতামাত্র হইলেও মমত্বকর্ত্তৃকই উহা পরিগৃহীত। তাই মন্ত্রেও "ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে" কথাটী রহিয়াছে।

বহ্নি দিলেন—"অগ্নিশৌচে চ বাসসী" অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বয়। বস্ ধাতুর অর্থ আচ্ছাদন; যাহা পরমাত্মভাবের আবরক তাহাই বাস। অগ্নিশৌচ শব্দের অর্থ জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা বিশোধিত। মায়া এবং অবিদ্যা ইহাই অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল। "মায়াবস্ত্রে কায়া ঢাকি, সতত সঙ্গোপনে থাকি," সেই গানটী এখানে একবার স্মরণ করিলেই ভাল হয়। অস্মিতা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াই সাধক মায়া এবং অবিদ্যার স্বরূপ যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারে। পরমাত্মস্বরূপে মায়াও নাই অবিদ্যাও নাই। ইতিপূর্ব্বে অর্থাৎ অস্মিতায় উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে সাধক মায়া এবং অবিদ্যার স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা জানিত, উহা একপ্রকার অস্ফুট বাচনিক জ্ঞানমাত্র, কিন্তু এখন উহা অগ্নিশৌচ হইয়াছে, অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা

বিশোধিত হইয়াছে। বিজ্ঞানময় কোষে না দাঁড়াইতে পারিলে, মায়া এবং অবিদ্যা যে কি এবং উহার কেন্দ্র যে কোথায়, তাহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্নগৃহ্যতে ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ। হে দৈত্যেন্দ্র! এইরূপ সমস্ত রত্নই আপনি আহরণ করিয়াছেন, কেবল এই কল্যাণী স্ত্রীরত্নটী কেন গ্রহণ করিতেছেন না!

ব্যাখ্যা। চণ্ডমুণ্ডের প্রলোভন-বাক্যের এইখানেই শেষ। এমনই করিয়া প্রবৃত্তিনিবৃত্তি জীবকে মাতৃলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। অস্মিতায় আত্মবোধ উপসংহৃত হইলে, সাধক বেশ বুঝিতে পারে—সর্ব্বরূপে বহুরূপে যাহা কিছু প্রকাশিত হইতেছে, সে সমস্তই রত্নমাত্র! আমার আমিত্বরূপ মহারত্নদ্বারাই এ বিশ্ব সংগঠিত। যে জিনিষ আমার পরম প্রিয়তম আমিত্বদ্বারা গঠিত সে সকলই আমার নিকট রত্নরূপে, প্রিয়তম বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়দ্বারা পরিগৃহীত হয়, সে সমস্তই ত আমার আমিত্বময়! আমিত্বরূপ মহারত্নই ত সর্ব্বরূপে বহুরূপে প্রকাশিত! তাই মন্ত্রে "রত্নানি সমস্তানি" পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। জগৎময় প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে সাধক দেখিতে পায়—আমার আমিটাই জগদ্রূপে প্রকাশ পাইতেছে, এবং জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমিত্ব-রত্নই "সমস্ত"রূপে অবস্থিত, ইহার উপলব্ধি বড়ই লোভনীয়, বড়ই আনন্দদায়ক। অনেক সাধক এখানে আসিয়া জীবনের চরিতার্থতা মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। ইহা এমনই মধুময়ী অবস্থা। কিন্তু

এখানেও নয়, আরও অগ্রসর হইতে হইবে! তাই মা আমার চণ্ডমুণ্ড-রূপে—প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপে চিতিশক্তির—পরমাত্মার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হন, এবং সাধককে নানারূপে প্রলুব্ধ করিয়া পরমাত্মাভিমুখে তীব্র আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পান। আশঙ্কা হইতে পারে—একমাত্র চণ্ড অর্থাৎ পরমাত্মাভিমুখী প্রবৃত্তিই ত সাধককে প্রলুব্ধ করে, মুণ্ড অর্থাৎ নিবৃত্তি ত প্রলুব্ধ করে না! তাহার উত্তর এই যে, যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিবৃত্তি কখনও সাধককে পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ করে না বটে, তথাপি ঐ নিবৃত্তিই পূর্ব্বলব্ধ রত্নাদি বা যোগ-বিভূতির প্রতি তীব্র আসক্তি দূর করিয়া দিয়া প্রবৃত্তির আকর্ষণের বিশেষ সহায় হয়। শুম্ভ যদি গৃহস্থিত রত্নরাজিতেই একান্ত মুগ্ধ থাকিত, তবে কি অম্বিকাকে লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইত? নিবৃত্তির প্রভাবেই অম্বিকা লাভ হয়। সে যাহা হউক, চণ্ডমুণ্ড শুম্ভকে বলিল—সবই যখন আপনার, তখন আর এই কল্যাণী মূর্ত্তিটীকেই বা আপনি কেন গ্রহণ করিতেছেন না সব রত্নই যখন আপনার, তখন এ স্ত্রীরত্নই বা আপনার কেন না হইবে? ইহাকেও আপনার করিয়া লউন! শুম্ভ চণ্ডমুণ্ডের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া অম্বিকাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু হায়! সে জানে না যে, অম্বিকাকে আপনার করিতে গেলে, আপনি অর্থাৎ "আমি"টাই থাকে না, একমাত্র অম্বিকাই থাকেন। চিতিশক্তিকে গ্রহণ করিতে গেলে, অস্মিতাই বিনষ্ট হইয়া যায়। ক্রমে এই অপূর্ব্ব তত্ত্বই পরিস্ফুট হইবে।

সাধক! তুমিও শুম্ভের মত প্রলুব্ধ হও। প্রবৃত্তি তোমায় কল্যাণী মায়ের জন্য প্রলুব্ধ করুক। নিবৃত্তি তোমায় লব্ধ-রত্নের প্রতি আসক্তিহীন করিয়া দিউক, তুমিও মাকে আনিতে বা পাইতে গিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেল, মনুষ্য-জীবনের চরম চরিতার্থতা লাভ হউক।

ঋষিরুবাচ।

নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্ ॥৫৪॥
ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম।
যথা চাভ্যেতি সংপ্রীত্যা তথা কার্য্যং ত্বয়া লঘু ॥৫৫॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—চণ্ডমুণ্ডের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তখন শুম্ভ সুগ্রীবনামক জনৈক অসুরকে দূতরূপে দেবীর নিকট প্রেরণ করিল; এবং বলিয়া দিল—"তুমি আমার কথা অনুসারে সেখানে গিয়া এই সকল কথা বলিবে, এবং যাহাতে তিনি (সেই দেবী) সম্প্রীতির সহিত শীঘ্রই এখানে আগমন করেন, এরূপ কার্য্য করিবে।"

ব্যাখ্যা। চণ্ডমুণ্ডের বাক্যে শুম্ভ মুগ্ধ হইল—অস্মিতা প্রবৃত্তির প্রেরণায় আত্মলাভে উদ্যত হইল। শুম্ভের সর্ব্বপ্রথম উদ্যম—সুগ্রীব-নামক দূত-প্রেরণ। সু—শোভন গ্রীবাদেশ যাহার, তাহাকে সুগ্রীব কহে। সুগ্রীব—উত্তন উত্তম বাক্য-প্রয়োগ অর্থাৎ বাচনিক জ্ঞান। মাত্র বাচনিক জ্ঞানের সাহায্যে পরমাত্মস্বরূপ বুঝিবার চেষ্টাই শুম্ভের সুগ্রীবনামক দূত-প্রেরণের রহস্য।

অস্মিতা-ক্ষেত্রে উপনীত সাধকের মনে স্বতঃই এই ভাবটী জাগিতে থাকে যে, "আমিই ত জগৎপ্রকাশক, আমার আবার প্রকাশক কে আছে? যদিই বা থাকে—তবে সে ত অস্থূল অনণু অহ্রস্ব অদীর্ঘ ইত্যাদি নেতি নেতি মুখে প্রতিপাদিত শূন্যবৎ নিষ্ক্রিয় নিরবলম্ব সুষুপ্তিবৎ একটা অবস্থামাত্র। সে অবস্থায় গিয়াই বা ফল কি? এই ত বেশ আছি! এখন সুধু বেদান্তাদি-শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য নির্গুণ স্বরূপের বিষয় মৌখিক আলোচনা করিতে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সে অবস্থাটী—সেই বাক্যমনের অতীত স্বরূপটী, স্থূল দেহ থাকিতে উপলব্ধির বিষয় হয় না, হওয়ারও আবশ্যক নাই। এখন সুধু বাক্যের দ্বারা তাহার স্বরূপ

বুঝিতে পারিলেই হয়।" কিন্তু হায়! সাধক এখনও ঠিক বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার এই যে পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান, উহা কেবল শ্রুতি ও অনুমানজন্য পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র! অপরোক্ষানুভূতি এখনও ঠিক হয় নাই। যদি পরমাত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি তাহাকে প্ররোচিত না করিত, তবে সে এই ভাবাতীত স্বরূপের আলোচনাও করিত না, নিতান্ত বাধ্য হইয়াই যেন তাঁহার (পরমাত্মার) আলোচনা করিতে হয়, অধিকাংশ সাধকেরই এইরূপ একটা সাময়িক নিশ্চেষ্টতা আসিয়া পড়ে।

সাধক যাহারা, তাহাদের এরূপ ভাব প্রায়ই আসিয়া থাকে; কারণ, বহু জন্মার্জ্জিত সাধনার ফলে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে—অস্মিতায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বভাবের অধিষ্ঠাতৃত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়া সাধক পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সন্ধান পাইয়াছে। তাহার আর ইহার উপরে যাইবার বড় একটা ইচ্ছাই হয় না। নিতান্ত প্রবৃত্তির তাড়নায় অগত্যা অল্প-বিস্তর মৌখিক আলোচনা করিতে থাকে। একটা বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে আর সে নিরঞ্জনসত্তার দিকে অগ্রসর হইতে চায় না। তাই সুগ্রীবনামক দূত-প্রেরণের দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিতে প্রয়াস পায়। অতি চমৎকার এ তত্ত্ব।

বর্ত্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এইরূপ অবস্থাকেই জীবনের চরম চরিতার্থতা বলিয়া মনে করেন। ইহাকেই অপ্রাকৃত লীলানিকেতন বা নিত্যবৃন্দাবন প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করেন। পক্ষান্তরে পরমাত্মস্বরূপটী যেন নিতান্ত অন্ধকারময় সুষুপ্তিবৎ অবস্থা, এইরূপ স্থির করিয়া বলিয়া থাকেন—"চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনি খাওয়াই ভাল।" হায়! তাঁহারা জানেন না যে বিন্দুমাত্র ভেদ জ্ঞান থাকিতেও আত্মার স্বরূপ যথার্থ উপলব্ধ হয় না,—সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের, পরম প্রেমের আস্বাদও পাওয়া যায় না। তাঁহারা কি জানেন না যে অদ্বয় জ্ঞানই অমৃত, ভেদ জ্ঞানই মৃত্যু! যদিও স্থূল দেহ বিদ্যমান থাকিতে সে অদ্বয় স্বরূপে দীর্ঘকাল অবস্থান একান্ত অসম্ভব, তথাপি যতদিন অদ্বয় স্বরূপে উপনীত হইতে না পারা যায়,

ততদিন যতই লীলারসের আস্বাদন করা যাউক না কেন, অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায় না, অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না।

স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেঽতিশোভনে।
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥৫৬॥

অনুবাদ। যেখানে—যে অতিশোভন শৈলোদ্দেশে সেই দেবী অবস্থান করিতেছেন, সে (সুগ্রীব) সেখানে গিয়া কোমল মধুর বাক্যে তাঁহাকে (দেবীকে) বলিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। অতিশোভন শৈলোদ্দেশ—সহস্রার; অসীম জ্ঞান-ক্ষেত্র। তত্ত্ব-প্রকাশিকা নামক চণ্ডীর টীকাকার শৈলোদ্দেশে শব্দের অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"শৈলস্য ঊর্দ্ধপ্রদেশে"। যথার্থই এই দেহরূপ হিমাচলের সর্ব্বোর্দ্ধ প্রদেশে সহস্রদল কমল বিরাজিত। জগতের কোন সৌন্দর্য্যই তাহার সহিত উপমিত হইতে পারে না; কারণ, পার্থিব সৌন্দর্য্য জড়ত্বমণ্ডিত; কিন্তু সে স্থান—বিশুদ্ধ চিন্ময়-ক্ষেত্র। সে যে "আনন্দরূপং বিশুদ্ধবোধং নয়নাভিরামং!" তাই মন্ত্রে অতিশোভন পদটীর প্রয়োগ আছে।

সহস্রার বলিলে যাঁহারা মনে করেন—মস্তকের অভ্যন্তরে এক হাজার পাপড়িবিশিষ্ট একটা পদ্মফুল আছে, তাঁহারা এ রহস্য পরিগ্রহ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। বিশুদ্ধ চিন্ময় ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেই মস্তকের অভ্যন্তরে একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি প্রকাশ পাইতে থাকে। বোধবস্তু সর্ব্বতঃ প্রসারী, সর্ব্বতঃ প্রকাশশীল, অনন্ত শক্তির কেন্দ্র। অরসমূহ যেরূপ রথচক্র-নাভিতে সম্বদ্ধ থাকে, ঠিক সেইরূপ সেই বোধ-ক্ষেত্র হইতে অনন্ত প্রসার অনন্ত প্রকাশ অনন্ত শক্তি সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইয়া থাকে, তাই ইহাকে সহস্রার বলা হয়। সহস্র শব্দ অসংখ্যবাচক।

আজকাল অনেক সাধকই ষট্চক্রের ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানেন, বা অন্যকে উপদেশ করেন। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ সকল উপায় মন্দ নহে। বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন মূর্ত্তির চিন্তা এবং বিভিন্ন মন্ত্র জপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান, কিংবা চক্রে চক্রে শ্বাসের ক্রিয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি যদি অনুভূতিবিহীন হয়, অর্থাৎ চৈতন্যসত্তা উদ্‌বোধের সহায়ক না হয়, তবে ঐ সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা কখনও যে আত্মজ্ঞানের উদয় হইতে পারে, এরূপ আশা করা যায় না। ঐ সকল চক্রের বিশেষ রহস্য আছে। উহা তত্ত্বসমূহের কেন্দ্র। স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে ঐ সকল স্তর সাধকগণের একান্ত আশ্রয়নীয়। তত্ত্বজ্ঞানী গুরুগণ উপযুক্ত অধিকারীকেই সে সকল রহস্য ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই অনধিকারীর নিকট উহা প্রকাশ করেন না; নতুবা লুকাইয়া রাখা তাঁহাদের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে অন্য কথা—

"শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা"—অতিশয় কোমল মধুর বাক্যপ্রয়োগে শুম্ভের দূত দেবীকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। অতি মধুর প্রণবাদি মন্ত্র জপ, অতি মধুর স্তোত্রাদি পাঠ, অতি মধুর উপনিষদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রভৃতি উপায়ে আত্মাকে—অম্বিকাকে শুম্ভ স্বকীয় গৃহে অস্মিতাক্ষেত্রে আনয়ন করিতে প্রয়াস পায়; কিন্তু তাহা যে হইবার নহে। শুম্ভকে আত্মবলি দিতে হইবে; নতুবা তিনি আসিবেন না। অস্মিতার লয় না হইলে, তাঁহার প্রকাশ হইবে না। মাকে আনিতে হইলেই, আমিটী হারাইতে হইবে। যতক্ষণ আমিটী থাকে ততক্ষণ মায়ের আগমন হয় না, ইহাই সত্যকথা। সাধক এইখানে একবার সেই "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" ইত্যাদি সত্যদর্শী ঋষির বাক্য স্মরণ করিয়া লও, তাহা হইলেই শুম্ভের এই দূত প্রেরণের নিস্ফলতা বুঝিতে পারিবে।

দূত উবাচ।

দেবি! দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥৫৭॥
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥৫৮॥

অনুবাদ। দূত বলিল—দেবি! দৈত্যেশ্বর শুম্ভ ত্রিলোকের পরমেশ্বর। তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি দূতরূপে এখানে আপনার নিকট আসিয়াছি। যাঁহার আজ্ঞা সমগ্র দেবতাবৃন্দ সর্ব্বদা অবনত মস্তকে প্রতিপালন করিয়া থাকে, সমস্ত দৈত্যারিবৃন্দকে যিনি সম্যক্ নির্জ্জিত করিয়াছেন, তিনি—সেই শুম্ভ (আপনাকে) যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন।

ব্যাখ্যা। সুগ্রীব বলিল—শুম্ভ ত্রিলোকের ঈশ্বর। অস্মিতায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ ত্রিবিধ প্রকাশ অবস্থিত; সুতরাং অস্মিতাই ত সর্ব্বভাবের ধর্ত্তা, পাতা ও সংহর্ত্তা ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। বাচনিক জ্ঞানরূপী সুগ্রীব দূত আসিয়া দেবীর নিকট শুম্ভের এই ঈশ্বরত্বের বিষয় অর্থাৎ অস্মিতার ঐশ্বর্য্যমহত্বাদি-বিষয়ের বর্ণনা করিতে থাকে। যথা—জগৎ বলিয়া যাহা কিছু প্রকাশ পায়, সে সকলই যখন আমাতে প্রতিষ্ঠিত, তখন তুমি দেবী—দ্যোতনশীলা স্বপ্রকাশ-স্বরূপা চিতিশক্তি, তুমি কেন আমার পরিগ্রহে আসিবে না? সমস্ত দেব-শক্তির উপর আমার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, দেবতাগণ আমারই সত্তায় সত্তাবান্, আমার উপর দেবতাবৃন্দের কোনও অধিকার নাই, আমি তাঁহাদিগকে সম্যক্ নির্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছি; এইরূপ সকলই যখন আমার অর্থাৎ 'আমি'রই বহুভাবমাত্র, তখন তুমি আত্মা, তুমিও ত আমারই আত্মা। তুমিই বা কেন আমার না হইবে?" শুম্ভের এই ভাবটিই দূতমুখে প্রকাশিত হইতেছে।

শুন, জীব যখন প্রথম সাধনাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়, তখন মনে করে,

'আমি ভগবান্‌কে লাভ করিব অর্থাৎ আমি হইতে ভগবান্‌কে একটী সম্পূর্ণ পৃথক্ মূল্যবান্ বস্তুস্বরূপ বুঝিয়া লয়। ক্রমে সাধনা করিতে করিতে সন্দেহ অবিশ্বাস অহঙ্কার এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতি আমির গায়ের মলিন পরিচ্ছদগুলি খুলিয়া ফেলিয়া, শ্রদ্ধা বিশ্বাস দয়া ক্ষমা নিরভিমান প্রভৃতি মূল্যবান পোষাকগুলি দ্বারা আমিটীকে সাজাইতে থাকে। ক্রমে গুরু-কৃপায় এমন একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে আমি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না। যত কিছু বহুত্ব যত কিছু ভালমন্দ, সে সকল 'আমি'রই এক এক প্রকার স্ফুরণ মাত্র, এইরূপে দেখিতে পায়। তখন আশা খুবই বাড়িয়া যায়, তখন আত্মাকেও আমির আয়ত্বে আনিতে প্রয়াস পায়। কার্য্যতঃ ইহাও অজ্ঞান বা আসুরভাব মাত্র।

মুখে আমরা বলি "আমার আত্মা"। ইহাও অজ্ঞানমাত্র। আত্মা কখনও আমার হয় না, আত্মাই আমিরস্বরূপ। ইহা বুঝিতে না পারিয়া যখন জীব আত্মাকে আমির মধ্যে আনিতে চেষ্টা করে, তখনই এই চরম অজ্ঞানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই মহাসুর শুম্ভ। অজ্ঞানই শুম্ভের স্বরূপ; সুতরাং সে আত্মাকে মাকে আমির আয়ত্তে আনিতে চেষ্টা করিবেই। সেই চেষ্টাই দূত প্রেরণরূপে প্রথম প্রকাশ পায়।

মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ।
যজ্ঞভাগানহং সর্ব্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্ ॥৫৯॥

অনুবাদ। এই অখিল ত্রৈলোক্য আমার। দেবতাবর্গ আমার বশীভূত। আমি সমস্ত যজ্ঞভাগ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উপভোগ করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা। শুম্ভের কথাগুলি খুবই সত্য। অস্মিতায় উপনীত হইলে, সাধক! তুমিও বুঝিতে পারিবে এই কথাগুলি কত সত্য। ত্রৈলোক্য আমার, দেবতাবৃন্দ আমার বশীভূত, যজ্ঞভাগ আমি গ্রহণ করি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ, অথবা সৃষ্টিস্থিতি ও

লয় এই ত্রিবিধ প্রকাশকে ত্রিলোক কহে। লোক শব্দ প্রকাশার্থক। আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হন, তাই নিতান্ত জড় বুদ্ধিটীও আত্মারূপে আমিরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। আত্মা বা দৃক্‌শক্তি এবং বুদ্ধি বা দর্শনশক্তি, সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও তখন অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে, ইহাই অস্মিতা বা শুম্ভাসুর। সুতরাং স্থূল সূক্ষ্মাদি অথবা সৃষ্টি-স্থিত্যাদি ত্রিবিধ প্রকাশ এই অস্মিতাতেই উপলব্ধ হইয়া থাকে; তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মম ত্রৈলোক্যমখিলম্"।

দেবতাগণ কি ভাবে অস্মিতার বশীভূত এবং কি ভাবে যজ্ঞভাগ অস্মিতাকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এ স্থানে পুনরায় বিশেষরূপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। যজ্ঞভাগ শব্দের অর্থ—কর্ম্মফল। কর্ম্মই যজ্ঞ। এই ব্রহ্মাণ্ড কর্ম্মময়; সুতরাং এ ব্রহ্মাণ্ড যজ্ঞাগার। কর্ম্মের যাহা শেষ বা পরিণাম অর্থাৎ ফল, তাহাই যজ্ঞভাগ। এই যজ্ঞভাগ দেবতার প্রাপ্য; কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপতি সূর্য্যাদি দেবতাবর্গই রূপরসাদি বিষয়গ্রহণরূপ কর্ম্মের ফল গ্রহণ করিয়া থাকেন। খুলিয়া বলি—একটি ফুল দেখিয়া তুমি আনন্দিত হইলে। এস্থলে কি ব্যাপার হইল, একবার ভাবিয়া দেখ—বিরাট মনের যে পুষ্পবিষয়ক সঙ্কল্প আছে, তাহা হইতে এক প্রকার স্পন্দন গিয়া তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয়কে স্পন্দিত করিল। অমনি তোমার চক্ষু ফুলের বাহ্য রূপটী গ্রহণপূর্ব্বক মনের নিকট উপস্থিত করিল। মন উহা বুদ্ধির আলোকে আলোকিত করিয়া ফুলের মনোহর রূপটী গ্রহণ করিল। তাহার ফলে চক্ষুরিন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইল। এই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তির অর্থই চক্ষুর অধিপতি আদিত্যদেবতার তৃপ্তি অর্থাৎ যে চৈতন্যাংশ চক্ষুরিন্দ্রিয়-বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার—সেই আদিত্য-দেবতার পরিতৃপ্তি। ঐ তৃপ্তিটুকুর নাম যজ্ঞভাগ, রূপরসাদি বিষয়গ্রহণরূপ যজ্ঞের উহাই শেষভাগ বা অমৃত। উহাই দেবতাগণের প্রাপ্য বা ভোগ্য। কিন্তু এখন তাহা অস্মিতার অধিকারে আসিয়াছে; কারণ, খএ৯দেবতাবর্গ বিশুদ্ধ চৈতন্যের অংশরূপে প্রতিভাত হইতে না পারিয়া

বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের বিশেষ বিশেষ স্ফুরণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপে দেবতাবর্গ স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত এবং যজ্ঞভাগ হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"কর্ম্মদ্বারা দেবতাদের তৃপ্তিবিধান করিতে হয়। তাহা না করিয়া যদি কেহ কর্ম্মফলরূপ যজ্ঞভাগ স্বয়ং গ্রহণ করে, তবে তাহার চুরি করা হয়।" এই চুরিকরা ব্যাপারটি স্থূলদেহাত্মবোধ হইতেই আরম্ভ হয়। জীব যতদিন সাধক না হয়, ততদিন দেহাত্মবোধে বিচরণ করে ও রূপরসাদি বিষয় ভোগ করিয়া স্থূলদেহ বা মনকেই পরিতৃপ্ত করে। এই তৃপ্তিরূপ ফল বা যজ্ঞভাগ যে দেবতাদেরই প্রাপ্য, ইহা তখন বুঝিতে পারে না। তারপর সাধনা-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথম প্রথম মনকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকে; সুতরাং তখনও যজ্ঞভাগ চৈতন্যে অর্পিত হয় না। সর্ব্বশেষে বিজ্ঞানে আরোহণ করিয়া, বিজ্ঞানাত্মায় অবস্থান করিয়াও বিশুদ্ধ চৈতন্যে যজ্ঞভাগ অর্পণ না করিয়া বিজ্ঞানাত্মরূপী অস্মিতারই তৃপ্তিসাধন করে। সুতরাং সাধারণ জীব হইতে বিজ্ঞানময় কোষের সাধক পর্য্যন্ত সকলেই জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যজ্ঞভাগ হরণ করে। ইহাই অসুরকর্ত্তৃক যজ্ঞভাগ হরণের রহস্য। মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ পদের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক আহৃত রূপরসাদি বিষয়সমূহ বিজ্ঞানে গিয়াও পৃথক্ পৃথক্ রূপেই পরিগৃহীত হয়। যদি উহারা আত্মায় অর্পিত হইত, তবে আর এই পৃথক্ত্ব থাকিতে পারিত না; সকল ভেদ বিদূরিত হইয়া একরসরূপে পরিগৃহীত হইত। সাধক! অপূর্ব্ব এ তত্ত্ব ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখ, এবং আর যাহাতে এইরূপ যজ্ঞভাগ হরণ করিতে না হয়, যিনি সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি তাঁহাতেই যজ্ঞভাগ সমূহ যাহাতে অর্পিত হয়, তাহার জন্য যত্নবান হও, তোমার বহুস্বরূপ পাপ অনায়াসে বিদূরিত হইয়া যাইবে।

ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ।
তথৈব গজরত্নানি হৃত্বা দেবেন্দ্রবাহনম্ ॥৬০॥
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ।
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্ ॥৬১॥
যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্বেষূরগেষু চ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে ॥৬২॥

অনুবাদ। ত্রিলোকে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে, সে সকলই আমার অধীন! (এমন কি) দেবেন্দ্রের বাহন ক্ষীরোদমথনোদ্ভূত গজরত্ন ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরত্ন ইন্দ্রের নিকট হইতে আহরণ করিয়া দেবতাগণ প্রণিপাতপূর্ব্বক আমাকে অর্পণ করিয়াছে। হে শোভনে! দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং নাগগণের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিল, সে সকল এখন আমারই অধিকারে অবস্থিত।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বমন্ত্রে শুম্ভের সামর্থ্য বর্ণিত হইয়াছে। এই তিনটী মন্ত্রে তাহার ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে। ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। শুম্ভ দূতমুখে দেবীকে স্বকীয় ঐশ্বর্য্যের বিষয় শুনাইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, দেববিজয়ী বীর্য্য এবং পার্থিব অপার্থিব ঐশ্বর্য্য, সকলই যখন আমার অধিকারে অবস্থিত, তখন বিশুদ্ধচিৎস্বরূপ মহারত্ন তুমি কেনই বা আমার অধিকারে আসিবে না?

রত্ন শব্দে মণি বুঝায়। আবার যে জাতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাহাকেও সেই জাতির মধ্যে রত্ন বলা হয়। পার্থিব শ্রেষ্ঠ-ভোগসমূহ এবং অপার্থিব স্বর্গাদিশ্রেষ্ঠ ভোগসমূহকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে রত্ন শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। অস্মিতা বিশ্বময় এবং বিশ্বরূপে প্রতিভাত; সুতরাং বিশেষ অভাব অভিযোগ নাই, অপরের ত্যাগ গ্রহণ নাই, এবং অপরের প্রতি অনুরাগ বিরাগও নাই। মানুষ যেরূপ স্বকীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অভাব অনুভব করিয়া উহাদিগকে লাভ করিবার চেষ্টা

করে না; ঠিক সেইরূপ অস্মিতায় উপনীত সাধকেরও নিতান্ত ভেদজ্ঞানে ত্যাগ বা গ্রহণ থাকে না। সবই যখন আমি তখন আর ত্যাগ গ্রহণ কিরূপে থাকিবে? বিশ্বের সকল বস্তুই যে আমি দ্বারা গঠিত; সুতরাং দেবতা গন্ধর্ব্ব উরগ প্রভৃতি বিভিন্ন লোকে যাহা কিছু বস্তু বা রত্ন আছে, সে সকলই আমার অধিকারে অবস্থিত।

সাধক! কি মধুময়ী অবস্থা! ভাবিয়া দেখ—জগতের যেখানে যত কিছু ভোগ আছে, তাহা আমিই করিতেছি। জগতের সকল জীব, সকল ভোগই যে আমিময়! আমি এক অদ্বিতীয়—আর অসংখ্য জীব যেন আমারই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়; সুতরাং যেখানে যাহা কিছু ভোগ হইতেছে, স্বরূপতঃ তাহা আমিই ভোগ করিতেছি! অস্মিতা-ক্ষেত্র এমনই বটে! তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি—বহু সৌভাগ্যের ফলে সাধক এ তত্ত্বে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য লাভ করে।

সে যাহা হউক, শুম্ভ দূতমুখে বলিয়া পাঠাইল—হে শোভনে—হে পরম-শোভাময়ী চিতিশক্তি! সমস্তই আমিময়, শুধু তুমি কেন আমার আমিত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হও না? তোমার দিকে তাকাইলে, তোমার কথা ভাবিলে, তোমাকে যে আমা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়াই মনে হয়! কেন তুমি পৃথক্ থাকিবে দেবি! তুমিও আমার হও।

শুন, অস্মিতায় আসিলেই, অস্মিতা যাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত, যাঁহার সত্তায় অস্মিতার সত্তা, তাঁহার দিকে লক্ষ্য পড়ে; সুতরাং তাঁহাকে পাইবার জন্য সাধক মাত্রই সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়া থাকে। শুম্ভের এই অম্বিকা দেবীকে আনয়নের প্রযত্নটীও ঠিক সেই নিত্য-সিদ্ধ সাধন-প্রণালীরই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবীং লোকে মন্যামহে বয়ম্ ।
সাত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজোবয়ম্ ॥৬৩॥
মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্ ।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসি বৈ যতঃ ॥৬৪॥

অনুবাদ। আমাদের মনে হয়—ইহলোকে তুমিই একমাত্র স্ত্রীরত্নস্বরূপা। আমরাই যাবতীয় রত্ন ভোগের অধিকারী; সুতরাং তুমিও আমাদিগকে আশ্রয় কর। আমাকেই হউক অথবা আমার অনুজ উরুবিক্রম নিশুম্ভকেই হউক, হে চঞ্চলাপাঙ্গি! (তোমার যাহাকে ইচ্ছা) ভজনা কর; যেহেতু তুমি যে রত্নস্বরূপা!

ব্যাখ্যা। শুম্ভের প্রত্যেক কথাটী সত্য। মা আমার যথার্থ ই স্ত্রীরত্নভূতা। পূর্ব্বে বলিয়াছি স্ত্রী শব্দের অর্থ শক্তি। যত শক্তি আছে, তন্মধ্যে একমাত্র চিতিশক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার শক্তি প্রভৃতি সেই পরাশক্তিরই বিশেষ বিশেষ প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাই অম্বিকা মা আমার স্ত্রীরত্নস্বরূপা! জীব যতদিন এই আনন্দময়ী চিতিশক্তির সন্ধান না পায়, ততদিন কিছুতেই যথার্থ শান্তি লাভ করিতে পারে না। আজ কত লক্ষ লক্ষ জন্মের পর যখন ইহাঁর সন্ধান মিলিয়াছে, তখন যে কোনও প্রকারে ইহাঁকে আয়ত্ত করা আবশ্যক। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই শুম্ভ ইহাঁকে অঙ্কস্থা করিতে একান্ত প্রয়াসী। তাই বলিল—যেহেতু আমরাই রত্নাধিকারী, অতএব তুমি স্ত্রীরত্ন হইয়া কেন আমাদের অধিকারের বাহিরে থাকিবে? তাহা হইতেই পারে না; "অস্মানুপাগচ্ছ" আমাদের নিকটে এস, আমাদের আমিত্বের ভিতর দিয়াই তোমাকে পাইতে চাই। তুমি এস! আমার অপূর্ণ আমিকে পূর্ণ কর, একমাত্র তোমার অভাবই আমার এত ঐশ্বর্য্যময় আমিত্বকে অভাবগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। দেবি, তুমি স্বয়ং আসিয়া সে অভাব দূর কর, আমার অপূর্ণ আমি পূর্ণ হউক!

আমাদের উভয়ের মধ্যে তোমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই তুমি

ভজনা করিতে পার। আমাকে অথবা আমার ভ্রাতা উরুবিক্রম—প্রবলপরাক্রান্ত নিশুম্ভকে; যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তুমি আশ্রয় কর। তাহাতেই আমরা কৃতকৃত্য হইব। আত্মা তুমি—আমিত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হও, ক্ষতি নাই; নতুবা আমার আত্মারূপে প্রতিভাত হও, তাহাতেও ক্ষতি নাই। আমিত্বের মধ্য দিয়া ত তোমাকে ধরিতেই পারি না। আমি যে প্রতিবিম্বমাত্র! প্রতিবিম্ব হইয়া মূল বিম্বকে কিরূপে গ্রহণ করিব? তাই যদি একান্ত অসম্ভব হয়, তবে অগত্যা নিশুম্ভকে আশ্রয় কর, সেও প্রবল পরাক্রান্ত। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই নিশুম্ভের অর্থাৎ মমতার করতলগত। তুমি স্বয়ং আত্মা যদি নিশুম্ভের অর্থাৎ মমত্বের হও, তাহাতেও আমাদের পরম লাভ। মুখে সহস্রবার বলি বটে "আমার আত্মা," কিন্তু আত্মা তুমি কিছুতেই ত আমার হইলে না? যদি আত্মা আমার হইতে পারিত, তবে আমি আত্মাকে নিয়া যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা যে হয় না। আমার আত্মাকে ধরিতে গেলেই আমিটী হারাইয়া যায়—আমিও থাকে না, আমারও থাকে না। তাই তোমাকে পাই না। কিন্তু আর তাহা হইবে না; তোমাকে হয় আমিত্বের ভিতর দিয়া দেখিব, নচেৎ আমারবোধে একান্ত আত্মীয়বোধে তোমাকে ভোগ করিব। তুমি চঞ্চলাপাঙ্গী! তোমার ঐ চঞ্চল ভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে স্থিরভাবে ভজনা কর।

শুম্ভ ঠিকই বলিয়াছে—মা আমার চঞ্চলাপাঙ্গীই বটেন। চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে মা আমার অদৃশ্য হইয়া পড়েন। সে সৌম্য প্রকাশ; সে সর্ব্বতোভেদী প্রকাশ, সে বাক্য-মনের সম্পূর্ণ অগোচর প্রকাশ; ওগো, সে যে ক্ষণার্দ্ধ কাল মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়! ওগো, সে যে আমার সর্ব্বভাবহরা আমিত্ব-হরা মা! তাঁহাকে শরীর থাকিতে দীর্ঘকাল দেখিবার উপায় নাই, তাঁহাকে মন থাকিতে দীর্ঘকাল দেখিবার উপায় নাই। যদিও শরীর মন প্রভৃতি সর্ব্বভাবকে সম্পূর্ণবিলয় করিয়া তবে মা আমার প্রকাশিত হন, তথাপি ঐগুলির

বীজ থাকিয়া যায়। তাই চঞ্চলার স্থায়—বিদ্যুৎরেখার স্থায়, মায়ের অপাঙ্গ—নয়ন-প্রান্তভাগ উদ্ভাসিত হইতে না হইতেই মিলাইয়া যায়। সত্যই কি তাই? মা যে আমার নিত্য-স্থিরা নিত্য-প্রকাশ-স্বরূপা! তবে এত চঞ্চলতা কেন! ওগো! আমরা যে অতিশয় চঞ্চল, তাই মাকেও চঞ্চলারূপেই প্রতীয়মান হয়। আমি আমার আমিটাকে বড় ভালবাসি, উহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাই না; ভয় হয়, মা আসিলেই ত আমি থাকিবে না! তাই পলকের মধ্যে এক একবার মাকে দেখিয়া আবার বড় সাধের আমিটাকে জড়াইয়া ধরি। ওগো, মা-ই যে আমি, আমি বলিয়া যে আর কিছুই নাই, ইহা ঠিক ঠিক কবে বুঝিতে পারিব? মাগো, আমরা ত তোমাকে চাইবই না, আমরা ত তোমার সর্ব্বনাশক প্রকাশের সমীপে উপস্থিত হইবই না; তবু বল্‌ছি মা, তুমি দয়া করিয়া এস—প্রকাশিত হও! আমাদের আমিত্বভার বিদূরিত হউক!

সাধক, ঐ যে দেখিতে পাও—পর্ব্বত গহ্বরে দীর্ঘকালব্যাপী সমাধিতে অবস্থিত পুরুষ যোগাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; ভাবিও না—উনি অনবরতই মাকে দেখিতেছেন। ওরে, তাহা হয় না; অনবরত মাকে দেখিলে দেহ থাকে না; অল্পকাল মধ্যেই আত্মা দেহসম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া যায়। অনাত্মপ্রতীতি সম্যক্ বিলুপ্ত হইলে, দীর্ঘকাল দেহে অবস্থান একান্ত অসম্ভব। ঐ যে বিদ্যুতের রেখার মত দর্শন, উহাতেই জীব ধন্য হয়, জীবন্মুক্ত হয়, আনন্দময় হয়, ব্রহ্মস্বরূপ হয়। একবার সাক্ষাৎকার হইলে আর কখনও বিস্মৃতি আসে না; এবং ইচ্ছামাত্রেই আবার দর্শন করা যায়। আরে, এ যে আনন্দঘন জ্ঞান! ইহার বিস্মৃতি কিরূপে হইবে? আর কিই বা হারাইয়া যাইবে? সে যে আমি—সে যে আত্মা, মা আমার। তাঁকে আবার পাওয়া না পাওয়া, দেখা না দেখা কি? তবু কিন্তু দেখা চাই—তবু কিন্তু দেখিতে হয়, পাইতে হয়। উহাই ত যথার্থ চরিতার্থতা!

শুম্ভ আর একটী কথা মাকে বলিয়াছে—"ভজ ত্বং"—তুমি ভজনা কর। বড় সত্য কথা। কেবল শুম্ভই এরূপ কথা বলে নাই।

শ্রুতিও বলেন, "যমেবৈষ বৃণুতে" এই আত্মা যাহাকে বরণ করে, সে-ই আত্মাকে পায়। গীতা বলেন,—"তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" যে আমাকে যেরূপ ভাবে চায়, আমি তাহাকে সেইরূপ ভাবেই ভজনা করি। এইরূপে দেখিতে পাই—বেদ, গীতা ও চণ্ডী, তিনই সমান সুরে এক কথাই বলিয়াছেন। আত্মাই জীবকে ভজনা করে। কথাটা শুনিতে বিরুদ্ধ, বুঝিতে বিরুদ্ধ এবং বুঝাইতেও বিরুদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু উহাই যে একান্ত সত্য, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

সাধক! তুমি যে সাধন ভজনাদি করিয়া মাতৃলাভের দিকে অগ্রসর হইতেছ, বুঝিয়া লইও—উহা মায়ের সাধন ভজনেরই প্রতি-ধ্বনিমাত্র। মা তোমার ভজনা করেন, তাই তুমি ভজনা কর। মা, যখন তোমার ভজনা করেন, তখনই তোমার মধ্যে ভজনরূপ একটা বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। আত্মাই জীবকে ভজনা করে—চায়। তাই জীব আত্মাকে চাইবার ভাণ করে। এ কথাটা কিন্তু এই রুদ্র-গ্রন্থিভেদের অধিকারী পাঠকদের জন্যই বলা হইয়াছে। যাহারা মাকে একবারও দেখে নাই, তাহারা এ কথাটা নিয়া হয়ত কত বিরুদ্ধ-বাদই তুলিবে। তা হউক—কথাটা কিন্তু খুবই সত্য।

মা গো! যে যাহা ইচ্ছা বলুক, আমরা শুভ্তেরই মত শতবার বলি, সহস্রবার বলি—"ভজ ত্বং" তুমি আমাকে ভজনা কর,—তুমি আমাকে গ্রহণ কর। ওগো, তুমি আমাকে ভজনা করিলেই আমার মিথ্যা আমিটী হারাইয়া যাইবে। কিন্তু আমি যদি তোমাকে ভজনা করিতে যাই, তবে ঐটী থাকিয়া যায়। তাই প্রাণপণে বলি—মা তুমি আমায় নেও, তুমি আমায় নেও। আমি তোমার কাছে যাইতে পারিতেছি না, তুমি আমায় লইয়া চল।

ঋষিরাও বলিতেন—"আবিরাবির্ম এধি"। তুমি প্রকাশিত হও, তুমি আবির্ভূত হও, তুমি এস। মা গো, এইরূপ আবহমানকাল তুমিই জীবকে ভজনা করিয়া আসিয়াছ। তুমি যে মা! তুমি আমাদিগকে ভজনা করিবে না? তবে কি সন্তান মায়ের ভজনা

করিবে? মা গো, যে দিন হইতে তুমি আমি পৃথক্, সেই দিন হইতেই ত তুমি আমাকে ভজনা করিতেছ। আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি, তুমিই একটু একটু করিয়া জ্ঞানস্তন্যদ্বারা আমাকে ভজনা করিতেছ। এইবার এই ভজনার শেষ কর মা। আর কেন? কতকাল ধরিয়া সেবা করিতেছ, আদর করিতেছ, প্রতিপালন করিতেছ। এতদিনেও কি তোর সন্তান প্রতিপালনের সাধ মিটে নাই মা? এইবার একবার বুকে তুলিয়া লও মা! আমি তোমার ঐ নির্ম্মল বক্ষে এই ভেদজ্ঞানের সন্তপ্ত বুকখানা রাখিয়া শেষবারের মতন মা বলিয়া আত্মহারা হই, মাতা-পুত্র ভেদ চিরতরে তিরোহিত হউক! তুমি যেমন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তেমনই অদ্বিতীয় স্বরূপে বিরাজ কর।

শুম্ভ মাকে আর একটী কথা বলিয়াছে—"রত্নভূতাসি"। তুমি রত্নস্বরূপা। "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"। যাঁহাকে লাভ করিলে আর কোন রত্ন লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, চিরদিনের মত অভাবের কান্না বিদূরিত হয়, সেই রত্ন তুমি। তুমি স্বয়ং না আসিলে আমরা কিরূপে তোমাকে পাইব। যদিও কবি বলিয়াছেন—"ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ" রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না, রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে। তথাপি আমরা জানি—রত্ন স্বয়ংই মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয়। মনুষ্য কখনও অন্বেষণ করিয়া রত্ন পায় না। যদি অন্বেষণে রত্ন মিলিত, তবে সকলেই রত্নলাভে ধন্য হইত। কিন্তু তাহা হয় না, রত্ন যাহাকে অন্বেষণ করে, মাত্র সে-ই রত্নকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই কেবল শুম্ভ নয় মা, আমরাও কাতর প্রাণে বলিতেছি—"ভজত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি! রত্ন ভূতাসি বৈ যতঃ" তুমিই সাররত্ন, তাই তোমাকে ভজনা করিবার জন্য বলিতেছি। তুমি দয়া করিয়া এস, আমাদিগকে ভজনা কর, আমরা রত্নলাভে ধন্য হই।

পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ।
এতদ্‌বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ ॥৬৫॥

অনুবাদ। তুমি আমাকে পরিগ্রহ করিলে পরমৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে; সুতরাং এই বিষয়টী বুদ্ধিদ্বারা বেশ সমালোচনা করিয়া আমার পরিগৃহীতা হও।

ব্যাখ্যা। অস্মিতার ঐশ্বর্য্য বিপুল; যেহেতু সমগ্র বিশ্বই তাহাতে অবস্থিত। তাই দেবীকে ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখান হইতেছে। কিন্তু অসুর—অস্মিতা জানে না যে, মায়ের সত্তায়ই তাহার সত্তা। চিতি-শক্তিকে জগৎকর্তৃত্বের মধ্যে নিয়া আসিতে পারিলে, চিতিশক্তিরই যেন বিশেষ লাভ হইবে, ইহা ভাবিয়াই এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন। কিন্তু হায়! শুম্ভ জানে না যে, এ প্রলোভন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে। তাঁহাতে জগৎ বলিয়া কিছু নাই, ছিল না বা থাকিবে না। তিনি যদি আসেন অর্থাৎ প্রকাশিত হন, তবে নিমেষের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সত্তাহীন হইয়া পড়িবে। অথচ তিনিই—সেই অম্বিকা মাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্রী। যাক্ সে অন্য কথা—

শুম্ভ-দূত মাকে "বুদ্ধ্যা সমালোচ্য" বলিল। সমালোচনা ব্যাপারটী চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়াই সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে—"শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচন মাত্র মিষ্যতে বৃত্তিঃ" তথাপি এস্থলে সুগ্রীব অম্বিকাকে বুদ্ধিদ্বারা সমালোচনা করিতে বলিল। বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত মন এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নিষ্পন্নই হইতে পারে না। বিশুদ্ধবোধে সমালোচনা হয় না, বিশুদ্ধবোধস্বরূপিণী মাকে সমালোচনা করিতে হইলে বুদ্ধিক্ষেত্রেই অবতরণ করিতে হয়। দূতের এই বুদ্ধিশব্দ প্রয়োগের রহস্য একটী মন্ত্র পরেই প্রকটিত হইবে, তাই এস্থলে বিশেষ ভাবে বলা অনাবশ্যক।

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৬৬॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—দূত দেবীকে এইরূপ বলিলে সেই দেবী, যিনি দুর্গা ভগবতী ভদ্রা, যিনি এই জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি অন্তরে অন্তরে একটু হাসিয়া গম্ভীরভাবে সুমধুর স্বরে বলিলেন।

ব্যাখ্যা। দূতমুখে প্রেরিত শুম্ভের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অর্থাৎ শুম্ভের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মা একটু হাসিলেন। হেতু এই যে—শুম্ভ আমাকে চায় বটে ; কিন্তু সে জানে না যে আমাকে পাইলে, তাহার আর পৃথক্ সত্তাই থাকিবে না। আত্মা আমি-স্বরূপে প্রকাশিত হইলে, আর অস্মিতার অস্তিত্ব কোথায় ? এইরূপ শুম্ভের অভিপ্রায় ও তাহার পরিণাম দেখিয়াই যেন মায়ের এই মৃদু হাস্য।

এই মন্ত্রে মায়ের কয়েকটী নাম আছে ; দুর্গা—যিনি দুর্গম হইতে রক্ষা করেন। ভগবতী—ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী। ভদ্রা—মঙ্গলময়ী। এবং জগদ্ধাত্রী—যিনি জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে মা অচিরাৎ শুম্ভকে জীবত্বরূপ দুর্গা বা দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ করিয়া অনন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্য ভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন, যিনি নিত্যমঙ্গলস্বরূপা জগদ্‌বিধাত্রী চিতিশক্তি, যিনি শুম্ভের অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া কেবল জ্ঞানস্বরূপে প্রকটিত হইবেন, তিনিই শুম্ভের পূর্ব্বোক্তরূপ অভিপ্রায় জানিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

শুম্ভ যে নিজেকেই জগদ্ধারক বলিয়া মনে করে, সেই ভ্রম অচিরাৎ বিদূরিত হইবে। অস্মিতা ত আর যথার্থ জগদ্ধাত্রী নহে, জগদ্ধাত্রী স্বয়ং চিতিশক্তি মা। সাধক! এইখানে হয়ত আশঙ্কা উপস্থিত হইবে যে, চিতিশক্তি ত স্বরূপতঃ নির্গুণা, তিনি আবার জগদ্ধাত্রী কিরূপে হইবেন, আর নির্গুণের মৃদু হাস্যাদি লৌকিক ব্যবহারই বা কিরূপে সম্ভব হয় ?

তদুত্তরে বুঝিয়া লইবে—এ সমস্তই উপাধিকৃত অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে সমাহৃত যাবতীয় ভাব নির্গুণ চৈতন্যে আরোপিত হইয়াই নির্গুণেরও সগুণবৎ সর্ব্ব-ব্যবহার হইয়া থাকে। যেরূপ ঘট সঞ্চালিত হইলে, ঘটাকাশেরও সঞ্চালনরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে; ইহাও ঠিক সেইরূপই বুঝিতে হইবে।

"গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।" যিনি রোষ এবং তোষ, উভয়ত্র সমভাবে অবস্থান করিতে সমর্থা; তিনিই গম্ভীরা। মা আমার নিত্য নির্ব্বিকারা, কোন অবস্থায়ই তাঁহার বিন্দুমাত্র বিকার লক্ষিত হয় না, তাই তিনি গম্ভীরা। "অন্তঃস্মিতা" শব্দের অর্থ—অন্তরে অন্তরে একটু হাসিলেন। হাসির তাৎপর্য্য প্রথমেই বলা হইয়াছে। জগৌ "শব্দের" অর্থ গান করিলেন। অর্থাৎ মা শুম্ভ-দূতকে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা এত মধুর-কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, দূতের কর্ণে যেন সঙ্গীত-সুধা-বর্ষণ হইয়াছিল। সত্যই মায়ের বাণী এমনই মধুময়ী! যদিও শব্দহীন সে বাণী তবু সঙ্গীত স্বরবৎ অমৃত বর্ষিণী।

দেব্যুবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিত্ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ॥৬৭॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—(হে দূত) তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্য, মিথ্যা কিছুই বল নাই। শুম্ভ ত্রিলোকের অধিপতি, নিশুম্ভও তাদৃশই বটে।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রটীর অর্থ নানা প্রকার হইতে পারে, ক্রমে আমরা সেই সকল অর্থেরই আলোচনা করিব। মা অম্বিকা সুগ্রীবকে বলিলেন—শুম্ভ এবং নিশুম্ভ অর্থাৎ অস্মিতা এবং মমতা, উভয়ই ত্রিলোকের অধিপতি বলিয়া মনে করে, ইহা তুমি সত্যই বলিয়াছ; এ বিষয়ে মিথ্যা কিছুই বল নাই। অথবা হে দূত "ত্বয়া সত্যং ন উক্তং, অত্র

কিঞ্চিৎ মিথ্যা উদিতম্"। হে দূত! তুমি সত্য বল নাই, এখানে কিছু মিথ্যা বলিয়াছ; কারণ, শুম্ভ নিশুম্ভ ত আর বাস্তবিক ত্রিলোকাধিপতি নহে, অথচ ইতিপূর্ব্বে "ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ" বলিয়াছ। যথার্থ ত্রিলোকাধিপতি অস্মিতা নহে, আত্মা। আত্মসত্তায়ই ত্রিলোকের সত্তা। আত্মা না থাকিলে আর কোন কিছুরই সত্তা থাকিতে পারে না, সুতরাং মিথ্যাই বলা হইয়াছে। আর একপ্রকার অর্থ হইতে পারে। যথা— আত্মা আমিই শুম্ভ নিশুম্ভরূপে অস্মিতামমতারূপে ত্রিলোকাধিপতি; সুতরাং হে দূত! তোমার উক্তি সত্যই। তুমি কিছুই মিথ্যা বল নাই। যেহেতু শাস্ত্রে সকলই সত্যরূপে উক্ত হইয়াছে, মিথ্যা বলিয়া কোথাও কিছুই নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন—"যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে" এই যাহা কিছু প্রতীত হয়, সে সকলই সত্য বলিয়া কথিত হয়। সত্য মিথ্যা সর্ব্বত্র সৎস্বরূপ আত্মার অনুগম তুল্যরূপে থাকায় সকলই সত্য। প্রামাণিক উপনিষৎ সমূহে কিংবা ব্রহ্মসূত্রে কোথাও মিথ্যা এবং ভ্রান্তি এই দুইটী শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। স্বয়ং ভাষ্যকারও অনির্ব্বচনীয় অর্থেই মিথ্যা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আর মিথ্যাও সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র সৎস্বরূপ আত্মা ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই; সুতরাং সকলই সত্য। এতএব হে দূত—ত্বয়া সত্যং উক্তং, কিঞ্চিদপি মিথ্যা ন উক্তং।

কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥৬৮॥

অনুবাদ। কিন্তু এ বিষয়ে আমার যে একটী প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা কিরূপে মিথ্যা করা যায়? আমি অল্পবুদ্ধিবশতঃ পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা। ম বলিতেছেন—হে দূত! শুম্ভ নিশুম্ভ উভয়ই ত্রিলোকাধিপতি এবং সর্ব্বরত্ন ভোগে সমর্থ। সুতরাং তাঁহাদের

পরিগ্রহত্ব স্বীকার করাই আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু আমি পূর্ব্বে অল্পবুদ্ধি-বশতঃ একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

এস্থলে একটী আশঙ্কা হইতে পারে—মা কি তবে মিথ্যা কথা বলিলেন? যিনি স্বয়ং বুদ্ধিস্বরূপা, ইতিপূর্ব্বে দেবতাগণ যাঁহাকে "বুদ্ধি-রূপেণ সংস্থিতা" বলিয়াছেন, আবার পরেও যাঁহাকে "সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে" বলিয়া স্তব করা হইবে, তিনি আজ এখানে স্বয়ং বলিলেন—"অল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা।" ইহা কি মায়ের মিথ্যা কথা বলা হইল না? না, মিথ্যার লেশও ইহাতে নাই। সত্যই যাঁহার স্বরূপ, কোন অবস্থায়ই সত্যের অপলাপ নাই বলিয়াই যিনি নিরাবরণা দিগম্বরী, তাঁহাতে কোনরূপ মিথ্যার আরোপ বড়ই ব্যথাদায়ক। তবে কি? শুন বলিতেছি—আরে, বুদ্ধি নামক তত্ত্বটাই ত অল্প! শ্রুতিও বলেন আত্মার একদেশে—অতিঅল্পমাত্র স্থানেই জগৎ অর্থাৎ বুদ্ধি অবস্থিত। যে যাহার প্রকাশ্য, সে তাহার ব্যাপ্য হয়। আত্মা প্রকাশক—ব্যাপক, বুদ্ধি প্রকাশ্য—ব্যাপ্য; সুতরাং অল্প। বুদ্ধি চিরদিনই অল্প। আত্মার মায়ের আমার এই বুদ্ধিরূপে প্রকাশ পাওয়াই ত অল্প হওয়া। পূর্ব্বে আমরা অসৎ অনৃত অবিদ্যা অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দের নঞ্‌টী যে অল্পার্থক বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছি, এখানে দেখিতে পাই, মা স্বয়ংই সেই কথাটী বলিয়া দিলেন। আত্মা মা আমার যখন অল্প হইয়া—ঈষৎ হইয়া প্রকাশ পান, তখনই তাঁহার নাম হয় বুদ্ধি। তাই "অল্পবুদ্ধিত্বাৎ" কথাটীর মধ্যে বিন্দুমাত্রও মিথ্যার স্পর্শ নাই। আর এই প্রতিজ্ঞা-ব্যাপারটাও বুদ্ধিতেই হইয়া থাকে। "এক আমি বহু হইব" ইহাই মায়ের সর্ব্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা লইয়াই আত্মা মা আমার সর্ব্বপ্রথম মহতী বুদ্ধিরূপে অভিব্যক্ত হন। প্রতিজ্ঞা করিতে হইলেই মাকে অল্প হইতে হয়—বুদ্ধিরূপে প্রকাশ পাইতে হয়। আরে, বোধবস্তু স্বপ্রকাশ পূর্ণ, যখন তাহাতে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভাব প্রকাশ পায়, তখনই তিনি অল্প বা অপূর্ণ, তাই মা শুম্ভদূতকে বলিলেন—"শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা

কৃতা পুরা।" এইবার আমরা প্রতিজ্ঞার বিষয় আলোচনা করিব বড় সুন্দর! বড়ই বিস্ময়কর! শুন সাধক, মা কি বলিতেছেন ঃ—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলোলোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥৬৯॥

অনুবাদ। যে আমাকে সংগ্রামে জয় করিতে পারিবে, যে আমার দর্পনাশ করিতে পারিবে এবং যে আমার প্রতিবল অর্থাৎ সমবলসম্পন্ন হইবে, সেই আমার ভর্ত্তা হইবে।

ব্যাখ্যা। মায়ের প্রতিজ্ঞায় তিনটী কল্প আছে। প্রথম কল্প—সংগ্রাম জয়। সংগ্রাম অর্থে ইন্দ্রিয়-সংগ্রাম। ইন্দ্রিয়-বর্গ প্রতিনিয়ত রূপ রসাদি বিষয়সমূহকে জড় পদার্থরূপেই পরিগ্রহ করে। আনন্দময়ী চিতিশক্তিরূপিণী মা-ই যে রূপ রসাদি বিষয়াকারে ইন্দ্রিয়-পথে যাতায়াত করিতেছেন, ইহা সহস্রবার বুঝাইয়া দিলেও, ইন্দ্রিয়বর্গ পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ জড়রূপেই বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাই ইন্দ্রিয়-সংগ্রাম। জীব এই ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে নিত্যই পরাজিত। চৈতন্যময়ী মা আমার নিয়ত জড়ত্বের ভাণ করিয়া ইন্দ্রিয়রূপে বিষয়রূপে প্রকটিত হইয়া জীবকে পরাজিত করিতেছেন। বিষয় যে বিষয় নহে, আনন্দঘন সত্তাবিশেষ, ইন্দ্রিয় যে ইন্দ্রিয় নহে, আনন্দঘন শক্তিপ্রবাহবিশেষ; সাধারণ জীব ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারে না; তাই পরাজিত হয়। কিন্তু মা বলিলেন—যে আমাকে এই সংগ্রামে জয় করিতে পারিবে অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-পথে আমি—আত্মাই যে আনন্দঘন সত্তারূপে নিত্য বিরাজিত, ইহা যাহারা বুঝিতে—উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহারাই ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে।

দ্বিতীয় কল্প—দর্পনাশ। দর্প শব্দের অর্থ অহঙ্কার। আবার কামও দর্প শব্দের অর্থ হয়। কন্দর্প দর্প অনঙ্গ কাম পঞ্চশর এবং স্মর, ইহারা সমানার্থক শব্দ। কাম শব্দে বৃত্তিমাত্র না বুঝিয়া

কামনামাত্রই বুঝিতে হয়। সে যাহা হউক, মা বলিলেন—"যোমে দর্পং ব্যপোহতি" যে আমার দর্পনাশ করিতে পারিবে, অর্থাৎ আনন্দঘন আত্মা আমিই যে দর্পরূপে—অহঙ্কার অভিমান অস্মিতা মমতারূপে এবং কামাদি বৃত্তি অথবা কাম্য বস্তুরূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছি, ইহা যাহারা যথার্থ বুঝিতে উপলব্ধি করিতে পারিবে; অর্থাৎ আনন্দঘন আত্মা আমিই যে দর্পরূপ আবরণের দ্বারা প্রতিনিয়ত আমাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছি; যাহারা আমার এই দর্পরূপ আবরণ উন্মোচন করিতে পারিবে, মাত্র তাহারাই আমার দর্পনাশ করিতে সমর্থ হইবে। সহজ কথায় দর্পনাশ শব্দে অহঙ্কারনাশ এবং কামনার বিলয় বুঝিলেই হইবে।

তৃতীয় কল্প—সমান বল। মা বলিলেন, যে আমার সমানবল হইবে। মায়ের বল কি? একত্ব অবিক্রিয়ত্ব আনন্দময়ত্ব গুণাতীতত্ব নিরঞ্জনত্ব ইত্যাদি। যে জীব ঠিক এইরূপ একত্ব আনন্দময়ত্ব গুণাতীতত্ব প্রভৃতি বলসম্পন্ন হইবে, অর্থাৎ যে জীব স্বকীয় ব্রহ্মভাবটী ঠিক্ ঠিক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

"স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি" সে আমার ভর্ত্তা হইবে। পূর্ব্বোক্ত তিনটী কল্প যাহার পক্ষে সম্ভব, কেবল সেইমাত্র আমার ভর্ত্তা হইতে পারিবে। ভর্ত্তা—ভরণকর্ত্তা। ভৃ ধাতুর অর্থ ধারণ এবং পোষণ। পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মবোধকে সম্যক্ ধারণ এবং পোষণ করার নামই মায়ের ভর্ত্তা হওয়া। এইবার সমস্ত মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ বুঝিয়া লও। মা বলিলেন—যে ব্যক্তি বিষয়েন্দ্রিয়-সংস্পর্শে আনন্দময় আত্মাকেই গ্রহণ করিয়া থাকে, যাহার অহংবোধ এবং কামনা অর্থাৎ মমতাবোধ সম্যক্ তিরোহিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি স্বকীয় একত্ব ও আনন্দময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, মাত্র সেই আমার ভর্ত্তা হইতে পারিবে, অর্থাৎ সে-ই ব্রহ্মাত্মবোধের ধারণ ও পোষণ করিতে পারিবে। শ্রুতিও বলেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই সকল বাক্যের যাহা তাৎপর্য্য, তাহাই মায়ের এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের

মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে ব্রহ্মকে জানে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত কল্পত্রয় যাহার পক্ষে সম্ভব, সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। সংগ্রামজয়, দর্পনাশ এবং সমবল না হইলে মাতৃলাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। ইন্দ্রিয়পথে সমাহৃত বিষয়গুলিকে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইলেই, দর্প দূর হয়; অর্থাৎ "অহং কর্ত্তা, মম কর্ত্তব্যম্" ইত্যাকার ভাব বিদূরিত হয়। তখন আত্মার নিত্যত্ব অবিক্রিয়ত্ব একত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম উপলব্ধিযোগ্য হয়; সুতরাং সমবল হইয়া পড়ে। এইরূপ হইলেই আত্মা এবং ব্রহ্মের অভিন্নত্ব খ্যাতি হইয়া থাকে। তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিয়া সাধক যাবতীয় ভেদজ্ঞানের পরপারে উপনীত হয়। স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে।

অনেকে পূর্ব্বোক্ত তিনটী কল্পের বিকল্প মনে করেন। অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের অভাবে পরপর কল্প হইলেও ভর্ত্তা হইতে পারিবে। মন্ত্রে কিন্তু সেরূপ বিকল্পবোধক "বা অথবা কিংবা" প্রভৃতি কোন শব্দই নাই; সুতরাং কেন কল্পনা করিয়া বিকল্প স্বীকার করিতে যাইব? সমুচ্চয় অর্থ ই ভাল। কল্পত্রয়ের সমুচ্চয় হইলেই ভর্তৃত্ব লাভের যোগ্য হইবে, এইরূপ অর্থ ই আমরা বুঝিয়া লইব। কারণ, দেখা যায়—উহাদের মধ্যে প্রথমটী হইলেই পরপরটী আপনা হইতে আসিয়া থাকে, সংগ্রাম-জয় হইলেই দর্পনাশ হয়, দর্পনাশ হইলেই সমবল হইতে পারে, সমবল হইলেই আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য হয়।

এই মন্ত্রটীর অর্থ বুঝিতে গিয়া অনেকে অনেক রকম কথাই বলিয়া থাকেন। সে সকলের সবিস্তর উল্লেখ করিয়া আমরা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। কেহ বলেন—"স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি" কথার তাৎপর্য্য—প্রকৃতিজয়। কেহ বলেন—প্রথম কল্প অর্থাৎ সংগ্রামজয়দ্বারা কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় কল্প—দর্পনাশদ্বারা ভক্তিযোগ এবং তৃতীয় কল্প—প্রতিবল কথাটীদ্বারা জ্ঞানযোগ লক্ষিত হইয়াছে। এই সকল অর্থের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই। সকলেই

সত্য বলিয়াছেন; সুতরাং সকলই উপাদেয়। প্রকৃতিজয় এবং কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ব্যতীত যে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য।

তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্ণাতু মে লঘু ॥৭০॥

অনুবাদ। অতএব মহাসুর শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ অচিরে এখানে আসিয়া উপস্থিত হউন এবং আমাকে জয় করিয়া শীঘ্র আমার পাণিগ্রহণ করুন।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রটীতে উপনিষৎ প্রোক্ত "যমেবৈষবৃণুতে তেনৈবলভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং" এই অপূর্ব্ব বাক্যটীরই প্রতিধ্বনি আছে। যে ব্যক্তি আত্মাকে বরণ করে, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে এবং তাহার নিকটই ইনি—এই আত্মা স্বকীয় স্বরূপটী প্রকাশিত করিয়া থাকেন। কন্যা যেমন পতিকে বরণ করে, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি আত্মাকে বরণ করে, ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করে, সেই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভে ধন্য হয়। তাহার সহিতই আত্মার পরিণয় হয়। মা শুম্ভ-দূতকে বলিলেন—যদি শুম্ভ কিংবা নিশুম্ভ আমার প্রতিজ্ঞানুরূপ সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তবে শীঘ্র আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন। আদান-শক্তির নাম পাণি। তাহাদ্বারা পরিগ্রহ করাকে পাণিগ্রহণ বলে। আমাকে (অর্থাৎ আত্মাকে) গ্রহণ করিবার জন্য যে তীব্র ব্যাকুলতা, তাহাই এ স্থলে পাণি বা আদান-শক্তি শব্দের তাৎপর্য্য। শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ তীব্র ব্যাকুলতাদ্বারা আমাকে লাভ করুক। পাণিগ্রহণ শব্দের পরিণয়রূপ অর্থ করিলেও কিছু হানি নাই। আত্মার প্রতি একান্ত আসক্তি ব্যতীত আত্মার সহিত পরিণয় অর্থাৎ মিলন বা সাক্ষাৎকার হয় না। অস্মিতারূপী শুম্ভ চিতিশক্তিরূপী আত্মাকে লাভ করিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল বলিয়াই, নিজত্ব

বিসর্জ্জন দিয়া আত্মাকে পাইয়াছিল। আপনাকে হারাইয়া ফেলা এবং কেবল অভীষ্ট বস্তুরূপে থাকা, ইহাই আসক্তি বা ব্যাকুলতার চরম পরিণাম। আকুলতাই সাধনার প্রাণ, একমাত্র আকুলতা থাকিলে আর কিছু অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। তবে একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে—ব্যাকুলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা কিন্তু এক জিনিষ নহে। সব ছাড়িয়া আত্মলাভের জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটির নাম ব্যাকুলতা নহে; সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র। ব্যাকুলতা মানুষকে কর্ত্তব্যজ্ঞান-হীন করে না। সমস্ত কার্য্য, সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া প্রাণের গতি এক লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত হওয়াই ব্যাকুলতার যথার্থ স্বরূপ। কিন্তু সে অন্য কথা।

এখানে একটী গুহ্যতম রহস্যের অবতারণা করা হইবে, সাধকগণ অবহিত হইবেন। ভগবানের প্রতি এই ব্যাকুলতা যাহাতে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, দিন দিন যাহাতে ভগবৎপ্রেম উপচীয়মান হয়, তজ্জন্য এদেশের মনীষিগণ পঞ্চবিধ ভাবের সাহায্যে উপাসনা করিতেন। ঐ পঞ্চভাব—শাস্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য এবং মধুর নামে অভিহিত হয়। পিতা পুত্র কিংবা মাতা পুত্রভাবে ভগবদারাধনার নাম শাস্ত ভাব, প্রভু-ভৃত্যভাবে উপাসনার নাম দাস্য ভাব, পুত্র কন্যার প্রতি পিতা মাতার যে স্নেহ-ভাব, ঐরূপ ভাবে উপাসনার নাম বাৎসল্য ভাব, সখা অর্থাৎ বন্ধুভাবে উপাসনার নাম সখ্যভাব, এবং পত্নীভাবে উপাসনার নাম মধুর ভাব। পরকীয়াভাবে উপাসনা মধুর ভাবের চরম। শাস্তভাবের উপাসনার দৃষ্টান্ত স্থল—ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি; দাস্য-ভাবের—হনুমান্ গরুড় প্রভৃতি; বাৎসল্যভাবের—নন্দ যশোদা কৌশল্যা এবং মেনকা প্রভৃতি; সখ্যভাবের—রাখাল-বালক, অর্জ্জুন ও বিভীষণ প্রভৃতি; এবং মধুর ভাবের—রাধা ও অন্যান্য গোপীগণ। যে ভাবের মধ্যে ব্যাকুলতা যত বেশী, সেই ভাব তত শ্রেষ্ঠ। যদিও বৈষ্ণব শাস্ত্র পূর্ব্বপূর্ব্বগুলিকে "এহ বাহ্য আগে যাহ আর" বলিয়া একমাত্র মধুরভাবকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন, তথাপি যাঁহারা

যথার্থ প্রিয়তম পরম-প্রেমাস্পদ পরমাত্মার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা শান্ত দাস্য প্রভৃতি সর্ব্বভাবেই তাঁহার সহিত তুল্যভাবে যুক্ত হইতে পারেন এবং অতুলনীয় মিলনানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। কারণ, এমন কোনও বিশিষ্ট ভাব নাই যে, সেইটী ব্যতীত অন্য কোন ভাবের সাহায্যে আত্মার সমীপস্থ হওয়া যায় না। যিনি আত্মা, তিনি যে আমাদের সব গো, পিতা মাতা প্রভু সখা পুত্র কন্যা জায়া পতি, সবই যে তিনি; সুতরাং আত্মার সহিত আত্মীয়তা করিতে সকল ভাবই তুল্য।

বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধুরভাবের উপাসনা করিতে গিয়া ব্রজগোপীদিগের আদর্শ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পরমপুরুষ, আর সকলেই তাঁহার প্রকৃতি; সুতরাং নারী। এই ভাবে উপাসনা করিতে গিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ভগবানের প্রিয়তমা সখীরূপে ভাবনা করিয়া থাকেন। এমন কি, পুরুষ ভক্তগণও এই সখীভাবকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য কখনও কখনও স্ত্রীজাতির ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদ হাবভাব নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন। যদিও এই সকল ভাব অস্বাভাবিক বলিয়াই অনেকের মনে হইতে পারে; তথাপি উহা নিন্দনীয় নহে। এই ভারতে—এই ভাবুকের ও রসিকের দেশে, সর্ব্বভাবের উপাসক থাকাই দেশের মহত্ত্ব ও গৌরব। সে যাহা হউক, পরমাত্মাকে পতিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করা যেরূপ মধুরভাব, পরমাত্মাকে পত্নীরূপে উপাসনা করাও ঠিক সেইরূপই মধুর ভাব। কিন্তু এই ভাবটী বৈষ্ণবশাস্ত্র গ্রহণ করেন নাই। পুরুষ ভক্তদিগের পক্ষে এরূপ ভাবের উপাসনা পূর্ব্বোক্ত সখীভাব অপেক্ষা অনেক সহজ বলিয়া মনে হয়। কোন গ্রন্থই এই ভাবটী স্পষ্টভাবে লিখিতে প্রত্যক্ষতঃ সাহস করেন নাই। এই চণ্ডীতে শুম্ভের বাক্য হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন প্রাণতোষিণী প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রেও অনেক স্থানে এইরূপ ইঙ্গিতমাত্র আছে। জানি, এরূপ উপাসনাকে লক্ষ্য করিয়া অনেকে অনেক রকম আপত্তি ও দোষ প্রদর্শন

করিবেন। কিন্তু ইহা ঠিক যে, যিনি আত্মা, যিনি আমার আমি, যিনি আমার সর্ব্বস্ব, যিনি না থাকিলে আমির অস্তিত্বই থাকে না, তাঁহাতে সকল ভাবেরই আরোপ একান্ত সম্ভব। পুত্র কিংবা কন্যা বলিয়া আত্মাকে আদর করিতে গেলে যেরূপ তাঁহার গৌরবের কিছুই হানি হয় না, সখা বলিয়া, বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে যেরূপ আত্মার মহত্ত্ব খর্ব্ব হয় না, ঠিক এইরূপই পত্নী বলিয়া, প্রিয়তমা ভার্য্যা বলিয়া, সবটা প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে গেলেও তাঁহার বিন্দুমাত্র মহত্ত্বের অপলাপ হয় না। জগতে যে সকল মানুষ পত্নীগতপ্রাণ, পত্নীর সুখ সম্ভোগ বিধানই যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাহাদের সেই পত্নীপ্রেম যদি পরমাত্মায় অর্পিত হয়, তবে সেই সকল লোকের জীবন ধন্য হইয়া যাইতে পারে। এই মধুর ভাবের মধ্যে আবার পরকীয়া ভাব আরও স্বাভাবিক এবং শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ সকল অন্য কথা— আমরা ভাবাতীত স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছি, ভাবাতীত স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতেছি; সুতরাং এখন ভাবরাজ্যের বিষয় আলোচনা করিয়া পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন নিষ্প্রয়োজন।

মা বলিলেন—আমার পাণিগ্রহণ করিতে হইলে, "মাং জিত্বা" আমাকে জয় করিতে হইবে; অর্থাৎ আমি যেরূপ একা অদ্বিতীয়া নির্ব্বিকারা সর্ব্বভাবাতীতা, যে আমাকে পরিগ্রহ করিতে চায়, তাহাকেও ঠিক সেইরূপ ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইতে হইবে। "মাং জিত্বা" শব্দের আর একটী রহস্য আছে—আমিত্বকে নির্জ্জিত করিয়া আত্মাকে লাভ করিতে হয়। "আমি" যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আত্মার প্রকাশ হয় না—হইতে পারে না।

জানি মা, তোমায় পাইতে হইলে ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে তোমাকে জয় করিতে হইবে—ইন্দ্রিয়-পথে স্থূলে তোমাকেই ধরিতে হইবে, তোমার সর্ব্বময় অক্ষুণ্ণ-কর্ত্তৃত্ব দেখিয়া আমার অহংকর্তৃত্বরূপ দর্প বিনাশ করিতে হইবে, তারপর বলবান হইয়া অর্থাৎ তোমার তুল্যবল প্রাপ্ত হইয়া একত্ব অবিক্রিয়ত্ব প্রভৃতির উপলব্ধি করিয়া, তবে তোমার সমীপে উপস্থিত

হইতে হইবে। এইরূপ হইতে পরিলেই তোমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারিব—আমি তোমাতে আত্মহারা হইয়া যাইব—আমার আমিত্ব চিরতরে বিলয় প্রাপ্ত হইবে। তখন একমাত্র তুমিই অদ্বিতীয় স্বরূপে বিরাজ করিবে। তাই ত পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি—আমাদের মুক্তির কোনই প্রয়োজন ছিল না, যদি মুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে প্রাণ দিয়া তোমাকে ভালবাসিতে পারিতাম। যাঁহারা বলেন—মুক্তি চাই না, ভক্তিই একমাত্র প্রার্থনীয়; হায়, তাঁহারা জানেন না যে, মুক্তিলাভ হওয়ার পূর্ব্বে যথার্থ ভক্তি হইতেই পারে না। বদ্ধ জীব মুক্ত আত্মাকে কতটা ভক্তি করিতে পারে? অসমানধর্ম্মে প্রেম হয় কি? বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকিতে প্রেম হয় না, হইতে পারে না। অনন্যভক্তিই জীবের একমাত্র প্রার্থনীয়। ভেদজ্ঞানে যে ভক্তি হয়, উহা ভক্তির সাধন মাত্র। কিন্তু সে অন্য কথা—

দূত উবাচ।

অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ। দূত বলিল—দেবি! তুমি এরূপ অহঙ্কার করিও না আমার নিকট বল দেখি, এই ত্রিলোকমধ্যে এমন কে আছে, যে শুম্ভ নিশুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে?

ব্যাখ্যা। শুম্ভ-দূত সুগ্রীব ইতি পূর্ব্বে নানারূপ প্রলোভন বাক্য বলিয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হওয়ায় এইবার ভয়প্রদর্শন আরম্ভ করিল। শুম্ভের বলবীর্য্য বিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি এই অম্বিকা দেবী তাহার অঙ্কস্থা হন, তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, দূতের মনোভাব এইরূপই বটে; সে যাহা হউক, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা যায়—অস্মিতার সম্মুখে যাহা কিছু প্রতিভাত, সে সকল অস্মিতারই বিশেষ বিশেষ ব্যূহরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বহুভাবকে অস্মিতা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু

বলিয়া মনে হয় না ; সুতরাং শুম্ভ নিশুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, এরূপ পৃথক্ পুরুষ আর কে থাকিবে ? পুরুষ ত পরমাত্মার নাম। দেহরূপ পুরে শয়ন করেন বলিয়া তাঁহার নাম পুরুষ। অস্মিতা আপনাকেই স্বপ্রকাশ বলিয়া মনে করে ; সুতরাং অপর কোনও প্রকাশক পুরুষ আসিয়া তাহার সম্মুখে যে দাঁড়াইতে পারে, ইহা কিছুতেই সে মনে করিতে চায় না। দূত-বাক্যের মধ্য দিয়া এই রহস্যটীই প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে যখন কোন পুরুষই শুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না, তখন তুমি স্ত্রীমূর্ত্তি হইয়া কি অবলেপ কি গর্ব্ব করিতেছ— শুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিবে ? আশ্চর্য্য বটে ! (ত্রৈলোক্য শব্দটীর অর্থ ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে।)

অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্ব্বে দেবা ন বৈ যুধি।
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা ॥ ৭২ ॥
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রয়াস্যসি সম্মুখম্ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ। দেবতাগণ অন্যান্য দৈত্যবৃন্দের সম্মুখেই যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতে পারে না ; এতএব হে দেবি ! একাকিনী তুমি আর কি যুদ্ধ করিবে ? ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ সংগ্রামক্ষেত্রে যাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারে না, সেই শুম্ভ প্রভৃতি মহাসুরগণের সম্মুখে তুমি নারী হইয়া কিরূপে যুদ্ধার্থ গমন করিবে ?

ব্যাখ্যা। অন্যান্য দৈত্যগণের অর্থাৎ ধূম্রলোচন চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ প্রভৃতি শুম্ভের অনুচরবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতেই যখন দেবতাগণ অক্ষম, তখন তুমি অসহায়া অদ্বিতীয়া একাকিনী নারী স্বয়ং শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে ? (ধূম্রলোচন প্রভৃতির স্বরূপ পরে যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে)।

ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ কেন যে শুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না, তাহা ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞভাগ-গ্রহণ ব্যাখ্যায় বিশেষরূপে বলা হইয়াছে; পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এখানে এইমাত্র বুঝিয়া রাখিলেই চলিবে যে, দেবতাবর্গ অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহরূপে প্রতিভাত হয় বলিয়াই তাহাদের চৈতন্যাংশ তিরস্কৃত অর্থাৎ আবৃত থাকে। দেবতাগণ স্ব স্ব বিশিষ্টচৈতন্যাংশ লইয়া দাঁড়াইতে গেলেই অস্মিতার অংশরূপে প্রতিভাত হইয়া পড়ে, কাজেই তাহারা শুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। সাধক! একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিও—দূতবাক্যের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে কিন্তু যুদ্ধ কথাটাই নাই, শুধু সম্মুখে অবস্থানের কথা আছে। দেবতাগণ শুম্ভের সম্মুখে আসিলেই স্ব স্ব বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলে, এমনই শুম্ভের প্রভাব। তারপর তৃতীয়মন্ত্রে যুদ্ধের কথাও আছে—"তস্থূর্যেষাং ন সংযুগে" ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেও সর্ব্বথা নির্জ্জিত হইয়া পড়ে। দেবতাবর্গেরই যখন এরূপ অবস্থা, তখন নারীমূর্ত্তি কিরূপে শুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইবে?

শুম্ভদূত সুগ্রীব (বাচনিক জ্ঞান) সর্ব্বদাই দেখিতে পায় যে, সর্ব্ব বলিয়া, বিশ্ব বলিয়া, দেবতা বলিয়া যাহা কিছু বিশিষ্টসত্তা লইয়া প্রকাশ পায়, সে সকলই অস্মিতার স্ফুরণরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অস্মিতা হইতে পৃথক্‌রূপে কোন কিছুর সত্তাই প্রতীত হয় না। কেবল এই নারীমূর্ত্তিটী অর্থাৎ চিতিশক্তিকেই অস্মিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে দেখা যাইতেছে; যদি কোন প্রকারে ইহাকে শুম্ভের সমীপে লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ইনিও নিশ্চয়ই তাহারই পরিগ্রহযোগ্যা হইবেন। কিন্তু হায়! দূত জানে না যে, তাহার এই ভয় প্রদর্শনও ব্যর্থ হইবে ঐ নারীমূর্ত্তিটীকে পরিগ্রহ করিতে হইলে শুম্ভের শুম্ভত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ক্রমে আমরা ইহাই দেখিতে পাইব।

সা ত্বং গচ্ছ ময়েবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
কেশাকর্ষণনির্দ্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥৭৪॥

অনুবাদ। অতএব তুমি আমার কথা অনুসারে শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকটে চল। কেশাকর্ষণে বিলুপ্তগৌরবা হইয়া সেখানে যাওয়া ভাল নয়।

ব্যাখ্যা। ইহাই দূতবাক্যের উপসংহার। দূত শেষ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিল—যদি স্বেচ্ছায় শুম্ভ নিশুম্ভের পার্শ্ববর্ত্তিনী না হও, তবে কেশাকর্ষণের দ্বারা তোমার গৌরব বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে অর্থাৎ বলপ্রয়োগে তোমাকে শুম্ভের সমীপে উপস্থিত করা হইবে। এই ত গেল স্থূল কথা। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমরা এখানে কি দেখিতে পাই ?

প্রথমতঃ কেশাকর্ষণ শব্দটির অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে। (ক+অ+ঈশ=কেশ) ক শব্দের অর্থ ব্রহ্মা আকারের অর্থ বিষ্ণু এবং ঈশ শব্দের অর্থ মহেশ্বর। এইরূপ একাক্ষরকোষ অভিধান অনুসারে অর্থ করিয়া এই যে একটা কষ্ট কল্পনা করা, ইহা শুধু আমাদেরই উদ্ভাবিত নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণই ইহার পথ প্রদর্শক। কালীর ধ্যানে "মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং" পদের অর্থ করিতে গিয়া কোন প্রাচীন প্রসিদ্ধ টীকাকার বলিয়াছেন, "মুক্তাঃ কেশাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ যয়া সা মুক্তকেশী" যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও মুক্তি দেন, তিনিই মুক্তকেশী। এই চণ্ডীর টীকা তত্ত্বপ্রকাশিকাও এই স্থানে কেশ শব্দের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপ অর্থ করিয়াছেন।

যাহা হউক, ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয় অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিত্যাদি শক্তি-ত্রয়ই মায়ের কেশ শব্দের অর্থ। এই তিন শক্তিকে আকর্ষণ করিতে পারিলেই চিতিশক্তি হীনবল হইয়া পড়িবে, তখন তাঁহার মহত্ত্ব বিলুপ্ত হইবে ; সুতরাং বিনষ্টগৌরবা হইয়া পড়িবে। দূত এইরূপ চিন্তা করিয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। সে ভাবিয়াছে—

আত্মার ঐ জগজ্জন্মস্থিত্যাদি ব্যাপার যদি আকর্ষণ করিয়া লওয়া যায়, অর্থাৎ অস্মিতাই যদি জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় করিতে সমর্থ হয়, তখন আর চিতিশক্তির শক্তিত্বই থাকিবে না। সেই অবস্থায় উহাকে গ্রহণ করা সহজসাধ্য হইবে। কিন্তু হায়! দূত জানে না যে, মায়ের কেশকে—মায়ের সৃষ্ট্যাদি শক্তিকে কেহই আকর্ষণ করিতে পারে না। যত বড় শক্তিমান্ সাধকই হউক, মায়ের কেশাকর্ষণ করিবার শক্তি কাহারও নাই; তাই ভগবান্ ব্যাসদেব বেদান্তদর্শনে "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" বলিয়া একটী বিশেষ সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্ত পুরুষদিগের অন্য সমস্ত ক্ষমতাই হইতে পারে, কেবল জগদ্-ব্যাপারে তাহাদের কোন হাত নাই। অর্থাৎ সমগ্র জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কর্তৃত্ব এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কাহারও হইতে পারে না। মুক্ত পুরুষগণ ইচ্ছা করিলে, এই জগতের মধ্যে থাকিয়া উহার উপর আংশিক আধিপত্য করিতে পারেন মাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্তৃত্ব তাঁহাদের কোন অবস্থায়ই হয় না। সুতরাং মায়ের কেশাকর্ষণ সর্ব্বথা অসম্ভব, উহা করিতে গেলে স্বয়ং বিলুপ্ত হইতে হয়। ব্যবহারিক জগতেও দেখা যায় নারীর মর্য্যাদা নষ্ট করিতে গেলে স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়। সে যাহা হউক, শুম্ভ যে অম্বিকার পাণিগ্রহণ করিতে চায়, সে শুধু এই জগদ্ব্যাপারের জন্যই। শুন, খুলিয়া বলিতেছি—আস্মিতায় উপনীত সাধক আপনাকেই জগতের ঈশ্বররূপে দেখিতে পায়, ব্যষ্টি পদার্থসমূহের উপর কথঞ্চিৎ আধিপত্যও করিতে পারে; অল্পাধিক ঈশ্বরধর্ম্মও প্রকাশ পায়, ইচ্ছার অনভিঘাতও হইতে থাকে বটে, কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের উপর হাত দিতে পারে না; তাই বাধ্য হইয়া চিতিশক্তির—পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়। যেখান হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, যদি তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে হয় ত জগদ্ব্যাপারের উপরেও আধিপত্য আসিবে! শুম্ভের আশা ঠিক এইরূপই; তাই অম্বিকাকে গ্রহণ করিবার জন্য তাহার এত আয়োজন।

জীব মাতে ঐ ভ্রান্তির দ্রষ্টৃত্ব আরোপ করে; সুতরাং সত্যস্বরূপ চিন্ময় আনন্দময় হইয়াও যে ভ্রান্তির দ্রষ্টা হইতে হইবে, ইহা ত আর পূর্ব্বে কল্পনা করা হয় নাই; তাই মন্ত্রে অনালোচনার কথা বলা হইয়াছে। আর একটী দিক দিয়া দেখা যায়—আলোচনা ইন্দ্রিয় ধর্ম্মমাত্র, মা আমার অতীন্দ্রিয়া সুতরাং পুরা অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে মা যথার্থই "অনালোচিতা" আলোচনার অতীত স্বরূপেই বিরাজ করেন।

দেবী আর একটী কথা বলিলেন—অসুররাজের নিকট আমার কথাগুলি উপেক্ষার ভাবে বলিও না. বেশ আদরপূর্ব্বক বলিও। আমি যেমন বলিয়াছি, ঠিক তেমনই বলিও। আমি ত শুম্ভের বীর্য্যবত্তায় সংশয় অথবা তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করি নাই। সে যে আমারই প্রতিবিম্ব, তার উপর আমার স্নেহ দয়া ব্যতীত কখনও ক্রোধ বা অবজ্ঞা নাই—থাকিতে পারে না।

শুম্ভকে এ স্থলে অসুরেন্দ্র বলা হইয়াছে। যাবতীয় সুর-বিরোধী ভাবের অনাত্মভাবের ইনিই একমাত্র অধিপতি। সংস্কাররূপ বীজসমূহের অস্মিতাই একমাত্র অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, তাই ইহাকে অসুরেন্দ্র বলিতে হয়।

সাধক! এ তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে কি? যদি সত্য ও প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক, যদি বুদ্ধিতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাক, যদি সেই নির্ম্মল ধীক্ষেত্রে ক্ষণকালের জন্যও অবস্থান করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই তোমার আত্মবোধ অস্মিতায় উপনীত হইয়াছে। সর্ব্বভাবের সহিত একান্ত অন্বিত, অথচ সর্ব্বভাব হইতে একান্ত পৃথক্ ঐ যে তোমার আমিত্ব, তাহাই আত্মরূপে প্রতীত হইতেছে, বাস্তবিক উনিও আত্মা নহেন—আত্মপ্রতিবিম্বমাত্র। এই অস্মিতাও যথার্থ আত্মস্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে। এখানে আসিয়া তুমি আত্মবিভূতি দর্শনে মুগ্ধ হইও না, স্বীয় ঈশ্বরত্বের আভাস পাইয়া ইহাকেই তোমার চরম নিকেতন বলিয়া বুঝিয়া লইও না। ওগো! যাহার প্রতিবিম্বমাত্র পাইয়া তুমি আপনাকে এত উন্নত ও মহান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ, একবার সেই বিম্বের দিকে পরমাত্মার

দিকে আনন্দময়ী চিতিশক্তিরূপিণী মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর, প্রবল অধ্যবসায়ে অগ্রসর হও, ইহাও অসুর-ভাব বলিয়া তুচ্ছ করিতে অভ্যাস কর। মনে রাখিও—যতদিন বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকিবে, ততদিন কিছুতেই অমৃতলাভ করিতে পারিবে না—যথার্থ আনন্দের সন্ধান পাইবে না। যেরূপ প্রবল আগ্রহ নিয়া স্থূল জড় পদার্থকে মা বলিয়া বুঝিয়াছিলে, সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে, যেরূপ অভাবের তীব্র যাতনা বুকে করিয়া সাধনারাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলে, ঠিক সেইরূপ প্রবল আগ্রহ ও তীব্র অভাব বোধ বুকে করিয়া "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" আনন্দময় তত্ত্বেরদিকে লক্ষ্য রাখ; তুমি অমৃতলাভে ধন্য হইবে; জন্মমৃত্যুর সংস্কার চিরতরে বিদূরিত হইয়া যাইবে। শুধু কাতরপ্রাণে বলিতে থাক—মা! কতদিনে তুমি এই প্রবল প্রারব্ধ-সংস্কাররূপ অসুরকুলকে নিহত করিয়া নির্ম্মল চিন্মাত্র আনন্দময় স্বরূপে প্রকটিত হইবে। কোন্ অনাদি কাল হইতে এই জীবত্বের বোঝা বহন করিয়া আসিতেছি, ভ্রান্তি মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া কতকাল কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তোমারই আশায় ছুটিতেছি, তোমাকে পাইব, তোমার স্বপ্রকাশ নয়নে আমার বিশিষ্ট প্রকাশরূপ মলিন দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া শেষবারের মত মা বলিয়া আত্মহারা হইব, এই আশায় তোমারই মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া আছি। এস মা! অসুর অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমাকে নির্ম্মল বোধমাত্রস্বরূপে উপনীত কর। যেখানে মাতা পুত্র বলিয়া কোন ভেদ নাই, তোমার সেই ভাবাতীত ত্রিগুণরহিত স্বরূপটী উদ্ভাসিত কর, আমি ধন্য হই। সাধক! এমনই করিয়া কাঁদ। কাঁদিতে পারিলেই মায়ের কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবে। কৃপার উপলব্ধি হইলে শুম্ভ নিশুম্ভ অসুর বিনষ্ট হইতে আর বিলম্ব থাকিবে না।

এই অধ্যায়ে এই দেবী দূত সংবাদের মধ্য দিয়া আমরা আর একটী রহস্যের সন্ধান পাই—প্রথমে চণ্ডমুণ্ড অম্বিকা-পরিগ্রহের জন্য শুম্ভকে নানারূপে উৎসাহিত করিয়াছিল। তারপর শুম্ভের প্ররোচনায় দেবীকে শুম্ভের অঙ্কস্থা করিবার জন্য নানারূপ প্রলোভন ও পরে ভয়

প্রদর্শন করিয়াছিল। আমাদের যাবতীয় বিধিশাস্ত্রসমূহও ঠিক এইরূপ রোচক ও ভয়ানক বাক্যদ্বারা পরিপূর্ণ। "যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হইবে," "হিংসা করিলে নরকে যাইতে হইবে," ইত্যাদিরূপ রোচক ও ভয়ানক বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, বহির্মুখ জীবসমূহকে আত্মাভিমুখ করিয়া ক্রমে স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া। শাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধ পালনে সাধারণতঃ অপ্রবৃত্ত জীবসমূহ ঐ সকল রোচক ও ভয়ানক বাক্যের প্রভাবেই বিধিনিষেধ পালনে প্রবৃত্ত হয়; তাহার ফলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে। অবশেষে অদ্বয়ানন্দস্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকারে ধন্য হয়। তখন যাবতীয় বিধিনিষেধের পরপারে চলিয়া যায়।

ইতি সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় দেবীদূত সংবাদ।

সাধন-সমর

বা

দেবী-মাহাত্ম্য।

রুদ্রগ্রন্থি ভেদ।

ধূম্রলোচন বধ।

ঋষিরুবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥১॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণে সেই দূত ক্রোধান্বিত হইয়া দৈত্যরাজের নিকট আগমনপূর্ব্বক সবিস্তর বর্ণনা করিল।

ব্যাখ্যা। বাচনিক-জ্ঞান, বাচনিক-প্রার্থনা নিষ্ফল হইল। চিতিশক্তি বিনা যুদ্ধে অস্মিতার আয়ত্তী-ভূতা হইলেন না। দূত আসিয়া শুম্ভকে দেবীর প্রতিজ্ঞা শুনাইল—"যে তাঁহাকে সংগ্রামে জয় করিতে পারিবে, যে তাঁহার দর্পনাশ করিতে পারিবে এবং যে তাঁহার তুল্যবলসম্পন্ন হইতে পারিবে, দেবী মাত্র তাঁহারই পরিগ্রহযোগ্যা হইবেন।"

এই মন্ত্রে দূতকে 'অমর্ষপূরিত' বলা হইয়াছে। দেবীর পূর্ব্বোক্ত-রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়া শুম্ভদূত সুগ্রীব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; হইবারই কথা। বাচনিক-জ্ঞান কখনও আত্মলাভে সমর্থ হয় না। আজকাল অনেক স্থানেই আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব জগত্তত্ত্ব বিষয়ক দার্শনিক আলোচনা হইয়া থাকে, ঐ সকল মৌখিক আলোচনাদ্বারা

কখনও আত্মলাভ হয় না। অনেকে মনে করেন "আমি ব্রহ্ম" এইটী মৌখিক আলোচনায় তর্কে বিচারে বুঝিয়া লইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হইল। বাস্তবিক তাহা হয় না। ঐরূপ জ্ঞান জ্ঞানই নয়—উহা জ্ঞানাভাসমাত্র। জ্ঞান যতক্ষণ অনুভূতিময় না হয়, ততক্ষণ উহা জ্ঞানপদবাচ্যই হয় না। আত্মা স্বয়ং অনুভবস্বরূপ; তাঁহাকে লাভ করা হইল, অথচ বিন্দুমাত্র অনুভূতি আসিল না, ইহা একান্ত অসম্ভব কথা। আরে, তোমরা সুখ দুঃখ শোক শীত গ্রীষ্ম এইগুলিকে জান ত? ঐ জানা মানেই অনুভব করা। তুমি সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্মকে জানিলে অর্থাৎ অনুভব করিলে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐগুলি তোমার অনুভব-পর্য্যন্ত না পৌঁছায়, ততক্ষণ তুমি সহস্রবার ঐ সকল শব্দ উচ্চারণ করিলেও উহাদের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পার না। জাগতিক পদার্থ সম্বন্ধেই যখন এইরূপ, তখন যে আত্মা কেবল অনুভবানন্দস্বরূপ, তাঁহাকে শুধু মৌখিক জ্ঞান-আলোচনায় কিরূপে লাভ করিবে? জল জল বলিয়া সহস্রবার চীৎকার করিলে পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। শুম্ভের দূত সুগ্রীবের বিফলমনোরথ হওয়া এবং ক্রোধান্ধ হইয়া দেবীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসার ইহাই আধ্যাত্মিক রহস্য।

তস্য দূতস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্ ॥২॥
হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
তামানয় বলাদ্ দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥৩॥

অনুবাদ। অনন্তর দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুররাজ ক্রোধান্বিত হইয়া বহু অসুরসৈন্যের অধিপতি ধূম্রলোচন নামক অসুরকে বলিল, হে ধূম্রলোচন! তুমি শীঘ্র স্বকীয় সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হইয়া বলপ্রয়োগপূর্ব্বক সেই দুষ্টা রমণীকে কেশাকর্ষণে বিহ্বল করিয়া এখানে আনয়ন কর।

ব্যাখ্যা। শুম্ভের প্রথম সেনাপতি ধূম্রলোচন। শুম্ভ তাহাকেই

সর্ব্বাগ্রে বলপ্রয়োগপূর্ব্বক দেবীকে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিল। ধূম্রলোচন ধূমাচ্ছন্ন-দৃষ্টি অর্থাৎ বিপর্য্যয়জ্ঞান। যে বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা না জানিয়া অন্যথা-প্রতীতির নাম বিপর্য্যয়-জ্ঞান। দার্শনিকগণ ইহাকেই ভ্রান্তি বলিয়া থাকেন। এই ভ্রান্তি বা বিপর্য্যয়-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই অস্মিতার ত্রিলোকাধিপত্য। মায়ের—আত্মার যাহা যথার্থস্বরূপ, তাহা না বুঝিয়া আমিত্বকেই আত্মারূপে প্রতীতি হওয়ার কারণ—এই বিপর্য্যয়-জ্ঞান। কথাটী আর একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক—প্রথমে ধর আত্মা; উহা বুদ্ধির প্রতিসম্বেদি-বস্তু। প্রতি-সম্বেদন অর্থ প্রতিবিম্বিত হওয়া। মনে কর একখানা দর্পণ, উহাতে আলো প্রতিবিম্বিত হইয়া, যে স্থান হইতে আলো আসিতেছে আবার সেইস্থানে ফিরিয়া যায়। ঠিক এইরূপ আত্মা বুদ্ধিরূপদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া আবার আত্মাভিমুখে ফিরিয়া যায়। বুদ্ধিতে আত্মপ্রতিবিম্ব পড়ামাত্রই আমিত্ববোধ ফুটিয়া উঠে। তারপর ঐ আমিত্ববোধের যাহা কেন্দ্র অর্থাৎ যেখান হইতে বিম্ব আসিয়া বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হওয়ায় আমিত্ববোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রতিবিম্বটী সেই কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হয়। এইরূপ প্রতিক্ষণে আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইতেছে; এই যে প্রতি-ফলন ইহারই নাম প্রতিসম্বেদন। এই প্রতিসম্বেদনের যে কেন্দ্র তাহাই আত্মা। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মার নাম অস্মিতা। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অস্মিতা আত্মার অত্যন্ত-বিভিন্নস্বরূপ না হইলেও, যথার্থ আত্মস্বরূপ নহে। সাধককে কিন্তু ঐ প্রতিসম্বেদন ধরিয়াই আত্মাকে বুঝিতে হয়। প্রতিসম্বেদন অবলম্বনে প্রতিসম্বেদীকে ধরিতে হয়। সে যাহা হউক, সাধকগণ যখন গুরুকৃপায় অস্মিতায় আসিয়া উপনীত হয়, তখন কিছুদিন ঐ কেন্দ্রকে অর্থাৎ বুদ্ধির প্রতিসম্বেদি বস্তুস্বরূপ আত্মাকে কিছুতেই ধরিতে পারে না। মহাসুর শুম্ভ এখান হইতেই সাধকের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়—অস্মিতার বা শুম্ভের অনুচর ঐ বিপর্য্যয়জ্ঞানরূপী ধূম্রলোচন। যে বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ নহে, তাহাকে তৎস্বরূপে গ্রহণ করানই ধূম্রলোচনের কার্য্য। বিপর্য্যয়-জ্ঞানই অস্মিতাকে আত্মারূপে

প্রতীত করায়। প্রথমে যেরূপ স্থূলদেহকেই আমি বলিয়া প্রতীতি হইত, এখানেও সেইরূপ অস্মিতাকে আমি বলিয়া প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ কিন্তু অস্মিতা আমি নহে, আমির প্রতিবিম্বমাত্র। তবে এখানে উহাকে প্রতি-বিম্ব বলিয়া ধরা একটু কঠিন ; কারণ, বুদ্ধিতত্ত্ব এতই স্বচ্ছ যে, উহাকে প্রতিবিম্ব বলিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায় না। যেরূপ অতি স্বচ্ছ দর্পণের ভিতর দিয়া আলো আসিলে প্রথমদৃষ্টিতে সে দর্পণটা ধরাই যায় না, ঠিক সেইরূপ অস্মিতায় আসিয়া, যে আমিকে দেখা যায়, তাহাও যে যথার্থ আমি নহে, আমির প্রতিবিম্বমাত্র, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। যাহার প্রভাবে এইরূপ হয়, তাহারই নাম ধূম্রলোচন বা ধূমাচ্ছন্ন-দৃষ্টি। অবিদ্যারূপ উপনেত্র চক্ষুতে পরান থাকিলে আত্মপ্রতিবিম্বকেই আত্মা বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে। এই কথাটী বেশ ভালরূপে বুঝিয়া রাখিতে না পারিলে, সাধকের পক্ষে এই উত্তমচরিত্রে প্রবেশ করা বড়ই কঠিন হইবে।

যাহা হউক, এই ধূম্রলোচন বা বিপর্য্যয়-জ্ঞানকেই প্রথমে মায়ের নিকট প্রেরণ করা হইল। উদ্দেশ্য কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দেবীকে আনয়ন। কেশাকর্ষণ শব্দের অর্থ ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। জগতের সৃষ্টি স্থিত্যাদি ব্যাপারের যে কর্ত্তৃত্ব বা শক্তি, তাহাকে আকর্ষণ অর্থাৎ গ্রহণ করিতে পারিলেই চিতি-শক্তিরূপিণী দেবী অম্বিকা বিহ্বলা—অবশা অর্থাৎ শক্তিহীনা হইয়া পড়িবেন। এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াই মহাসুর শুম্ভ ধূম্রলোচনকে দেবীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল।

তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্ যদি বোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ।
স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষোগন্ধর্ব্ব এব বা ॥৪॥

অনুবাদ। যদি কেহ তাহাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য উদ্যত হয়, তবে সে দেবতা হউক, যক্ষ হউক, গন্ধর্ব্ব হউক, তাহাকেও হত্যা করিবে।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে শুম্ভের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। শুম্ভ ধূম্রলোচনকে বলিল—হে ধূম্রলোচন! আমি দূতমুখে শুনিয়াছি সে নারী একাকিনী; সুতরাং বলপ্রয়োগ করিলে তুমি অনায়াসেই তাহাকে এখানে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে, আর যদি অন্য কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়, তবে সে দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব যে কেহ হউক না কেন, তাহাকে হত্যা করিবে।

বিপর্য্যয়-জ্ঞান যখন আত্মার সমীপস্থ হইতে চেষ্টা করে, তখন উহাকে অনায়াসলভ্য বলিয়াই মনে করে। কারণ, সে অস্মিতাকে আত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানে। বিপর্য্যয়-জ্ঞান জানে, জগৎ অস্মিতায়ই প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং চিতি-শক্তি বলিয়া ঐ যে একটী বস্তুর আভাস পাওয়া যাইতেছে, উহাই বা অস্মিতার মধ্যে কেন প্রকটিত না হইবে? সাধক মনে রাখিও এইরূপ জ্ঞানের নামই ধূম্রলোচন।

শুম্ভ দেখিতে পায়—দেবী সেখানে একা দ্বিতীয় কেহ তাহার সহচর নাই; সুতরাং তাহাকে আনয়ন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। তাই ধূম্রলোচনকে আদেশ করিল যে, যদি সেই দেবী অপরের সাহায্য লয়, অর্থাৎ দেবতা গন্ধর্ব্ব অথবা যক্ষ যে কেহ সেখানে তাহার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়, তবে তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিয়া দিবে। আসল কথা এই যে—যেখানে কোনরূপ বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়, সেইখানেই অস্মিতার আধিপত্য। অস্মিতাকে আশ্রয় না করিয়া দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কেহই প্রকাশ পাইতে পারে না; কারণ, উহারাও অস্মিতারই বিশেষ বিশেষ বূহমাত্র। সুতরাং দেবতা প্রভৃতিকে বিনষ্ট করা অস্মিতার পক্ষে বা তাহার অনুচরের পক্ষে একান্তই সহজ। যক্ষ এবং গন্ধর্ব্ব ইহারাও দেব-যোনিবিশেষ।

ঋষিরুবাচ।

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ ॥৫॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন, শুম্ভকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই দৈত্য ধূম্রলোচন ষষ্টি সহস্র অসুর-বল পরিবৃত হইয়া দ্রুতবেগে অভিযান করিল।

ব্যাখ্যা। ধূম্রলোচনের ষষ্টি সহস্র সৈন্য। বিপর্য্যয়-জ্ঞানেতেই জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে প্রভৃতি ষড়্‌ভাববিকারের বীজ থাকে। উহারা আবার দশ ইন্দ্রিয়পথে প্রকাশিত হইতে গিয়া ষষ্টি সংখ্যক হয়, তারপর অসংখ্য বিষয়ভেদে ঐ ষষ্টি সংখ্যক বিকারবীজ অসংখ্যভাবে প্রকাশ পায়; তাই মন্ত্রে অসংখ্যবোধক সহস্র শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সাধক! আশঙ্কা করিও না যে, পূর্ব্বে মহিষাসুরবধে এই ষড়্‌ভাববিকারকেই অন্যান্য অসুরের শক্তি বা সৈন্যবলরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া এখানে পুনরায় ধূম্রলোচনের সৈন্যবলরূপে ব্যাখ্যা করায় পুনরুক্তি দোষ হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা হয় নাই, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে উহা স্থূলে—কার্য্যক্ষেত্রে, কিন্তু ইহা সূক্ষ্মে অব্যক্তে কারণ-ক্ষেত্রে। কারণক্ষেত্রে ষড়্‌ভাববিকারের বীজ থাকে বলিয়াই ত স্থূলে উহা কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়, ইতিপূর্ব্বে সেই কার্য্যভাবাপন্ন বিকারসমূহের নাশ বলা হইয়াছে, আর এইবার কারণভাবাপন্ন ষষ্টি সহস্র বিকার বীজ বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই উত্তম চরিত্রে যে ধূম্রলোচনাদি অসুরের বিষয় বর্ণিত হইবে, তাহারা সকলেই যে কারণ ক্ষেত্রীয় অনাত্মভাব সুরবিরোধীভাব, এই সত্য তত্ত্বটী স্থির ধারণা রাখিতে পারিলে আর কোনরূপ সংশয় দ্বারা আকুলিত হইতে হইবে না। এইবার নির্ব্বিশেষ আত্মস্বরূপ প্রকটিত হইবার উপক্রম হইতেছে, তাই সূক্ষ্মতম বিকারবীজসমূহও প্রলয়ানলে আত্মাহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছে।

স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্ ।
জগাদোচ্চৈঃ প্রয়াহীতি মূলং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৬॥
ন চেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্ভর্ত্তারমুপৈষ্যতি ।
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥৭॥

অনুবাদ। অনন্তর হিমালয়স্থিতা সেই দেবীকে দেখিয়া ধূম্রলোচন উচ্চৈঃস্বরে বলিল "শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট চল, যদি আমার প্রভুর নিকট প্রীতির সহিত উপস্থিত না হও, তবে এই আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে কেশাকর্ষণবিহ্বলা করিয়া লইয়া যাইব।"

ব্যাখ্যা। বিপর্য্যয়জ্ঞান স্থূল দেহকে আশ্রয় করিয়াই চিতিশক্তির সন্ধান পায়, তাই মন্ত্রে 'তুহিনাচল-সংস্থিতা' কথাটী আছে। যাবতীয় অনাত্মভাবের বিলয় স্থূল দেহকে আশ্রয় করিয়াই সম্পন্ন হয়। যাহারা মনে করে মৃত্যুর পর তবে দ্বৈত জ্ঞানবিলুপ্ত হইবে, তাহারা ভ্রান্ত। জীবিত অবস্থায়ই মুক্ত হইতে হয়। যদি মৃত্যুই হয়, তবে জন্ম অবশ্যম্ভাবী। সে যাহা হউক, ধূম্রলোচন মায়ের সন্ধান পাইয়া দূর হইতেই তাঁহাকে অস্মিতার গণ্ডীর ভিতর লইয়া আসিতে চেষ্টা করে; মাকে পাইলেই যথার্থ ঈশ্বরত্ব আবির্ভূত হইবে, সেই-আশায়ই প্রীতির সহিত দেবীকে শুম্ভের নিকট আগমন করিবার কথা বলে। মায়ের সম্মুখস্থ হইবার উপায় নাই; কারণ তাঁহার সম্মুখস্থ হইলেই যাবতীয় দ্বৈত-প্রতীতি সম্যক্ বিলয়প্রাপ্ত হয়; তাই সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়া, বহুত্বের ভিতর দিয়া মাকে ভোগ করিবার জন্য অসুরগণের এই চেষ্টা চলিতে থাকে। যদি তাঁহাকে একান্তই অঙ্কস্থ করা অসম্ভব হয়, তবে বাধ্য হইয়া বলপ্রয়োগ অর্থাৎ কেশাকর্ষণ করিতে হইবে। জগৎ কর্ত্তৃত্ব দূরীভূত করিয়া—জগৎ সৃষ্ট্যাদি শক্তি অপহরণ করিয়া চিতিশক্তিকে অস্মিতাক্ষেত্রে লইয়া আসিতে পারিলেই ঈশ্বরত্ব লাভ হইবে, এই আশায়ই শুম্ভের এইরূপ প্রযত্ন। কিন্তু হায়, শুম্ভ জানে না যে, তাহার এ প্রযত্ন কখনই সফল হইতে পারে না। সাধক, তুমিও যখন মাকে তোমার আয়ত্ত করিতে

চাও, তখন বুঝিতে পার না যে, মাকে পাইলে তোমার আমিত্বটী একেবারেই হারাইয়া যাইবে।

দেব্যুবাচ।

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্ ॥৮॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—তুমি দৈত্যেশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত, স্বয়ং বলবান্, আবার সৈন্যবলে পরিবেষ্টিত; সুতরাং বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইবে, আমি আর তোমার কি করিতে পারিব!

ব্যাখ্যা। বিপর্য্যয়-জ্ঞান অনাদিজন্মসঞ্চিত এবং ভেদ-প্রতীতি দ্বারা সম্যক্ পরিপুষ্ট। বহুপ্রযত্নেও ইহাকে বিনষ্ট করা যায় না; তাই মা ধূম্রলোচনকে বলবান্ বলসংবৃত বলিলেন। বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে, "আমি আর কি করিতে পারি" এই কথাটী বলিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহা করার, মা তাহাই করিয়া ফেলিলেন। সাধকমাত্রেরই এইরূপ সংঘটন হয়। প্রথমতঃ বিপর্য্যয় জ্ঞান বা অবিদ্যার সাহায্যেই সাধক মাকে পাইবার চেষ্টা করে। যত শাস্ত্রবিধি, সাধন ভজন, ব্রত নিয়ম, বেদ বেদান্ত, সকলই অবিদ্যাবস্থার কার্য্য। শাস্ত্রজ্ঞান তপঃশক্তি যোগবল ভক্তি-আকর্ষণ, এ সকলই অবিদ্যাক্ষেত্রের কথা। এই সকলের সাহায্যে মাকে পাইবার যে চেষ্টা, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই মা বলিলেন "বলান্নয়সি মাং" আমাকে ত বলপূর্ব্বকই লইয়া যাইবে!. বাস্তবিকই সাধনা বা উপাসনার সাহায্যে মাকে পাওয়ার চেষ্টা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে সাধক বলপূর্ব্বক মাকে আকর্ষণ করিতে চায়। এইরূপ অবিদ্যার সাহায্যে বিদ্যালাভ করিবার অর্থাৎ মাতৃসাক্ষাৎকারের যে প্রয়াস তাহার পরিণামফল যে কি হয়, তাহাই "ততঃ কিন্তে করোম্যহম্" বলিয়া মা স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন। সাধক মনে রাখিও—অজ্ঞানান্ধকার যত দীর্ঘকালের এবং যত ঘনীভূতই হউক, মায়ের কৃপা হইলে

উহা বিনষ্ট হইতে ক্ষণকালও বিলম্ব হয় না, পরবর্ত্তী মন্ত্রে ইহাই পরিব্যক্ত হইবে।

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবত্তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ ॥৯॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—দেবী এইরূপ বলিলে, সেই অসুর ধূম্রলোচন তাঁহার (দেবীর) প্রতি অভিধাবিত হইল। তখন অম্বিকা দেবী হুঙ্কারদ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

ব্যাখ্যা। অবিদ্যা যখন বিদ্যার সম্মুখস্থ হইতে যায়, তখন ঠিক এইরূপেই দেখিতে না দেখিতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অন্ধকার যেরূপ আলোকের সমীপস্থ হইলেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ বিপর্য্যয়-জ্ঞান যতই বলবান্ হউক, যতই বলসংবৃত হউক, একবার সেই বিশুদ্ধা চিতি-শক্তির সম্মুখস্থ হইলেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞান যত দীর্ঘকালের এবং যত ঘনীভূতই হউক না কেন, জ্ঞানের সমীপবর্ত্তী হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই উহার অস্তিত্বের বিলোপ হয়। অজ্ঞানের অস্তিত্ব ততক্ষণ, যতক্ষণ জ্ঞানের আলোক তাহার উপর নিপতিত না হয়!

হুঙ্কার ক্রোধপ্রকাশক অব্যয়, তন্ত্রে ইহা প্রলয়বীজরূপে অভিহিত হইয়াছে। আমি নিত্য নির্ম্মল—স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ-জ্ঞান, আমার সম্মুখে আবার বিপর্য্যয়-জ্ঞানের আবির্ভাব কিরূপে, কোথা হইতে সম্ভব হইল? এইরূপ ভাবের ভিতর দিয়াই যেন অজ্ঞান বিনষ্ট হয়; তাই মন্ত্রে ক্রোধের ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভস্ম করিলেন কথাটার মধ্য দিয়াও একটী রহস্য প্রকাশ পাইতেছে—অসুরের আর কোন চিহ্নই রহিল না। অজ্ঞান একবার বিনষ্ট হইলে, আর কখনও সত্তাবান্ হইতে পারে না। আশঙ্কা হইতে পারে—আত্মজ্ঞানী পুরুষদিগেরও অজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানী পুরুষেরাও অবিদ্যার কার্য্য—লোকশিক্ষা, শাস্ত্রপ্রণয়ন,

বিধি নিষেধ পালন ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অজ্ঞান একবার বিনষ্ট হইলে, যদি আর তাহার পুনরাবৃত্তি-সম্ভব না-ই হয়, তবে এই সকল অনুষ্ঠান, অথবা এক কথায় দেহধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতে হয়—বাধিতানুবৃত্তি ন্যায়ে পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ অজ্ঞানের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যেরূপ কুলালচক্রের ভ্রামক দণ্ড অপসৃত হইলেও পূর্ব্ববেগবশতঃ ভ্রমী বা আবর্ত্তন কিছুক্ষণ থাকে, সেইরূপ জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হইলেও পূর্ব্বারব্ধ অজ্ঞানের ফলরূপ দেহ এবং তদনুবর্ত্তী কর্ম্মসমূহ কিছুদিন থাকে।

সে যাহা হউক, সাধক! এইরূপ ভাবে যতদিন অম্বিকা মা তোমার বিপর্য্যয়-জ্ঞানকে ভস্মীভূত না করিবেন, ততদিন মাকে কিরূপে পাইবে? তাই ত বলি—ভাল হউক মন্দ হউক, পাপ হউক পুণ্য হউক্, জ্ঞান হউক্ অজ্ঞান হউক্, সকলই মায়ের সম্মুখে ধর, সকলই মায়ের কাছে পাঠাইয়া দাও। শুম্ভ যেরূপ ধূম্রলোচন প্রভৃতি অনুচরবর্গকে ক্রমে ক্রমে মায়ের নিকট পাঠাইয়াছিল, তুমিও সেইরূপ তোমার বলিয়া যাহা কিছু আছে, সৎ অসৎ নির্ব্বিচারে সে সকলকে এক একটী করিয়া মায়ের কাছে পাঠাও, মা স্বয়ং উহাদের যথাযোগ্য বিধান করিবেন! তুমি কেন নিজে ভ্রান্তিনাশ, অবিদ্যানাশ, চিত্তবিলয়, বৃত্তিনিরোধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক ব্যাপার লইয়া সমুদয় জীবন ক্ষত বিক্ষত করিতে যাও, অশান্তিতে অবস্থান কর? তুমি মায়ের ছেলে, মা ব্যতীত আর কিছুই জান না, ভাল মন্দ যাহাই আসুক, উলঙ্গ শিশুর ন্যায় নির্ব্বিচারে মায়ের নিকট উপস্থিত কর, মা ক্রমে তোমার সর্ব্বভাব বিলয় করিয়া আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিবেন, তোমার সকল আশা পূর্ণ হইবে। অবিদ্যার—অজ্ঞানের ধাঁধা চিরতরে বিদূরিত হইবে।

অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাম্।
ববর্ষ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ ॥১০॥

অনুবাদ। অনন্তর (সে ঘটনায়) ক্রুদ্ধ হইয়া বিপুল অসুর-বাহিনী অম্বিকার প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। শর শক্তি পরশু প্রভৃতি অস্ত্রগুলির আধ্যাত্মিক রহস্য পূর্ব্বেই (দ্বিতীয় খণ্ডে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুনরায় তাহার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন। তবে সাধকগণ এইমাত্র বুঝিয়া লইবেন যে, দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ কথাই সূক্ষ্ম দেহকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এ খণ্ডে কারণ-দেহ বা আনন্দময়-কোষকে লক্ষ্য করিয়াই অনেক কথা বলা হইবে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, রাগ দ্বেষ, ভেদ-জ্ঞান, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ইত্যাদি যে সকল কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি হইবে। ঐ সকলকে পুনরুক্তি না বুঝিয়া আরও সূক্ষ্মতর স্তরের কথা বুঝিলেই ঠিক হইবে। এবার আমরা স্থূল সূক্ষ্ম ছাড়িয়া অনেকটা কারণের দিকে অগ্রসর হইয়াছি। এই কারণ-ক্ষেত্রে স্থূল ও সূক্ষ্মের ন্যায় সকলই আছে, কেবল অব্যক্তভাবে; ইহাই বিশেষ। ঐ অব্যক্ত ভাবটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারিলেই স্থূল ও সূক্ষ্মের বীজগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সংসারবীজ নষ্ট হইলে মাতৃলাভ অনিবার্য্য।

যাহা হউক, অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়াছে, বিপর্য্যয়-জ্ঞানরূপী মহাসুর ধূম্রলোচন ভস্মীভূত হইয়াছে; সুতরাং তাহার অনুচরগণ অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। অবিদ্যানাশের সঙ্গেসঙ্গেই অবিদ্যার কার্য্যগুলিও বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া উচিত এবং হয়ও তাহাই। তবে সাধকের তাহা উপলব্ধি করিতে একটু সময় অবশ্যক হয়। কারণ, বাধিতানুবৃত্তি ন্যায়ে বিনষ্ট-অবিদ্যার কার্য্যসমূহ পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ কিছুদিন অনুবর্ত্তন করে। সর্পভ্রান্তি দূরীভূত হইলেও পূর্ব্বলব্ধ ভীতিজনিত হৃৎকম্পাদি কিছুক্ষণ থাকে। কুলালচক্রের ভ্রমী বদ্ধ

করিয়া দিলেও পূর্ব্ববেগবশতঃ কিছুকাল সে ভ্রমটা থাকিয়া যায় অবিদ্যার কার্য্য আপনিই বিনষ্ট হয়। কিরূপে বিনষ্ট হয়, তাহাই ক্রমে মহর্ষি মেধস অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সুরথকে দেখাইয়া দিতেছেন। এক্ষণে যে সকল অসুরের নিধন বর্ণিত হইবে, তাহার অধিকাংশই বিনষ্ট অবিদ্যার কার্য্য।

ধূম্রলোচন নিহত হইলে তাহার ষষ্টিসহস্র সৈন্য মায়ের প্রতি শাণিত শর শক্তি পরশু প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অর্থাৎ ষড়্ভাববিকারসমূহ স্বপ্রকাশরূপিণী মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ষড়্ভাববিকারের অন্য নাম জীব-ভাব; পূর্ব্বে ইহাকে ছায়া বলা হইয়াছে। আতপের সত্তা ব্যতীত ছায়ার সত্তাই থাকিতে পারে না, ইহা সহস্রবার বুঝিয়া লইলেও ছায়া যেরূপ আতপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, ঠিক্ সেইরূপই ধূম্রলোচনের অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্রপ্রয়োগে মাকে আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিল।

ততো ধূতসটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবম্।
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স্ববাহনঃ ॥১১॥

অনুবাদ। অনন্তর দেবীর স্ববাহন সিংহ ক্রোধে কেশর কম্পিত করিয়া অতি ভয়ঙ্কর গর্জ্জনপূর্ব্বক অসুরসৈন্য-মধ্যে আপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। বিপর্য্যয়জ্ঞান বিনষ্ট হইলে, জীব বিশুদ্ধ-বোধের সন্ধান পাইয়া সিংহবিক্রমে সংস্কারক্ষয়কল্পে বদ্ধপরিকর হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি—জীবত্বহননেচ্ছু সাধকই সিংহ। মায়ের কৃপায় এত দিনে সে যথার্থ জীবভাবটী যে কি এবং তাহার বিনাশই বা কি, তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। এখন যত শীঘ্র হয়, তীব্র পুরুষকারপ্রয়োগে অসুরানুচরগণকে নিধন করিতে পারিলেই জীবত্বের সম্যক্ অবসান হয়, ইহা বুঝিতে পারিয়াই অসুরসৈন্যমধ্যে আপতিত হইল। মায়ের স্বরূপের

আভাস পাইলে সাধকের কর্ম্মোদ্যম অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তখন অভয়প্রাণে ভৈরব গর্জ্জনে জয় মা বলিয়া আসুরিক সংস্কার ক্ষয় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। কারণ তখন বুঝিতে পারে—সে "দেব্যাঃ স্ববাহনঃ" দেবীর স্ববাহন, পূর্ব্বেও মায়েরই বাহন ছিল বটে, কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে। এখন বিপর্য্যয়জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় মাকে স্ব বলিয়া, আত্মা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। আত্মস্বরূপে মায়ের কোনও বিশিষ্টতা নাই; এখানে মা আমার কেবলানন্দ-মূর্ত্তি; তাই সাধক আজ সাক্ষাৎ কেবলানন্দের বাহন; সুতরাং প্রাণে বল কত! বহু সৌভাগ্যে সুকৃতির ফলে শ্রীগুরুর বিশেষ কৃপায় সাধক নিজেকে মায়ের স্ববাহন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। এখানে সাধক সত্যসত্যই আনন্দের ক্রীড়াপুত্তুল। জীব! কবে তুমি সেই অবস্থায় উপনীত হইবে ?

কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্।
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্ জঘান সুমহাসুরান্ ॥১২॥
কেষাঞ্চিৎপাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥১৩॥
বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধূতকেশরঃ ॥১৪॥
ক্ষণেন তদবলং সর্ব্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপনা ॥১৫॥

অনুবাদ। সেই সিংহ কতকগুলি দৈত্যকে কর-প্রহারে, কতকগুলিকে মুখে গ্রাস করিয়া, কতকগুলিকে অধর দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক অর্থাৎ চর্ব্বণ করিয়া নিহত করিল। এইরূপে কেশরী নখরাঘাতে কতকগুলি অসুরের কোষ্ঠ (উদরপ্রদেশ) বিদীর্ণ করিয়া দিল। কতকগুলির বা চপেটাঘাতে মস্তক (দেহ হইতে) পৃথক্ করিয়া দিল। সেইরূপ অপর কতকগুলি অসুর ছিন্নবাহু ও ছিন্নশির হইয়াছিল। অনন্তর সেই

সিংহ কেশর কম্পিত করিয়া (আহ্লাদে) অন্য অসুরের কোষ্ঠ হইতে রুধির পান করিয়াছিল। এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যে সেই দেবীর বাহন অতি কুপিত মহাবল পরাক্রান্ত সিংহকর্ত্তৃক অসুরসৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।

ব্যাখ্যা। এই চারিটি মন্ত্রে সিংহকর্ত্তৃক অসুরনাশের প্রকারগুলি বর্ণিত হইয়াছে। সিংহের অপর কোন অস্ত্রশস্ত্র নাই, স্বকীয় শরীরই তাহার শত্রুসংহারক অস্ত্র। সে ছয়টী উপায়ে অসুরসৈন্য ক্ষয় করিয়াছিল, যথা (১) কর-প্রহার (২) আস্য প্রহার অথবা মুখেগ্রাস (৩) অধরাক্রমণ অর্থাৎ চর্ব্বণ (৪) নখাঘাত বা নখরাঘাত (৫) তলপ্রহার অর্থাৎ চপেটাঘাত (৬) এবং শত্রুভয়দায়ক কেশরকম্পন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ধূম্রলোচন ষষ্টিসহস্র অনুচর সহ যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিল। উহা দশ-ইন্দ্রিয়-গুণিত অসংখ্য ভেদপ্রাপ্ত জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকারকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। এখানেও দেখিতে পাওয়া যায়—সিংহ কর-প্রহার প্রভৃতি ছয়টী উপায়ে সেই ষষ্টি সহস্র অসুরকে নিপাতিত করিয়াছিল। আমরা এস্থলে জন্মাদি বিকারগুলির বিষয় একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব। (১) জায়তে—আমি জন্মবান্‌। আমায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এই যে ভাব; উহা বাস্তবিক আমাতে নাই; অথচ আমি জাত এইরূপ একটা বোধ সর্ব্বদাই আমাদের থাকে; ইহাই প্রথম বিকার। আজ মায়ের কৃপায় বিপর্য্যয়জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতীতি অর্থাৎ জন্মসংস্কার অনায়াসে বিলয়প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। দেবীর বাহন সিংহের কর প্রহারে প্রথম অস্ত্র প্রয়োগে কতকগুলি অসুরনিপাতের ইহাই রহস্য। (২) অস্তি—আমি অস্তিত্ববান্‌ অর্থাৎ জন্মগ্রহণের পর আমি আছি, এইরূপ একটী বিশিষ্ট-সত্তার প্রতীতি হয়। উহাই দ্বিতীয় বিকার। এইরূপ বিশিষ্ট সত্তাবোধও বিপর্য্যয়জ্ঞানের ফল! বাস্তবিক আমার সত্তা নিত্য ও নির্ব্বিশেষ। তাহাতে জন্মাদি কোন ভাবেরই অন্বয় নাই। সাধক ইহা এতদিন বুঝিতে পারে নাই, অথবা বুঝিয়াও ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে নাই; কিন্তু আজ মায়ের কৃপায় বিপর্য্যয়-জ্ঞান-রূপী ধূম্রলোচন নিহত হওয়ায়, তাহারই

অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সেই নিত্য সত্তাটীর প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে বিশিষ্ট সত্তাবোধরূপ বিকারও বিলুপ্ত হইতেছে। ইহাই মন্ত্রে "দৈত্যানাস্যেন চাপরান্" অর্থাৎ মুখব্যাদানপূর্ব্বক সিংহকর্ত্তৃক অসুর-গুলির গ্রাসরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে ছাত্রজীবনের রচিত একটী স্তোত্রের প্রথম শ্লোক সহৃদয় পাঠকবর্গকে শুনাইবার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না ; চপলতা মার্জ্জনীয়।

অস্তীত্যস্মিন্ পদং যৎ পরমবুধগণৈস্তৎ-প্রযুক্তং তবৈব,
ভ্রান্তিস্বপ্নাবসানে ত্বয়ি হি বিলসিতং নিত্যসত্তাশ্রয়ত্বম্।
মায়ামোহৈর্নিকামং ন জগদিদমসন্মন্যমানা বয়ং হি,
মাতঃ সর্ব্বেশ্বরে নঃ কলিকলুষহরে তত্ত্ববোধং বিধেহি॥

মা, "অস্তি" এই যে একটী পদের প্রয়োগ জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা (অস্তিপদটী) পরম বুধগণ—পরমাত্মসাক্ষাৎকারী মনীষিবৃন্দ একমাত্র তোমাতেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন ; (তুমি ছাড়া আর কোথাও "অস্তি" শব্দটীর প্রয়োগ করা যায় না) যেহেতু ভ্রান্তি-স্বপ্নের অবসানে দেখা যায়—যথার্থ সত্তাটী একমাত্র তোমাতেই বিলসিত রহিয়াছে ; কিন্তু মা আমরা মায়া মোহ বশতঃ এই জগৎকে "অসৎ" অর্থাৎ সত্তাহীন বলিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারি না। অতএব হে সর্ব্বেশ্বরে, হে কলি-কলুষহরে মা, আমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান কর।

যথার্থ ই জীব বলিয়া, জগৎ বলিয়া পৃথক্ কোন সত্তাই নাই। একমাত্র মাতৃসত্তাই জগৎরূপে পরিচিত হইতেছে। ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই ত জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর কশাঘাতে ব্যথিত হইতেছে। কিন্তু এবার মা আমার স্বয়ং জীবোদ্ধার করিতে আবির্ভূতা, মা আমার জীবত্বের শৃঙ্খলগুলি স্বহস্তে ছেদন করিয়া দিতেছেন ; সুতরাং আশা হয়—এবার জীব-জগত নিশ্চয়ই মাতৃসত্তা পাইয়া ধন্য হইবে।

(৩) বর্দ্ধতে—আমি বৃদ্ধি-বিশিষ্ট, দিন দিন আমার বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, এইরূপ প্রতীতিই তৃতীয় বিকার। আত্মস্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞানতাই এইরূপ বিকার-প্রতীতির হেতু। বিপর্য্যয়-জ্ঞানেই উহার

প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এবার মা স্বয়ং বিপর্য্যয়-জ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়াছেন; সুতরাং তদাশ্রিত বিকার অনায়াসেই বিলুপ্ত হইবে। মন্ত্রস্থ "আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্" অর্থাৎ অধরাক্রমণে অপর কতকগুলি অসুর নিহত হইয়াছিল, এই অংশটী-দ্বারা এই তৃতীয় বিকারের বিলয় বর্ণিত হইল। (৪) বিপরিণমতে—আমি পরিণামপ্রাপ্ত। আমি বৃদ্ধির শেষ সীমায় উপস্থিত, আর আমি উপচয়প্রাপ্ত হইব না। এইরূপ প্রতীতি চতুর্থ বিকার; বিপর্য্যয়জ্ঞান-বিনাশের সঙ্গে ইহাও বিলয়প্রাপ্ত হয়। ইহাই সিংহকর্ত্তৃক নখরাঘাতে অসংখ্য ধূম্রলোচন-সৈন্য নিপাতের রহস্য। (৫) অপক্ষীয়তে —আমি অপক্ষয়বিশিষ্ট, দিন দিন আমি শীর্ণ হইতেছি, এইরূপ প্রতীতি পঞ্চমবিকার; আত্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হইলে, এইরূপ অপক্ষয়প্রতীতি থাকে না। বিপর্য্যয়জ্ঞান-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই উহা বিলয়প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রে "তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্" কথাটীতে এই অপক্ষয়রূপ বিকারের বিলয় সূচিত হইতেছে। (৬) নশ্যতি—আমি নশ্বর, আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, এইরূপ প্রতীতি ষষ্ঠ বিকার। বিপর্য্যয়জ্ঞানের বিলোপ হইলে—অমৃতময়ী মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করিলে, জীবের মৃত্যুভয় চিরতরে বিদূরিত হয়; এই ষষ্ঠ বিকারও যে আমাতে নাই, ইহা ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারিলেই, জীব মৃত্যুভয়রূপ অসুর-আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হয়। আজ দেবীর স্ববাহন জীব-সিংহ ধূম্রলোচনের অনুচরধ্বংসরূপী-বিকারকে বিনষ্ট করিয়া অসুর-অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। কেশরকম্পনপূর্ব্বক অসুরগুলির ভীতি উৎপাদন এবং উদর বিদারণপূর্ব্বক রুধির পানের ইহাই তাৎপর্য্য।

বিপর্য্যয়জ্ঞান বিনষ্ট হইলে, বিপর্য্যয়জ্ঞান জন্য আত্মার ষড়্‌ভাববিকাররূপ অসুরসৈন্যক্ষয় হইতে আর বিলম্ব হয় না। তাই মন্ত্রে "ক্ষণেন" পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সিংহকে এখানে মহাত্মা বলা হইয়াছে। জীব যতদিন আত্মার সন্ধান না পায়, ততদিনই তাহার মহত্ত্ব অন্তর্হিত থাকে। সে যে যথার্থই "মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্" ইহা তখন পর্য্যন্ত কিছুতেই বুঝিতে পারে না। কিন্তু এইবার

মাতৃকৃপায় ভ্রান্তি-স্বপ্নের অবসান হইয়াছে, পরমাত্মস্বরূপের সন্ধান মিলিয়াছে; সুতরাং আত্মমহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আসিয়াছে। তাই মন্ত্রে সিংহের বিশেষণস্বরূপ "মহাত্মনা" পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। মনে রাখিও সাধক, দেবীর বাহন না হইলে—আত্মসমর্পণযোগী না হইতে পারিলে, এত সহজে এবং এত শীঘ্র এই দুর্জ্জয় অসুরকুল বিনষ্ট হয় না। আত্মসমর্পণকারী সাধকই যে দেবীর বাহন সিংহ, এ তত্ত্ব দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে।

শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবী-কেশরিণা ততঃ ॥১৬॥
চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥১৭॥

অনুবাদ। দেবীকর্ত্তৃক ধূম্রলোচনের নিধন এবং দেবীর কেশরীকর্ত্তৃক সমগ্র সৈন্যক্ষয়ের বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক দৈত্যাধিপতি শুম্ভ অধর প্রকম্পিত করতঃ ক্রোধের সহিত মহাসুর চণ্ডমুণ্ডের প্রতি আদেশ করিলেন।

ব্যাখ্যা। বিপর্য্যয়জ্ঞান এবং তজ্জন্য ষড়্‌ভাববিকার তিরোহিত হইলে, অস্মিতার আশঙ্কা হয়—যাহাদিগকে লইয়া আমি আছি, তাহারা যদি এইরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তবে আর আমার অস্তিত্ব কোথায়? তাই শুম্ভ আত্মসত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশায় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে মায়ের সমীপে প্রেরণ করিল।

পূর্ব্বে যে ছয়টী বিকারের কথা বলা হইয়াছে, উহা শুধু স্থূল দেহের কথা নহে। সাধক ভুলিও না, এই উত্তম চরিত্রে স্থূল দেহের কথা খুব কমই আছে। তবে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, স্থূল দেহকে পরিত্যাগ করিলে, জন্মাদি ষড়্‌ভাব বিকারের সম্ভাবনা কোথায়? তাহার উত্তরে বুঝিতে হইবে, স্থূল দেহে জন্মাদি যে বিকারগুলি দেখা যায়, উহার

অনুভব সূক্ষ্ম দেহেই হইয়া থাকে অর্থাৎ আমি জাত, আমি বর্দ্ধিত, আমি শীর্ণ ইত্যাদিরূপ প্রতীতি সূক্ষ্ম দেহেই হয়। আবার সূক্ষ্ম দেহে যে ঐরূপ জ্ঞান প্রকাশ পায়, কারণ-শরীরে তাহার বীজসমূহ অবস্থান করে। ষড়্‌ভাববিকারের সূক্ষ্মতম সংস্কারগুলি অব্যক্তভাবে কারণ-শরীরে অবস্থান করে। সুতরাং কেবল স্থূলদেহ নয় সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ ও বিকারপ্রতীতির আশ্রয়, কিন্তু আত্মা মা আমার অবিকারী বস্তু।

এখন আমরা শুম্ভের বা অস্মিতার দিক্ দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধিস্থ চিৎপ্রতিবিম্বই অস্মিতা। যাহা যথার্থ আমি, তাহা কিন্তু প্রতিবিম্ব নহে স্বয়ংচিৎ। এই চিদ্‌বস্তুকে আমিরূপে না বুঝিয়া চিৎপ্রতিবিম্বকে যে আমিরূপে গ্রহণ করা হয়, উহার মূলে একটী বিপর্য্যয়জ্ঞান থাকে। উহাই অযথাভূতজ্ঞান উৎপাদন করিয়া দেয়। ধূম্রলোচন-বধে সেই বিপর্য্যয়জ্ঞান বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এইবার অস্মিতার বিলয় অবশ্যম্ভাবী; এমন কেহ নাই যে, তাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু অস্মিতাও নিতান্ত সহজ বস্তু নহে—উহা বহুজন্ম বহুযুগসঞ্চিত প্রতীতিবিশেষ; সে সহজে বিলয়প্রাপ্ত হইতে চায় না। যেরূপ বিষধর সর্পের মস্তক চূর্ণিত হইলেও পুচ্ছ আস্ফালন করিয়া আঘাতকারীকে প্রতিঘাত করিতে চেষ্টা করে, ইহাও ঠিক সেইরূপ।

সে যাহা হউক, এইবার শুম্ভ স্বয়ং বিচার করিয়া দেখিল—যদিও ধূম্রলোচন নিহত হইয়াছে, তথাপি এখনও চণ্ডমুণ্ড নামক প্রধান অসুরদ্বয় বিপুল বাহিনী সহ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারাই আমাকে প্রথমে এই নারীমূর্ত্তির সংবাদ দিয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগকেই যুদ্ধার্থ প্রেরণ করা যাউক।

সাধক মনে রাখিও, বিপর্য্যয়প্রতীতি বিনষ্ট হইলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিনাশ হইতে আর বিলম্ব হয় না। যদিও এই সকল ঘটনা ক্ষণকাল মধ্যেই সংঘটিত হইয়া থাকে, তথাপি ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া উপাখ্যানাকারে একজনকে বুঝাইয়া দিতে বহুপ্রয়াসের আবশ্যক হয়।

আর বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু বিপর্য্যয়জ্ঞান বিনষ্ট হইবার পরেও পূর্ব্ব-বেগবশতঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রভৃতি সংস্কারগুলি কিছুদিন্ থাকিয়া যায়। পুনঃ পুনঃ আত্মস্বরূপে স্থিতির অভ্যাস সুদৃঢ় ও বহুক্ষণস্থায়ী হইলেই উহা ক্রমে বিলুপ্ত হয়।

হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্ব্বহুলৈঃ পরিবারিতৌ।
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু॥ ১৮॥
কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধ্বা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি।
তদাশেষায়ুধৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যতাম্॥ ১৯॥
তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে।
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধ্বা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্॥ ২০॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
ধূম্রলোচনবধঃ।

অনুবাদ। হে চণ্ড! হে মুণ্ড! তোমরা বহুসংখ্যক সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেখানে যাও এবং সত্বর সেই দেবীকে কেশাকর্ষণ কিংবা বন্ধনপূর্ব্বক এখানে আনয়ন কর। আর যদি তাহার সহিত যুদ্ধে তোমাদের কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তবে সমস্ত অসুর সমবেত হইয়া অশেষ অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগে তাহাকে নিধন করিবে। এইরূপে সেই দুষ্টা রমণীকে নিহত এবং সে সিংহটাকেও বিনিপাতিত করিয়া শীঘ্র আগমন করিবে; অথবা সেই অম্বিকাকে বন্ধন করিয়া এখানে লইয়া আসিবে।

ব্যাখ্যা। অস্মিতার প্রেরণাই শুম্ভের আদেশ। এইবার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়ই বহুসংখক অনুচর সহ অম্বিকাকে আনয়ন করিতে যাইবে। সেখানে যাইয়া কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে শুম্ভের আদেশ তিন প্রকার। কেশাকর্ষণ অথবা বন্ধন করিয়া দেবীকে আনয়নের চেষ্টা করিবে; ইহা প্রথম আদেশ। যদি সংশয় উপস্থিত

হয় অর্থাৎ কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন করা একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবে দেবী এবং তাহার বাহন সিংহ, উভয়কেই নিহত করিবে; ইহা দ্বিতীয় আদেশ। শুম্ভ আবার তৃতীয় আদেশ করিল—বন্ধন করিয়া আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবে। এই ত্রিবিধ আদেশের মধ্যে, প্রথম কল্পে দেবীর প্রতি শুম্ভের ক্রোধ, দ্বিতীয় কল্পে অনন্যোপায় হইলে নিধন, এবং তৃতীয় কল্পে দেবীকে আনয়ন-বিষয়ক তীব্র আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে।

অপরিণামিনী অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তি হইতে যদি সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব-রূপ ঈশ্বরত্ব অপনীত হয়, তবেই সে হীনবল হইয়া পড়িবে, তখন তাহাকে আনয়ন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে; হয়ত তখন ঈশ্বরত্ব অস্মিতার মধ্য দিয়াও সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে; এই আশায়ই শুম্ভের পূর্ব্বোক্তরূপ কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দেবীকে আনয়নের আদেশ। শুম্ভ নিজেই এইরূপ আদেশের সফলতা বিষয়ে সন্দিহান; কারণ, বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বরত্ব কখনও চিতিশক্তিকে ছাড়িয়া থাকে না। তাই হতাশ পক্ষে অগত্যা নিধনের আদেশ। চিতিশক্তি বা আত্মাকে নিহত করার তাৎপর্য্যই শেষতত্ত্বকে শূন্যরূপে নির্ণয় করা। বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তিকালে বৌদ্ধধর্ম্ম এই শূন্য-বাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তথা-কথিত বৌদ্ধগণ আত্মাকেই বিনাশ করিতে প্রয়াস পাইত। স্বয়ং বুদ্ধদেবের উপদেশ কালক্রমে বিকৃত হইয়া এইরূপ বৈনাশিকবাদে পরিণত হইয়াছিল। আত্মার বিনাশ সাধন করিয়া শূন্যতত্ত্বে উপনীত হওয়াই ইহাঁদের মুক্তি বা নির্ব্বাণের অর্থ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু হায়! তাঁহারা জানিতেন না যে, আত্মা অশক্যপ্রতিষেধ। আত্মা কখনও আত্মহত্যা করিতে পারেন না। আত্মার নিধন করিয়াও যিনি থাকেন, তিনিই আত্মা-রূপে নিত্য রহিয়া যান। এস্থানে সংক্ষেপতঃ একটু বৌদ্ধমতের আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিটী বৌদ্ধগণের প্রধান উপজীব্য। এই শ্রুতির বাস্তবিক অর্থ—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ

নামরূপাদি-দ্বারা অব্যাকৃত ছিল। বৌদ্ধগণ
অর্থ করেন; তাঁহারা বলেন—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা অসৎ অর্থাৎ অভাব বা শূন্যমাত্র। সুতরাং শূন্যই শেষ তত্ত্ব। উহাদের আর একটী কথা—ক্ষণিক-বিজ্ঞান। বাহ্যজগৎ বলিয়া কিছু নাই তবে জগৎ রূপে যাহার প্রতীতি হয়, উহা আমাদেরই সংস্কার অর্থাৎ ক্ষণকালস্থায়ী বিজ্ঞানমাত্র। ঐ বিজ্ঞান দুই প্রকার, ধারাবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। আমরা প্রতিক্ষণে যে রূপরসাদি বিষয় গ্রহণ করিতেছি, উহার প্রত্যেকটীর সঙ্গেই একটী "আমি আমি" ভাবের ধারা আছে। আমি দেখি, আমি শুনি, আমি করি, ইত্যাদি বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে সঙ্গে যে ক্ষণস্থায়ী কতকগুলি আমির ধারা চলিয়াছে, উহাই ধারাবিজ্ঞান। ঐ ধারাবাহিক আমিগুলির তলদেশে একটা অখণ্ড আমি-বিজ্ঞান আছে, যাহার উপরে উক্ত খণ্ড খণ্ড আমিগুলি ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছে, থাকিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে। সেই যে আধারস্বরূপ বিজ্ঞান, উহাই আলয়-বিজ্ঞান নামে কথিত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তে বৌদ্ধগণ সর্ব্বপ্রথমে যোগাদি উপায়ের দ্বারা ঐ ধারাবিজ্ঞানকে নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। পরে আলয় বিজ্ঞানকেও বিলয় করিয়া শূন্য বা অভাবরূপ পদার্থে উপনীত হইয়া উহাকেই নির্ব্বাণ বা মুক্তির স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

আচার্য্য শঙ্কর নানাবিধ যুক্তি তর্কের সাহায্যে এই মতের সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন। এস্থলে সে সকলের উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। আমরা এই পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইব যে, বৌদ্ধগণ যাহাকে আমির সম্পূর্ণ অভাব বলিয়াছেন, সেই অভাবটী প্রকাশ করিবার জন্যও একটী আমি থাকিয়া যায়। অর্থাৎ আমির অভাব যে আছে, তাহা যিনি জানেন, তিনিই আত্মা; সুতরাং আত্মার নিধন অসম্ভব। পক্ষান্তরে এই বৌদ্ধমতের সহিতও আমাদের কিছুই বিরোধ নাই। যাহা কিছু বিরোধ প্রতীত হয়, উহা শুধু ভাষার অর্থাৎ শব্দ প্রয়োগের বিরোধ; বস্তুসত্তা বিষয়ে কিছুই বিরোধ নাই। বৌদ্ধের ধারাবিজ্ঞান—আমাদের

অহংকার, বৌদ্ধের আলয়-বিজ্ঞান—আমাদের অস্মিতা। আর ঈশ্বর-সঙ্কল্প-স্বরূপ বাহ্যজগৎ আছে, এইটুকু স্বীকার করিয়া জীব-ভোগ্য জগৎকে ক্ষণিকবিজ্ঞান বলিলেও ক্ষতি হয় না। তারপর শূন্যতত্ত্বের কথা। যথার্থই ত নিরঞ্জনস্বরূপে কোনরূপ বিশিষ্টতা পাওয়া যায় না; তাই বৌদ্ধগণ পূর্ণকে লক্ষ্য করিয়াই শূন্য বা অভাব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমরা প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। চল সাধক, আবার প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপস্থ হই।

শুম্ভ চণ্ডমুণ্ডকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিবার সময় তৃতীয় কল্পে যে কথাগুলি বলিয়াছিল, তাহাতে বেশ প্রতীতি হয়—অম্বিকাকে নিধন করা শুম্ভের অভিপ্রায় নহে; অঙ্কশায়িনী করাই একান্ত অভিলাষ; অগত্যাপক্ষে নিধনই বাঞ্ছনীয়।

শুন, অস্মিতারও আবার কেহ প্রকাশক আছে, ইহা সে স্বীকার করিতে চায় না। যদি আত্মা নামে কিছু থাকে, তবে সে অস্মিতার প্রকাশ্যরূপে পরিচিত হউক; ইহাই অস্মিতার অভিপ্রায়। উচ্চস্তরের সাধকগণ নিশ্চয়ই এ রহস্য সহজে অনুধাবন করিতে পারিবেন। কিন্তু যাহাদের বুদ্ধিতত্ত্ব সম্যক্ উন্মেষিত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে এ সকল কথা প্রহেলিকার মত মনে হইতে পারে। তবে যাঁহারা আগ্রহের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইবেন, খুব আশা করা যায়—তাঁহারা অচিরকাল মধ্যেই বুদ্ধিতত্ত্বে উপনীত হইতে পারিবেন এবং তখন অস্মিতা ও আত্মার এই সকল রহস্য নখদর্পণবৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক উপাসনা-পদ্ধতির সহিত এই সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। সকলে স্ব স্ব বিশিষ্টতা সম্যক্ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও ইহার অনুশীলন করিতে পারিবেন; এবং কিছুদিন করিলে, ইহার সার্থকতা স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন। মনে রাখিতে হইবে—যতদিন অবিদ্যা বা বিপর্য্যয়-জ্ঞানরূপী ধূম্রলোচন নিহত না হয়, ততদিন জীবত্বের শৃঙ্খল কিছুতেই মোচন হয়

না, হইতে পারে না। আজ সত্যপ্রতিষ্ঠ সাধকগণ মায়ের কৃপায় এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন যে, "অবিদ্যানাশ" যে কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

মায়ের চরণে একান্ত শরণাগত সন্তানগণের বিপর্য্যয়-জ্ঞানরূপী অসুরকে মা হুঙ্কারমাত্রে ভস্ম করিয়া দিলেন। রুদ্রগ্রন্থিভেদের ইহাই বীজ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্ঞানময় গ্রন্থির নামই রুদ্রগ্রন্থি। এই জগদ্‌বিষয়ক জ্ঞান, এই আমিত্ব প্রতীতিরূপ জ্ঞান, এ সকলই একটীমাত্র বিপর্য্যয়-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মস্বরূপ বিষয়ক অনভিজ্ঞতার উপরই এই অজ্ঞান নামক জ্ঞানরাশি অবস্থিত। এইবার মায়ের কৃপায় তাহা দূরীভূত হইল; সুতরাং অজ্ঞানের কার্য্যরূপে অবশিষ্ট যাহারা আছে, তাহারাও এখন ক্রমে ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

এস সাধক, আমরা "জয় মা" বলিয়া অগ্রসর হই। দেখি, মা কিরূপে চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ প্রভৃতি অসুরকুলকে নিহত করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। আমাদের মঙ্গলময়ী মায়ের চরণে অসংখ্য প্রণাম।

ইতি সাধন-সমর বা দেবী মা

ধূম্রলোচন ২২

সাধন-সমর

বা

দেবী মাহাত্ম্য

রুদ্রগ্রন্থিভেদ।

চণ্ডমুণ্ডবধ

ঋষিরুবাচ।

আজ্ঞপ্তাস্তু ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ।

চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥১॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—অনন্তর শুম্ভের আদেশে চণ্ডমুণ্ডকে অগ্রগামী করিয়া চতুরঙ্গবল-পরিবেষ্টিত দৈত্যগণ উদ্যতায়ুধে (দেবীর উদ্দেশে) অভিযান করিল।

ব্যাখ্যা। অস্মিতার অনুপ্রেরণায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সদলবলে চিতিশক্তির উদ্দেশে অভিধাবিত হইল। সাধক! তুমিও দেখ, ঠিক এমনই করিয়া তুমিও প্রবৃত্তির সাহায্যে মাকে আমার পরিগ্রহ করিতে চাও, নিবৃত্তির সাহায্যে বিষয়বিরতি পরিপুষ্ট করিয়া ঐ মাতৃমুখী প্রবৃত্তির বলবৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাও। কেবল ইহাই নহে, এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অসংখ্য ভাব, অসংখ্য কার্য্যপ্রণালী সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। ইহাই সদলবলে চণ্ডমুণ্ডের অভিযান। এইবার ইহারাও বিনষ্ট হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিলয় করিয়া তবে মাতৃ-আবির্ভাব হইয়া থাকে।

চতুরঙ্গবলের ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইয়াছে। ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয়, ইহারাই চতুরঙ্গবল। সূক্ষ্মদেহে যেরূপে উহাদের

অবস্থান বুঝিয়া লইয়াছ, কারণদেহেও ঠিক সেইরূপ বুঝিয়া লও। কারণশরীরে অব্যক্তভাবে—বীজভাবে ক্লেশকর্ম্মাদি থাকে বলিয়াই সূক্ষ্মদেহে উহারা অঙ্কুরিত হয়, এবং স্থূলদেহে ফলরূপে অভিব্যক্ত হয়। মায়ের কৃপায় স্থূল ও সূক্ষ্ম সংস্কার বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এইবার কারণশরীরস্থ অব্যক্ত বীজরূপী সংস্কারগুলিরও ক্ষয় হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই মা আমার চণ্ডমুণ্ডকে চতুরঙ্গ বলের সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত করিলেন।

দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥২॥

অনুবাদ। অনন্তর তাহারা সুবর্ণময় মহৎ হিমালয়শিখরে সিংহোপরি অবস্থিত ঈষৎহাস্যমুখী দেবীকে দেখিতে পাইল।

ব্যাখ্যা। হিরণ্ময়-হিমালয়-শিখরে জীব-সিংহবাহিনী মা আমার স্মিতমুখী। যে শরীরকে আশ্রয় করিয়া মা আমার শুম্ভবধের লীলা প্রকাশ করেন, সে শরীর হিরণ্ময়ই বটে। হিরণ্যগর্ভ স্বরূপকে অবলম্বন করিয়াই ত আত্মায় বা বিশুদ্ধ চিতিশক্তিতে নানাবিধ লীলাবিলাস প্রকটিত হয়। মা আমার ঈষদ্ধাসা। এত সৈন্যসজ্জা, সম্মুখে সমর-কোলাহল, দুর্দ্দান্ত অসুর চণ্ডমুণ্ড সদলবলে যুদ্ধার্থ উপস্থিত, তথাপি মা আমার ঈষদ্ধাসা। সত্য সত্যই সাধক, মায়ের এই হাস্যময়ী আনন্দময়ী মূর্ত্তির অন্যথাভাব কোন কালে কোন অবস্থায়ই হয় না। পরিদৃশ্যমান জড়জগদাকারে আকারিত হইতে গিয়া, অনবরত দ্বন্দ্বের মধ্যে—সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে অবস্থান করিয়াও মায়ের আমার আনন্দময় ভাবটীর ব্যতিক্রম কখনই হয় না। যেরূপ শর্করাগঠিত রাক্ষসীমূর্ত্তিরও সর্ব্বাবয়বই মধুর, সেইরূপ আনন্দঘনমূর্ত্তি মায়ের আমার সর্ব্বভাবেই আনন্দটী অক্ষুণ্ণ। রোগে—আনন্দ, শোকে—আনন্দ, প্রলয়ে—আনন্দ, আর্ত্তনাদে—আনন্দ, এমনই আনন্দময়ী মা আমার!

আরে, সবই যে আনন্দদ্বারা গঠিত! সাধক, কবে তুমি এই আনন্দময় সত্তার সন্ধান পাইয়া—মায়ের ঈষৎ-হাস্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া জীবন ধন্য করিবে? অম্বিকা সর্ব্বমনোহরা হাস্যমুখী মা আমার সর্ব্বত্র প্রতিভাত, কোথাও লুকাইয়া নাই। তাকাও একবার মায়ের দিকে! তোমার আমিত্ব, তোমার স্থূল দেহের প্রত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত আনন্দরসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমং চক্রুরুদ্যতাঃ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ॥৩॥

অনুবাদ। তাঁহাকে (অম্বিকাকে) দেখিবামাত্র কতকগুলি অসুর ধনুঃ এবং অসি ধারণপূর্ব্বক দেবীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল অপর কতকগুলি অসুর তাঁহার সমীপস্থ হইল।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়—অসুরসৈন্য দুই দলে বিভক্ত হইয়া দেবীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। একদল সশস্ত্র, অন্য দল নিরস্ত্র। প্রবৃত্তির দল—অসি, চাপ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে, অর্থাৎ ধারণা ধ্যানাদির সাহায্যে আত্মাকে আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পায় এবং নিবৃত্তির দল নিরস্ত্র হইয়া অর্থাৎ সর্ব্ববিধ বিষয় পরিগ্রহের পরিহারপূর্ব্বক নেতি নেতি মুখে আত্মসমীপস্থ হইতে চেষ্টা করে।

মনে রাখিও সাধক, প্রবৃত্তির কার্য্য সাধনা এবং নিবৃত্তির কার্য্য বৈরাগ্য; এই উভয়ের দ্বারা মায়ের সমীপস্থ হওয়া যায় মাত্র, ঠিক মাকে পাওয়া যায় না। কারণ, সাধনা এবং বৈরাগ্য, উভয়ই অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। মা আমার ইহারও অনেক উপরে প্রতিষ্ঠিতা। এই কথাটী বুঝাইবার জন্যই ঋষি আজ সরল ভাষায় বলিলেন,—"আদাতুং উদ্যমং চক্রুঃ" এবং "তৎসমীপগাঃ"। প্রবৃত্তির দল মাকে ধরিতে উদ্যম করিল; কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিল না। আর নিবৃত্তির দলও সমীপস্থ

হইল মাত্র, ঠিক লাভ করিতে পারিল না। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক।

পাতঞ্জল এবং গীতা উভয়েই বলিয়াছেন—অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারাই চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হয়; অর্থাৎ বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। এই বৃত্তি-নিরোধ এবং আত্মলাভ, ইহা একই কথা নহে। আত্মলাভ হইলে বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, ইহা খুবই সত্য; কিন্তু বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই আত্মলাভ হয় না। কারণ, বৃত্তি নিরোধের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা বুদ্ধির উপরে অবস্থিত। বৃত্তিনিরোধের ব্যাপার বড় জোর বুদ্ধি পর্য্যন্ত। আচ্ছা এখন দেখ, প্রবৃত্তির কার্য্য সাধনা অর্থাৎ অভ্যাস, আর নিবৃত্তির কার্য্য বৈরাগ্য। এই ত্যাগ ও বৈরাগ্য মায়ের নিকটস্থ হইতে পারে; সাধককে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিতে পারে, কিন্তু ঠিক আত্মলাভ করাইয়া দিতে পারে না। একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের ফল বড় বেশী কিছু নহে; কারণ, লক্ষ্য উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত শর যদি লক্ষ্য বিদ্ধই না করে, তবে উহা লক্ষ্যের দশ হাত দূর হইতে চলিয়া যাওয়ায় যেরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, লক্ষ্যের খুব নিকটস্থ হইয়া চলিয়া যাওয়ায়ও ঠিক সেইরূপই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

উদ্দেশ্য—আত্মলাভ বা পরমসুখ-প্রাপ্তি। অভ্যাস ও বৈরাগ্য পরম-সুখ আনিয়া দিতে পারে না, দুঃখের নিবৃত্তিমাত্র করিতে পারে। সাধনা এবং বৈরাগ্যের ফলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়, ইহা খুবই সত্য; কিন্তু পরম-সুখের প্রাপ্তি হয় না। দুঃখের নিবৃত্তির জন্য যে সুখ, মাত্র তাহাই হয়। দুর্ব্বহভার-বহনকারী ব্যক্তির মস্তক হইতে ভারটী নামাইয়া নিলে, তাহার দুঃখের নিবৃত্তিজন্য যে সুখ, তাহা লাভ হয় বটে; কিন্তু পরমসুখ লাভ হয় না।

জীবমাত্রেই এইরূপ সাধনা এবং বৈরাগ্যের সাহায্যে অগ্রসর হয়, অর্থাৎ কেবল আত্মার সমীপস্থ হয়; তাই এখানেও দেখিতে পাই—চণ্ডমুণ্ডের সৈন্যদল "সমীপগাঃ" হইল, অর্থাৎ মায়ের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া

উপস্থিত হইল। এইবার মা অচিরাৎ ইহাদিগকে বিনাশ করিবেন, আত্মা মা যে আমার সর্ব্ব-ভাবাতীতা ; সুতরাং সর্ব্বভাবের সহিত সাধনা ও বৈরাগ্যকে বিলয় করিয়া, তারপরে তিনি স্বরূপে প্রকাশিত হইবেন। যাঁহারা যথার্থ সাধক, তাঁহারা চণ্ডীর এই অপূর্ব্ব রহস্য অবগত হইয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন। আর যাঁহারা এই রহস্য অবগত হইয়া সাধনা এবং বৈরাগ্যকে একান্ত নিষ্প্রয়োজন মনে করিবেন, তাঁহারা যে মহাভ্রান্ত এ বিষয়েও কোন সংশয় করা যায় না। মায়ের সমীপস্থ হইতে হইলে ঐ দুইটী ব্যতীত অন্য উপায় নাই। মায়ের সমীপস্থ হইলে তারপর ত মাতৃলাভ। যাহারা সমীপস্থই হইতে পারেন নাই তাহাদের পক্ষে মাতৃলাভের আশা সুদূর পরাহত। সুতরাং সাধন এবং বৈরাগ্য যে নিষ্প্রয়োজনীয় এবাক্য ভ্রান্তি মূলক।

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদা ॥৪॥

অনুবাদ। অনন্তর অম্বিকা সেই শত্রুগণের প্রতি অতিশয় কোপ প্রকাশ করিলেন। তখন কোপবশতঃ তাঁহার বদনমণ্ডল মসীবর্ণ হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। অম্বিকা মা আমার তখন শত্রুগণের প্রতি অতিশয় কুপিতা হইলেন। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এবং তদনুচরবর্গ যথার্থই শত্রু নহে কি ? মায়ের স্বকায় স্বরূপটী প্রকাশের পক্ষে উহারাই যে অন্তরায়! আপত্তি হইতে পারে---মায়ের আবার শত্রু মিত্র কি ? ইহার উত্তর পূর্ব্বেও দেওয়া হইয়াছে। মা আমার নিত্য নির্ব্বিকারা, তাঁহাতে কোনরূপ ভাববিকার নাই, ইহা খুবই সত্য, তথাপি উপাধিকৃত এই সকল ব্যবহার হইয়া থাকে। যে যেরূপ ভাবটী নিয়া মায়ের সম্মুখে উপনীত হয়, মা আমার তাহার নিকট সেইরূপ ভাবেই প্রকটিত হন। চণ্ডমুণ্ড শত্রুভাবে উপস্থিত ; সুতরাং অবিকারা মাও শত্রুভাবাপন্নবৎ

প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাই মন্ত্রে "অরীন্ প্রতি" কথাটী প্রযুক্ত হইয়াছে।

অসুরগণ মায়ের সমীপস্থ হইয়াছে; সুতরাং উহাদের বিলয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আত্মার সন্নিহিত হওয়া মাত্র সর্ব্বভাব বিলয়প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন,—"চন্দ্র সূর্য্যাদিও সেখানে প্রকাশ পায় না। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অন্ন। স্বয়ং মৃত্যুও তাঁহার উপকরণ" ইত্যাদি। সর্ব্বতোভেদী সর্ব্বভাব-বিলয়কারী সে প্রকাশ। অসুরগণ জানে না যে, তাহাদের বাস্তবিক সত্তাই নাই; এই যে ব্যবহারিক সত্তা পরিলক্ষিত হয়, তাহাও একমাত্র মায়ের সত্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং মায়ের স্বরূপ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অসুরগণের বিলয় অবশ্যম্ভাবী। অন্ধকার যদি আলোককে ধরিতে যায়, তবে অন্ধকারের যে দশা উপস্থিত হয়, সম্প্রতি অসুরগণেরও সেই দশা উপস্থিত। এই যে স্বাভাবিক প্রলয়, এই যে সৎএর মধ্যে অসতের বিলয়, ইহারই পূর্ব্বরূপ—মায়ের কোপ; তাই ঋষি বলিলেন—'কোপং চকার।'

জগতে দেখিতে পাওয়া যায়—কোপ হইলে বদন রক্তবর্ণ হয়; কিন্তু এখানে ঋষি বলিলেন—মায়ের বদনমণ্ডল কোপভরে মসীবর্ণ হইল। মা আমার অচিরে প্রলয়ঙ্করী ঘোরা তামসী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবেন, ইহা তাহারই পূর্ব্বসূচনা। সাধারণতঃ ক্রোধ হইলে রজোগুণের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু এখানে রজোগুণের নহে, পরাপ্রকৃতির তমোগুণের অভিব্যক্তি হইতেছে; তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ, তাই মা আমার মসীবর্ণা। তমোগুণেই সর্ব্বভাবের বিলয় সাধিত হয়। ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় খণ্ডে বলিয়া আসিয়াছি—তমোগুণের চরম পরিণতি সর্ব্ববৃত্তির অত্যন্ত নিরোধ। এই নিরোধ এবং বিলয় একই কথা। সর্ব্বভাবের সম্যক্ বিলয় হইলেই মা আমার বিশুদ্ধবোধ-স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। বদন শব্দের অর্থ সম্মুখভাগ। চিতিশক্তির যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহাই অতীব সুমনোহরা কেবলানন্দময়ী অম্বিকামূর্ত্তি। মায়ের এই

অম্বিকা মূর্ত্তির সম্মুখভাগেই সর্ব্বভাবের প্রলয় বিরাজ করে পরবর্ত্তিমন্ত্রে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

ভ্রূকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥৫॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥৬॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥৭॥

অনুবাদ। তখন তাঁহার (অম্বিকার) ভ্রূকুটীকুটিল ললাটফলক হইতে অতিদ্রুতবেগে করালবদনা কালীমূর্ত্তি বিনিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ মূর্ত্তির হস্তে অসি পাশ এবং বিচিত্র খট্বাঙ্গ, উহার বিভূষণ নরশিরোমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মাংস শুষ্ক (অর্থাৎ দেহ অতিশয় শীর্ণ), আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর, বদন অতিবিস্তৃত, বিলোল রসনা ঐ ভীষণ মূর্ত্তিকে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার রক্তবর্ণ নয়নত্রয় কোটরপ্রবিষ্ট, তিনি ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। অম্বিকার কোপ প্রলয়ঙ্করী সংহারিণী শক্তিতে প্রকাশ পাইল। ললাটফলক অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতেই সর্ব্বভাব বিলয়কারী মহাশক্তির আবির্ভাব হইল! সাধকগণও বুঝিতে পারেন—আজ্ঞাচক্রে সমাহিত হইলেই জগদ্ভাব সম্যক্ বিলুপ্ত হয়; তাই মন্ত্রে "ললাটফলকাৎ" পদটীর প্রয়োগ হইয়াছে। মায়ের ললাটদেশ হইতে ভীষণা কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল।

কালী—কালশক্তি। যে চৈতন্যময়ী মহাশক্তি কালবোধে প্রবুদ্ধা হন, তাঁহাকেই কালীশক্তি বলে। কালাতীত সত্তায় প্রবেশ করিতে

হইলে, সকল সাধককেই এই কালীমূর্ত্তির ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। কালী মা আমার ভীষণা সংহারিণী মহতী শক্তি। এতদিন এ মূর্ত্তি নেত্রপথে নিপতিত হয় নাই। বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে অবস্থান করিবার জন্য একান্ত লালায়িত না হইলে, মায়ের এই সংহারিণী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হয় না। আজ সাধক জগদ্‌ভাবকে তুচ্ছ করিয়া, স্বকীয় বিশিষ্ট আমিত্বটাকে বলি দিয়া, আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করিবার জন্য উন্মত্ত, আজ প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়াও মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য একান্ত লালায়িত; তাই মা আজ কৃপা করিয়া চণ্ডমুণ্ড-বধের জন্য সর্ব্বভাব বিলয়ের জন্য সংহারিণী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

চিতিশক্তি সর্ব্বপ্রথমেই আপনাতে কাল ও দিক্ কল্পনা করেন, তারপর ক্রমে ক্রমে অনন্তবৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের সৃষ্টি হয়। চিতিশক্তি হইতেই কালশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তাই অম্বিকার ললাটফলক হইতে কালীর নিষ্ক্রামণ বর্ণিত হইয়াছে। এই কালই জগদাধার। সর্ব্বভাবের কলন বা সংহরণ করেন বলিয়াই ইঁহার নাম কালী। কাল ও কালী অভিন্ন। সাধক! একবার প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, তুমি এবং এই জগৎ কালের গর্ভেই ফুটিয়া উঠিয়াছ, আবার কালের গর্ভেই অস্তমিত হইতেছ। সৃষ্টির প্রথম ক্ষণ হইতেই কলন বা সংহরণ-ক্রিয়া চলিতে থাকে; তারপর একদিন উহার পরিসমাপ্তি হয়,—অর্থাৎ পূর্ণভাবে সংহরণ হইয়া যায়। সৃষ্ট বস্তুকে সংহার করিতে যতটুকু অপেক্ষা, যতটুকু সময়ের আবশ্যক হয়, সেইটুকুরই নাম স্থিতি। বাস্তবিক স্থিতি বলিয়া কিছুই নাই, সকলই মৃত্যুপুরাভিমুখে গতিশীল। স্থিতি একমাত্র সত্য-স্বরূপিণী মাতে অবস্থিত। কাল ও গতি অভিন্ন। তত্ত্বতঃ কাল বস্তুটাই ভয়ঙ্কর গতিশীল (১); সুতরাং কালরূপ আধারে যাহা কিছু

(১) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—কাল স্থির অখণ্ড দণ্ডায়মান, আর এখানে বলা হইল—কাল ও গতি অভিন্ন। তত্ত্বদৃষ্টিতে এই উভয় বাক্যে কোন বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, ক্রিয়ার আধাররূপ কালকে লক্ষ্য করিয়া স্থির বলা যায়, আর ক্রিয়ারূপ কালকে লক্ষ্য করিয়া উহাকে চঞ্চল বলা যায়। মীমাংসাদর্শন "ক্রিয়ৈব কালঃ" এই মতাবলম্বী।

প্রকাশ পায়, সে সকলই গতিশীল। যেমন দ্রুতগামী শকটারূঢ় ব্যক্তি শত চেষ্টায়ও স্বকীয় গতি নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, ঠিক সেইরূপ কালারূঢ় জীবজগৎ সহস্র চেষ্টায়ও স্বকীয় ধ্বংসাভিমুখী গতিকে ক্ষণকালের তরেও নিরুদ্ধ করিতে পারে না।

এই বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে—অগণিত জীব প্রতি মুহূর্ত্তে দ্রুতবেগে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। আজ যে শিশু, কিছুদিন পরে সে যুবক। সকলেই শিশুর বয়োবৃদ্ধি দর্শন করে; বাস্তবিক কিন্তু শিশুর আয়ুঃ হ্রাস হইতেছে—ধ্বংসপুরাভিমুখে বেশী অগ্রসর হইয়াছে। এইরূপ বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী দেব দানব নর গ্রহ উপগ্রহ, এক কথায় ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত সকলেই অজ্ঞাতসারে দ্রুতবেগে মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কি এক প্রবল আকর্ষণে এই পরিদৃশ্যমান জীব-জগৎ স্বেচ্ছায় ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা কে বলিবে? দেখ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালীর করালবদনে প্রবেশ করিবার জন্য অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। দেখ—"যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ। তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥" বহ্নির অভিমুখে ধাবিত পতঙ্গবৃন্দের ন্যায়, জীবসমূহ যেন ভূতাবিষ্ট হইয়া সংহার-অনলে আত্মাহুতি দিবার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। দেখ, তোমার দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণু কালীর করাল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সংহারিণী শক্তির অঙ্কে মিলাইয়া যাইবার জন্য কত ব্যস্ত! ওঃ! তুমি কি অবস্থায় আছ! দেখ, তোমার ঊর্দ্ধে নিম্নে, সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র কালী—সর্ব্বত্র মৃত্যু! কেবল ধ্বংস, কেবল বিনাশ! মৃত্যুরই কোলে তুমি অবস্থিত! কেবল তুমি নয়, তুমি যাহাদিগকে আমার বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছ, একটু স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখ—তাহারাও তোমাকে ছাড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন দিবার জন্য কত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। প্রতিশ্বাসে-প্রশ্বাসে এই মরণাভিমুখী গতি প্রকট হইতেছে! যে শ্বাস প্রশ্বাসকে

তোমরা জীবনের লক্ষণ বলিয়া মনে কর, ঐ উহাই ত প্রতি পলে পলে তোমাদিগকে ধ্বংসপুরের অতিথি করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। মৃত্যুই তোমাদের স্বরূপ, মরিবার জন্যই জন্মধারণ করিয়াছ! ওগো! তুমি কি করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? তুমি কি মায়ের এই সংহারিণী করাল—কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাও না?

মাভৈঃ! কিন্তু ভয় নাই! মৃত্যু মৃত্যু বলিয়া ভয় করিয়া পলাইতে চেষ্টা করিও না, পলাইবার উপায় নাই, উহাকেই মা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। যে দিকে অগ্রসর হইতেছ, সেই মৃত্যুরই কোলে মা বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে চেষ্টা কর, দেখিবে—তুমি কালাতীত সত্তার—অমৃতের সন্ধান পাইয়াছ। যেখানে মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই, কালী তোমায় সেইখানে আনিয়া দিবেন। তখন দেখিতে পাইবে, তুমি নিত্য, তুমি অমৃত, তুমি আনন্দময়। কিন্তু সে অন্য কথা।

এই কালী—করালবদনা। মায়ের আমার মুখমণ্ডল অতি ভীষণ; সমগ্র অনাত্মভাবকে মা গ্রাস করেন, তাই মা আমার করাল-বদনা। মা আমার ঘোরা—কৃষ্ণবর্ণা; যে স্থানে সর্ব্ববর্ণের সর্ব্বভাবের অভাব হয়, যেখানে কোন কিছুই নাই, সে স্থান যে কত ঘোর, কত কৃষ্ণ, কত অপ্রকাশ, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? যদি কাহারও সেই ঘনকৃষ্ণা সংহারিণী মাতৃমূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, তবে মাত্র তিনিই বুঝিতে পারিবেন—মা আমার কত ভীষণা! আরে, যেখানে আমিটাকেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—দেহ ইন্দ্রিয় ত দূরের কথা, ইহা সেই স্থান! ঘোর-ঘনঘটাচ্ছন্ন অমাবস্যা-নিশীথে গভীর সুষুপ্তির ভিতর দিয়াও যদি সচেতন অর্থাৎ জাগিয়া থাকিতে পার—না, না, তাতেও যে প্রাণনক্রিয়া বা শ্বাস প্রশ্বাস থাকে—উহাও থাকিবে না; দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই, মন নাই, কল্পনা নাই, কিছু নাই! কিছু নাই! আমিও নাই! তারপর আস্তে আস্তে যদি আমি-বর্জ্জিত আমিটার সন্ধান লইতে পার, তবেই বুঝিতে পারিবে, কালী কত ভীষণা। ভাষায় সে ভীষণতা ব্যক্ত হয় না। (শুষ্কমাংসাতিভৈরবা

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ইত্যাদি যতই বল না কেন, সে ভীষণতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

যাঁহারা চিত্রে অঙ্কিত কালীর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া উঁহাকে প্রণাম করিতেও ভয় পাইয়া দ্বিভুজ মুরলীধর রাধিকারমণের শরণাপন্ন হইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা জানেন না যে, মৃত্যুর পরপারে না গেলে, অর্থাৎ কালশক্তিকে অতিক্রম করিতে না পারিলে, সে হৃদয়রঞ্জন শ্যামসুন্দর রূপের দর্শন হয় না। যিনি কালী, তিনিই যে কালাতীতস্বরূপে আনন্দময় শ্যামসুন্দর, ইহা তাঁহারা যেদিন বুঝিতে পারিবেন, সেদিন আর ঐ ভীতিভাব থাকিবে না। যাক্, এ সকল অবান্তর কথা।

মা আমার অসি পাশ এবং বিচিত্র-খট্বাঙ্গধারিণী। অসি—ছেদনকারক অস্ত্র। পাশ—আকর্ষণকারক অস্ত্র। খট্বাঙ্গ—চূর্ণ কারক অস্ত্র। ছেদন আকর্ষণ এবং চূর্ণকরণ, এই ত্রিবিধ প্রকারে সর্ব্বভাব—অনাত্মভাব কালের করালবক্ত্রে বিলয় প্রাপ্ত হয়। যে পারমার্থিক সত্তাকে আশ্রয় করিয়া দৃশ্যবর্গের ব্যবহারিক অস্তিত্ব প্রকাশ পায়, উহাদের নিকট হইতে সেই পারমার্থিক সত্তাকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করাই কালশক্তির প্রথম কার্য্য। মায়ের হস্তস্থিত অসিখানি উহারই প্রতিভূ। কল্পিত অংশ বিচ্ছিন্ন হইলে, যে পারমার্থিক অংশ প্রকাশিত হয়, তাহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক পরমাত্মসত্তায় মিলন করিয়া দেওয়া দ্বিতীয় কার্য্য। মায়ের হস্তস্থিত আকর্ষণকারী পাশ অস্ত্রের ইহাই রহস্য। অবশেষে যাবতীয় দৃশ্যভাবকে চূর্ণ অর্থাৎ বিলয় করিয়া দেওয়াই মায়ের তৃতীয় কার্য্য। কালীর হস্তস্থিত খট্বাঙ্গ নামক অস্ত্রটী এই বিলয়-কার্য্যের প্রতিভূস্বরূপ বুঝিয়া লইবে। মা এই তিন প্রকারেই অনাত্ম-ভাবের বিলয় সাধন করিয়া থাকেন, তাই মন্ত্রে মাকে "অসিপাশিনী বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা" বলা হইয়াছে।

নরমালাবিভূষণা। নরমালা শব্দে নরমুণ্ড-মালা বুঝিতে হইবে। মা আমার পঞ্চাশন্মুণ্ডমালিকা—পঞ্চাশটী নরমুণ্ডদ্বারা মালা গাঁথিয়া মা গলদেশে পরিধান করেন। পঞ্চাশন্মুণ্ডমালা কি? পঞ্চাশৎ

বর্ণমালিকা। অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ এবং ককারাদি চতুস্ত্রিংশদ্ ব্যঞ্জনবর্ণ, সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশটী বর্ণ—অক্ষর; ইহাই মায়ের মুণ্ডমালা। কথাটা একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক।

এই যে জগৎ দেখিতে পাইতেছ, উহা কতকগুলি শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। মহিষাসুরবধ প্রসঙ্গে নাদতত্ত্বের ব্যাখ্যাবসরে ইহা বিশেষরূপ বলা হইয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য মনুষ্য পশু বৃক্ষ লতা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দই জগদাকারে পরিদৃশ্যমান হইতেছে। যেরূপ "ঘট" বলিলে একটা নামমাত্র পাওয়া যায়, বাস্তবিক মৃত্তিকা ব্যতীত ঘটের অপর কোন সত্তা নাই, সেইরূপ এই জগৎ কতকগুলি নাম বা শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাই উপনিষদের ঋষি প্রশান্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন,—"বাচারম্ভনং নামধেয়ং বিকারঃ মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" এ জগৎ 'বাচারম্ভন'—বাক্যমাত্র। বাক্য বর্ণসমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই বর্ণগুলিই অসুর; কারণ, ইহারাই সমষ্টিভাবাপন্ন হইয়া ঘট পটাদি অনাত্মভাব ফুটাইয়া তুলে। বর্ণসমূহ যতক্ষণ বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাবের প্রকাশক থাকে, ততক্ষণই উহারা জীবিত, কিন্তু মা যখন সর্ব্ব-গ্রাসিনী কালীমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন বা প্রকটিতা হন, তখন পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটি বর্ণ আর কোনরূপ বিশিষ্ট ভাব উৎপাদন করিতে পারে না; মৃতবৎ হইয়া পড়ে। বিভিন্ন পদার্থের প্রতীতি করাইবার সামর্থ্যই বর্ণের বর্ণত্ব বা জীবিত ভাব। যখন ভাব বলিতে আর কিছু থাকে না, তখন বর্ণের বর্ণত্ব বিলুপ্ত হয়, অর্থাৎ ভাব উৎপাদন-সামর্থ্য বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং মৃতবৎ অবস্থান করে। উহাই প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তির গলদেশে মুণ্ডমালারূপে পরিশোভিত। উহারা ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজরূপে থাকিয়া যায় বলিয়াই মাতৃঅঙ্গের বিভূষণরূপে অবস্থান করে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হওয়ামাত্র সাধকগণের হৃদয়ে এ তত্ত্ব স্বতঃই প্রকাশ পায়।

দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা—শার্দ্দূলচর্ম্মপরিহিতা। কালীমূর্ত্তি সর্ব্বদাই দিগ্‌বসনা উলঙ্গিনী। সংহারিণী শক্তির কোথাও কিছু আবরণ বা

সঙ্কোচ নাই। এখানে কিন্তু দেখিতে পাই—মা আমার শার্দ্দূল-চর্ম্মপরিহিতা। এখনও চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ প্রভৃতি অসুর নিহত হয় নাই—অর্থাৎ এখনও কারণ-দেহস্থ সূক্ষ্মতম সংস্কারের বীজগুলি বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই, তাই ঐ সকল বৈচিত্র্যময় নানাভাবের বীজগুলি এখন পর্য্যন্ত মাতৃ-অঙ্গে বিরাজ করিতেছে—উহাই ব্যাঘ্রচর্ম্ম। কৃষ্ণ পীত রক্ত প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণময় শার্দ্দূলচর্ম্মরূপ নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কার-সমূহ এখন পর্য্যন্ত মায়ের বসন বা আচ্ছাদনরূপে অবস্থান করিতেছে, তাই এখানে মা আমার চামুণ্ডামূর্ত্তিতে আবির্ভূতা। আর যখন সর্ব্ব-ভাবের বিলয় হইয়া যাইবে, তখনই শ্যামা মা আমার উলঙ্গিনী মূর্ত্তিতে প্রকটিতা হইবেন।

অনেক সাধক শার্দ্দূল-চর্ম্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সাধন ভজনাদি করিয়া থাকেন। উহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি (তাড়িত শক্তির অপরিচালকতা প্রভৃতি) যাহাই থাকুক্ না কেন, উহা যে সূক্ষ্মতম সংস্কারসমূহের বাহ্যলক্ষণস্বরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। ব্যাঘ্রচর্ম্ম দর্শনমাত্রই নিজের নানা বিচিত্র কর্ম্মসংস্কারগুলি মনে পড়িয়া যায় বলিয়াই, বোধ হয় পূর্ব্বকালে উগ্রতপাঃ সাধকগণ উহার ব্যবহার করিতেন। যাক্ এ সকল অপ্রাসঙ্গিক কথা।

শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। সর্ব্ববিধ সংস্কার ক্ষয় করিবার পূর্ব্বে মা আমার "শুষ্কমাংসা"—অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা শীর্ণাই থাকেন। আরে, সমগ্র সংস্কার আহার করিলে, তবে না মায়ের অঙ্গ পুষ্ট হইবে। এখন মায়ের ঐরূপ ক্ষুধিত মূর্ত্তিরই প্রয়োজন। প্রলয়ের পূর্ব্বাবস্থায় শক্তিকে বুভুক্ষিতই মনে হয়। সর্ব্বভাবকে প্রলয়কবলিত করিবার জন্য উদ্যত হইলেই মায়ের আমার শীর্ণ ও ভীষণ ভাব পরিলক্ষিত হয়। সাধক! প্রলয়ঙ্করী শক্তি যথার্থই অতি ভৈরবা।

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা। রক্তবীজবধের জন্য অচির-কালমধ্যেই মায়ের ঐরূপ বিস্তারবদন ও বিলোলরসনার বিশেষ প্রয়োজন হইবে। আমরা যথাস্থানে এ রহস্য বুঝিতে পারিব।

নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা। ক্রোধের উদ্দীপনাই প্রলয়ের হেতু, তাহারই বহির্লক্ষণ রক্তনয়ন এবং নাদ। বিশিষ্ট প্রকাশশক্তি বিলুপ্তপ্রায়, তাই নয়ন নিমগ্ন অর্থাৎ চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট; তদ্‌ব্যতীত মায়ের ভীষণ নাদ সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়াছে, আর বিশিষ্ট ভাবে এটা কি ওটা কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। এ সকলই প্রলয়ঙ্করী শক্তির স্বরূপ বর্ণনা।

সাধক মনে করিও না—জগদ্‌ভাব অর্থাৎ স্থূল নামরূপগুলির বিলয় করিতেই এইরূপ সংহারিণী শক্তির প্রয়োজন। একটু স্বচ্ছ চিদাকাশ প্রকাশ হইলেই স্থূল ভাবগুলি অতি সহজে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম-ভাবগুলি—জীবত্বের সূক্ষ্মতম বীজগুলির বিলয় করিতে মাকে এইরূপ বিশেষভাবে প্রকটিত হইতে হয়। এইরূপ প্রলয়ঙ্করী শক্তির আবির্ভাব না হইলে জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারগতির হেতুভূত সূক্ষ্মতম সংস্কারগুলির বিলয় হয় না। সর্ব্বভাব যে কেন্দ্র হইতে বিকশিত হয়, সেই অব্যক্ত বীজময় কেন্দ্রটীকে বিলয় করিতে হইলে, মায়ের এইরূপ চামুণ্ডামূর্ত্তিতে আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক।

ওগো, যাহারা মায়ের এমন স্বরূপটী দেখিতে পাও নাই, বুঝিও—তাহাদের সংসার-গতি-নিবৃত্তির উপায় হয় নাই। সত্যই এ রূপ দেখা যায়—সত্যই প্রলয়ঙ্করী শক্তির প্রকাশ হয়। মা মা বলিয়া কাঁদিলে, মায়ের বক্ষে আপন সত্তাটী মিলাইয়া দিবার জন্য ব্যাকুল হইলেই, মা আমার এইরূপে দেখা দিয়া জীবত্বের যাবতীয় সংস্কার বিলয় করিয়া দেন। সাধক! তুমি কি বীর সন্তানের মত এই প্রলয়ঙ্করী কালীমূর্ত্তি দেখিতে চাও?

সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্‌।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্‌বলম্‌ ॥৮॥

অনুবাদ। সেই কালী মহাসুরগণকে নিহত করিতে করিতে

সুরারি-সৈন্যমধ্যে অভিপতিত হইলেন; এবং অসুরবলকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। সংহারিণী-শক্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় আসুরিক ভাব অস্তমিত হইতে থাকে। সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এক দিকে ভয়ঙ্করী ঘোরা কৃষ্ণা মূর্ত্তির প্রকাশ, অন্য দিকে চিত্তগত ব্যক্ত অব্যক্ত ভাবসমূহের একে একে বিলয়। সাধকপ্রবর অর্জ্জুনও এক দিন এই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে একান্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মা এখানে অসুরসৈন্যমধ্যে নিপতিত হইয়া যে সকল অসুরকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন—উহারা চণ্ডমুণ্ডের সৈন্য অর্থাৎ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অনুচর। প্রবৃত্তির বিষয়াভিমুখী বেগের ফলে যে সকল সংস্কার আহিত হয়, তাহা পূর্ব্বে মহিষাসুর বধের সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হইয়াছে। এখানে প্রবৃত্তি আত্মাভিমুখী এবং নিবৃত্তি বিষয়-বিরতি সম্পাদনপূর্ব্বক প্রবৃত্তির সহায়। এতদুভয়েরও বিভিন্ন কর্ম্ম আছে। কর্ম্ম থাকিলেই কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ত্তব্যত্ব প্রভৃতি সংস্কার থাকে। যদিও ইহারা সূক্ষ্ম—উন্নত স্তরে, তথাপি ইহারাও অনাত্ম-ভাবের পরিপোষক। বিন্দুমাত্র অনাত্মবোধ থাকিতেও আত্মার যথার্থ স্বরূপটী উদ্ভাসিত হয় না। তাই মা আমার, সাধকের করুণ ক্রন্দনে উদ্বেলিত হইয়া প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন; এবং প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অনুচররূপ অনাত্ম-সংস্কারগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিলেন।

পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহিযোধঘণ্টাসমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্ ॥৯॥

অনুবাদ। তিনি পার্শ্বরক্ষক মহামাত্র (মাহুত) গজারোহী যোদ্ধা এবং ঘণ্টা প্রভৃতি আভরণ সহিত হস্তীগুলিকে এক হাতে ধরিয়া মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, চণ্ডমুণ্ড চতুরঙ্গ বল সহ যুদ্ধার্থ

উপস্থিত হইয়াছে। হস্তী তাহার প্রথম অঙ্গ। হস্তীর পার্শ্বরক্ষককে পার্ষ্ণিগ্রাহ এবং পরিচালক অর্থাৎ মাহুতকে অঙ্কুশগ্রাহী বলে। চামুণ্ডা মা আমার এই পার্ষ্ণিগ্রাহ, অঙ্কুশগ্রাহী যোদ্ধা স্বয়ং এবং ঘণ্টা প্রভৃতি আভরণ সহ হস্তীসমূহকে এক হাতে ধরিয়া মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিচিত্র যুদ্ধ! স্বয়ং সংহারিণী শক্তির সম্মুখে কে দাঁড়াইবে! যাহা কিছু অনাত্ম-ভাবরূপে প্রকাশ পায়, সে সকলই প্রলয়কবলিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডে চিক্ষুরের চতুরঙ্গ সেনার ব্যাখ্যাবসরে বলা হইয়াছে, ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয়, ইহারাই চতুরঙ্গ। সে স্থানে সূক্ষ্মশরীরস্থ ক্লেশ কর্ম্মাদিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, আর এখানে কারণ শরীরে যে ক্লেশাদির বীজ থাকে, তাহাকেই চণ্ডমুণ্ডের চতুরঙ্গ বলা হইয়াছে।

হস্তী—ক্লেশস্থানীয়। কারণদেহে সুখ দুঃখ নামক ক্লেশের বীজ থাকে বলিয়াই সূক্ষ্মদেহে সুখ দুঃখ উপস্থিত হয়। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত ঐ সূক্ষ্ম ক্লেশ-বীজগুলি যে চেতনকর্ত্তৃক পরিচালিত, রক্ষিত এবং যে অধিষ্ঠান-চৈতন্যে উহা অবস্থিত তাহারাই যথাক্রমে পার্ষ্ণিগ্রাহ, অঙ্কুশগ্রাহী এবং যোদ্ধা। যদিও চৈতন্যাংশে ঐরূপ কোন ভেদ নাই—থাকিতে পারে না, তথাপি ঐ সকল উপাধিবশে চৈতন্যও যেন বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এই বিশিষ্টতা নাশই অসুর বিলয়। প্রলয়ঙ্করী শক্তির কবলে উহারা অর্থাৎ এই বিশিষ্ট ভাবসমূহ যুগপৎ নিপতিত হইতেছে, তখন আর ক্লেশ বলিয়া কোনরূপ প্রত্যয় থাকে না। যথার্থ সে সংহারিণী কৃষ্ণামূর্ত্তির প্রকাশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবরাশি মিলাইয়া যাইতে থাকে। সে অবস্থায় মনে হয়—ভাবগুলি যেন একখানা কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর মুখের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। কালীর তীব্র আকর্ষণশক্তির প্রভাবে সূক্ষ্মতম সংস্কারের বীজগুলি অব্যক্ত ক্ষেত্রে মিলাইয়া যাইতেছে—এইটি বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রে "হস্তেন আদায়" বলা হইয়াছে।

তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবম্ ॥১০॥

অনুবাদ। সেইরূপ অশ্বসহ আরোহী, সারথিসহ রথ (এবং রথী) মুখে নিক্ষেপপূর্ব্বক দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বমন্ত্রে হস্তীর কথা বলা হইয়াছে, এই মন্ত্রে অশ্ব এবং রথের বিষয় বলা হইল। অশ্ব ও রথ শব্দে যথাক্রমে কর্ম্ম এবং কর্ম্মাশয় বুঝায়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে চৈতন্য কর্ম্ম এবং কর্ম্মাশয়রূপে প্রকাশিত, তাহাই অশ্বরক্ষক ও রথচালক বা সারথি। এ সকলই মা আমার করালবক্ত্রে নিক্ষেপপূর্ব্বক দন্তদ্বারা অতি ভীষণভাবে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন—অর্থাৎ কারণদেহস্থ অব্যক্ত বীজভাবাপন্ন কর্ম্ম এবং কর্ম্মাশয়কে প্রলয়কবলিত করিলেন।

ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়াও ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন,—"অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ। ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি। কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।" সেখানেও দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক বদনে স্বপক্ষ বিপক্ষ যোদ্ধৃবর্গের চর্ব্বণ বর্ণিত হইয়াছে। সেখানেও অর্জ্জুনের প্রার্থনায় ভগবান্ নিজের স্বরূপ বলিতে গিয়া "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। গীতায় যিনি কাল, চণ্ডীতে তিনিই কালী। গীতায় স্থূল সংস্কারগুলির প্রলয়ের কথা আছে, দেবী-মাহাত্ম্যের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সূক্ষ্ম সংস্কারসমূহের বিলয় বর্ণিত হইয়াছে, আর এই তৃতীয় খণ্ডে—কারণ-শরীরগত সূক্ষ্মতম বীজরূপী সংস্কারসমূহের প্রলয় বর্ণিত হইতেছে। সাধকগণ যেমন স্তরে স্তরে জ্ঞানের উন্নত সোপানে আরোহণ করিতে থাকেন, সংস্কারগুলিরও ঠিক তেমনি স্তরে স্তরে ভেদ হইয়া যায়। জ্ঞানের এই সকল উচ্চস্তরে আরোহণ করিবার পক্ষে একমাত্র শরণাগত ভাবই সহজ

ও সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা। সাধক যে পরিমাণে ভগবানের শরণে অর্থাৎ আশ্রয়ে আসিতে থাকে, সেই পরিমাণেই জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে। শরণাগত ভাবের পূর্ণতা আত্মজ্ঞানে। যখন আর আমি বলিতে কেহ থাকে না, অথচ একমাত্র আমিই থাকে তখনই শরণাগত ভাব পূর্ণ হয়! আবার একমাত্র আস্তিক্যবুদ্ধিই এই শরণাগত হওয়ার পক্ষে সর্ব্ব-প্রধান অবলম্বন। মানুষ যে পরিমাণে ভগবৎসত্তায় বিশ্বাসবান্ অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ হইতে থাকে, শরণাগত ভাবটীও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমরা দেবী-মাহাত্ম্যের পাঠকগণ সর্ব্বথা শরণাগত হইবার জন্যই চেষ্টা করি; তাই দেখিতে পাইতেছি, মা আমার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া আমাদের অনাত্ম-সংস্কার-সমূহকে—ভেদজ্ঞানের বীজগুলিকে স্বয়ংই ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিতেছেন। অহো ধন্য আমরা!

একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। অনন্তর কাহারও কেশ, কাহারও বা গ্রীবাদেশ ধারণ করিলেন। কাহাকেও পদদ্বারা, কাহাকেও বা বক্ষোদ্বারা বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। চণ্ড মুণ্ডের চতুরঙ্গ বলের তিনটী অঙ্গ হস্তী অশ্ব এবং রথ শেষ হইয়াছে। এইবার অবশিষ্ট পদাতি-সৈন্যের ক্ষয় বর্ণিত হইতেছে। বিপাক অর্থাৎ কর্ম্মের পরিণামসমূহই পদাতি সৈন্যস্থানীয়। কর্ম্মাশয়ে সঞ্চিত কর্ম্মবীজগুলিকে ইহারা ফলোন্মুখ অবস্থায় আনয়ন করে। সূক্ষ্মে ঐ বিপাকশক্তি থাকে বলিয়াই উহারা ফলোন্মুখ হইয়া স্থূলে আসিয়া জাতি আয়ু এবং ভোগরূপে প্রকাশ পায়। "আমি অমুক জাতি, আমার এত বয়স, আমার এই সুখ দুঃখ ভোগ" এ সকলই, ঐ বিপাক-শক্তির কার্য্য।

মা এখানে প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া উহাদিগকে "কেশেষু

জগ্রাহ”—কেশ গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ শিরোদেশ পরিগ্রহ করিলেন। প্রলয়ঙ্করীর গ্রহণ বলিলেই প্রলয় করা বুঝা যায়। বিশেষ কথা এই যে সংস্কারের মস্তক গৃহীত হইলে আর কোনও কালেই তাহাদের পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কা থাকে না। সাধারণতঃ সংস্কারবীজগুলি অব্যক্ত ক্ষেত্রে লুক্কায়িত থাকে উপযুক্ত দেশকাল ও পাত্রসহযোগে ফুটিয়া উঠে; তাই মা আজ সেই অব্যক্ত ক্ষেত্রকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

সাধক! যদিও মাতৃকৃপায় সঞ্চিত এবং আগামী কর্ম্মের অশ্লেষ এবং বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি তুমি জাতি আয়ু এবং ভোগরূপ ভেদপ্রতীতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাও নাই। ক্ষণে ক্ষণে উহাদের নানারূপ বিকাশ দেখিতে পাও; উহার কারণ, এখনও চণ্ডমুণ্ডের চতুরঙ্গ বল নিহত হয় নাই! কিন্তু এবার মা তোমাকে সর্ব্ববিধ ভেদজ্ঞানের পরপারে লইয়া যাইবেন। তাই এত আয়োজন, এত ক্রূর অভিনয়, এত প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য। মা নানাভাবে অসুর ক্ষয় করিতে লাগিলেন—কাহারও গ্রীবা গ্রহণ, কাহাকে চরণে মর্দ্দিত, কাহাকে বা বক্ষোদ্বারা নিপোথিত করিলেন। স্থূল কথা—প্রলয়-শক্তির প্রকাশে নানা-জাতীয় সংস্কার নানাভাবে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সংস্কার সমূহের বিচিত্রতাবশতঃই প্রলয়েরও বিচিত্রতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তাই কেশগ্রহণ গ্রীবাগ্রহণ পদমর্দ্দন প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়গুলি বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী তিনটী মন্ত্রেরও ইহাই রহস্য।

তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্মথিতান্যপি ॥১২॥

অনুবাদ। অসুরগণ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল। দেবী সেগুলিকে মুখে গ্রহণপূর্ব্বক দন্তদ্বারা বিচূর্ণিত করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। প্রলয়মুখে প্রবিষ্ট হইবার সময়েও পূর্ব্বলব্ধ বেগবশতঃ অব্যক্ত বিপাকস্থানীয় পদাতি সৈন্যসমূহ স্বকীয় বহির্মুখী শক্তি প্রয়োগ

করিতে বিমুখ হয় না; অসুরগণের অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগের ইহাই রহস্য। সাধকগণও ইহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন—তাঁহারা যতই জ্ঞান ভক্তির অনুশীলন করুন, যতই মাতৃস্বরূপে সমাহিত থাকুন, বিপাকের ফলরূপ জাত্যায়ুভোগরূপ ত্রিবিধ প্রতীতি হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পান না। বিপাকের ঐ যে পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশ, উহাই অসুরের অস্ত্রাদি প্রয়োগ। কিন্তু এবার উহা ব্যর্থ হইবে—মা এবার স্বয়ং প্রলয়-মূর্ত্তিতে প্রকটিতা। এখন এক একবার ঐরূপ জাত্যাদি বিষয়ক প্রতীতি ফুটিয়া উঠিবে, আর অমনি অদ্বয় আত্মসত্তা তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিবে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতেই উহারা ক্ষীণবল হইয়া পড়িবে।

দেখিতে পাওয়া যায়—সন্ন্যাসিগণ—পরমহংসগণ এই জাতিপ্রতীতি বিলয় করিবার জন্য শিখাসূত্র প্রভৃতি জাতীয় চিহ্ন পরিত্যাগ করেন এবং সকল জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। আয়ুঃপ্রতীতি বিলয় করিবার জন্য স্থূল শরীরের বয়সের কথা বলেন না। ভোগপ্রতীতি বিলয় করিবার জন্য প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি সহ্য করিয়া থাকেন। এ সকলই অতি উত্তম। সন্ন্যাসিগণ আমাদের নমস্য। কিন্তু এই সকল বাহ্য উপায় অবলম্বন এবং অবর্ণনীয় কঠোরতা সহিষ্ণুতা প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াও কয়জন পরমহংস যে উহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহা জানি না। যে হেতু শিখাসূত্রাদি ত্যাগ এবং সকল জাতির অন্ন গ্রহণ করিলেও অন্তরে অন্তরে "আমি অমুক জাতি" এইরূপ একটা প্রতীতি থাকিয়া যায়। বয়সের বিষয় আলোচনা না করিলেও বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি জ্ঞান থাকিয়া যায়। আর ভোগ যে আছে, স্থূল দেহই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। একমাত্র অদ্বয় আত্মস্বরূপ প্রকটিত হইলেই ঐ সকল ভেদ প্রতীতি বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্যথা সহস্র চেষ্টায়ও উহা অপনীত হয় না। আশঙ্কা হইতে পারে, জ্ঞানলাভের পরও ত "জাত্যায়ুভোগ" থাকে তবে আর মায়ের কালীমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া অসুরগ্রাসের সার্থকতা কি হইল? না, এরূপ আশঙ্কা করিও না। মা সত্য সত্যই উহাদিগকে গ্রাস

করিয়া থাকেন, আত্মস্বরূপে প্রকটিত হইয়' থাকেন। এইরূপে আত্মস্বরূপটী উদ্‌ভাসিত হইবার পরও উহাদের অনুবৃত্তি হয়, উহাকে বাধিতানুবৃত্তি কহে। তখন উহারা থাকিয়াও না থাকারই মত হয়। এ বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

বলিনাং তদ্‌বলং সর্ব্বমসুরাণাং মহাত্মনা।
মমর্দ্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ত্তথা ॥১৩॥

অনুবাদ। মা এইরূপে সেই বলবান্ মহাকায় অসুরসৈন্যগণের কতকগুলিকে মর্দ্দিত, কতকগুলিকে ভক্ষিত এবং অপর কতকগুলিকে বিতাড়িত করিলেন।

ব্যাখ্যা। যাহারা মর্দ্দিত এবং ভক্ষিত তাহারা আর কখনও প্রকাশ পাইবে না। কিন্তু যাহারা বিতাড়িত, তাহারা আবার বাধিতানুবৃত্তিরূপে প্রকাশ পাইবে। যে সকল বিপাক আত্মস্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে একান্ত বিরোধী, প্রলয়শক্তি তাহাদিগকে মর্দ্দন ও ভক্ষণ করিলেন। কিন্তু যাহারা বাস্তবিক অন্তরায় নহে, মা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন। এই মনে কর—জাতি আয়ু এবং ভোগ; আত্মস্বরূপ হইতে ব্যুত্থিত হইলেই উহাদের প্রতীতি ফুটিয়া উঠে। সুধু আত্মস্বরূপে অবস্থান কালেই উহারা সম্যক্ বিতাড়িত থাকে। যখন মা আমার আত্মপ্রকাশ করেন, তখন আর ইহাদের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কখনও ছিল বা থাকিবে, এমনও মনে হয় না। কিন্তু ব্যুত্থিত হইলেই উহাদের আবির্ভাব হয়। সাধকের নিজের জাতি আয়ু এবং ভোগবিষয়ক জ্ঞান বিশেষভাবে না থাকিলেও, অপরের জাতি আয়ু এবং ভোগবিষয়ক প্রতীতি থাকিয়া যায়। আবার যে প্রতীতি নিজের বেলা মোটেই নাই, তাহা অপরের সম্বন্ধে কিরূপে থাকিবে, এইরূপ আশঙ্কাও হয়; সুতরাং উহাদের বাধিতানুবৃত্তি অর্থাৎ বিতাড়িত হইয়াও পুনরায় ফিরিয়া আসারূপ ব্যাপারটী নিশ্চয়ই আছে, ইহা বলিতে হয়। এস্থলে পুনরায়

সেই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। যদি জাতি আয়ু এবং ভোগই রহিয়া গেল, তবে মা যে প্রলয়-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া উহাদের নাশ করিলেন, তাহার আর সার্থকতা কি হইল ? হাঁ, সার্থকতা খুবই আছে। উহাদের পারমার্থিকত্ববুদ্ধির বিনাশ হয়। সাধারণ জীব যেরূপ জাতি আয়ু এবং ভোগকে পরমার্থসত্তা-বিশিষ্ট একটা কিছু মনে করে, আত্মজ্ঞানীদের তাহা থাকে না। "আমি ব্রাহ্মণ, আমার আয়ু এত, আমার সুখ দুঃখ" ইত্যাদি প্রয়োগগুলি যে কেবল কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ-জন্য ব্যবহার, উহাদের যে বাস্তবিক কোন সত্তা নাই, ইহা তাঁহারা এত বেশী বুঝিতে পারেন যে, সহস্রবার জাত্যাদির প্রতীতি জাগিলেও তাঁহাদের অদ্বৈত প্রতীতির বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না।

তবে একটা কথা মনে রাখিও—যাহাদের ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয়কে স্বয়ং মা আসিয়া বিলয় করিয়া না দেন, তাহারা শত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া, সহস্র উপদেশ শুনিয়াও উহাদের পারমার্থিকত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারে না। একমাত্র আত্মা মা আমার পরমার্থস্বরূপে আছেন, আর যে কিছুই নাই—এক অদ্বয় সত্তা ব্যতীত আর সকল সত্তাই যে ব্যবহারিক মাত্র, ইহা মা-ই কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দেন। সম্যক উপলব্ধি ব্যতীত কেবল শ্রবণ এবং অনুমান জন্য জ্ঞান কখনও অজ্ঞানকে সম্যক্ দূরীভূত করিতে পারে না।

অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্বাঙ্গতাড়িতাঃ।
জগ্মুর্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥১৪॥
ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্ ॥১৫॥

অনুবাদ। কতকগুলি অসুর খড়্গের দ্বারা নিহত, কতকগুলি খট্বাঙ্গ দ্বারা প্রহৃত, অবশিষ্টগুলি দন্তাগ্রদ্বারা আহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যেই সেই সৈন্যবল নিপাতিত

হইল। ইহা দেখিতে পাইয়া মহাসুর চণ্ড অতি ভীষণা কালীর প্রতি অভিধাবিত হইল।

ব্যাখ্যা। অসি খট্বাঙ্গ প্রভৃতির তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অসুরসৈন্য অসংখ্য। প্রথমেই ধর—জাতিজ্ঞান হইতেই বর্ণ-ধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও নিত্য-নৈমিত্তিকাদি বহু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ক সংস্কার উপচিত হয়। আয়ুজ্ঞান হইতে বাল্য যৌবনাদি বিশেষ অবস্থা ও তত্তৎ কালোচিত কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য জ্ঞানের সংস্কার উপচিত হয়। এইরূপ ভোগ-বিষয়ক বহুসংখ্যক অবান্তর সংস্কারও আহিত হয়। এই সকল একত্র হইয়াই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সৈন্যবল অগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু যতই অসংখ্য হউক না কেন, "ক্ষণেন তদ্‌বলং সর্ব্ব-মসুরাণাং নিপাতিতম্।" ক্ষণকাল মধ্যেই অসুরবল নিপাতিত হইল। আরে, সাক্ষাৎ প্রলয়ঙ্করী শক্তির সম্মুখে উহাদের অস্তিত্ব আর কতক্ষণ থাকিবে। আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকার যেরূপ ক্ষণকাল মধ্যেই বিলয় হয়, জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান এবং তজ্জন্য ভেদ প্রতীতিরাশিও, সেইরূপ ক্ষণকালেই বিলয় হইয়া যায়। এইরূপে স্বকীয় সৈন্যবলকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া স্বয়ং চণ্ড (প্রবৃত্তি) যুদ্ধার্থ মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

শরবর্ষৈর্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরাঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ ॥১৬॥

অনুবাদ। মহাসুর চণ্ড অতি ভীষণ শরবৃষ্টি করিয়া ভীমনয়না দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, এবং মুণ্ডও সহস্র সহস্র চক্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। এইবার চণ্ডমুণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একজন ভীষণ শরবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং অন্যজন সহস্র সহস্র চক্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শর—প্রণব। পুনঃ পুনঃ প্রণবাদি মন্ত্রের স্মরণে অথবা

অনাহত কেন্দ্র হইতে স্বত উত্থিত অতি মধুর প্রণবনাদে মুগ্ধ হইয়া চিত্তকে স্থির রাখিবার যে অদম্য প্রয়াস, তাহাই চণ্ডের শরবর্ষণ। আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তির ইহাই ত শেষ কার্য্য। আর মুণ্ডের বা নিবৃত্তির অস্ত্র হইতেছে চক্র। এই সংসার-চক্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত করান নিবৃত্তির কার্য্য। এইরূপে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়েই স্ব স্ব শক্তি প্রয়োগে প্রলয়শক্তির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। সাধক বুঝিয়া রাখ—যতক্ষণ সাধনা আছে, উপাসনা আছে, প্রণবাদি মন্ত্র জপ আছে, ধ্যান ধারণা আছে, ততক্ষণ আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হয় নাই। আবার যতক্ষণ বিষয়বৈরাগ্য অনাসক্তি প্রভৃতি বোধ আছে, ততক্ষণও মাতৃপ্রকাশ হয় নাই। শরবৃষ্টি ও চক্রাচ্ছাদনের ইহাই তাৎপর্য্য। পরে ইহা আরও পরিস্ফুট করা হইতেছে।

তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্।
বভুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্ ॥১৭॥

অনুবাদ। সেই চক্রসমূহ দেবীর মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, মেঘমণ্ডলাভ্যন্তরস্থিত অসংখ্য রবিবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। ভয়ঙ্করী প্রলয়ঙ্করী শক্তির কবলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অধ্যবসায়গুলি বিলয় হইবার সময় অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। উপমা-স্বরূপ দেবী-মাহাত্ম্যের ঋষি অর্কবিম্ব এবং ঘনোদর এই দুইটী পদ প্রয়োগ করিলেন। ঘনোদরের সহিত কালীর মুখমণ্ডলের এবং রবিবিম্বের সহিত অস্ত্রসমূহের উপমা করা হইয়াছে। মহাসুর মুণ্ডকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত চক্রসমূহ—ত্যাগ বৈরাগ্য সংযম নিয়ম অহিংসা অপরিগ্রহ প্রভৃতি নিবৃত্তির কার্য্যসমূহ যখন কালীর মুখমণ্ডলে অর্থাৎ প্রলয়-গহ্বরে বিলয় হইতে থাকে, তখন বাস্তবিকই মনে হয়, কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডলের অভ্যন্তরে রবিবিম্ব সদৃশ উজ্জ্বল উজ্জ্বল ভাবগুলি মিলাইয়া যাইতেছে। যেগুলি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ উপাদান, যাহারা

সত্ত্বগুণের নির্ম্মল প্রকাশ, যে সকল দেবোচিত শ্রেষ্ঠ গুণ, সেই সকল সমুজ্জ্বল গুণ যখন প্রলয়ের দংষ্ট্রাকরাল ঘনকৃষ্ণ মুখমণ্ডলে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন উহাদের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা যেন আরও পরিবর্দ্ধিত হয়। উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি যেমন একটী একটী করিয়া ঘন কৃষ্ণ মেঘমণ্ডলের অভ্যন্তরে লুকাইয়া যায়, ঠিক তেমনই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিও যেন ধপ্ ধপ্ করিয়া একটী একটী করিয়া মিলাইয়া যাইতে থাকে।

এতদিন সাধক শুধু দেবোচিত গুণরাশি অর্জ্জন করিয়া দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, এইবার সেগুলিকেও বিলয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এবার সাধককে দেবত্বে নয়, ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে হইবে; তাই মা স্বয়ং প্রলয়-মূর্ত্তিতে যাবতীয় সদ্‌গুণরাশিকেও বিলয় করিয়া লইতেছেন। বিন্দুমাত্র বিশিষ্টতা বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকিতেও মা ছাড়িবেন না। সৎ অসৎ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বভাবকে সম্পূর্ণ বিলয় করিয়া তবে মা আমার স্বকীয় অম্বিকারূপটী উদ্‌ভাসিত করিবেন। এ সকল তাহারই পূর্ব্বায়োজন চলিতেছে। অপূর্ব্ব এ তত্ত্ব!

ততোঽট্টহাসমতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দ্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥১৮॥

অনুবাদ। অনন্তর কালী অতিশয় ক্রোধবশতঃ ভৈরব গর্জ্জন ও ভীষণ অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন, তৎকালে তদীয় করালবদনের মধ্যবর্ত্তী দুর্দ্দর্শ দন্তসমূহের প্রভা তাঁহাকে উজ্জ্বল করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। অট্ট হাসি ভৈরব গর্জ্জন, দশনপংক্তির শুভ্রতা প্রভৃতি দ্বারা মায়ের আমার প্রলয়ঙ্করী কৃষ্ণামূর্ত্তির ভীষণতা আরও বর্দ্ধিত হয়। এ সকলই প্রলয়ের অবস্থা। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে নিধন করিতে হইলে মায়ের এমনই মূর্ত্তির প্রয়োজন। আরে, কাম ক্রোধ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অসদ্‌ভাবগুলি মানুষ সহজেই পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সাধন

ভজন ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ সদ্‌ভাবগুলি কেহই সহজে ছাড়িতে চায় না; তাই মা আমার সাক্ষাৎ করালবদনা কালীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া উহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিলয় করিয়া দেন। এ মূর্ত্তি দেখিলে সাধক মাত্রেরই ভয় হয়। স্বয়ং অর্জ্জুনও এই মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে" "ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো"। তাই ইতিপূর্ব্বে বলিতেছিলাম—সাধকমাত্রকে এই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। যে সকল সাধক শ্যামসুন্দর নব নটবর মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া, করাল-বদনা কালীর নাম করিতেও ভয় কিংবা বিদ্বেষভাব পোষণ করেন, তাহারাও জানিয়া রাখুন—অর্জ্জুনের ন্যায় তাঁহাদের নিকটও ঐ শ্যামসুন্দরই একদিন "কালোঽস্মি লোক ক্ষয়কৃৎ" বলিয়া, লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর কালমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইবেন। আরে, লোকক্ষয় না হইলে যে শ্যামসুন্দরের আবির্ভাবই হয় না, হইতে পারে না। লোক অর্থাৎ দৃশ্য বলিতে যতক্ষণ কিছু থাকে, ততক্ষণ সেই পরমরূপের প্রকাশ হইতেই পারে না। সুতরাং লোকক্ষয় একান্ত আবশ্যক। মায়ের অতিরোষ, অট্টহাসি, ভৈরব গর্জ্জন, দশনবিস্তার, এ সকলই লোকক্ষয়ের সহায়ক।

সাধক! বড়ই মনোহর, বড়ই আনন্দদায়ক সে মূর্ত্তির প্রকাশ! যতই ভয়দায়িনী হউক না কেন, এই মূর্ত্তিই সাধকগণের একান্ত ইষ্ট। ইহাই ত চণ্ডীর যথার্থ স্বরূপ। চণ্ডমুণ্ড বধের সময়েই মায়ের আমার বিশেষভাবে চণ্ডী-মূর্ত্তিতে আবির্ভাবের প্রয়োজন। মা আমার চণ্ডী না হইলে—অতিরোষময়ী না হইলে, আমাদের এই মিথ্যার খেলাঘর যে কিছুতেই ভাঙ্গে না। মা আমার দুইখানি ঘর ভাঙ্গিয়াছেন, আর একখানি ভাঙ্গিবার যোগাড় করিয়াছেন, ইহাই ত মায়ের চণ্ডীমূর্ত্তির সার্থকতা। ভয় কি রে! সিংহীর সন্তান কি মায়ের দংষ্ট্রা করাল মুখমণ্ডল দেখিয়া ভয় পায়? সে যে মা রে! হউক ভীষণা, হউক প্রলয়ঙ্করী, হউক সর্ব্বনাশী, তথাপি সেই যে মা রে! মায়ের করাল দশন দেখিয়া ভয় হইলে, মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া, মায়েরই গলা জড়াইয়া

ধরিয়া আত্মহারা হইবার জন্য আবার তাঁহাকেই মা বলিয়া ডাকিতে হয়। যদিও সেখানে মাতাপুত্র সম্বন্ধ নাই, যদিও স্থূলদৃষ্টিতে সেখানে স্নেহ দয়া কিছুই নাই, তথাপি আমরা প্রলয়স্থান পর্য্যন্ত মাতৃভাব হইতে বিচ্যুত হইব না। প্রথমে স্থূল মাটি জল বৃক্ষ লতা হইতে মা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, আর এই সর্ব্বভাবের প্রলয় পর্য্যন্ত মা বলিয়া ডাকিব। তারপর যখন আর আমি থাকিব না, যখন আর মা বলিয়া ডাকিব না, তখনই এই অভূতপূর্ব্ব মাতৃলীলার সম্যক্ অবসান হইবে।

এখনও এদেশে বহুস্থানে কালীপূজা হয়। বাস্তবিক উহা কালীপূজা হয় না, মায়ের পূজা—শ্যামাপূজা হয়। কালীকে মা বলিলে আর কালী থাকে না, শ্যামা হইয়া যায়। আমরা যে কালীপূজা করিতেই পারি না। পূজা করিতে করিতে কালীকে মা বলিয়া ফেলি; পাছে আমার বড় সাধের পুত্রত্বটী পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাই ভয়ে ভয়ে মা বলিয়া ফেলি। মাও আমার দ্বৈতপ্রতীতি বজায় রাখিবার জন্য মাতৃভাবেই প্রকটিতা হন। বহুদিনের বহুজন্মের সংস্কার; তাই দ্বৈতভাবটী কিছুতেই ছাড়িতে পারি না; কিন্তু এবার আর তাহা হইবে না; মা স্বয়ং চণ্ডী হইয়াছেন, সর্ব্বত্বের বিলয় ও একত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই মা আমার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছেন। সুতরাং এবার আমরা নিশ্চয়ই মাতা পুত্র সম্বন্ধ বিহীন, বাক্য মনের অগোচর পরমাত্মস্বরূপে উপনীত হইব। মা মা মা! এ কথা ভাবিতেও শরীর পুলককণ্টকিত হইয়া উঠে।

উত্থায় চ মহাসিং হং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥১৯॥

অনুবাদ। অতঃপর দেবী সক্রোধে মহা-অসি উত্তোলন করতঃ চণ্ডের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং কেশ গ্রহণপূর্ব্বক সেই অসিদ্বারাই তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন।

ব্যাখ্যা। মন্ত্রস্থ "মহাসিং হং" অংশটীতে দুইটী পদ আছে। একটী মহাসিং এবং অন্যটী হং। হং এই পদটী ক্রোধসূচক অব্যয়। মহা অসি—দ্বৈতপ্রতীতি-নাশক অস্ত্র, অর্থাৎ অদ্বয় জ্ঞান। জীব এবং ব্রহ্মের অভিন্নতাপ্রতিপাদক মহাবাক্যই মহা অসি। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, তৎ ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি" বেদচতুষ্টয় প্রোক্ত এই মহাবাক্য-চতুষ্টয়-প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞানই যাবতীয় দ্বৈত প্রতীতি-বিনাশের হেতু। এই অদ্বয় জ্ঞানই চণ্ডীর ভাষায় দেবীর হস্তস্থিত মহা অসি।

"মহাসি" পদটীর অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। সামবেদোক্ত মহাবাক্য "তত্ত্বমসি" মন্ত্রটীর একদেশেও 'অসি' এই পদটী পাওয়া যায়। অস ধাতুর অর্থ সত্তা। মহাসি শব্দে মহতী সত্তা বুঝায়। মহতী সত্তার অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তার প্রকাশ হইলেই ব্যবহারিক সত্তা বিলুপ্ত হয়। প্রলয়ঙ্করী মা আজ মহা অসি উত্তোলনপূর্ব্বক সেই অসির আঘাতে চণ্ডের শিরশ্ছেদ করিলেন; অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তাটীর প্রকাশ করিয়া দ্বৈত-প্রতীতির মূলীভূত যে প্রবৃত্তি, তাহার বিলয় সাধন করিলেন। দ্বৈত জ্ঞানই যাবতীয় প্রবৃত্তির হেতু। অদ্বয় জ্ঞান দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রবৃত্তি বলিয়া আর কিছুই থাকে না।

এই মন্ত্রে আর একটী কথা আছে—মা চণ্ডের কেশ গ্রহণ করিয়াছেন। কেশ গ্রহণের রহস্য পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মত্ব বিষ্ণুত্ব ও শিবত্ব লাভের প্রলোভন-বিনাশই দেবীকর্ত্তৃক চণ্ডের কেশ গ্রহণের তাৎপর্য্য। মা আমার ঈশ্বরত্ব লিপ্সাকেও বিদূরিত করিয়া তবে প্রবৃত্তিকে বিনাশ করিলেন। আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নাই, থাকিতেও পারে না। মা যখন মহা অসি উত্তোলন করেন অর্থাৎ একটীমাত্র মহতী সত্তা যখন বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতীতিযোগ্য হইতে থাকে, তখন আর প্রাপ্য প্রাপক কিংবা সাধ্য সাধকরূপ কোন ভেদই লক্ষিত হয় না; সুতরাং প্রবৃত্তির সমূলে উচ্ছেদ হইয়া যায়। সাধক! ভাবিও না কেবল তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ বিচার করিয়াই দ্বৈত প্রতীতি বিলয়রূপ

মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে। মা যতদিন "অসি" উত্তোলন করিয়া এই চণ্ডাসুর নিধন না করেন ততদিন মোক্ষের আশা আশামাত্ররূপেই থাকিয়া যায়।

অথ মুণ্ডোঽপ্যধাবত্তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা ॥২০॥

অনুবাদ। অনন্তর চণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া, মুণ্ডও দেবীর প্রতি ধাবিত হইল, তখন দেবী ক্রোধবশতঃ তাহাকেও খড়গাঘাতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন।

ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তি-বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তিরও নিবৃত্তি হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি—ইহারা উভয়ই সহভাবী; সুতরাং একের বিনাশে অপরের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহারাই প্রথমে অস্মিতার নিকট মায়ের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল; কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে—যে জন্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তির প্রয়োজন, তাহা অবসিত হইয়াছে; তাই উভয়েই আত্মবলি দিয়া মাতৃস্বরূপ প্রকাশের পূর্ব্বায়োজন সম্পন্ন করিল।

পূর্ব্বে যে মহা অসির কথা বলা হইয়াছে, সেই অসির দ্বারাই মুণ্ডও নিপাতিত হইল। মহাবাক্যার্থজ্ঞানরূপ মহা অসিই সর্ব্ববিধ ভেদ-প্রতীতি বিলয়ের অক্ষুণ্ণ এবং অব্যর্থ উপায়।

সাধক! ভাবিয়া দেখ, তোমার বিষয়াভিমুখী প্রবৃত্তিকে পরমাত্মাভিমুখী করিবার জন্য কতই চেষ্টা, কতই কঠোরতা, কতই সাধনা করিয়াছিলে, আবার বিষয়াসক্তি দূর হইল না বলিয়া, নিবৃত্তির প্রকাশ হইল না বলিয়া, কতই যোগ-কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলে, তোমার আশা পূর্ণ হইল না বলিয়া কতই না দুঃখ অনুভব করিতে, কতই না নীরব-অশ্রু মাতৃচরণে উপহার দিতে। তারপর যখন আশাপূর্ণ হইল—প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে মাতৃমুখী হইল, নিবৃত্তি যথার্থই বিষয়-বিরতি আনিয়া উপস্থিত করিল, তুমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার

উপক্রম করিলে, অমনি মা আমার কালীমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া, তোমার অতিপ্রিয় প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে—তোমার সাধনা এবং বৈরাগ্যকেও গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। সাধক! আপনাকে ধন্য মনে কর। এতদিনের সাধনা, এত দিনের ত্যাগ বৈরাগ্য এক মুহূর্ত্তমধ্যে মা করালবদনে গ্রাস করিলেন বলিয়া দুঃখ করিবে কি? না না, তুমি যে চণ্ডী-তত্ত্বের সাধক! তুমি যে জীবত্ব-হননেচ্ছু সিংহ! তুমি যে অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্বের প্রয়াসী! তুমি দুঃখিত হইবে কেন? জয় মা বলিয়া, জয় গুরু বলিয়া অগ্রসর হও। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি গেল—এখন যাহা বাকী আছে, তাহাও মায়ের মুখের কাছে ধর। মা আমার চামুণ্ডা-মূর্ত্তিতে তোমার সর্ব্বস্বকে গ্রাস করিয়া অদ্বয়তত্ত্বে উপনীত করিয়া দিবেন। এই জন্যই ত প্রথম হইতে বলিয়া আসিতেছি—চণ্ডীতত্ত্ব অতিশয় গহন। উপনিষদ্‌ও বলেন—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥" যথার্থ ই এ সকল তত্ত্ব গহন নয় কি?

হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্য্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্ ॥২১॥

অনুবাদ। চণ্ড মুণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিল।

ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অধিকাংশ অনুচরবর্গ পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, প্রলয়ঙ্করী শক্তির আবির্ভাবে তাহারা ভীতচিত্তে পলায়ন করিল। বাধিতানুবৃত্তিরূপে পুনরায় যাহাদের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই মন্ত্রে পলায়নকারী সৈন্যদল বলা হইয়াছে। খুলিয়া বলিতেছি—

প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিনাশ হইবার পরও সাধকগণ জগতে স্থূলদেহে অবস্থান করেন। তাঁহাদের আহার নিদ্রাদি কিংবা লোক-শিক্ষাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি এবং শাস্ত্রনিন্দিত কার্য্যে নিবৃত্তি দেখা যায়। প্রবৃত্তি

নিবৃত্তি থাকিলেই তাহাদের অনুচরবৃন্দ কতক কতক থাকিবেই। এইরূপে যাহারা পুনরাবর্ত্তন করে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে "দিশো ভেজে ভয়াতুরম্" কথাটী বলা হইয়াছে। আশঙ্কা হইতে পারে যে, বিনষ্ট প্রবৃত্তি নিবৃত্তির এবং তদীয় কতিপয় অনুচরের যদি পুনরাবর্ত্তনই হয়, তবে আর উহাদের বিলয় হইল কই? সত্য, পূর্ব্বেও ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যদিও প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ব্যবহার থাকে, তথাপি উহাদের পারমার্থিকত্ব বুদ্ধি বিলয়প্রাপ্ত হয়, শুধু যে মুহূর্ত্তে সাধক আত্মস্থ হন, মাত্র সেই মুহূর্ত্তেই ঐ ব্যবহার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। আসল কথা এই যে, 'আত্মাতিরিক্ত আর কোন কিছুরই সত্তা নাই,' এই জ্ঞানে উপনীত হইবার জন্যই যত কিছু আয়োজন, যত কিছু যুদ্ধ বিগ্রহ। ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষীভূত অর্থাৎ সম্যক্ অনুভূত হইবার পরও অনাত্ম প্রতীতি পুনরাবর্ত্তিত হয়। উহা অসুরভাব নহে, যেহেতু সর্পের খোলসের মত উহারা আর কখনও দংশনাদি করিতে পারে না। তবে ইহা স্থির যে, যখন কোনও আত্মজ্ঞ পুরুষেরও জগদ্‌ব্যবহার হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তিনি সে সময় আত্মস্বরূপ হইতে বিচ্যুত। তবে, এই যে বিচ্যুতি, ইহাতে তাহার কিছুই হানি হয় না; যে হেতু তাহার অনাত্মজ্ঞান বা অজ্ঞান সম্যক্ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেবচ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥২২॥
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥২৩॥

অনুবাদ। কালী চণ্ডমুণ্ডের মস্তক গ্রহণ করিয়া চণ্ডিকার সমীপে আগমনপূর্ব্বক প্রচণ্ড অট্টহাস্য সহকারে বলিলেন—এই যুদ্ধযজ্ঞে চণ্ডমুণ্ড নামক মহাপশুদ্বয় তোমাকে উপহার দিলাম। শুম্ভ নিশুম্ভকে তুমি স্বয়ংই হনন করিবে।

ব্যাখ্যা। কালী চণ্ডমুণ্ডের মস্তক লইয়া চণ্ডিকা-চরণে উপহার দিলেন। সাধক ভুলিও না—পূর্ব্বে যাহাকে কৌষিকী বলিয়া বুঝিয়াছ, তিনিই অম্বিকারূপে হিমালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারই ক্রোধ মূর্ত্তিমান্ প্রলয়রূপে—কালীশক্তিরূপে প্রকটিত হইয়া চণ্ড মুণ্ডের মস্তক উপহার দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অম্বিকা মা আমার এখানে অতি কোপনা, তাই চণ্ডিকা নামে অভিহিতা। এই চণ্ডিকাই দেবী-মাহাত্ম্যের প্রতিপাদ্য বস্তু। পরমাত্ম-স্বরূপের প্রকাশ হইলে সর্ব্বভাবের বিলয় অবশ্যম্ভাবী। সেই বিলয়ই মায়ের ক্রোধের ফলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে শক্তি সেই সর্ব্বভাবের বিলয় করিয়া থাকেন, তিনিই কালী। এই যে এতবড় কাণ্ডখানা—এত অসুর নিধন, এত বড় ভীষণ যুদ্ধ, এ সকল ব্যাপারেও আত্মা মা আমার নিত্য নির্ব্বিকারা নিত্যানন্দময়ী চির হাস্যময়ী। সেখানে কিন্তু কোনওরূপ বিকারই নাই; অথচ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া, এই অসুরকুলের যুদ্ধ ও ক্ষয় সংঘটিত হইয়া থাকে।

সাধকমাত্রেরই এইরূপ হয়। আত্মস্বরূপটি উদ্‌ভাসিত হইবার পূর্ব্বেই আত্মশক্তি, সংহারিণীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন; এবং স্বরূপ প্রকাশের অন্তরায়গুলি সম্যক্ বিদূরিত করিয়া দেন। বাকী থাকে একমাত্র অস্মিতা মমতা, ইহারা আত্মপ্রতিবিম্ব অর্থাৎ চিদাভাসমাত্র; উহারা বিম্বেই মিলাইয়া যায়। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—কালী অম্বিকাকে বলিলেন, "যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি"। আভাস বা প্রতিবিম্ব একটা কিছু আশ্রয় অর্থাৎ বিশিষ্টতা না পাইলে প্রকাশ পাইতেই পারে না। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার স্থূলদেহ কিংবা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রভৃতি কোনও কিছুর আশ্রয় না পাইলে আর চিদাভাস বলিয়া কিছুই থাকে না। যেমন শূন্যে কোন ছায়া পতিত হয় না, ঠিক সেইরূপ কোন আশ্রয় না পাইলে চিৎএর প্রতিবিম্ব থাকে না, একমাত্র চিৎই থাকে; তাই স্বয়ং চিতিশক্তিকর্ত্তৃকই চিৎ প্রতিবিম্ব স্বরূপ শুম্ভ নিশুম্ভ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

আর একটী কথা আছে—কালী চণ্ডমুণ্ডের মস্তক চণ্ডিকাচরণে উপহার দিলেন। দেহহীন মৃত প্রবৃত্তি নিবৃত্তির উত্তমাঙ্গটী অম্বিকা-চরণে রহিয়া গেল। উহারা থাকিবে বটে, কিন্তু দ্বৈতজ্ঞানের হেতু হইবে না। পূর্ব্বে ইহারা অদ্বৈত প্রতীতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ ছিল, তাই অসুররূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু এখন ইহারা দেহহীন অর্থাৎ পৃথক্ সত্তাবিহীন মৃত মুণ্ডমাত্র। সাধক, বুঝিয়া রাখিও,—পূর্ব্বে যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বাধিতানুবৃত্তির বিষয় বলিয়া আসিয়াছি, তাহাই এই মন্ত্রের ঐ মুণ্ডোপহার কথাটীদ্বারা বেশ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আর শেষ কথা—আত্মজ্ঞ পুরুষদিগের অনুভবও এইরূপই বটে। আরও একটু রহস্য আছে—মুণ্ডদ্বয় মাতৃচরণে উপহৃত। মাতৃলাভের পর যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির খোলসমাত্র থাকে, তাহারা যথার্থই মাতৃচরণস্থিত উপহার। মাতৃলাভের পর প্রবৃত্তি নিবৃত্তির যত কিছু কার্য্য হয়, সে সকলই মাতৃ-ইচ্ছার অনুবর্ত্তিরূপে নিষ্পন্ন হয়; "অহং কর্ত্তা, মম কর্ত্তব্যম্" এরূপ প্রতীতির একেবারেই বিলোপ হইয়া যায়।

ঋষিরুবাচ

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥২৪॥
যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥২৫॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে
চণ্ডমুণ্ড বধঃ।

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—অতঃপর সেই চণ্ডমুণ্ড (নিহত অবস্থায় উপহার রূপে) আনীত হইয়াছে দেখিয়া, কল্যাণী চণ্ডিকাদেবী ললিত মধুর বাক্যে কালীকে বলিলেন "যেহেতু তুমি চণ্ডমুণ্ডকে লইয়া

উপস্থিত হইয়াছ, সেই হেতু—হে দেবী! অদ্য হইতে তুমি লোক মধ্যে চামুণ্ডা নামে আখ্যাত হইবে।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় দেবী-
মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে চণ্ডমুণ্ড বধ।

ব্যাখ্যা। প্রলয়ঙ্করী শক্তিকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত থাকিবার জন্যই অম্বিকার এইরূপ বরদান। চণ্ডমুণ্ডকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়াই উহার নাম চণ্ডমুণ্ডা বা চামুণ্ডা। চণ্ডমুণ্ড শব্দের উত্তর হননার্থবোধক আ ধাতু হইতে চামুণ্ডা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। পৃষোদরাদি সূত্র অনুসারে চণ্ডমুণ্ডা শব্দটী চামুণ্ডারূপে পরিণত হয়। সে যাহা হউক, চণ্ডিকাদেবীর বরপ্রভাবে এই চামুণ্ডারূপিণী প্রলয়শক্তি প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিলয় করিবার জন্য চিরকাল প্রকট রহিয়াছেন, এবং থাকিবেন। অদ্যাপি প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের সময় মহাষ্টমী মহানবমীর সন্ধিক্ষণে ইহার বিশিষ্ট পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

দেখ সাধক! জগৎময় চামুণ্ডার লীলা! জগৎময় যে শোক দুঃখ হাহাকার দেখিতে পাও, সে সকলই এই চামুণ্ডার তাণ্ডব লীলা। যদি সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপা এই প্রলয়ঙ্করী চামুণ্ডার করালকবল হইতে মুক্তি-লাভ করিতে চাও, যদি মরণ-ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অভয় অমৃতের কোলে আশ্রয় লইতে চাও, যদি মরণ-কোলাহলপূর্ণ এই মর্ত্ত্যধামে থাকিয়া অমৃতের শান্তি-আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে চাও, তবে এই চামুণ্ডা শক্তির পূজা কর—জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনরূপ মহা-সন্ধিক্ষণে এই সংসার-মহাশ্মশানে স্বয়ং শবাসনে উপবিষ্ট হও, তাহার পর বিরাট্ মরণের ভিতর যে অস্তিত্বের সন্ধানটুকু পাওয়া যায়, তাহারই উপর তোমার ঐ আমিটীকে নগ্নমূর্ত্তিতে সংস্থাপিত কর, অবশেষে মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আত্মাবীজ সহকারে প্রাণের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ কর। এইরূপ করিতে পারিলেই চামুণ্ডার পূজা হইবে। যাহারা জীবন্তে মরিতে না পারে, তাহারা চামুণ্ডার পূজা করিতে সমর্থ হয় না, যাহারা চামুণ্ডার

পূজায় অক্ষম, তাহাদের প্রতি চামুণ্ডার প্রসন্নতাও দুর্লভ; চামুণ্ডার প্রসন্নতা লাভ না হইলে, করাল মৃত্যুর ছায়া অপসৃত হয় না। যাহারা চামুণ্ডাকে চিনিয়াছে, যাহারা চামুণ্ডাকে আত্মশক্তি বলিয়া বুঝিয়াছে, যাহারা উহার করাল গ্রাসকে স্নেহময় মাতৃ-অঙ্ক বলিয়া অনুভব করিয়াছে, কেবল তাহারাই ইহার আধিপত্য হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বাধীন আনন্দময় আত্মস্বরূপে উপনীত হইতে পারে।

ওগো! দেখ, জগতের আনন্দ ভাণ্ডার লুটিয়া খাইতেছে—এই চামুণ্ডা। জীবের হৃদয় রক্ত শোষণ করিতেছে—এই চামুণ্ডা। মনুষ্যের যাবতীয় উৎসাহ উদ্যম অধ্যবসায় ধ্বংস করিয়া দেয়—এই চামুণ্ডা। পূর্ব্বে বলিয়াছি—এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ আনন্দ। আনন্দই জীব-জগতের যথার্থ স্বরূপ; তথাপি জীববৃন্দ আনন্দের অভাব বোধ করিয়া আনন্দের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, ইহার একমাত্র কারণ ঐ চামুণ্ডা—ঐ মৃত্যুর করাল গ্রাস। পাছে আমার আমিটী হারাইয়া যায়, এই ভয়ে সঙ্কুচিত জীব প্রাণ খুলিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে না; স্বাধীনভাবে মুক্তপ্রাণে আনন্দময়ী মায়ের আমার অক্ষয় আনন্দ-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে পারে না। এই চামুণ্ডা—এই মৃত্যু-ভীতি সকল আনন্দের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু তোমরা সাধক, তোমরা মায়ের বীর সন্তান; তোমরা মৃত্যুভয়ে ভীত হইও না। পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃত্যু ধাবিত হইতেছে দেখিয়া, মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় পলায়ন করিও না, মৃত্যুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না, ফিরিয়া দাঁড়াও, মা মা বলিয়া বীরের মত মৃত্যুর সম্মুখীন হও, মা মা বলিয়া মৃত্যুরই চরণে প্রাণের পুষ্পাঞ্জলি স্বেচ্ছায় অর্পণ কর, জয় মা বলিয়া পূর্ণ সাহসে পূর্ণ উদ্যমে ঐ প্রলয়ঙ্করী কালীশক্তির অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়। দেখিবে—মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই; যে মৃত্যুকে পিশাচী শয়তানী বলিয়া ভীত হইয়াছিলে, সেই মৃত্যুই মঙ্গলময়ী স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিরূপে তোমাকে বক্ষে ধরিয়া অমরত্বে উপনীত করিয়া দিয়াছে; তুমি অমর হইয়াছ।

কেবল সাধনা জগতে নয়, যাহারা মৃত্যুভয়ে একান্ত ভীত, ব্যবহারিক জগতেও তাহাদের দ্বারা কোন বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন হইবার আশা নাই। কিন্তু সে অন্যকথা—

এস সাধক! আমরা "কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপ-হারিণি" বলিয়া মায়ের চরণে প্রণত হই। যাঁহার কৃপায় আমাদের বহু জন্মের সঞ্চিত সংস্কার—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-রূপ মহাসুরদ্বয় বিলয় প্রাপ্ত হইল, তাঁহারই চরণে সম্যক্ আত্মনিবেদন করিয়া মায়ের বিচিত্র লীলা—রক্তবীজ বধ দর্শন করি। আমাদের মস্তকে মায়ের মঙ্গল আশীষ বর্ষিত হউক।

ইতি সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায়

চণ্ডমুণ্ড বধ সমাপ্ত।

সাধন-সমর

বা

দেবী মাহাত্ম্য।

রুদ্রগ্রন্থিভেদ।

রক্তবীজ বধ।

ঋষিরুবাচ।

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ ॥১॥
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্।
উদ্‌যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥২॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—চণ্ডমুণ্ড নিপাতিত এবং বহুসংখ্যক সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায়, অসুরেশ্বর প্রতাপশালী শুম্ভ কোপাবিষ্ট চিত্তে সমস্ত দৈত্যসৈন্যকে যুদ্ধার্থ উদ্‌যোগ করিতে আদেশ করিলেন।

ব্যাখ্যা। অনুচরবর্গের সহিত প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নিধন দর্শনে অস্মিতা কোপাবিষ্ট হইয়া ভীষণ যুদ্ধের উদ্যম করিল। দৈত্যকুলের যত সেনা ও সেনাপতি ছিল, সকলকেই যুদ্ধে যাইবার জন্য আদেশ করিল। দ্বৈতপ্রতীতির নামই দৈত্য। দ্বৈতপ্রতীতি অসংখ্য; সুতরাং দৈত্যও অসংখ্য। "অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধি"রূপ বিপর্য্যয়জ্ঞানই

যাবতীয় দ্বৈতপ্রতীতির হেতু ; সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে বিপর্য্যয় জ্ঞানের বিনাশ আবশ্যক ; তাই এই উত্তম চরিত্রে সর্ব্বপ্রথমেই বিপর্য্যয়জ্ঞানরূপী ধূম্রলোচনের বধ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর দ্বৈতপ্রতীতির সর্ব্বপ্রধান অবলম্বনস্বরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বা চণ্ডমুণ্ডেরও নিধন হইল। ইহা দেখিয়া অস্মিতা তাহার অবশিষ্ট সমগ্র অধ্যবসায় প্রয়োগ করিল ; ইহাই শুম্ভের ভীষণ রণসজ্জার রহস্য। সর্ব্বভাব এইবার প্রলয়কবলিত হইবে ; তাই মন্ত্রে সর্ব্বসৈন্যের যুদ্ধোদ্যোগ বর্ণিত হইয়াছে এইবার নিশুম্ভের সহিত শুম্ভকেও আত্মবলি দিতে হইবে। এই ভীষণ সমর-আয়োজন তাহারই পূর্ব্বসূচনামাত্র। সাধক, মনে রাখিও—এ সকলই মাতৃকৃপা বা মাতৃ-আকর্ষণ। স্মরণ কর গীতার বিশ্বরূপের সেই শ্লোকটী—"যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ। তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ"॥ প্রদীপ্ত অগ্নির মনোহর রূপে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গবৃন্দ যেরূপ আত্মাহুতি প্রদান করে, ঠিক সেইরূপ মায়ের আমার প্রবল আকর্ষণে সমাকৃষ্ট দৈত্যগণ সমরানলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া পতঙ্গবৃত্তি সম্পাদন করিতেছে। সাধক ভাবিয়া দেখিও, —ইহা সাধনাদ্বারা হয় কি ? মায়ের কৃপা ব্যতীত এমন সুযোগ আসে কি ? মা যে আমার, স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁহার স্নেহময় প্রবল আকর্ষণ না আসিলে, দ্বৈতপ্রতীতিসমূহ এক অদ্বয়সত্তায় আত্মহারা হইবার জন্য ধাবিত হয় কি ? তুমি মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত উদাসীন সাক্ষী পুরুষের মত বসিয়া রহিয়াছ ; আর মায়ের স্নেহময় আকর্ষণ তোমার যাবতীয় দ্বৈতভাবের বিলয় সাধন করিয়া তোমাকে পরমানন্দময় অদ্বৈতস্বরূপে উপনাত করিতেছে। একথা ভাবিতে গেলেও আনন্দে বিস্ময়ে উল্লাসে প্রাণের ভিতর কেমন করিতে থাকে।

সাধক ! যতদিন মায়ের এই আকর্ষণ গণ্ডীর বাহিরে অবস্থান করিবে, ততদিন অসুরভাবসমূহের স্বেচ্ছায় আত্মবলিরূপ মায়ের বিশিষ্ট কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবে কি ?

অদ্য সর্ব্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বূনাং চতুরশীতি নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ ॥৩॥
কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া ॥৪॥
কালকা দৌহৃর্তা মৌর্য্যাঃ কালকেয়া স্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম ॥৫॥

অনুবাদ। আজ আমার আদেশে সমগ্র অসুর স্ব স্ব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত হইয়া সত্বর নির্গত হউক। উদায়ুধ-বংশীয় ষড়শীতি, কম্বুবংশীয় চতুরশীতি, কোটিবীর্য্যকুলের পঞ্চাশৎ এবং ধূম্রবংশীয় শতসংখ্যক অসুর আর কালক দৌহৃর্ত মৌর্য্য ও কালকেয় নামক অসুর সম্প্রদায় স্ব স্ব সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হইয়া আমার আজ্ঞায় যুদ্ধার্থ শীঘ্র নির্গত হউক।

ব্যাখ্যা। মহাসুর শুম্ভ ভীষণ সমরায়োজনের আদেশ করিতে গিয়া যে সকল অসুরের নাম উল্লেখ করিল, তাহাতে আটটী অসুর সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। যথা উদায়ুধ কম্বু কোটীবীর্য্য ধৌম্র কালক দৌহৃর্ত মৌর্য্য এবং কালকেয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এই অষ্টসংখ্যক অসুর সম্প্রদায় অষ্টপাশরূপে পরিচিত হয়। কুলার্ণবতন্ত্রে উক্ত আছে "ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শঙ্কা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী, কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ঘৃণা লজ্জা ভয় শঙ্কা জুগুপ্সা কুল শীল এবং জাতি, এই আটটীকে অষ্টপাশ কহে। জীব এই অষ্টবিধ পাশদ্বারা আবদ্ধ। এই অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইলেই জীব শিব হইয়া যায়। "পাশবদ্ধোভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।" ইহাও তন্ত্রের বাক্য। এতদিনে জীব মায়ের কৃপায় শিবত্বে উপনীত হইতে চলিয়াছে। তাই শুম্ভ—অস্মিতা উহাদিগকেও—এই অষ্টপাশকেও মাতৃসমরে প্রেরণ করিল। এইগুলি বিনষ্ট হইলেই অস্মিতার বিশেষ আলম্বনগুলি অপসৃত হয়। ক্রমে আমরা সেই অপূর্ব্ব রহস্যে উপস্থিত

হইব। এস সাধক ; এস্থলে আমরা অসুরগুলির একটু পরিচয় লইতে চেষ্টা করি।

১। উদায়ুধ—উদ্যত আয়ুধ যাহার। আধ্যাত্মিকদৃষ্টিতে ইহার নাম ঘৃণা। বাস্তবিকই ঘৃণা উদ্যত-আয়ুধ। অপরের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিতে গেলেই, আমিকে অর্থাৎ অহঙ্কারকে উদ্যত করিতে হয়। আমি—শুদ্ধ উন্নত। অপর—অশুদ্ধ হীন ; এইরূপ প্রতীতি হইতেই ঘৃণার আবির্ভাব হয় ; সুতরাং ঘৃণাকে উদায়ুধ অসুর বলা যায়। ইহারা সংখ্যায় ষড়শীতি। জাগ্রৎকালে চতুর্দ্দশ করণকে আশ্রয় করিয়া জরায়ুজাদি চতুর্বিধ ভূতজাতের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ পায় ; সুতরাং জাগ্রতাবস্থায় ইহার ভেদ ষট্‌পঞ্চাশৎ। আবার স্বপ্নাবস্থায়ও অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়কে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ ভূতের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায় ; সুতরাং স্বপ্নকালে ইহার ভেদ ষোড়শ সংখ্যক। আর পরমাত্মস্বরূপে স্থিতি-প্রয়াসী অস্মিতার স্বকীয় বিভিন্ন স্ফুরণরূপা চতুর্দ্দশ করণের প্রতি যে স্বাভাবিক একটু বিদ্বেষ বা ঘৃণাভাব, তাহার সংখ্যা চতুর্দ্দশ। এইরূপে সমষ্টিতে ঘৃণা বা উদায়ুধ অসুরের ষড়শীতি প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয় ; তাই মন্ত্রে "ষড়শীতি রুদায়ুধাঃ" এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

২। কম্বু—শব্দের অর্থ শঙ্খ। ইহা জীবের দ্বিতীয় পাশ বা বন্ধন। লজ্জাই ইহার স্বরূপ। শঙ্খজাতীয় জলচর প্রাণীদিগের হস্তপদাদি অবয়বগুলি আবরণের ভিতর লুক্কায়িত থাকে। কোনও রূপ একটু প্রতিকূল বেদন আসিলেই, ইহারা আত্মগোপন করিয়া থাকে। মনুষ্যের লজ্জাও ঠিক এইরূপ। কোনরূপ দুর্ব্বলতা যাহাতে প্রকাশ না পায়, তজ্জন্য সর্ব্বদাই মনুষ্যকে সঙ্কোচ বা আত্মগোপন করিতে হয়। তাই লজ্জা জিনিষটা বুঝাইতে হইলে, এই কম্বুজাতীয় জীবের কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। ইহাও একপ্রকার পাশ বা বন্ধন। ভেদজ্ঞান হইতেই এইরূপ লজ্জা বা সঙ্কোচের আবির্ভাব হয়। সাধক লক্ষ্য করিও—পূর্ব্বে যে "লজ্জারূপেণ সংস্থিতা" বলিয়া ইহাকে মাতৃরূপে

প্রণাম করা হইয়াছে, তাহারই ফলে, আজ এই ভেদজ্ঞানমূলক লজ্জা বা আত্মসঙ্কোচ, কম্বু-অসুররূপে আত্মবলি দিবার জন্য মাতৃসমীপে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ইহার সংখ্যা চতুরশীতি। চতুর্দ্দশ করণকে আশ্রয় করিয়া ষাট্‌কৌশিক দেহেই ইহার অভিব্যক্তি হয়। উক্ত সংখ্যাদ্বয় পরস্পর গুণিত হইয়া চতুরশীতি সংখ্যা হয়। এইরূপে লজ্জার ভেদ চতুরশীতি প্রকার হইয়া থাকে। তাই শুম্ভের আদেশ-বাক্যে "কম্বূনাং চতুরশীতি" এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। কোটিবীর্য্য—কোটি অর্থাৎ অপরিমেয় বীর্য্য যাহার। ইহাই জীবের ভয় নামক তৃতীয় পাশ। ভয় যথার্থই কোটিবীর্য্য অর্থাৎ অমিতপরাক্রম। স্বকীয় অস্তিত্ব-নাশের ভয় মানুষকে প্রাণ খুলিয়া জগদ্‌ভোগ করিতে দেয় না। প্রাণ খুলিয়া সাধন ভজনও করিতে দেয় না। একমাত্র পারমার্থিক সত্তার অপ্রকাশ বশতঃই এইরূপ আত্মবিনাশের ভীতিরূপ কোটিবীর্য্য-অসুরকুলের আবির্ভাব হয়। ইহারা সংখ্যায় পঞ্চাশৎ। দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কোষই এই অসুরকুলের প্রকাশ স্থান। উক্ত সংখ্যাদ্বয় পরস্পর গুণিত হইয়া পঞ্চাশৎ সংখ্যা হয়। এইরূপে ভয় নামক পাশের পঞ্চাশৎ ভেদ হইয়া থাকে। তাই মন্ত্রে "কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশৎ" এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। ধৌম্র—ধূম্র নামক অসুরের বংশকে ধৌম্র কহে। এই ধূম্র আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ধূম্রলোচন ভিন্ন অন্য কেহ নহে। বিপর্য্যয় জ্ঞান হইতেই যাবতীয় শঙ্কার আবির্ভাব হয়; তাই ইহাদিগকে ধৌম্র বংশীয় অসুর বলা হয়। ইহাই জীবের শঙ্কা নামক চতুর্থ পাশ বা বন্ধন। ভয় এবং শঙ্কার মধ্যে প্রভেদ আছে। ভয়—অস্তিত্ব নাশের আশঙ্কা; শঙ্কা—সম্বন্ধি পদার্থের বিনাশ-জনিত মানসিক বিকার। সহজ কথায় ভয় শব্দের অর্থ মৃত্যুভয়, এবং শঙ্কা শব্দে ধন পুত্রাদিবিনাশের আশঙ্কা বুঝা যায়। ভেদপ্রতীতি হইতেই ইহাদের আবির্ভাব; সুতরাং ইহারাও বন্ধনবিশেষ। ইহাদের সংখ্যা একশত। দশ ইন্দ্রিয়,

পঞ্চতন্মাত্রা এবং পঞ্চভূত, এই দশ, ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই শঙ্কা নামক অসুরকুলের প্রকাশ হয়। উক্ত সংখ্যাদ্বয় পরস্পর গুণিত হইয়া শত সংখ্যা হয়। এইরূপে শঙ্কা বা ধৌম্র অসুরের শত-সংখ্যক ভেদ হয়। তাই মন্ত্রে "শতং কুলাণি ধৌম্রাণাং" বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে।

৫। কালক—কৃষ্ণবর্ণ অসুরগণ। কাল শব্দের উত্তর স্বার্থে ক প্রত্যয় যুক্ত হইয়া এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা জুগুপ্‌সা নামক পঞ্চম পাশ। অজ্ঞান কৃষ্ণবর্ণ। অজ্ঞান হইতেই বহুত্বপ্রতীতি বা ভেদজ্ঞান পরিপুষ্ট হয়। ভেদজ্ঞান হইতেই জুগুপ্‌সা বা নিন্দার আবির্ভাব হয়। সাধক যতদিন একত্বে—অদ্বিতীয়ত্বে উপনীত হইতে না পারে, ততদিন কিছুতেই এই কালক নামক অসুর বা জুগুপ্‌সার হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না।

৬। দৌর্হৃত—ইহারা দুর্হৃত নামক অসুরের বংশধর। দুষ্ট ভাবের আহরণ করে বলিয়াই ইহাদের নাম দুর্হৃত বা দৌর্হৃত। ইহাই কুল অর্থাৎ কুলাভিমানরূপ ষষ্ঠ পাশ। সাধক শত সহস্রবার অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তার উপদেশ পাইলেও স্বকীয় কুলাভিমানরূপ অজ্ঞানের হাত হইতে সহসা পরিত্রাণ পায় না। সুতরাং ইহাও অসুরভাব।

৭। মৌর্য্য—ইহারা মূর নামক অসুরের সন্তান। আধ্যাত্মিক দর্শনে ইহা জীবের শীল বা সপ্তম পাশ। শীল শব্দের অর্থ স্বভাব বা প্রকৃতি। অদ্বয়জ্ঞানে উপনীত হওয়ার পক্ষে স্ব স্ব প্রকৃতি-বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞানই মহান্ অন্তরায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্ব স্ব প্রকৃতিই জীবের মা। যাঁহারা এই সত্যের অনুশীলন করিয়াছেন, মাত্র তাঁহারাই এই রুদ্রগ্রন্থি-ভেদের ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইবেন—সেই প্রকৃতি আপনা হইতেই জীবকে ছাড়িয়া দিয়া অদ্বয় আনন্দময় সত্তার সন্ধান আনিয়া দিতেছেন। স্বকীয় প্রকৃতিকে মা বলিতে না পারিলে কখনও বিশ্ব-প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায় না।

বিশ্ব-প্রকৃতির সন্ধান না পাইলে, বিশ্বাতীত ক্ষেত্রে—নিরঞ্জন স্বরূপে উপনীত হওয়া যায় না।

৮। কালকেয়—কালক নামক অসুরের সন্তানগণ। ইহাই জীবের জাতি নামক অষ্টম পাশ। অজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান হইতেই জাত্যাভিমান পরিপুষ্ট হয়। তাই ইহাদিগকে কালক অর্থাৎ অজ্ঞানরূপী কৃষ্ণবর্ণ অসুরের সন্তান বা কালকেয় বলা যায়। এই জাতিজ্ঞান সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে চণ্ডমুণ্ডবধ ব্যাখ্যাবসরে অনেক কথা বলা হইয়াছে; সে স্থলে ইহার বিনাশও বর্ণিত হইয়াছে। এখানে পুনরায় জাতির কথা বলিতে গিয়া যে পুনরুক্তি-দোষ লক্ষিত হইতেছে, আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ তাহাতে শঙ্কিত হইবেন না। কারণ সেস্থলে যে জাত্যায়ু ভোগের কথা বলা হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণত্বাদিরূপ ব্যষ্টি জাতি, আর এস্থলে মনুষ্যত্বাদি রূপ সমষ্টি জাতির কথাই বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই এই কুল শীল জাতি প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি একান্ত দুরপনেয়। বারংবার বিলয় প্রাপ্ত হইলেও নানাভাবে নানারূপে পুনরায় ইহারা আবির্ভূত হয়; এই সকল প্রতীতিকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্যই মায়ের এই চরম আয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি অষ্টপাশ জীবত্বের সুদৃঢ় বন্ধন। এই বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিলে, বিমল-বোধস্বরূপ মাতৃসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অথবা মাতৃসাক্ষাৎকার লাভ না হইলে পূর্ব্বোক্ত অষ্টপাশ ছিন্ন হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়—সাধকদিগের মধ্যে অনেকেই এই পাশ হইতে বিমুক্ত হওয়ার জন্য নানারূপ বাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি সংস্কারগুলিকে বিলুপ্ত করিবার জন্য নানারূপ প্রতিকূল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু হায়! তাহাতে একদিকে যেমন পাশগুলি বিচ্ছিন্ন হয় না, অন্যদিকে তেমনই উহার বিপরীত কর্ম্মের অনুষ্ঠানজন্য আবার কতকগুলি নূতন সংস্কার সঞ্চিত হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে—বন্ধন এবং মুক্তি, উভয়ই জ্ঞানের প্রকারভেদমাত্র। যতক্ষণ বিশুদ্ধ

বোধের উদয় না হয়, ততক্ষণ অজ্ঞানমূলক অষ্টপাশ বা বন্ধন কিছুতেই সমূলে ছিন্ন হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—"বিষয়াবিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥" নিরাহারী হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সংযম করিতে পারিলে বিষয় সমূহের বিনিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তদ্‌বিষয়ক রস—অনুরাগ অর্থাৎ সূক্ষ্ম সংস্কারটী থাকিয়া যায়। একমাত্র পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলেই ভেদজ্ঞানমূলক বিষয়রস বা সূক্ষ্ম সংস্কার সম্যক নিবৃত্ত হইয়া যায়।

যে সকল সাধক সাধনার প্রথম অবস্থা হইতেই সরল প্রাণে অকপট হৃদয়ে স্বকীয় সৎ অসৎ সকল ভাব নির্ব্বিচারে মায়ের সম্মুখে ধরিতে পারে, কেবল তাহারাই মায়ের কৃপায় অতি সহজে অষ্টপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দসাগরে অবগাহন করিতে সমর্থ হয়। সাধন-সমরের প্রারম্ভে প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় "অষ্টম মনু" শব্দের রহস্য বলিতে গিয়া, এই অষ্টপাশ মুক্ত হওয়ার কথাই বলা হইয়াছিল। সাধক স্মরণ কর,—প্রথমে যাহার সূচনামাত্র করা হইয়াছিল, কত অবস্থা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া, কত ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আসিয়া এতদিনে তাহা যথার্থ ফলোন্মুখ হইয়াছে। রুদ্রগ্রন্থিভেদের সাধক মাতৃ-অঙ্কে নির্ভয়চিত্তে অবস্থান করিয়া ঠিক এমনই দেখিতে পায়—মায়ের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পাশসমূহ এক একটি করিয়া স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিবার জন্য প্রলয়াভিমুখে অগ্রসর হয়। যে পাশ হইতে বিমুক্ত হওয়ার জন্য কত কঠোর সাধনারই আবশ্যকতা মনে হইয়াছিল, যে পাশ হইতে বিমুক্ত হওয়া একান্ত অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই পাশগুলি আপনা হইতেই ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

সাধক! তুমি কি ইহা বিশ্বাস করিতে পার না! সত্য সত্যই মাকে সরল প্রাণে মা বলিয়া ডাকিলে, সত্য সত্যই মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, সত্যসত্যই মাতৃঅঙ্কে আরোহণ করিবার

জন্য ব্যাকুল হইতে পারিলে, তোমার যাবতীয় বন্ধন এইরূপ অনায়াসে খুলিয়া যাইবে। মা স্বয়ং আসিয়া স্নেহের সন্তান তোমার সকল বন্ধন নিজহস্তে খুলিয়া দিবেন। তোমাকে বক্ষে করিয়া মুক্তির হিরণ্ময় মন্দিরে উপনীত হইবেন। সন্তান, তুমি বহুদিন আত্মরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া, স্বেচ্ছায় জীবত্বের বন্ধন স্বীকার করিয়া লইয়াছ, স্নেহবিহ্বলা মা তোমার সে কল্পিত বন্ধন চিরতরে দূর করিয়া দিবেন। যেখানে বন্ধন বলিয়া কিছু নাই, যেখানে ভেদজ্ঞানের লেশমাত্র নাই, যেখানে নিরানন্দের স্পর্শও নাই, সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বিশুদ্ধ চৈতন্যময় অখণ্ড ব্রহ্মসত্তায় তোমার বিশিষ্ট সত্তাটি চিরতরে মিলাইয়া লইবেন। তুমিও "ব্রহ্মাহমস্মি" বলিয়া জীবত্বের পরপারে চলিয়া যাইবে। তোমার মানবজীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ হইবে।

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জগাম মহাসৈন্যসহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥৬॥

অনুবাদ। ভীমশাসন অসুরপতি শুম্ভ এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ংও বহুসংখ্যক মহাসৈন্য-পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল।

ব্যাখ্যা। অস্মিতা অসুরপতি—যাবতীয় দ্বৈতপ্রতীতির আশ্রয়। অস্মিতা ভৈরবশাসন—অস্মিতার আদেশ কেহই অমান্য করিতে পারে না; কারণ, দ্বৈতপ্রতীতিসমূহ অস্মিতারই বিভিন্ন স্ফুরণমাত্র। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। শুম্ভ কেবল সেনাপতিগণকেই যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয় নাই; স্বয়ংও বহুসংখ্যক সৈন্যসহ নির্গত হইল। বলা বাহুল্য যে, নিশুম্ভও শুম্ভের সহিত যুদ্ধার্থ অভিযান করিয়াছিল। অস্মিতা ও মমতা এক সঙ্গেই সমর ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকে। জীবভাবীয় যাবতীয় সংস্কার বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ঈশ্বরভাবীয় সংস্কার সমূহ এখনও অবশিষ্ট আছে; উহাদিগকেই মন্ত্রে শুম্ভ নিশুম্ভের সহগামী সৈন্যদল বলা হইয়াছে। ক্রমে ইহা স্ফুটতর হইবে।

আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যমতিভীষণম্ ।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীর্গগনান্তরম্ ॥৭॥

অনুবাদ। সেই অতিভীষণ সৈন্যবাহিনী আসিতেছে দেখিয়া দেবী চণ্ডিকা জ্যাশব্দে পৃথিবী এবং গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিলেন।

ব্যাখ্যা। যথার্থ ই এবারকার সৈন্যসজ্জা বড়ই ভীষণ। যত কিছু দ্বৈতসংস্কার ছিল, সকলই একসঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে। সেই বিপুলবাহিনী দূর হইতে আসিতেছে দেখিয়া—মা জ্যাধ্বনি করিলেন। সে ধ্বনি পৃথিবী এবং গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়াছিল। জ্যাধ্বনি—প্রণবধ্বনি; ইহা পূর্ব্বে অনেক স্থানে শ্রুতি-প্রমাণসহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধক, মনে রাখিও—যতদিন মা স্বয়ং প্রণবধ্বনি না করেন, ততদিন অসুরকুল ভীত হয় না। যতদিন তোমার প্রণব-ধনুর জ্যাধ্বনি ছিল, ততদিন অসুরবৃন্দকে বিন্দুমাত্রও ভীত ও সন্ত্রস্ত করিতে পার নাই। তারপর যেদিন মাতৃকৃপায় মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, যেদিন তোমার কর্ত্তৃত্ব বিদূরিত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই মায়ের কার্য্য—জ্যাধ্বনি আরম্ভ হইয়াছে। যদিও প্রণবাদি মন্ত্র জপকালীন ধ্বনি তোমার বাক্‌যন্ত্র হইতেই নির্গত হয়, তথাপি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, সে ধ্বনি তোমার নহে। উহা মহতী শক্তিরই প্রবল আকর্ষণময় নাদ; সুতরাং ঐ ধ্বনির দিকে অবধান প্রয়োগ করিলেই দেখিতে পাইবে—উহা ধরণী গগনান্তর পরিপূর্ণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিক্, দশদিক্ সর্ব্বত্র নাদময়। নাদ ব্যতীত যেন কোথাও কিছু নাই। এ জগৎ যেন একটা অশ্রান্ত ধ্বনিমাত্র। জন্ম মৃত্যু, নানা যোনি- ভ্রমণ, সুখদুঃখ, সঙ্কল্প বিকল্প সেই অশ্রান্তধ্বনিরই বিভিন্ন তরঙ্গমাত্র। অসুরবল যতই অসংখ্য ও সন্নদ্ধ হউক না কেন, একবার এই স্বাভাবিক নাদ উত্থিত হইলে আর কোন ভয় থাকে না। সে নাদপ্রবাহে সর্ব্ব ভাব পরিপ্লাবিত হইয়া যায়। কি মধুর অথচ গম্ভীর এবং সর্ব্বতঃপ্রসারী সে নাদ।

ততঃ সিংহোমহানাদমতীব কৃতবান্নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ ॥৮॥

অনুবাদ। হে নৃপ! এই সময়ে সিংহও পুনঃ পুনঃ মহানাদ করিতে লাগিল। স্বয়ং অম্বিকাদেবী ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা সে নাদকে আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। দেবীর বাহন সিংহ অর্থাৎ জীবও এই সময় যথাশক্তি পুরুষকার প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইল। ইহাই যে জীবের সর্ববশেষ প্রযত্ন; ইহা বুঝিতে পারিয়াই, দ্বৈতভাবসমূহের প্রতিকূলে যত রকম আয়োজন সম্ভব, জীব তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য উদ্যত হইল। এই কর্ম্মোদ্যম, এই পুরুষকার, এই তীব্র উৎসাহ লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে সিংহের মহানাদের কথা বলা হইয়াছে। কেহ যেন এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী না হন যে, মাতৃচরণে যাহারা আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাদের আর পুরুষকার বলিয়া কিছুই থাকে না। বাস্তবিক কিন্তু আত্মসমর্পণ-যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণই যথার্থ পুরুষকার জিনিষটার স্বরূপ বুঝিতে পারে। তাহারা কখনও তামসিক জড়তাগ্রস্ত হইয়া পড়ে না। আরে, পুরুষ ত মা! তাহার যে কার বা কৃতি, তাহাই ত পুরুষকার। যতক্ষণ মাতাপুত্র-রূপ একটু ভেদও থাকিবে, ততক্ষণই পুরুষকার থাকিবে। যখন মাতা পুত্র-সম্বন্ধহীন এক অদ্বিতীয় নিরঞ্জন ক্ষেত্রে উপনীত হইবে, তখন—কেবল তখনই পুরুষকার বলিয়া কিছু থাকে না। যেখানে ইন্দ্রিয় নাই, মন নাই, বুদ্ধি নাই, সেখানে আর পুরুষকার কিরূপে থাকিবে? তাইত বলি—সাধনার প্রথম অবস্থা হইতেই তীব্র পুরুষকারের প্রয়োজন, এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উহাকে ধরিয়া রাখিতে হয়। যে মুহূর্ত্তে সর্ববভাবের বিলয় হয়, সেই মুহূর্ত্তেই পুরুষকারের পরিসমাপ্তি ও কেবল পুরুষস্বরূপে স্থিতি হয়। পাতঞ্জল ইহাকেই দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান বলেন, গীতা ইহাকে ব্রাহ্মী স্থিতি বলেন, ভক্তিশাস্ত্র ইহাকে প্রেমে আত্মহারা-ভাব বলেন। কিন্তু সে অন্য কথা—

আমরা সিংহের মহানাদের কথা বলিতেছিলাম। যখন অসুর-অত্যাচার

আরম্ভ হয়, তখন সাধকগণ "জয় গুরু" "জয় মা" বলিয়া, "অলখ্ নিরঞ্জন" বলিয়া অথবা স্ব স্ব অভীষ্ট শব্দের প্রয়োগ করিয়া, যে সিংহনাদ ছাড়েন, তাহাও সাধনা-রাজ্যে নিতান্ত কম উপকারী নহে। সাধকের সেই সিংহনাদ আবার মা অম্বিকা স্বয়ং ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা উপবৃংহিত—পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। অনাহত ঘণ্টাধ্বনি সাধকের বাগ্‌যন্ত্র-নির্গত ধ্বনির সহিত সম্মিলিত হইয়া উহাকে আরও তুমুল করিয়া তুলে। দ্বিতীয় খণ্ডে এই নাদরহস্য বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সে স্থলে বৈখরীনাদের কথাই বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। এই উত্তম চরিত্রে সূক্ষ্ম মধ্যমা পশ্যন্তী ও পরা নাদের বিষয়ই—বলা হইতেছে, ইহা বুঝিতে পারিলে আর কোনরূপ সংশয় উঠিবেনা। সাধক যেমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে আরোহণ করে, নাদও তেমন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তরে প্রবেশ করে।

ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং শব্দাপূরিতদিঙ্‌মুখা।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা ॥৯॥

অনুবাদ। ধনুর জ্যাধ্বনি, সিংহের নাদ এবং ঘণ্টার শব্দ একত্রিত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। আবার বিস্তারিতাননা কালিকা দেবী স্বকীয় ভীষণ নিনাদে সে ধ্বনিকেও তিরস্কৃত করিলেন।

ব্যাখ্যা। কালীর ধ্বনি—প্রলয়কালীন ভীষণ হুঙ্কার। সে ধ্বনি অপর সকল ধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিবেই; কারণ, সকল ধ্বনিই প্রলয়-হুঙ্কারে মিলাইয়া যায়। এবার শুম্ভের সৈন্যসজ্জা যেরূপ ভীষণ, মায়ের বিজয়-ধ্বনিও সেইরূপ প্রচণ্ড। কেবল সূক্ষ্ম নহে, এইরূপ স্থূল নাদেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। যখন দ্বৈতভাব-জনিত প্রতিকূল বেদন আসিয়া সাধককে দুর্ব্বল ও হতাশ করিয়া ফেলে, তখন সর্ব্বতোভাবে নাদের আশ্রয় লইতে হয়। মানস প্রণব ধ্বনি, উপাংশু অনাহত ধ্বনি, স্থূলের "জয় মা" প্রভৃতি ধ্বনি, এবং সর্ব্বভাব-বিলয়াত্মক মহাশক্তির হুঙ্কার

ধ্বনি, এই সকল যুগপৎ সমবেতভাবে প্রকাশিত হইলে, সাধকের সকল অবসাদ, সকল দুর্ব্বলতা ক্ষণকালের মধ্যে পলায়ন করে। সাধক তখন নব বলে বলীয়ান্ হইয়া অমিত তেজে সাধন-সমরে অবতীর্ণ হয়।

তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দ্দিশম্।
দেবী সিংহ স্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ ॥১০॥

অনুবাদ। সে নিনাদ শ্রবণ করিয়া দৈত্যসেনাগণ সক্রোধে চতুর্দ্দিক্ হইতে দেবী, সিংহ এবং কালীকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল।

ব্যাখ্যা। দেবী—অম্বিকা, স্বয়ং চিতিশক্তি; বাহন—সিংহ, জীব; এবং কালী—প্রলয়ঙ্করী মহতী শক্তি। অগণিত দৈত্যসেনা দূর হইতে এই তিনজনকে দেখিতে পাইল। কিন্তু ইহাদের নিকট হইতে যে সর্ব্বলোক-ক্ষয়কারী প্রলয় ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে দৈত্য সৈন্যগণ অতিমাত্র বিস্মিত হইল। যেহেতু, মাত্র তিনটী শক্তির সমর ধ্বনি যে এত তুমুল, এত সর্ব্বদিগ্ব্যাপী হইতে পারে, ইহা তাহারা ভাবিতেও পারে না। যাহা হউক, এখন উহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিবার জন্য দৈত্যগণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অষ্টপাশ প্রভৃতি বন্ধনজনক সংস্কারগুলি চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল।

শুন, সাধক যখন ধীরে ধীরে সর্ব্বভাবাতীত ত্রিগুণ-রহিত সেই নিত্য নিরঞ্জন সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন নানাবিধ লৌকিক সংস্কাররাশি আসিয়া তাহার সে গতিকে প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়ায়। কিছুতেই সেই অদ্বয় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরস পান করিতে দেয় না। প্রতি পদক্ষেপে সহস্র সহস্র সংস্কার আসিয়া সাধকের অগ্রগতি নিরুদ্ধ করে। বহুজন্মসঞ্চিত দ্বৈতসংস্কার প্রবলবেগে আসিয়া অদ্বয়ক্ষেত্রে উপনীত হওয়ার অন্তরায়স্বরূপ দণ্ডায়মান হয়। দৈত্য সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টনের ইহাই রহস্য। যাহারা সাধক, তাহারা এ সকল কথা একেবারে মজ্জায় মজ্জায় বুঝিতে পারিবেন।

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ ॥১১॥

ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ ।
শরীরেভ্যোবিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥১২॥

অনুবাদ। হে ভূপ সুরথ! ইত্যবসরে সুরবিদ্বেষিগণের বিনাশের জন্য এবং দেবশ্রেষ্ঠগণের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মা শিব কার্ত্তিকেয় বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের অতিবীর্য্য বলান্বিত শক্তিগণ, তাঁহাদের (ব্রহ্মা প্রভৃতির) শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সেই সেইরূপে আবির্ভূত হইয়া চণ্ডিকাদেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

ব্যাখ্যা। মহর্ষি মেধস এখানে সুরথকে ভূপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। জীব এতদিনে ক্ষিতিতত্ত্ব অর্থাৎ জড়ত্বের উপর আধিপত্য করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। জড়পদার্থসমূহ যে চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, এ কথাটা সুরথ এতদিনে বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে বলিয়াই এস্থলে ঋষির এরূপ সম্বোধন। শিষ্য যেরূপ স্তরে স্তরে জ্ঞানের উন্নত সোপানে অধিরোহণ করিতে থাকে, শ্রীগুরুও তাহাকে তদনুকূল বাক্য-প্রয়োগে উৎসাহিত করিতে থাকেন। শ্রীগুরুর উৎসাহ বাক্যই শিষ্যের অগ্রগমনের একমাত্র সম্বল। মেধস এইবার দুরধিগম্য রহস্যের অবতারণা করিবেন; পাছে সুরথ স্বকীয় জীবভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া, সেই রহস্যের অনুধাবন করিতে না পারে, এই আশঙ্কায় প্রথমেই "ভূপ" বলিয়া—জড়ত্ববিজয়ী মহারাজ বলিয়া আহ্বান করিলেন।

অসুরসৈন্যবৃন্দ যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া দেবীকে পরিবেষ্টন করিল, তখন সমগ্র দেবশক্তি সম্মিলিত হইয়া দেবীর সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল। মহিষাসুরবধে দেখিতে পাইয়াছি—দেবতাগণ স্ব স্ব শক্তি অর্পণ করিয়া মহতী শক্তিকে বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদের নিজ নিজ

অস্ত্র শস্ত্র অর্থাৎ স্ব স্ব শক্তি একমাত্র মহামায়ারই মহতী শক্তি, তাই অল্পায়াসেই মহিষাসুর নিহত হইয়াছিল। কিন্তু এবার এই অসুরবৃন্দ তদপেক্ষাও প্রবল পরাক্রান্ত, তদপেক্ষাও দুর্জ্জয়। এবার আর কেবল শক্তিসমর্পণদ্বারাই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। এবার মহতী শক্তিতে সমর্পিত বিভিন্ন শক্তিসমূহকে আবার বিশিষ্টভাবে আবির্ভূতা হইতে হইবে।

এস্থলে একটু সাধনার রহস্য আছে। সাধকগণ অবহিত হইবেন। প্রথমতঃ স্ব স্ব বিভিন্ন শক্তিগুলিকে একটি একটি করিয়া মহতী শক্তির উদ্দেশ্যে অর্পণ করিতে হয়। অর্থাৎ একমাত্র চৈতন্যময়ী মহাশক্তির বিভিন্ন প্রবাহই যে আমাদের দর্শন শ্রবণ গ্রহণ মনন প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা বুঝিতে হয়—উপলব্ধি করিতে হয়। তারপর আবার ঐ একই মহতীশক্তি যে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-আকারে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা অনুভব করিতে হয়। নিজের নিত্য অনুভবযোগ্য বিভিন্ন শক্তি গুলিকে মহতী মাতৃশক্তির বিভিন্ন বিলাসরূপে বুঝিতে না পারিলে, সমগ্র বিশ্বের শক্তি-প্রবাহকে এক অভিন্ন চৈতন্যশক্তিরূপে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

স্বকীয় বিশিষ্ট শক্তিকে মিলাইয়া দিতে পারিলেই শক্তির ক্ষুদ্রতা ও বিশিষ্টতা দূর হয়। সে অবস্থায় জীব ঈশ্বরভাবে অনুভাবিত হইতে থাকে। তারপর মহাশক্তিতে সমর্পিত বিশিষ্ট শক্তিকে অতি-বীর্য্যবলান্বিত করিয়া—পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া জীবত্বের অচ্ছেদ্য পাশগুলি ছিন্ন করিতে হয়। মহাশক্তিতে অর্পিত হইবার পূর্ব্বে বিশিষ্টশক্তিগুলি যেন হীনবল থাকে; কিন্তু একবার ঈশ্বরশক্তির সংস্পর্শ পাইলে, উহারাও অমিতবীর্য্য হয়। তাই মন্ত্রে "অতিবীর্য্য-বলান্বিতা" বলা হইয়াছে। অতি-বীর্য্যবলান্বিতা বলিয়াই উহারা অসুর-নিধনে চণ্ডিকার সহায়তা করিতে সমর্থ হয়। শ্রুতিও বলেন, "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে।" পরমাত্মার শক্তি পরা অর্থাৎ মহতী এবং বিবিধ। পরাশক্তি হইতেই যে বিবিধ শক্তির বিকাশ হয়, ইহা বুঝিতে

পারিলেই চণ্ডিকার শরীর হইতে দেবশক্তিসমূহের নির্গমরহস্য বুঝিতে পারা যায়। যেরূপ দর্শন শ্রবণ গমন গ্রহণ প্রভৃতি নানাশক্তি সমন্বিত একটী আধারকেই মনুষ্য বলা হয়, সেইরূপ ব্যষ্টি সমষ্টি যাবতীয় বিভিন্ন শক্তির যে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় বা অনুভব করিতে পারা যায়, সে সকলই একমাত্র পরাশক্তি বা পরমাত্মশক্তির প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

"ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ" এই অংশটির ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী মন্ত্রগুলিতে বিশেষভাবে পাওয়া যাইবে। শুধু "শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য" এই অংশটী নিয়া একটু আলোচনা করা আবশ্যক। সাধারণতঃ মনে হয়, ব্রহ্মাদি দেবতাগণের শরীর হইতেই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। "শরীরেভ্যঃ" পদটীতে বহুবচনের প্রয়োগ দেখিয়াও সেইরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরে শুম্ভবধে পাওয়া যাইবে—ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিসমূহ একমাত্র দেবীর শরীরেই বিলীন হইয়াছিল। যে কারণ হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, সেই কার্য্য পুনরায় সেই কারণেই লয় প্রাপ্ত হয়, ইহাই অবিসংবাদিত নিয়ম ও সিদ্ধান্ত; সুতরাং চণ্ডিকার শরীর হইতেই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ করাই সঙ্গত। আর পক্ষান্তরে ব্রহ্মাদি দেবতার শরীর হইতে উঁহাদের নির্গম স্বীকার করিলেও বিশেষ হানি হয় না; কারণ, ব্রহ্মাদি দেবতার শরীর অম্বিকাশরীর হইতে বাস্তবিক কোন অংশেই বিভিন্ন নহে। যাহা হউক, আমরা এ স্থলে চণ্ডিকার শরীর হইতেই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তির নির্গম বুঝিয়া লইব। মায়ের শরীর এক হইলেও উহার অসীমত্ব লক্ষ্য করিয়াই "শরীরেভ্যঃ" এই বহুবচন প্রয়োগ হইয়াছে।

পূর্ব্বে মহিষাসুর-বধে দেবতাগণের অস্ত্র-অর্পণ বা শক্তি সমর্পণ দেখা গিয়াছে। আর এখানে সেই অর্পিত শক্তির বিশিষ্টভাবে পুনরায় নিষ্ক্রমণ দেখা যাইতেছে। সেখানে মহিষাসুর বধকালে অর্পণদ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল; যেহেতু, তখন ছিল অপ্রকটিত সঞ্চিত

সংস্কার; উহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, আর এস্থলে প্রকটিত প্রারব্ধ সংস্কার, ইহারা ফলোন্মুখ; সুতরাং অতিশয় বলবান্। তাই এবার দেবশক্তিবৃন্দকে বিশিষ্টভাবে সমরক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতে হইয়াছে।

প্রিয়তম সাধক! মনে আছে কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মা-তে যাহা অর্পিত হয়, তাহাই মাতৃশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া পুনরায় অর্পণকারীর নিকটই ফিরিয়া আইসে। দেখ, অসুরকর্ত্তৃক নির্জ্জিত দেবতাবৃন্দ স্ব স্ব ক্ষীণ শক্তি একদিন মাতৃচরণে অর্পণ করিয়াছিল; আর আজ সেই শক্তিই অতিবীর্য্যবলান্বিতা হইয়া মূর্ত্তিমতী দেবশক্তি রূপে অম্বিকার শরীর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া অসুর নিধনের জন্য আবির্ভূত হইল। এইরূপ তুমিও অকপটচিত্তে যাহা কিছু মাতৃচরণে অর্পণ করিবে, তাহা, যতই মলিন ও ক্ষুদ্র হউক না কেন, যদি ঠিক ঠিক অর্পণ করিতে পার, তবে দেখিতে পাইবে—তোমার সেই অর্পিত বস্তু কত উজ্জ্বল, কত মহান্, কত পবিত্র হইয়া তোমার কাছে ফিরিয়া আসিবে।

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥১৩॥

অনুবাদ। যে দেবতার যে প্রকার রূপ, যেরূপ ভূষণ এবং যেরূপ বাহন, সেই দেবতার শক্তি সেইরূপ আকৃতি, ভূষণ এবং বাহন সহ যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন।

ব্যাখ্যা। যে দেবতার যেরূপ আকার, অর্থাৎ যে বিশিষ্ট চৈতন্য যেরূপ বিশিষ্টতার অধিষ্ঠান, সেইরূপ বিশিষ্টতা লইয়াই সেই দেবতার শক্তি সমরক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। ভূষণ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি; যে দেবতার যাহা বিভূতি, তাহাই সেই দেবশক্তির বিভূষণ। বাহন শব্দের অর্থ শক্তি-পরিচালক আশ্রয়। প্রথম খণ্ডে বাহনতত্ত্ব এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ভূষণতত্ত্ব সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দেবশক্তির বিষয় আর একটু পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রত্যেক দেবতারই একটা বিশিষ্টতা আছে। ঐ বিশিষ্টতাই শক্তির কার্য্য। শক্তি—কারণস্বরূপ অদৃশ্য বস্তু। শক্তি যখন কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়, তখনই শক্তির সত্তা অনুমিত হয়, নতুবা শক্তি কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। মনে কর—বহ্নির যে দাহিকা শক্তি, তাহা তাপ আলোক প্রভৃতি কার্য্যদ্বারাই বুঝিতে পারা যায়; অন্যথা দাহিকাশক্তির স্বরূপটী কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। এই শক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানই জীবের চরম জ্ঞান। জগৎ বলিয়া, দেহ বলিয়া, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় বলিয়া, যাহা কিছু দেখা যায়, উপলব্ধি করা যায়, এ সকলই যে একমাত্র পরা শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ, ইহা বুঝিতে পারিলেই জীব ধন্য হয়। জীব সাধারণতঃ শক্তির বিকাশ অবস্থা বা কার্য্যটীমাত্র দেখিতে পায় ও তাহাতেই মুগ্ধ থাকে, শক্তির যথার্থ স্বরূপটী জানিতে চায় না; তাই শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। তবে ইহাও একান্ত সত্য যে, শক্তি স্বয়ং যদি ধরা না দেন, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে, কোনরূপ কৌশল বা প্রক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে ধরিতে বা বুঝিতে পারে। তাই ত অনেক সময় বলিয়া থাকি—মা আমার সর্ব্বরূপে সর্ব্বত্র সুপ্রতিভাত হইয়াও স্বয়ং কিন্তু নিত্যই অদৃশ্যা অগ্রাহ্যা অলভ্যা, বাক্য মনের অগোচরা হইয়া রহিয়াছেন।

শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটী কথা জানা আবশ্যক। ব্রহ্মনিরূপণ-সূত্রে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই কথাটী বলাতেই পরমাত্মার শক্তিস্বরূপত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। "যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম" এই কথাদ্বারাই ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপতা প্রমাণিত হয়; সুতরাং যাঁহারা নির্গুণত্ব ভঙ্গের ভয়ে ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপটী অস্বীকার করেন, আমরা এস্থলে তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না। আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, শক্তিরূপিণী মা আমাদের হৃদয়ে যতটুকু আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বলা যায়—"একমেবাদ্বিতীয়ং" বস্তু চিতিশক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই জগদ্রূপ কার্য্যদ্বারাই উহার

শক্তিরূপত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায়। আর যখন জগৎরূপ কার্য্য থাকে না, সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদও থাকে না, কেবল বিশুদ্ধ বোধস্বরূপটী উদ্‌ভাসিত হয়, তখন তাঁহাকে শক্তিময় কিংবা শক্তিহীন, কিছুই বলা যায় না। তবে যতক্ষণ পরমাত্মায় শক্তিময় স্বরূপটী প্রত্যক্ষ হয়, ততক্ষণ তাঁহাতে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বরূপ দ্বিবিধ মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। জীবভাবে সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত, এই ত্রিবিধ ভেদই দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরভাবে সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ থাকে না, কেবল স্বগত ভেদের উপলব্ধি হয়। জীব সাধনাদ্বারা, জ্ঞান ভক্তির অনুশীলনদ্বারা, এই ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে, তৎপরবর্ত্তী স্বরূপটী সর্ব্ববিধ সাধ্য সাধনার অতীত বলিয়াই শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণ তৎসম্বন্ধে মূক। তবে ইহা স্থির যে, জীব যখন সাধনার ফলে কিংবা মায়ের কৃপায় এই ঈশ্বরত্বে অর্থাৎ আত্মার শক্তিময় স্বরূপে উপনীত হইতে পারে, তখন—কেবল তখনই, নিরঞ্জন স্বরূপটী উদ্‌ভাসিত হয়। ঈশ্বরত্বের কিছুমাত্র আস্বাদ না পাইয়াও যদি কেহ নিরঞ্জন স্বরূপের বিষয়ে কোনও কথা বলিতে থাকেন, সুধু মহাবাক্যের অর্থ বিচার করিয়া "অহং ব্রহ্ম" বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ভাণ করেন, তবে বুঝিতে হইবে, তিনি যথার্থ তত্ত্ব হইতে এখনও বহু দূরে রহিয়াছেন! সেখানে—সেই নিরঞ্জন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, তারপর তাঁহাকে শক্তিময় বলিলেও ক্ষতি নাই, শক্তিহীন বলিলেও ক্ষতি নাই; উভয়রূপ বলিলেও ক্ষতি নাই, উভয়াভাবরূপ বলিলেও ক্ষতি নাই। তিনিই সব অথবা তিনি ইহার কিছুতেই নাই। সে যে কি মধুময় কি আনন্দময় তাহা ভাষায় কিরূপে বুঝাইব।

সে যাহা হউক, সগুণ ও নির্গুণ উভয় অবস্থায় পরমাত্মার শক্তি-স্বরূপত্ব স্বীকার করিয়া লইলেই সাধনমার্গ সুগম হয়। তারপর যদি এই উভয়ের আধাররূপে কোনও অজ্ঞেয় সত্তার স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে—যাহা শক্তির আশ্রয় তাহা শক্তির স্বরূপ হইতে একান্ত

ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না। আমরা কথাপ্রসঙ্গে বিচারের পথে আসিয়া পড়িয়াছি। যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত তাহাতে তর্ক কিংবা বিচারের অবসর কোথায় ?

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তি ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ১৪ ॥

অনুবাদ। হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া অক্ষসূত্র এবং কমণ্ডলুধারিণী ব্রহ্মার শক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি ব্রহ্মাণী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। এখান হইতে সাতটী মন্ত্রে দেবশক্তিগণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। ব্রহ্মাণী—সৃষ্টিশক্তি। অখণ্ড চৈতন্যসমুদ্রের যে অংশে সৃষ্টিক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেই চৈতন্যাংশের নাম ব্রহ্মা, অর্থাৎ আত্মা যেখানে সৃষ্টিক্রিয়ার অভিমান করেন, সেইখানে তিনি ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন। আর সেই চেতনাধিষ্ঠান হইতে যে ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, তাহার নাম ব্রহ্মাণী ; সুতরাং সাধনার দৃষ্টিতে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাণীর মধ্যে বাস্তবিক কোন ভেদই পরিলক্ষিত হয় না। শক্তি বস্তুটা যদি চৈতন্যাশ্রয় ব্যতীত সত্তাময় হইত, তবে ভেদ স্বীকার করা যাইত, এবং সেরূপ অনুভবও হইত। শক্তির সর্ব্বাবয়বই যখন সত্তা বা চেতনা, তখন শক্তিকে চৈতন্য বলায় কিছুই ক্ষতি হয় না। দাহিকাশক্তিকে অগ্নি বলায় কি ক্ষতি আছে ? অবশ্য তর্কমূলক সূক্ষ্ম বিচারে, উহাতেও নানারূপ আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সাধক তাঁহাদের পক্ষে শক্তি শক্তিমান্ অভিন্ন বলিয়া বুঝিয়া লইলে কিছুই ক্ষতি হয় না। তারপর যদি কিছু ভেদ থাকে, আপনা হইতে অনুভবগোচর হইয়া থাকে। তজ্জন্য কোনরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিবার আবশ্যক হয় না। আত্মা নিতান্ত প্রত্যক্ষ এবং একান্ত সহজ বস্তু ; সুতরাং অন্ধের মত কিছুই মানিয়া লইবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু সে অন্য কথা।

হংস—জীব। অক্ষসূত্র—বর্ণমালা। কমণ্ডলু—সৃষ্টির বীজাধার বা বিরাট্ কর্ম্মাশয়। খুলিয়া বলি, বুঝিতে চেষ্টা কর—তোমার যেরূপ ব্যষ্টি মন আছে, প্রত্যেক জীবেরই সেইরূপ আছে। ঐ ব্যষ্টি মনগুলি একটি সমষ্টি মনেরই অংশমাত্র। ঐ সমষ্টি মনের নাম দাও বিরাট্ মন। উনিই ব্রহ্মা। মনের ধর্ম্ম কল্পনা। এই বিশ্ব বিরাট্ মনের কল্পনা। কল্পনা একটা শক্তি, উহা মনের ধর্ম্ম বা স্বরূপ। ঐ কল্পনা-শক্তির নাম ব্রহ্মাণী; তিনি হংসবাহিনী। প্রতি জীবের যে বিভিন্ন সঙ্কল্প দেখিতে পাও, উহার মধ্য দিয়াই ঐ সমষ্টি মনের প্রকাশ বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং জীবই সৃষ্টিশক্তির পরিচালক। জীবকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ। জীব যদি না থাকে, তবে সৃষ্টিশক্তি যে আছে, তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না। তাই সৃষ্টিশক্তি-রূপিণী ব্রহ্মাণীর বাহন জীবরূপী হংস। জীবকে হংস বলিবার আর একটি তাৎপর্য্য আছে। উহারা শ্বাস প্রশ্বাসে দিবারাত্রিতে সাধারণতঃ একুশ হাজার ছয় শত হংসমন্ত্র জপ করিয়া থাকে, উহাকে অজপা কহে। এ সকল কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

অক্ষসূত্র—বর্ণমালা। কল্পনাগুলি শব্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই বিশ্ব কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দদ্বারাই গঠিত। শব্দসমূহ বর্ণসমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বর্ণের সংখ্যা পঞ্চাশটি। পঞ্চাশৎ বর্ণমালাই ব্রহ্মাণীর অক্ষমালা। পূর্ব্বে কালীর মুণ্ডমালায় যে বর্ণমালার কথা বলা হইয়াছে, ভাবোৎপাদনে সামর্থ্যহীন হওয়ায় তাহা শবমুণ্ডমালা। আর প্রতিক্ষণে অসংখ্য ভাবের সৃষ্টি করিতে সমর্থ বলিয়াই ব্রহ্মাণীর বর্ণমালা অক্ষমালা। অবশিষ্ট কমণ্ডলু। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের সৃষ্টির বীজ অনুসারেই পুনরায় অভিনব সৃষ্টির আরম্ভ হয়; এই সৃষ্টির বীজাধারকেই ব্রহ্মাণীর কমণ্ডলু বলা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ এ সকল কথার বিস্তারিত বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন।

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। বৃষারূঢ়া ত্রিশূলধারিণী সর্পবলয়া চন্দ্রকলাবিভূষিতা মাহেশ্বরী যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন।

ব্যাখ্যা। মাহেশ্বরী—লয়শক্তি। অখণ্ড চৈতন্যসমুদ্রের যে অংশে প্রলয়ভাব প্রকাশ পায়, সেই চৈতন্যাংশের নাম মহেশ্বর। অর্থাৎ আত্মা যেখানে প্রলয়ক্রিয়ার অভিমান করেন, সেই স্থানে তিনি মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। সেই চেতনাধিষ্ঠান হইতে যে প্রলয়রূপ ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, তিনিই মাহেশ্বরী। ইনি বৃষারূঢ়া। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞানশক্তি পরিচালিত হয়। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পরিচালনরূপ ধর্ম্ম যথারীতি অর্জ্জিত না হইলে জ্ঞানশক্তির বিকাশ হয় না। প্রথমখণ্ডের বাহনতত্ত্ব দ্রষ্টব্য। ত্রিশূল—ত্রিপুটী জ্ঞান। ইহা দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। মহাহিবলয়া—মহা অহি—মহাসর্প অর্থাৎ কুণ্ডলিনী। ইনি বলয়াকারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। কুণ্ডলিনী কি এবং তাহাকে সর্প কেন বলা হয়, এ কথাও পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। চন্দ্ররেখাবিভূষণা—চন্দ্ররেখা শব্দের অর্থ চন্দ্রকলা। চন্দ্রের ষোল কলা, তন্মধ্যে পঞ্চদশ কলা তিথিরূপে অভিব্যক্ত; অবশিষ্ট কলার নাম অমা। এই অমানাম্নী মহাকলা জ্ঞানশক্তিরূপিণী মাহেশ্বরীর ললাটে (একদেশে) অবস্থিতা। অমাশব্দের অর্থ করিতে গিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ ইহাকে অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই অমা বা মায়াই জ্ঞানশক্তির বিশিষ্ট বিকাশ। যে মহতী জ্ঞানশক্তিকে আশ্রয় করিয়া মায়ার লীলা সংঘটিত হয়, তিনিও অসুরনিধন উদ্দেশ্যে চণ্ডিকার সহায়তাকল্পে মাহেশ্বরী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন।

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা ।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ॥১৬॥

অনুবাদ। গুহ অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়রূপধারিণী অম্বিকা দেবী কৌমারীশক্তিরূপে শক্তি অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া, ময়ূরে আরোহণপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাখ্যা। কৌমারী—অসুরবিজয়িনী কার্ত্তিকেয়শক্তি। ইনি দেবসৈন্য-পরিচালিকা। দেবশক্তি ও অসুরশক্তির রহস্য দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। যে অসুরবিজয়িনী শক্তি আসুরিক বৃত্তিনিচয়ের দমন কল্পে দেবশক্তিসমূহের পরিচালনা করেন, তিনিই কৌমারী শক্তি। তদধিষ্ঠিত চৈতন্যশক্তি কুমার বা কার্ত্তিকেয় নামে অভিহিত হয়। ইহাঁর বাহন ময়ূর। ময়ূর সর্পভোজী বিহঙ্গম। সর্প—কুটিলগতি। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ বিষয়াভিমুখে বিসর্পিতভাবে কুটিলগতিতে পরিচালিত হয়; যখন কোন সাধক উহাদিগকে বিলয় করিবার মত বল বা সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারে, তখনই সে ময়ূরধর্ম্মী হয়। এইরূপ ময়ূরধর্ম্মী জীবই কৌমারী শক্তির বাহন। আত্মার যে অংশে দেবভাবসমূহকে অসুরভাব বিমর্দ্দন কল্পে পরিচালিত করিবার ভাব ফুটিয়া উঠে, সেই অংশের নাম কুমার বা কার্ত্তিকেয়। সেই অধিষ্ঠানচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া যে শক্তি দেবভাবসমূহের পরিচালনা করেন, তিনিই কৌমারী শক্তি।

তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরিসংস্থিতা ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-খড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। সেইরূপ বৈষ্ণবী শক্তি গরুড়োপরি আরোহণপূর্ব্বক শঙ্খ চক্র গদা ধনু এবং খড়্গ হস্তে ধারণ করিয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাখ্যা। যে চৈতন্যসত্তা স্থিতিশক্তিতে অভিমান করেন, তিনি বিষ্ণু। স্থিতি বা পালনই তাঁহার শক্তি। শঙ্খ চক্র গদা প্রভৃতি শব্দের

ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। শার্ঙ্গ শব্দের অর্থ—ধনু অর্থাৎ প্রণব এবং খড়গ শব্দের অর্থ—দ্বৈত প্রতীতি বিলয়কারক অদ্বয় জ্ঞান। বিষ্ণু শব্দ ব্যাপকতা-বোধক। যে সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড জ্ঞানের উদয় হইলে, দ্বৈতপ্রতীতি বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই অখণ্ড জ্ঞানই বিষ্ণুর হস্তস্থিত খড়গ। গরুড় শব্দের অর্থ ইতিপূর্ব্বে বাহনতত্ত্ব ব্যাখ্যাবসরে বলা হইয়াছে। ত্রিবৃদ্ বেদই বিষ্ণুশক্তির পরিচালক; তাই বেদসমূহই গরুড়। ইহা আমাদের স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা নহে। স্বয়ং ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। যাঁহারা ঈশ্বর বলিলে কোন একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তিমাত্র বুঝিয়া থাকেন, যাঁহারা শ্রীভগবানের কালীয়দমন, রাসলীলা বস্ত্রহরণ প্রভৃতি অলৌকিক লীলারহস্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তিমাত্র বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি একটু বিশেষ অনুধাবনের সহিত পড়িয়া দেখিবেন, স্বয়ং ব্যাসদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন—লৌকিক লীলা ব্যপদেশে অভূতপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রহস্য প্রকটন করিবার জন্যই ভগবানকে বিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হয়। সাধক! মনে রাখিও অমূর্ত্ত স্বরূপের রহস্য সম্যক্‌রূপ অবগত হইতে না পারিলে মূর্ত্তির স্বরূপ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। সুতরাং যে মূল বস্তুটী বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাঁহার স্বরূপ জানা একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান কালে যে ধর্ম্ম গ্লানির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার প্রধান হেতু—এই মূর্ত্ত অমূর্ত্ত বিষয়ক সম্যক্‌জ্ঞানের অভাব। বিজ্ঞানময় গুরু—সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান্ এই অজ্ঞানতা দূর করিয়া দেশ হইতে এই ধর্ম্মগ্লানির হেতু সম্যক্ বিদূরিত করিয়া দিউন।

যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্ ॥১৮॥

অনুবাদ। হরির যে শক্তি যজ্ঞবরাহের রূপের ন্যায় অতুলনীয়

রূপ ধারণ করেন, তিনিও শৌকরবপু ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাখ্যা। বারাহী—ইনিও বিষ্ণুর অন্যতম শক্তি-বিশেষ। পুরাণে বর্ণিত আছে—স্বয়ং বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রলয়মগ্ন বসুন্ধরাকে দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। বরাহ ভগবান্ বিষ্ণুরই একটী নাম। এই বরাহ শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ—এক কল্প পরিমিত কাল। বর শব্দের অর্থ—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আত্মা; তাঁহাকে যিনি আহনন করেন, অর্থাৎ আবৃত করেন, তিনিই বরাহ। কালসত্তাই সর্ব্বপ্রথম আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে, অর্থাৎ আত্মায় সর্ব্বপ্রথমে কালসত্তাই পরিকল্পিত হয়; কালই আত্মার সর্ব্ব প্রথম আবরণ। বর্ত্তমানে আমাদের এই পৃথিবীতে বরাহকল্প নামক কাল-প্রবাহ চলিতেছে। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়। সম্প্রতি শ্বেতবরাহ কল্পের ছয়টী মহাযুগ অতীত হইয়াছে, সপ্তম মন্বন্তরীয় সপ্তবিংশতিসংখ্যক কলিযুগ চলিতেছে। এই বরাহকল্পের সুদীর্ঘকাল অতীত হইবার পর, আমাদের বাসভূমি এই বসুন্ধরার সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা প্রলয় সলিলে মগ্নই ছিল; তাই পুরাণকারগণ বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তিকর্ত্তৃক বসুন্ধরার উদ্ধার বর্ণনা করিয়া থাকেন। অতি দীর্ঘকালরূপ বরাহ-কল্পের একদেশে এই বসুন্ধরা অবস্থান করিতেছে; তাই বরাহের দন্তে অর্থাৎ সুবিশাল অবয়বের একদেশে বসুন্ধরা অবস্থিত। কালী-শক্তি এবং বারাহীশক্তির প্রভেদ এই যে—কালী প্রলয়ঙ্করী সমষ্টি-মহাকাল-শক্তি; আর বারাহী মাত্র এক কল্পরূপ ব্যষ্টি কালশক্তি। এই শক্তি জগতের আধারস্বরূপ বলিয়া ইহাকেও বিষ্ণুশক্তি বলা হয়। পালন-শক্তি ও আধার-শক্তি প্রায় অভিন্ন। আমাদের এই ভূলোক যে বিশাল কালরূপ আধারে অবস্থিত এবং পরিধৃত তাহাই বরাহ, আর সেই ভূলোক-বিভ্রতী (ধারিণী) মহতী শক্তির নামই বারাহী।

নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতীসদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্ত-নক্ষত্রসংহতিঃ ॥১৯ ॥

অনুবাদ। নারসিংহী নৃসিংহদেবের তুল্য দেহ ধারণ করিয়া যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলেন। তাঁহার কেশরাঘাতে নক্ষত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। নারসিংহী—ইনিও বিষ্ণুর অন্যতম শক্তিবিশেষ। নৃসিংহ—স্বরূপজ্ঞান। আত্মস্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞানের উদয় হইলেই মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। নৃ শব্দের অর্থ মানুষ এবং সিংহ শব্দটী শ্রেষ্ঠার্থবাচক। ইনি হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছিলেন। হিরণ্য শব্দের অর্থ আত্মা। ইহা শ্রুতি-সিদ্ধ। যে হিরণ্যকে অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প পরমাত্মাকে কশিত করে, নিগৃহীত করে অর্থাৎ বিষয়াভিমানরূপে প্রকটিত করে, সে-ই হিরণ্য-কশিপু। এই হিরণ্যকশিপু অসুরকে একমাত্র আত্মস্বরূপ-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই বিনাশ করিতে সমর্থ। তাই নৃসিংহ শব্দের অর্থ স্বরূপজ্ঞান; এই নৃসিংহের হস্তেই হিরণ্যকশিপুর নিধন হয়। নর যতদিন স্বকীয় স্বরূপ বুঝিতে না পারে, ততদিন সে কিছুতেই সিংহ বা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। পুরাণকারগণ হিরণ্যকশিপুবধের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ আখ্যান। প্রথমতঃ তপস্যাদ্বারা সে ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করিয়াছিল—দেবতা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর পশু বিহঙ্গমাদি কেহই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। সত্যই ত কোনরূপ বিশিষ্টজ্ঞান থাকিতে হিরণ্যকশিপু নিহত হয় না। নির্ব্বিকল্প জ্ঞান ব্যতীত সবিকল্প জ্ঞানরূপী অসুরকে অন্য কেহই বিলয় করিতে পারে না। হিরণ্যকশিপুর সন্তান প্রহ্লাদ—আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান। একটু একটু করিয়া যতই তাহার প্রকাশ হইতে থাকে, অজ্ঞান ততই তাহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করে। ক্রমে জলে স্থলে অনলে অনিলে গগনে সর্ব্বত্র প্রহ্লাদের হরিদর্শনরূপ সত্যজ্ঞানের প্রভাবে নৃসিংহমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ আত্মস্বরূপবিষয়ক

যথার্থ জ্ঞান উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন ভেদজ্ঞান বা হিরণ্যকশিপু নিহত হয়।

সাধক! তুমিও দেখ—তোমার অন্তরে অন্তরে যে বালক ভক্ত প্রহ্লাদ—আনন্দময় ব্রহ্মসত্তার স্ফুরণ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, উহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য তোমার বিষয়াসক্ত-মনরূপী হিরণ্যকশিপু কতই না চেষ্টা করিতেছে। কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া তোমার আনন্দময় শিশু সত্যজ্ঞান সর্ব্বত্র সত্যদর্শন করিবার অভ্যাস সুদৃঢ় ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। একদিন ঐ সত্যজ্ঞানই তোমার জড়ত্বজ্ঞানরূপী স্ফটিক স্তম্ভকে বিদীর্ণ করিয়া বিশুদ্ধ বোধমাত্রস্বরূপে প্রকটিত হইবেন, তুমি নৃসিংহমূর্ত্তিদর্শনে আত্মহারা হইবে, তোমার মনোরূপী হিরণ্যকশিপু বিনষ্ট হইবে। কিন্তু এ সকল অন্য কথা।

নৃসিংহের শক্তিই নারসিংহী। ব্রহ্মবিদ্যাই নারসিংহী শক্তি। কারণ, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেই জীব নৃসিংহ হয় অর্থাৎ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহার আবির্ভাবে বিশিষ্টজ্ঞানরূপী অসুরগুলি বিনষ্ট হইয়া যায় ইহা বুঝাইবার জন্যই "সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ" কথাটী বলা হইয়াছে। সটাক্ষেপ শব্দের তাৎপর্য্য স্বকীয় শক্তিপ্রভাব। বিশিষ্ট-জ্ঞানগুলিকে নক্ষত্র বলিবারও একটু উদ্দেশ্য আছে। আমরা প্রতিনিয়ত যে বিষয়গুলি গ্রহণ করি, অর্থাৎ যে বিশিষ্টজ্ঞানগুলিতে বিচরণ করি, উহাদের মধ্যেও অতি ক্ষীণভাবে একটু আলো বা আত্মপ্রকাশ আছে। আত্মপ্রকাশ না থাকিলে, কোনওরূপ বিশিষ্টজ্ঞান হইতেই পারে না। নারসিংহী বা বিদ্যাশক্তি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সত্যজ্ঞানের সেই বিশিষ্টতাকে বিদূরিত করিয়া দেন। সাধক! যদি তুমি সত্যই মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে—তোমার হৃদয়াকাশরূপ রণক্ষেত্র হইতে তোমারই স্বেচ্ছাকল্পিত বিশিষ্ট জ্ঞানগুলিকে অপসারিত করিয়া বিদ্যাশক্তি কিরূপ প্রযত্নে ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ বোধ উদয়ের উপায় বিধান করিয়া থাকেন।

বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা॥ ২০॥

অনুবাদ। এইরূপ ইন্দ্রের তুল্য রূপধারিণী বজ্রহস্তা গজারূঢ়া সহস্রনয়না ইন্দ্রাণী-শক্তি যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। ইন্দ্র—দেবাধিপতি। তাহার শক্তি ইন্দ্রাণী। বজ্রহস্তা, গজারূঢ়া প্রভৃতির ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে। এখানে কেবল সহস্রনয়না কথাটীর রহস্য বুঝিতে পারিলেই এই মন্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। সহস্রশব্দ অসংখ্যবাচক। নয়ন শব্দের অর্থ প্রকাশশক্তি। যাঁহার প্রকাশভাবটী অসংখ্য বিশেষণযুক্ত হইয়া অসংখ্য প্রকারে অভিব্যক্ত হয়, তিনিই সহস্রলোচন ইন্দ্র। তাঁহার সেই প্রকাশশক্তিটীই ইন্দ্রাণী। সমস্ত দেবাধিপত্য কথাটীর তাৎপর্য্য—সমস্ত দেবশক্তির মধ্য দিয়া স্বকীয় শক্তি প্রকাশিত করা। পুরাণকারগণের আখ্যায়িকায় বর্ণিত আছে—গুরুপত্নীহরণরূপ মহাপাপের ফলে ইন্দ্রের শরীরে সহস্র ক্ষত হইয়াছিল ; কঠোর তপস্যার ফলে সেই ক্ষতসমূহই পরে নেত্ররূপে পরিণত হয়। গুরু একমাত্র পরমাত্মা। তাঁহার স্বপ্রকাশশক্তিকে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গের অধিপতি ইন্দ্রদেব যথার্থই আত্মসাৎ করিয়া থাকেন ; এবং তাহারই ফলে স্বয়ং বহুভাবে বিভক্ত হইয়া পড়েন। তপস্যাদির ফলে যখন একটু একটু করিয়া জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হইতে থাকে, তখন ঐ বহুভাবের ভিতর দিয়াই আত্মার স্বপ্রকাশত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই ইন্দ্রদেব সহস্রনয়ন হইয়া থাকেন। সাধক! তুমিও দেখ—তোমার গুরুশক্তিকে তোমার ইন্দ্রিয়গণ নিয়ত অপহরণ করে ; তাই একই প্রকাশশক্তিকে নানা বিষয়ের ভিতর দিয়া অসংখ্য প্রকারে ভোগ করিতে গিয়া, তোমাকে কতই না ক্ষত বিক্ষত হইতে হয়। তুমি সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে ঐ অসংখ্য ক্ষতগুলির মধ্য দিয়া একই প্রকাশশক্তির অসংখ্য ভেদ দেখিতে অভ্যস্ত হও। তোমার ক্ষতগুলি নিশ্চয়ই নেত্ররূপে পরিণত হইবে।

ততঃ পরিবৃত স্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্ ॥২১॥

অনুবাদ। অনন্তর স্বয়ং ঈশান সেই দেবশক্তিগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া চণ্ডিকাদেবীকে বলিলেন—এইবার আমার প্রীতির জন্য অসুরকুলকে নিহত করা হউক।

ব্যাখ্যা। এ পর্য্যন্ত যে অষ্টশক্তির বিষয় বলা হইয়াছে, তাঁহাদের নাম—ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী নারসিংহী ইন্দ্রাণী এবং (পূর্ব্বকথিত) চামুণ্ডা। ব্রহ্মা মহেশ্বর কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি বিশিষ্ট চৈতন্য যে, শক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, ইহা বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত অষ্টশক্তির আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। সাধকগণ সর্ব্বশেষে এই শক্তিতত্ত্বেই উপনীত হন। তাই শাস্ত্রেও উক্ত আছে—"শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে"। যাহারা দ্বিজ অর্থাৎ বৈদিকী দীক্ষার ফলে যাহাদের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়, তাহারাই সাধক তাহারা সকলেই শাক্ত। শৈব বৈষ্ণব গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ও কার্য্যতঃ এই শক্তিরই উপাসনা করিয়া থাকে; তবে যতদিন শক্তির সন্ধান না পায়, ততদিন আপনাদিগকে শাক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে চায় না। ক্রমে যখন গুরুকৃপায় জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে, তখন দেখিতে পায়—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলে একমাত্র শক্তিরই উপাসনা করিয়া থাকে। এই শক্তিজ্ঞান হইতেই জীবের মুক্তিদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। সে যাহা হউক, শক্তি এবং শক্তিমান্ অর্থাৎ অধিষ্ঠান চৈতন্য ও অধিষ্ঠিত শক্তি, এতদুভয় যে সম্পূর্ণ অভিন্ন বস্তু, এবং অধিষ্ঠান-চৈতন্য যে শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তাহা এই চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিলে, অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বেও বলিয়া আসিয়াছি—আত্মাকে শক্তিস্বরূপ বস্তু বলিয়া বুঝিয়া লইবে তাহা হইলেই সাধন পথ অনেক সুগম হইয়া উঠিবে। তবে বিশেষ কথা এই যে নির্ব্বিকল্প বোধ স্বরূপ আত্মাকে একেবারেই শক্তিস্বরূপ বুঝিয়া লওয়া অত্যন্ত দুরূহ; তাই মহর্ষি মেধস প্রথমতঃ আত্মবিভূতিসমূহকে—

আত্মার স্বাধীন বিলাসগুলিকে শক্তিস্বরূপ বলিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছেন; সেই জন্যই তিনি এস্থলে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিতত্ত্বের অবতারণা করিলেন। মনে রাখিও সাধক, শক্তি-বস্তু চৈতন্য হইতে অনতিরিক্ত পদার্থ। এস, এইবার এই মন্ত্রটীর অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"ঈশান পূর্ব্বোক্ত শক্তিগণকর্তৃক পরিবৃত হইয়া অসুরনিধনের জন্য চণ্ডিকার নিকট প্রার্থনা করিলেন।" যে সমষ্টি অধিষ্ঠানচৈতন্যে পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী প্রভৃতি অষ্টশক্তি প্রকাশিত হয়, তিনি ঈশান—তিনিই প্রলয়ের দেবতা বিশুদ্ধ বোধময় মহেশ্বর। ঈশানরূপ অধিষ্ঠানেই অষ্টশক্তি বিরাজিত। এই অষ্টশক্তিবিশিষ্ট ঈশান আজ চণ্ডিকাকে অসুরনিধনের জন্য অনুরোধ করিলেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানময় সর্ব্বভূতমহেশ্বর গুরু এতদিনে সর্ব্বভাববিলয়ের জন্য চিতিশক্তির প্রতি অনুপ্রেরণা করিলেন। ঈশান আজ আপনাকে অষ্টশক্তির অধিষ্ঠানরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং অষ্টশক্তিকে অসুরহননে সমুদ্যত দেখিয়া স্বয়ং চিতিশক্তিকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন।

সাধক! দেখ না একবার নিজের বুকের দিকে চাহিয়া! তোমার জ্ঞানরূপী মহেশ্বর শববৎ শায়িত, তাঁহার যে কোন চেষ্টা বা কার্য্য আছে, তাহা বুঝিতেই পারা যায় না। উহাকে পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়া নানাবিধ শক্তি এতদিন বিষয়সম্ভোগের—বহুত্বের তাণ্ডব নৃত্য-বিলাস করিতেছিল। আজ সেই শক্তিসমূহ বিশেষভাবে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা বহুত্বকে—সর্ব্বত্বকে বিলয় করিয়া এক অখণ্ড চিতি-শক্তিতে মিলাইয়া যাইবার জন্য উদ্যত। ধন্য সাধক তুমি! ধন্য তোমার সাধনা! ধন্য তোমার মানবজীবন! আজ তোমার হৃদয়স্থ গুরু—স্বয়ং ঈশান অসুরক্ষয়ের জন্য সচেষ্ট। এতদিন শুধু তুমিই অসুর-অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিতে, আজ তোমার গুরুও তোমাকে সম্যক্ নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য উদ্যত। তোমার আর ভয় নাই। তুমি অচিরে অখণ্ড পরমানন্দ রসের আস্বাদ পাইবে।

ঈশান বলিলেন—"মমপ্রীত্যা" আমার প্রীতির জন্য। অসুরকুল নিহত হইলেই ঈশানের পরম প্রীতি লাভ হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ যাবতীয় শক্তিপ্রবাহ জ্ঞানে অর্থাৎ ঈশানে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়; অসুরকুল নির্ম্মূল হইলেই ঈশান সর্ব্বশক্তি সমন্বিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইতে পারেন, তাই অসুরনিধনে তাঁহার একান্ত প্রীতি আছে।

ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥২২॥

অনুবাদ। অনন্তর দেবীর শরীর হইতে অতিভীষণা চণ্ডিকা-শক্তি এবং অতি উগ্রা ও ভয়ানক নিনাদকারিণী শত শত শিবা বিনিষ্ক্রান্ত হইল।

ব্যাখ্যা। দয়াময় গুরু ঈশান প্রার্থনা করিলেন—"হন্যন্তা-মসুরাঃ শীঘ্রং" অসুরগণকে শীঘ্র হনন করুন কিন্তু ঈশানের এইরূপ প্রার্থনার প্রত্যুত্তরস্বরূপ দেবী একটীও বাক্য প্রয়োগ করিলেন না; কেবল স্বকীয় শরীর হইতে অতিভীষণা এক চণ্ডিকাশক্তি এবং বহু-সংখ্যক শিবা নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বমন্ত্রে যে চণ্ডিকা-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা অম্বিকাদেবীকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে; কারণ, এই মন্ত্রে দেবীর শরীর হইতে পুনরায় অতি-ভীষণা চণ্ডিকাদেবীর নিষ্ক্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডিকা—অতি কোপনা সংহারকারিণী শক্তি। অম্বিকা মা আমার নিত্য নির্ব্বিকারা তাঁহাতে তোষ বা রোষ কিছুই নাই; সেই জন্যই তাঁহাহইতে অতিকোপময়ী চণ্ডিকা নাম্নী এই অত্যুগ্রা শক্তির নিষ্ক্রামণ।

চিতিশক্তিরূপিণী অম্বিকাদেবী স্বয়ং অপরিণামিনী নির্ব্বিকারা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপা। তিনি স্বয়ং কিছু করেন না, অথচ তাঁহাতেই

সর্ব্বভাবের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। আবার যাহার যাহা কিছু প্রার্থনা, অভাব অভিযোগ ইত্যাদি থাকে, তাহাও তাঁহার নিকটই করিতে হয়। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কিছু না করিলেও, পরোক্ষে অভূতপূর্ব্ব উপায়ে সাধকের প্রার্থনা কোনও না কোন প্রকারে পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই দেখ, ঈশান প্রার্থনা করিলেন—"হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রম্" অথচ অম্বিকা একটী কথাও বলিলেন না। কিন্তু দেখা গেল—অম্বিকার শরীর হইতে অত্যুগ্রা চণ্ডিকাশক্তি ও শত শত শিবা বিনির্গত হইয়া আসিল। ইহাতেই বুঝা যায়—তিনি ঈশানের প্রার্থনাপূর্ণ বিষয়ক কোনরূপ বিশেষ অনুষ্ঠান না করিলেও, পরোক্ষভাবে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার উদ্যম করিলেন। অথচ পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে দিলেন না। মা আমার এমনই ছলনাময়ী বটে! সাধক! তুমি মা মা করিয়া যতই মাথা খুঁড়িয়া মর, যতই আকুলপ্রাণে অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া মা মা করিয়া কাঁদিতে থাক, আপনার অভাব অভিযোগগুলি মাকে জানাইবার জন্য যতই উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে থাক, তথাপি মা যে তোমার একটী কথাও শুনিতেছেন, এমন ভাবটীও প্রকাশ পায় না। তোমার সহস্র আর্ত্তনাদ, সহস্র ব্যাকুলতা সে নির্ব্বিকার ধীর স্থির মাতৃবক্ষকে বিন্দুমাত্র সংক্ষুব্ধ বা চঞ্চল করিতে পারে না। মা আমার যেমন ধীরা স্থিরা তেমনই অচল মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া থাকেন;—যেন কিছুই জানেন না। তারপর হঠাৎ একদিন তুমি দেখিতে পাইলে—তোমার অভাব অভিযোগগুলি পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে; তোমার সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে।

ঠিক এমনই হয়; মা আমার এমনই ছলনাময়ী বটে! মহাভারত-বর্ণিত একটী উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিতেছি—দ্বৈতবনে পঞ্চ-পাণ্ডবের বনবাসকালে যখন ষষ্টি সহস্র শিষ্যসহ দুর্ব্বাসা মুনি তাঁহাদের আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন, তখন দ্রৌপদীরও ভোজন শেষ হইয়াছে; সুতরাং সূর্য্যপ্রদত্ত অক্ষয় পাকস্থালীও অন্নশূন্য। বড়ই বিপদ! ব্রহ্মশাপে সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম। এইরূপ ঘোর বিপদে পড়িয়া,

তখন তাঁহারা সকলে বিপদের একমাত্র কাণ্ডারী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন। পাণ্ডবগণ অবসন্ন, তন্দ্রাগ্রস্ত। কেবল দ্রৌপদী জাগ্রতা। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি দ্রৌপদীকে বলিলেন—সখি দ্রৌপদি! অনেকদিন ধর্ম্মরাজের কোনও সংবাদ পাই নাই, তাই এই পথে যাইবার সময় একবার সংবাদ নিতে আসিলাম। আর একটী কথা—আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত; সখি! আমায় কিছু অন্ন দাও।

সাধক! বুঝিতে পার কি তখন দ্রৌপদীর মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? জগৎপতি প্রাণপতি পরম প্রিয়তম ব্রহ্মাণ্ডের অন্নদাতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আজ ক্ষুধিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন, অথচ গৃহে অন্ন নাই। দ্রৌপদীর বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হইতেছিল। চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নয়—রুধিরধারা নির্গত হইতেছিল। দ্রৌপদী তখন সব ভুলিয়া গেলেন। আজ পাণ্ডবকুল যে ব্রহ্মশাপে নির্ম্মূল হইতে চলিয়াছে, সে কথা পর্য্যন্ত মনে নাই। আজ সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধা দূর করিতে পারিতেন, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না; কিন্তু তখন এমন কোন উপায়ই ছিল না, যাহাতে প্রিয়তমের ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারেন। অগত্যা ছিন্নমূল তরুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—জগন্নাথ! অন্তর্য্যামিন্! বিশ্বের অন্নদাতা! আজ তুমি আমাকে একি মর্ম্মপীড়া দিলে, আমার এ ব্যথা একমাত্র তুমি ভিন্ন আর কে বুঝিবে? প্রাণেশ্বর! আজ তুমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতেছ, আর আমি অন্নহীনা (আর লিখিতে পারি না)।

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অটল অচল। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত; সখি, তোমার যাহা আছে, তাহাই দাও। দ্রব্যের পরিমাণ দেখিও না, শুধু শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ কর। তখন সেই স্থালীলগ্ন কণিকামাত্র শাকান্ন শ্রীকৃষ্ণের হাতে তুলিয়া দিতে গিয়া দারুণ মর্ম্মপীড়ায় দ্রৌপদী আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। এ দিকে "তৃপ্তোঽস্মি" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। কিছুকাল পরে দ্রৌপদী প্রকৃতিস্থ হইয়াও

কি ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জানিতে পারিলেন—ষষ্টি সহস্র শিষ্যসহ দুর্ব্বাসা পরিতৃপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সাধক! ভগবানের এই সব লীলারহস্য অনুধাবন করিতে পার কি? সে যাহা হউক, আজ এই দেবীমাহাত্ম্যেও দেখিতে পাই—ঈশানের প্রার্থনায় কোনরূপ উত্তর না দিয়াও অম্বিকা মা আমার কার্য্যতঃ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ক্রমে আমরা তাহাই দেখিতে পাইব।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অম্বিকা—নির্ব্বিকারা চিতিশক্তি। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, নির্ব্বিকারা চিতিশক্তি হইতে চণ্ডিকা এবং শত শত শিবার আবির্ভাব কিরূপে হইবে? যাহা হইতে কোন কিছুর আবির্ভাব হয়, তাহা ত অবিকারী বস্তু নয়! ইহার উত্তরে বলিতে হয়—এই যে বিকার, উহা পরমার্থরূপে নাই, উহা কল্পিত বা ব্যবহারিক-মাত্র। অনন্ত জগতের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। অম্বিকাদেবীর শরীর হইতে চণ্ডিকাশক্তি এবং অসংখ্য শিবা নির্গত হইলেও, তাঁহাতে বিন্দুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় না। বস্তুর অন্যথাভাব প্রাপ্তির নাম বিকার। চিতিশক্তি বাস্তবিক কোন অবস্থায়ই অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না। অসংখ্য ভেদের ভিতর দিয়াও তাঁহার একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব অব্যাহত থাকে।

শিবাশতনিনাদিনী—শিবের শক্তি শিবা। প্রলয়কালে সকল জীব যাহাতে শয়ন করে, তিনিই শিব। শিব শব্দের উহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। শিবা শব্দের সাধারণ অর্থ শৃগাল হইলেও, আমরা কিন্তু এস্থলে প্রলয়কালীন শক্তি বুঝিয়া লইব। অম্বিকার শরীর হইতে অসংখ্য প্রলয়াত্মিকা শক্তির বিকাশ হইল। উহারা প্রলয়কালীন নিনাদ অর্থাৎ হুঙ্কার করিতে লাগিল। অথবা শতনিনাদিনী শব্দটীকে পৃথক্ও করা যায়। এরূপ করিলে শত নিনাদিনী শব্দের অর্থ—অনবরত ভয়ঙ্কর গর্জ্জনকারিণী শিবা অর্থাৎ প্রলয়শক্তি এইরূপ অর্থ হয়। এইরূপ অর্থও উপাদেয়ই বটে।

সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূতত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥২৩॥
ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্ব্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপাস্থিতাঃ ॥২৪॥
ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥২৫॥
বলাবলেপাদথ চেদ্ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥২৬॥

অনুবাদ। অতঃপর সেই অপরাজিতা চণ্ডিকা দেবী ধূম্রবর্ণ জটাধারী ঈশানকে বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি দূতরূপে শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট গমন করুন এবং অতি গর্ব্বিত শুম্ভ নিশুম্ভ ও অন্য যে সকল দানব সেখানে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের সকলকে বলুন—ইন্দ্র ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করুক, দেবতাগণ হবির ভাগ গ্রহণ করুক; আর তোমরা যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে পাতালে প্রয়াণ কর। পক্ষান্তরে, যদি বলগর্ব্বিত হইয়া যুদ্ধাভিলাষী হও, তবে এস, তোমাদের মাংসে আমার শিবাগণ পরিতৃপ্ত হউক।

ব্যাখ্যা। অম্বিকার শরীর হইতে আবির্ভূতা চণ্ডিকা দেবী ঈশানকে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। অন্টশক্তির অধিষ্ঠানচৈতন্যই ঈশান! ইনিই ঈশিতা নিয়ন্তা, ইনিই জ্ঞানের দেবতা শিব। জ্ঞানের কার্য্য—নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক—হিতাহিত বিচার। কোন গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সময়, ঐ ঈশানই জীবের অন্তরে থাকিয়া, বিবেকরূপে তাদৃশ অন্যায় কার্য্য হইতে জীবকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পান। ঈশান আজ এখানে ধূম্র জটিল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত। প্রলয়ের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং জ্ঞানের স্বাভাবিক শুভ্রবর্ণের মিশ্রণে ধূম্রবর্ণ শক্তিপ্রবাহ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত করিয়া আজ জ্ঞানের দেবতা শম্ভু প্রলয়ের বার্ত্তা লইয়া দূতরূপে শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া

দৈত্যগণের নিকট তাঁহাকে যে সকল কথা বলিতে হইবে, চণ্ডিকা-দেবী তাহাও বলিয়া দিলেন।

প্রথম—"ত্রৈলোক্যমিন্দ্রোলভতাম্"। ইন্দ্র ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করুক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ"। মা এবার শুম্ভকে সেই ত্রিলোকাধিপত্য পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। অস্মিতা যে আপনাকেই ত্রিলোকের অধিপতি বলিয়া বুঝিয়াছিল, ঐ ভাবটী পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহার ত্রিলোক, তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। ইন্দ্র অর্থাৎ পরমাত্মাই যে ত্রিলোকের যথার্থ অধিপতি, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। "ইন্দ্রোমায়াভিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে ইন্দ্র শব্দদ্বারা পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। একমাত্র আত্মাই যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ ত্রিলোকের অধিপতি, অস্মিতা যে কখনই ত্রিলোকাধিপতি হইতে পারে না, ইহাই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে হইবে; ইহাই মায়ের আমার দূতমুখে শুম্ভের প্রতি প্রথম আদেশ।

তারপর দ্বিতীয় আদেশ—"দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।" দেবতাগণ যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করুক। অস্মিতার বিভিন্ন ব্যূহরূপী অসুরগণ যে অমৃতস্বরূপ যজ্ঞভাগ অর্থাৎ চৈতন্যাংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে; এইরূপ করিলেই দেবতাগণ বিশুদ্ধ চৈতন্যের অংশরূপে প্রতিভাত হইয়া যজ্ঞভুক্ হইতে পারেন। এই যজ্ঞভাগ হরণের রহস্য ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মায়ের তৃতীয় আদেশ—"যূয়ং প্রয়াত পাতালম্।" তোমরা পাতালে যাও। অস্মিতা মমতা ও তাহাদের অনুযায়িবর্গের স্বর্গে অর্থাৎ চিৎক্ষেত্রে আর স্থান হইবে না; পাতালে—জড়ক্ষেত্রে—দৃশ্যবর্গের মধ্যে পরিণত হইতে হইবে। এতদিন অস্মিতা আপনাকেই দ্রষ্টৃস্বরূপ বলিয়া মনে করিত, অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ চিৎপ্রতিবিম্বরূপ অস্মিতাই আত্মারূপে প্রতিভাত হইতেছিল, এখন আর তাহা থাকিবে না; যিনি যথার্থ দ্রষ্টা, তিনিই এখন স্বরূপে অবস্থান করিবেন। অস্মিতা প্রভৃতিকে দৃশ্যবর্গরূপে বিলয় প্রাপ্ত হইতে হইবে। অম্বিকা মা আমার শুম্ভ নিশুম্ভকে পাতালে

যাইবার আদেশ করিলেন, ইহার মধ্যেও একটু রহস্য আছে। পরমাত্ম-স্বরূপ উদ্ভাসিত হইবার পরও প্রারব্ধ বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত অস্মিতা মমতা প্রভৃতির বাধিতানুবৃত্তি হইয়া থাকে। সাধক যখন পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তখনই উহারা সম্যক্ অদৃশ্য থাকে। ব্যুত্থানদশায় পুনরায় উহাদের আবির্ভাব হয়। এইরূপ আবির্ভাব হইলেও উহারা আর দ্বৈতপ্রতীতি জন্মাইতে পারে না। কারণ, আত্মসাক্ষাৎকার হইলে অস্মিতা প্রভৃতির পারমার্থিকত্ব-বুদ্ধি বিনষ্ট হয়।

মায়ের চতুর্থ আদেশ—"যদি বলগর্ব্বিত হইয়া যুদ্ধার্থী হও, তবে এস, আমার শিবাগণ তোমাদের মাংসে পরিতৃপ্তি লাভ করুক।" অস্মিতা মমতা ও তদীয় অনুচরবর্গ যদি আপনা হইতেই দৃশ্যবর্গের ন্যায় বিলয়প্রাপ্ত হইতে না চায়, তবে মায়ের শরীর হইতে বিনির্গত প্রলয়াত্মিকা শক্তিসমূহ অচিরাৎ উহাদিগকে বিলয় করিয়া দিবে। শিবাগণ—প্রলয়ঙ্করী শক্তিসমূহ প্রলয়যোগ্য বস্তুর অভাবে এতদিন যেন অনশনে ছিল, এইবার অস্মিতা প্রভৃতিকে প্রলয়-কবলিত করিয়া তাহাদের প্রলয়ক্ষুধার নিবৃত্তি করিবে। শিবাগণ পরিতৃপ্ত হইবে।

অম্বিকার শরীর হইতে চণ্ডিকাশক্তি বিনির্গত হইয়া ঈশানকে দূতরূপে শুম্ভের নিকট প্রেরণ করিলেন। অম্বিকা স্বয়ং কিছুই করেন না, তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণা। অথচ তাঁহাকে অধিষ্ঠানরূপে পাইয়া, তাঁহার শক্তিতে চৈতন্যময় হইয়াই যাবতীয় বিশিষ্ট ভাব যাবতীয়-কার্য্য সম্পাদন করে। চণ্ডিকার এই দূতপ্রেরণ যে সফল হইবে না, ইহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। শুম্ভ যে স্বেচ্ছায় পাতালে গমন করিবে না, ইহা তিনি ভালরূপেই বুঝিতেন; তথাপি মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে উহার অনুষ্ঠান করিলেন। ফলের দিকে লক্ষ্যহীন—কেবল কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মানুষ্ঠানই যে জীবকে যথার্থ শান্তির পথে আনয়ন করিতে পারে, ইহা বুঝাইবার জন্যই মায়ের এইরূপ লীলা। শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্রসমরের প্রারম্ভে দূতরূপে দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া পাঁচখানামাত্র গ্রাম পাণ্ডবদিগের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ত পূর্ণ হয়ই নাই, অধিকন্তু

দুর্য্যোধনের হস্তে তাঁহার লাঞ্ছিত হইবারও উপক্রম হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কি জানিতেন না যে, ভারত-সমর অনিবার্য্য? তথাপি কিন্তু স্বয়ং কর্ত্তব্যবোধে যুদ্ধবিরতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধক! যাহা তুমি কর্ত্তব্যরূপে বুঝিয়া লইবে, তাহার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া ঠিক এইরূপই অনুষ্ঠান করিয়া যাইবে। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" গীতার এই অপূর্ব্ব মন্ত্রটীর কার্য্যকরী অবস্থাটী বিশেষ-ভাবে দেখাইবার জন্যই বোধ হয়, চণ্ডিকা-দেবী ঈশানকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আর একটী বিষয়ও দেখিবার যোগ্য—আমরা যখন যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, আমাদের হৃদয়স্থ দেবতা বিবেকরূপী ঈশান, অন্তরে অন্তরে নীরব ভাষায় উহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ক আদেশ করিয়া থাকেন। যখন আমরা এই হৃদয়স্থ গুরুর আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করিতে পারি, তখনই আমরা অভ্যুদয়ের সন্নিহিত হই। আর যখন গুরুর আদেশকে শ্রেয়ঃ বলিয়া বুঝিয়াও প্রেয়ের আকর্ষণে শ্রেয়কে উপেক্ষা করি, তখনই আমাদের নিম্নগতি সূচিত হয়। আমাদের প্রস্তাবিত স্থলেও শুম্ভ নিশুম্ভ এবং অন্যান্য অসুরগণ ঈশানের বাক্য অবহেলা করিয়াই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

জানি প্রভু, তোমার আদেশ তোমার ইঙ্গিত পালন করাই আমাদের শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু কই, নির্ব্বিচারে তোমার আদেশ শিরোধার্য্য করিতে পারি কই গুরো? তুমি ঈশান, তুমি নিয়ন্তা, তুমিই যে আমাদের ইহ পরকালের একমাত্র গতি; এই কথাটা যে কিছুতেই মর্ম্মে মর্ম্মে ধারণা করিয়া রাখিতে পারি না। আমাদের এই দুর্ব্বলতা একমাত্র তুমিই দূর করিতে সমর্থ। গুরো! তোমার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা আনিবার উপায়ও একমাত্র তুমিই। বহুদিন হইতে, বহুজন্ম হইতে সুধু এই দুর্ব্বলতার জন্যই তোমার অভয় অঙ্ক হইতে দূরে অবস্থান করিতেছি। আর না, আর যে পারি না প্রভো! আমায় নিয়ে চল। সুধু উপদেশ, সুধু পথ দেখাইয়া দিলে

চলিবে না। আমি যে গতিহীন, আমি যে শক্তিহীন; সুতরাং উপদেশ আমার কি করিবে? তুমি নিজে এসে হাতে ধরে আমায় নিয়ে চল প্রভু! আমায় নিয়ে চল! সুধু অন্তরে থাকিয়া নীরব ভাষায় আদেশ করিও না। আদেশ প্রতিপালনের সামর্থ্যরূপেও তুমিই আবির্ভূত হও।

সাধক! এমনই করিয়া ঈশানের চরণে সরল প্রাণে নিবেদন কর; তাঁহার কৃপায় হৃদয়ে বল আসিবে, গুরুর আদেশ পালনের সামর্থ্য আসিবে। তখন অবলীলাক্রমে এই সকল গহনতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া জন্ম মৃত্যুর পরপারে অতি সহজে উপনীত হইতে পারিবে। তোমার বহু-জন্মব্যাপী কঠোর সাধনা ফলবতী হইবে।

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। যেহেতু সেই দেবী (চণ্ডিকা) কর্ত্তৃক স্বয়ং শিব দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি লোকমধ্যে শিবদূতী নামে খ্যাত হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা। স্বয়ং শিব যাঁহার দূত, তিনি শিবদূতীই বটেন। যাঁহার প্রেরণায় অন্তর্য্যামী পুরুষ প্রতিজীবের অন্তরে থাকিয়া জীবের উচ্ছৃঙ্খল গতিকে সংযত করেন, যাঁহার প্রেরণায় ঈশান নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বা বিচাররূপে প্রতিজীবের অন্তরে অবস্থান করেন, তিনিই শিবদূতী। শিবকে—বিজ্ঞানময় গুরুকে দূতরূপে নিয়োগ করিবার সামর্থ্য একমাত্র চিতিশক্তিরই আছে। তাই অম্বিকার শরীর হইতে নির্গত চণ্ডিকাদেবী ঈশানকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। চিতিশক্তি স্বয়ং সর্ব্ব-ভাবাতীত বলিয়া তদাশ্রিত বা তদুৎপন্ন শক্তিসমূহই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

সাধক, যতক্ষণ বিজ্ঞানময় গুরু চিতিশক্তির অমৃতময় বার্ত্তা লইয়া দূতরূপে জীবের নিকট উপস্থিত না হন, ততদিন জীবের কি সাধ্য যে,

জগতের ধূলা-খেলাকে তুচ্ছ করিয়া অমৃতের অন্বেষী হয়। গুরুই ত একান্ত আগ্রহে মায়ের নিকট গিয়া বলেন,—"হন্যস্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যা"—"আমার প্রীতির জন্য শীঘ্র অসুর বিনাশ করুন"। গুরুর ইচ্ছায়ই ত চণ্ডিকাকর্তৃক অসুরগণ নিপাতিত হয়। যতদিন গুরুর হৃদয়ে অসুর-বিনাশের ইচ্ছা না জাগে, ততদিন চণ্ডিকাদেবী অসুর নিধন করিতে উদ্যত হন না। কি হইলে গুরুর এইরূপ মঙ্গলময়ী ইচ্ছা জাগে, তাহা জানিতে চাও? তবে শুন—যখন শিষ্যের ইচ্ছা বলিয়া কিছু থাকে না, শিষ্য হৃদয়ের প্রত্যেক ইচ্ছাটী যখন গুরুর ইচ্ছারই সম্যক্ অনুবর্ত্তন করে, তখনই বুঝিতে হইবে, অসুর-নিধনের জন্য গুরুর অনুপ্রেরণা আসিতে আর বিলম্ব নাই। গুরুকে দেখিতে পাও না? এই বিশ্বই যে গুরুর স্থূলরূপ। গুরুকে দেখিতে পাও না? ঐ যে অন্তরে অন্তরে বোধরূপে, জ্ঞানরূপে, হিতাহিত বিচাররূপে নিত্যই তিনি বিরাজিত। তথাপি দেখিতে পাও না? তবে শুন—যিনি স্থূলে বিশ্বমূর্ত্তি, সূক্ষ্মে কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি, তিনিই আবার বিশেষ করুণায় বিশিষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বিজ্ঞানময় গুরু ঘন হইয়াই মনুষ্যের আকার ধারণ করেন। গুরু কখনও মানুষ হন না, অথবা মানুষ কখনও গুরু হয় না। গুরু, নিত্যই গুরু, নিত্যই ঈশান, নিত্যই সর্ব্বভূত-মহেশ্বর—বিশ্বনাথ। যাহাদের হৃদয়ে মা আমার শ্রদ্ধামূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, কেবল তাহারাই গুরুর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

সাধক, এই যে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক বা বিচার বলিয়া কথাটা শুনিতে পাও, ঐ যে বিবেক, ঐ যে বিচার, উহাই ত গুরুর প্রকট কৃপা। কেবল শ্রবণদ্বারা, কেবল মৌখিক আলোচনাদ্বারা কখনও নিত্যানিত্য-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হয় না। নিত্য বস্তুতে বিচরণ করিতে না পারিলে, অনিত্য বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। বস্তুর স্বরূপ-বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান না হইলে, তদ্‌বিষয়ে আগ্রহ বা ত্যাগ কিছুই উপস্থিত হয় না। নিত্যানিত্য বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানের প্রতি একমাত্র গুরুকৃপাই

অব্যর্থ হেতু। গুরুর আসন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে, জীব নিশ্চয়ই নিত্যানিত্য বস্তুবিচারে সমর্থ হয়।

সে যাহা হউক, আমরা এখানে দেখিতে পাইতেছি—হিতোপদেশ লইয়া ঈশান শুম্ভের নিকট উপস্থিত। সাধক, তোমরাও লক্ষ্য করিয়া দেখিও, তোমার প্রত্যেক কার্য্যেই এইরূপ ঈশানের আবির্ভাব হয় কি না?

তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্ব্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥২৮॥

অনুবাদ। ঈশান-বর্ণিত দেবীর বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া অসুরগণ অত্যন্ত ক্রোধের সহিত, যেখানে কাত্যায়নী দেবী অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল।

ব্যাখ্যা। "আসন্নকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ," "ন শৃণ্বন্তি সুহৃদ্‌বাক্যং হতায়ুষঃ" আসন্নকালে জীবের বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয়; হতায়ু ব্যক্তি সুহৃদের হিতোপদেশ শ্রবণ করে না। অসুরগণও এই নীতির অন্যথা করিল না; তাহারা প্রলয়-পুরীর আতিথ্যস্বীকারে উদ্যত হইল। শর্ব্বকর্ত্তৃক আখ্যাত অর্থাৎ ঈশানকর্ত্তৃক বর্ণিত দেবীর তিনটী আদেশই অসুরগণ উপেক্ষা করিল। দেবী বলিয়াছিলেন—"ত্রৈলোক্য-মিন্দ্রোলভতাং, দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ, যূয়ং প্রয়াত পাতালম্" এই তিনটী আদেশ অমান্য করিয়া, অসুরগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইল; সুতরাং মায়ের চতুর্থ বাক্য নিশ্চয় সফল হইবে। অচিরে অসুরের মাংসে শিবাগণের পরিতৃপ্তি সাধন হইবে।

শুন, অস্মিতা যে আত্মা নহে, বুদ্ধি যে স্বয়ং চৈতন্য নহে, ইহা আমরা যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে বিশেষরূপ বুঝিতে পারিলেও, আমাদের কার্য্যগুলি তাহার বিপরীতভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ আমরা অস্মিতাকেই আত্মারূপে এবং বুদ্ধিকেই চৈতন্যরূপে

গ্রহণ করি। সুতরাং ঈশানের উপদেশ—বিবেকের বাণী আমাদের নিকট কোনও কার্য্যকরী হয় না। আমরা কিছুতেই বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ বস্তুকে পরিগ্রহ করিতে পারি না, ভয় হয়—পাছে আমার বড় সাধের আমিটী হারাইয়া যায়! কিন্তু এইবার আশা হইয়াছে—অসুরগণ ক্রোধান্ধ হইয়া কাত্যায়নীর নিকট যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং উহাদের প্রলয় অবশ্যম্ভাবী।

এই মন্ত্রে অম্বিকাদেবীকেই কাত্যায়নী বলা হইয়াছে। কাত্য শব্দের অর্থ—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ; তাঁহারা যাঁহাকে অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় করেন, তিনিই কাত্যায়নী। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ একমাত্র চিতিশক্তিকে অর্থাৎ অম্বিকাদেবীকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন; তাই মা আমার কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধা। সাধক অচিরেই ব্রহ্মবিদ্ হইবেন তাই ঋষি এখানে মাকে আমার কাত্যায়নী নামে অভিহিত করিলেন।

ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষুরুদ্ধতামর্ষাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥২৯॥
সা চ তান্ প্রহিতান্ বানাঞ্ছূলচক্রপরশ্বধান্।
চিচ্ছেদ লীলয়াধ্মাতধনুর্ম্মুক্তৈর্মহেষুভিঃ ॥৩০॥

অনুবাদ। অনন্তর প্রথমেই ক্রোধে উদ্ধত অসুরগণ দেবীর প্রতি শর, শক্তি এবং ঋষ্টি অস্ত্রসমূহ বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং দেবীও সেই অসুর-নিক্ষিপ্ত বাণ শূল চক্র এবং পরশু প্রভৃতি অস্ত্রগুলিকে অবলীলাক্রমে শব্দায়মান ধনু হইতে বিমুক্ত মহাশরসমূহ প্রয়োগ করিয়া ছিন্ন করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা প্রথমে অস্ত্র প্রয়োগ করে, তাহাদিগকে আততায়ী পক্ষ কহে, এবং যাহারা পরে অস্ত্র প্রয়োগ করে, তাহাদিগকে আত্মরক্ষী পক্ষ কহে; যুদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রথম কৌরব পক্ষ শঙ্খধ্বনি করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইয়াছিল ; সেইজন্য দুর্য্যোধনাদি আততায়ী পক্ষ এবং পাণ্ডবগণ আত্মরক্ষী পক্ষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানেও দেখিতে পাই—অসুরগণই প্রথমে মাতৃ-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত। উহারা আত্মাকে হনন করিতে চায়, তাই আততায়ী। শাস্ত্রে উক্ত আছে—আততায়াকে নির্ব্বিচারে হত্যা করিবে। তাই মা আমার অচিরাৎ ইহাদিগকে হত্যা করিয়া, স্নেহের সন্তানকে অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

এইবার আমরা অসুরগণের অস্ত্র-প্রয়োগের রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। ঘৃণা লজ্জা ভয় জাতি কুল প্রভৃতি সংস্কারসমূহ অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহমাত্র। উহারা স্ব স্ব বিশিষ্ট ভাবের দ্বারা আত্ম-বোধকে বিশেষিত করিতে প্রয়াস পায়, ইহাই অসুরগণের মাতৃ-অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ। পূর্ব্বোক্ত ঘৃণা লজ্জাদি বিশিষ্ট ভাবগুলি আত্মবোধের সহিত এমনই জড়াইয়া গিয়াছে যে, পুনঃ পুনঃ বিচারের দ্বারা আত্মার অসঙ্গত্ব নির্ণীত হইলেও ঐ সকল ভাব পুনঃ পুনঃ আত্মবোধকে বিশিষ্ট করিয়া তুলে। সর্ব্বথা অসঙ্গ আত্মাকে কোন প্রকারে বিশেষিত করাই অসুরদিগের অস্ত্র-প্রয়োগ।

এইরূপ উদায়ুধ প্রভৃতি অসুরগণ অর্থাৎ ঘৃণা লজ্জাদি পাশসমূহ পুনঃ পুনঃ বিশুদ্ধ চিতিশক্তির অঙ্গে নানাভাবরূপ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল ; তখন মা আমার শব্দায়িত ধনু হইতে মহা ইষু নিক্ষেপ করিয়া অসুর-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলিকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। শব্দায়িত ধনু হইতে মহা ইষু নিক্ষেপ করাই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য উপাসনার রহস্য। প্রণবরূপ ধনুতে আত্মবোধরূপ শর সংযুক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিতে হয়। ঐরূপ করিলেই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন ; সুতরাং ঘৃণা লজ্জাদি বিশিষ্ট ভাবগুলি অন্তর্হিত হইয়া যায়। আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে আপনাকে বিচ্যুত বা পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন বলিয়াই ত তাঁহাকে অষ্টপাশরূপী অসুরগণের অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে হয়। শুধু পূর্ব্বোক্ত শরপ্রয়োগে অর্থাৎ উপাসনা-রূপ তীব্র প্রযত্নের ফলেই আত্মার নির্ব্বিশেষ স্বরূপটীর উপলব্ধি হয়।

সাধক! তুমিও তোমার বহুজন্মসঞ্চিত অষ্টপাশরূপী আসুরিক ভাবগুলিকে ধরিয়া মায়ের অঙ্গে নিক্ষেপ কর। তুমি মায়ের কৃপায় অচিরে পাশমুক্ত হইবে—জীবত্ব বিদূরিত হইবে, শিবত্ব লাভ হইবে। আর যদি মাতৃচরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাক, তবে আর তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না; সাধন-সমরে প্রবিষ্ট সাধকগণের ন্যায় তোমাকেও মা স্বয়ংই অষ্টপাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইবেন।

তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্।
খট্বাঙ্গপ্রোথিতাংশ্চারীন্ কুর্ব্বতী ব্যচরত্তদা ॥৩১॥

অনুবাদ। তখন কালী অরিগণকে শূলাঘাতে বিদীর্ণ এবং খট্বাঙ্গদ্বারা প্রোথিত করিয়া তাঁহার (অম্বিকার) সম্মুখভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। এইবার দেবশক্তিসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অসুর-ক্ষয়ের বিবরণ বর্ণিত হইবে। প্রথমেই কালী বা চামুণ্ডা-শক্তির কথা হইতেছে। তিনি কতকগুলি অসুরকে শূলাঘাতে বিদীর্ণ, অপর কতক-গুলিকে খট্বাঙ্গদ্বারা প্রোথিত করিলেন। যদিও কালীশক্তির বিনিষ্ক্রমণ-কালে বিশেষভাবে শূলাস্ত্রের কোন উল্লেখ নাই, কেবল অসি, পাশ, খট্বাঙ্গ, এই তিনটী অস্ত্রেরই উল্লেখ আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে,—এই অষ্টশক্তি যখন ঈশানেরই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, তখন ঈশানের বিশেষ অস্ত্র শূল প্রত্যেক শক্তিরই আছে। শূলাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইয়াছে। শূল শব্দে সাধারণতঃ ত্রিশূলই বুঝায়। ত্রিপুটী জ্ঞানই ত্রিশূল। অসুর নিধনের পক্ষে এমন অব্যর্থ অস্ত্র আর নাই। মহিষাসুর হইতে শুম্ভ পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান অসুরগুলি সকলেই এই শূলাঘাতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধক! দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রিশূল বলিতে জ্ঞানের ত্রিপুটী বুঝিয়াছিলে, আর এখানে উহাকে আনন্দের ত্রিপুটী বলিয়া বুঝিয়া লইবে। আনন্দ, তাহার অনুভব এবং

আনন্দের অনুভবকর্ত্তা, এই তিনটীকে আনন্দের ত্রিপুটী কহে। একই আনন্দ বস্তু এই ত্রিবিধ স্পন্দনে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে। এইটী যখন সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তখনই অসুরকুল নির্ম্মূল হয়: তাই বলিতেছিলাম—অসুর-নিধন পক্ষে ত্রিশূল অস্ত্রই বিশেষ কার্য্যকারী।

কালী—প্রলয়ঙ্করী শক্তি এইরূপে আনন্দের ত্রিপুটী প্রয়োগে ষড়শীতি-সংখ্যক উদায়ুধবংশীয় অসুরগণকে নিহত করিয়া, অম্বিকা দেবীর অগ্রভাগে আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বিশুদ্ধা চিতিশক্তির সম্মুখভাগেই প্রলয়-শক্তি বিরাজ করে। কারণ, সর্ব্বভাবের বিলয় না হইলে পরমাত্মবোধ উদ্ভাসিত হয় না। তাই মন্ত্রে "তস্যাগ্রতোব্যচরৎ" এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে। "তস্যাগ্রতঃ" পদটীতে তস্যাঃ শব্দটীর বিসর্গলোপ হওয়াতেও সন্ধি হইয়াছে; উহা আর্ষ প্রয়োগ। সে যাহা হউক, যদিও এই মন্ত্রে উদায়ুধ-অসুরের নিধন বর্ণিত হয় নাই, তথাপি বুঝিয়া লইতে হইবে—শুম্ভের আদেশে যে আটটী অসুর-সম্প্রদায় যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়াছে, যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা লজ্জাদি অষ্টপাশরূপে বুঝিয়া লইয়াছি, এইবার সেই অষ্টপাশরূপী আটটী অসুর-সম্প্রদায় অম্বিকার শরীর হইতে বিনির্গত অষ্টশক্তিকর্ত্তৃক ক্রমে ক্রমে নিহত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমেই চামুণ্ডা-শক্তি উদায়ুধ নামক অসুরকে অর্থাৎ জীবের ঘৃণা নামক প্রথম পাশকে বিলয় করিয়া দিলেন। একমাত্র অখণ্ড আনন্দসত্তা ব্যতীত আর যে কোথাও কিছু নাই, ইহার উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীবের ভেদজ্ঞান সম্যক্ অপনীত হয়। ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইলেই জীবের ঘৃণানামক সংস্কার চিরতরে বিলুপ্ত হয়। এইরূপে সাধক প্রথম পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মাণী যুদ্ধক্ষেত্রের যে যে অংশে দ্রুতবেগে গমন করিতেছিলেন, কমণ্ডলু-জলনিক্ষেপে সেই সেই অংশের শত্রুদিগকে হতবীর্য্য ও হতোদ্যম করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। যে শক্তি-প্রভাবে সৃষ্টির অব্যক্ত বীজগুলি পুনরায় সৃষ্টি কার্য্যের উপযোগী হইয়া থাকে, সেই শক্তিই সৃষ্ট জীবের জীবন। উহাই ব্রহ্মাণীর কমণ্ডলুস্থিত জল। ঐ জল অর্থাৎ জীবনীশক্তি নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মাণী অসুরদিগকে হতবীর্য্য এবং হতোদ্যম করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণীর কমণ্ডলু-জলক্ষেপরূপ ব্যাপারটীদ্বারা বীজসমূহের পুনরায় ভাবোৎপাদনের সামর্থ্য অর্থাৎ বীজের বীজত্ব বিনষ্ট হইতেছিল। সাধক! মনে রাখিও—মা যতদিন এইরূপ ব্রহ্মাণী-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টির বীজাধার হইতে জল বা জীবনীশক্তিকে অপসারিত করিয়া না দেন, ততদিন জন্মমৃত্যুর স্রোত নিরুদ্ধ হয় না। সাধকের নিজের চেষ্টায় ইহা কোনও রূপেই সম্পন্ন হইতে পারে না। আমাদের পুঞ্জীভূত ইচ্ছার তলদেশে কোথায় কোন্ সংস্কার লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা জানি না, জানিতে পারি না; কিন্তু মায়ের তীব্র দৃষ্টিতে সে সকলই উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। সেই লুক্কায়িত সংস্কারগুলিকে প্রকট করিয়া, উহার জীবনীশক্তি বিনষ্ট করিয়া দেওয়াই ব্রহ্মাণীশক্তির কার্য্য। সাধকগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন—সাধনার পথে যতই বেশী অগ্রসর হওয়া যায়, ততই মধ্যে মধ্যে নানারূপ প্রতিকূল সংস্কার অতিতীব্র বেগে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এবং তাহারই প্রভাবে অনেক সাধক একেবারে হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন। এই সময় গুরুর সমীপে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। তিনি বুঝাইয়া দিবেন ঐরূপ ঘটনায় হতাশের কোন কারণ নাই। উহা অসুর কুলের জীবনীশক্তি নাশের পূর্ব্বায়োজন। ব্রহ্মাণীর এই কমণ্ডলুজল নিক্ষেপের রহস্য বুঝিতে পারিলে আর সাধক-

গণের কোনরূপ হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। আর একটী কথা যদিও এই মন্ত্রে বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই, তথাপি বুঝিয়া লইতে হইবে যে, ব্রহ্মাণী-শক্তি কর্তৃকই ষড়শীতিসংখ্যক কম্বু নামক অসুরকুল নিহত হইয়াছিল। এইরূপেই মা আমার ভেদজ্ঞানমূলক লজ্জা বা আত্মসঙ্কোচরূপ দ্বিতীয় পাশ ছিন্ন করিয়া দেন। স্থূল কথা, বিপর্য্যয়-জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার পর সাধক যতই অদ্বয় সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই যাবতীয় ভেদজ্ঞান এবং তজ্জন্য নানারূপ সংস্কার বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহাতে অসম্ভবতা এবং অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই।

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা॥ ৩৩॥

অনুবাদ। মাহেশ্বরী ত্রিশূলদ্বারা, বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা এবং কৌমারী শক্তিঅস্ত্রদ্বারা অতিশয় ক্রোধের সহিত দৈত্যবৃন্দকে নিধন করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। মাহেশ্বরী বৈষ্ণবী এবং কৌমারী শক্তি—ত্রিশূল চক্র এবং শক্তি অস্ত্র প্রয়োগে, যথাক্রমে কোটিবীর্য্য ধৌম্র এবং কালক নামক অসুরসমূহকে নিহত করিলেন। ত্রিশূল চক্র এবং শক্তি শব্দের ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অসুরত্রয় যথাক্রমে ভয় শঙ্কা এবং জুগুপ্সা নামক জীবের তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম পাশ; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মা আমার মাহেশ্বরী বিজ্ঞানময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ত্রিশূল অর্থাৎ আনন্দময় ত্রিপুটী-প্রয়োগে অতি প্রবল মৃত্যুভয়রূপ সংস্কার বিলয় করিয়া দিলেন। যে মরণ ত্রাস জ্ঞানবানেরও বিদূরিত হয় না, মা আমার মাহেশ্বরী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া আজ তাহাও বিনষ্ট করিয়া দিলেন। বৈষ্ণবী প্রাণময়ী স্থিতিশক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া সুদর্শনচক্র অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি প্রয়োগে আশঙ্কারূপ চতুর্থ পাশ ছিন্ন করিলেন। প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তির বিনাশ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা

উন্নতস্তরের সাধকগণেরও দেখিতে পাওয়া যায়। মা আমার বৈষ্ণবী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া তাহারও বিলয় সাধন করিলেন। এইরূপ কার্ত্তিকেয় শক্তি অর্থাৎ দেবসেনা-পরিচালনকারিণী শক্তি আবির্ভূত হইয়া ভেদজ্ঞানমূলক জুগুপ্সা নামক সংস্কার বিনষ্ট করিলেন। ভেদজ্ঞান যত ক্ষীণ হইতে থাকে গোপনেচ্ছা আত্মসঙ্কোচ প্রভৃতি ততই বিনষ্ট হইয়া যায়। সাধক! দেখ—মা যাহাকে পাশমুক্ত করিয়া শিবত্ব প্রদান করেন, ঠিক এমনই করিয়া তাহার সকল বন্ধন নিজ হস্তে ছিন্ন করিয়া দেন। যাঁহারা মাতৃচরণে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইতে পারিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়—একমাত্র তাঁহারাই এইরূপ সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভে ধন্য হইয়া থাকেন। তাই বলি প্রিয়তম সাধকবৃন্দ! মাতৃচরণে সর্ব্বথা শরণাগত হইবার জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন প্রয়োগ কর।

ঐন্দ্রী কুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্ব্বিদারিতা ভূমৌ রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ ॥৩৪॥
তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥৩৫॥
নখৈর্ব্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা ॥৩৬॥

অনুবাদ। ইন্দ্রাণী বজ্রপাতের দ্বারা শত শত দৈত্য দানবকে বিদার্ণ করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। তাঁহাদের দেহ হইতে রুধিরধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। বারাহীশক্তি অসুরগণকে স্বকীয় তুণ্ডপ্রহারে বিধ্বস্ত করিলেন, দন্তাঘাতে তাহাদের বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত এবং অস্ত্রাঘাতে তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ নারসিংহী শক্তিও অন্য অসুরদিগকে নখরসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ঘোর নাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। এই তিনটী মন্ত্রে ইন্দ্রাণী, বারাহী এবং নারসিংহী শক্তির অসুর-ক্ষয়-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। শুম্ভ যে আটটী অসুরসম্প্রদায় যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার তিনটীমাত্র অবশিষ্ট আছে। উহাদের নাম দৌহৃ‍র্ত, মৌর্য্য এবং কালকেয়। ইন্দ্রাণী বারাহী এবং নারসিংহী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া মা আমার এই অসুরত্রয়কেও নিহত করিলেন। আধ্যাত্মিকভাবে ইহাদিগকে কুল, শীল ও জাতিরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই তিনটীই জীবের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পাশ। এই কুল শীল ও জাতিরূপ পাশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সাধকগণ শিখাসূত্রত্যাগ সন্ন্যাসগ্রহণ যথেচ্ছ-আহার-বিহার প্রভৃতি কতই না উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক সাধকই যথার্থ ঐ সকল বন্ধনের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। বন্ধন অর্থবোধক পশ্ ধাতু হইতে পাশ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং পাশমুক্ত হওয়া ও বন্ধনমুক্ত হওয়া একই কথা। মা যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন; তাই দেখিতে পাই—মা আমার নানা মূর্ত্তিতে নানাভাবে সন্তানকে পাশমুক্ত করিয়া দিতেছেন। ধন্য সাধক! এইবার তুমি অষ্টপাশমুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভের যোগ্য হইলে। ধন্য তোমার মাতৃচরণে শরণাগতি!

প্রারব্ধ সংস্কারের মধ্যে এই অষ্টপাশের সংস্কার অতি প্রবলভাবে অবস্থান করে। সঞ্চিত ও আগামী সংস্কারের মধ্যে ইহারা যে থাকে না, তাহা নহে, তবে ইতিপূর্ব্বেই মায়ের কৃপায় তাহা অশ্লেষ এবং বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞানে উপস্থিত হওয়ার পক্ষে প্রবল প্রারব্ধই বিশেষ অন্তরায়; তাই মা ইহাদিগকে নানারূপে বিনষ্ট করিয়া দেন। কতকগুলিকে ভোগের ভিতর দিয়া, কতকগুলিকে সংযমের ভিতর দিয়া, কতকগুলিকে স্বপ্নের ভিতর দিয়া বিলয় করেন। কোন্ সংস্কার যে কিরূপভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। মায়ের মহতী ইচ্ছা কতরকমভাবে প্রকটিত হইয়া, কতরকমে যে স্নেহের সন্তানকে পাশমুক্ত করিয়া দেয়, তাহা সাধকগণ সামান্যমাত্রই

লক্ষ্য করিতে পারেন। সে যাহা হউক, আমরা এখানে দেখিতে পাইতেছি—মা বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া বিভিন্ন সংস্কারগুলি ক্ষয় করিয়া দিতেছেন।

চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাং স্তাংশ্চখাদাথ সা তদা ॥৩৭॥

অনুবাদ। শিবদূতী দেবীর (অম্বিকার শরীর হইতে আবির্ভূতা চণ্ডিকা দেবীর) প্রচণ্ড অট্টহাস্যে অসুরগণ অভিদূষিত অর্থাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল, তখন তিনি স্বয়ং সেগুলিকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। শিবদূতী অর্থাৎ চণ্ডিকা দেবীও পূর্ব্বোক্ত অষ্টমাতৃকার সহিত একত্রিত হইয়া অসুরকুল ক্ষয় করিতে লাগিলেন। অট্টহাস্যই ইহার যুদ্ধ-সাধন অস্ত্র। প্রলয়ের অট্টহাসি অসুরবৃন্দের হৃদয়ে এমন ভীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল যে, তাহারা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল, এবং দেবী স্বয়ং তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। যাবতীয় ভেদভ্রান্তিই শিবদূতী কর্ত্তৃক নিধনযোগ্য অসুর। যাঁহার প্রেরণায় বিজ্ঞানময় মহেশ্বর ঈশান দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি—সেই শিবদূতী—সেই জ্ঞানময়ী মহতী শক্তিও আজ অসুর নিধনে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবে যে সর্ব্ববিধ ভেদভ্রান্তি বিদূরিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ভেদ পাঁচ প্রকার—(১) জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, (২) জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, (৩) জীবের সহিত জীবের ভেদ, (৪) জীব ও জড়ের ভেদ (৫) এবং জড়ের সহিত জড়ের ভেদ। এই সকল ভেদভ্রান্তিরূপ অসুর একবার অদ্বয় জ্ঞানের আলোক পাইলে অচিরাৎ মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হয়। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মন্ত্রের উচ্চারণ এবং তৎসঙ্গে অদ্বয় জ্ঞানের ক্ষণিক প্রকাশরূপ উজ্জ্বল হাসি ভেদভ্রান্তিরূপ অসুরসমূহকে ক্ষণকালমধ্যেই বিলয় করিয়া

দেয়। ইতিপূর্ব্বে উহারা জ্ঞানময় সত্তার উপরেই অধিষ্ঠিত ছিল; তখন উহাদিগকে ঠিক অজ্ঞান বলিয়া ধরিতে পারা যায় নাই; কিন্তু এইবার অখণ্ড জ্ঞানময় সত্তা প্রকাশিত হওয়ায়, উহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তারপর সে সকলকে শিবদূতী স্বয়ং গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তাই মন্ত্রে "তাংশ্চখাদ"—"সেই অসুরদিগকে ভক্ষণ করিলেন" এইরূপ বাক্যের উল্লেখ হইয়াছে।

সাধক দেখ, যে পরিমাণে জ্ঞানের আলোক আসিয়া পড়িতে থাকে, সেই পরিমাণেই অজ্ঞান বা ভেদ-ভ্রান্তিরূপ অসুর নির্ম্মূল হইতে থাকে। তাই ত প্রথম হইতেই বলিয়া আসিয়াছি—ওগো, তোমরা অজ্ঞান দূর করিতে চেষ্টা করিও না; শুধু জ্ঞানের উদয়ের দিকে লক্ষ্য রাখ। অজ্ঞান দূর করাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে, আলোক দর্শন বা জ্ঞানলাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। জ্ঞানলাভ হইলে অজ্ঞান-অন্ধকার আপনা হইতেই পলায়ন করে। কিন্তু সে অন্য কথা—

ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ৈর্ব্বিবিধৈর্নেশুর্দ্দেবারি-সৈনিকাঃ ॥৩৮॥

অনুবাদ। এইরূপ নানা উপায়ে মাতৃগণ মহাসুরগণকে বিমর্দ্দিত করিতেছেন দেখিয়া, দৈত্যসৈন্যগণ অদৃশ্য হইল অর্থাৎ পলায়ন করিল।

ব্যাখ্যা। মা একা অদ্বিতীয়া হইয়াও আজ মাতৃগণরূপে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিরূপে অসুরগণকে—যাবতীয় দ্বৈত প্রতীতিসমূহকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে অসুর কুল বিনষ্ট হইতে লাগিল। সাধক। লক্ষ্য করিও—দ্বৈত-প্রতীতিসমূহ বিশুদ্ধ বোধের উদয়ে একে একে বিনষ্ট হইয়া যায়। মায়ের কৃপায় পঞ্চবিধ ভেদ-ভ্রান্তি, অষ্টবিধ পাশ এইরূপেই অদৃশ্য হইয়া যায়। অদর্শনার্থক নশ্ ধাতু হইতে "নেশুঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বোধ বস্তু যখন স্বপ্রকাশ-

রূপে উদ্ভাসিত হয়, অর্থাৎ মাত্র আপনাকেই আপনি প্রকাশ করেন, তখন ভেদ-জ্ঞানগুলি অথবা ভেদজ্ঞানমূলক বিভিন্ন সংস্কারগুলি আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইবার দেখ সাধক, মা তোমাকে ধীরে ধীরে কোথা হইতে কোথায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। মনোরাজ্য হইতে বিজ্ঞানরাজ্যে, বিজ্ঞান হইতে ভাবাতীত ক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছেন। অথচ তোমাকে কিছুই করিতে হয় নাই। তুমি মাতৃ-অঙ্কস্থ নগ্ন শিশু; তুমি সরল প্রাণে শুধু মা মা বলিয়াই নিশ্চিন্ত। তারপর কি করিতে হইবে, কিরূপে তোমার বহুজন্ম সঞ্চিত দুরপনেয় সংস্কাররাশিকে বিলয় করিতে হইবে, সে সকল বিষয়ে আর তোমার লক্ষ্য করিবার কিছু আবশ্যক নাই। শুধু মায়ের খেলাগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া যাওয়াই তোমার কার্য্য। ভ্রমেও ভাবিও না, তোমাদের কঠোর সাধনা কিংবা সুদৃঢ় ভক্তির বলে এইরূপ হইতে পারে। যদি তাহা হইত, তবে সাধক বা ভক্তিমান্‌মাত্রেই মুক্তিলাভ করিতে পারিত। স্মরণ কর—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥" যাহারা আত্মাকে বরণ করে—যাহারা আত্মাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জানিয়া আত্মচরণে আত্মসমর্পণ করে, একমাত্র তাহাদের নিকটেই আত্মা তাঁহার স্বকীয় স্বরূপটী সম্যক্‌রূপে উদ্ভাসিত করেন।

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দ্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৩৯॥
রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ ॥
সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ ॥৪০॥

অনুবাদ। মাতৃগণকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত দৈত্যগণকে পলায়নতৎপর দেখিয়া অতিক্রুদ্ধ রক্তবীজনামক অসুর যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। তাহার শরীর হইতে একবিন্দু রক্ত ভূতলে নিপতিত হইলে, ঠিক সেইরূপ প্রমাণবিশিষ্ট অপর একটী অসুর ভূমিতল হইতে পুনরায় সমুত্থিত হয়।

ব্যাখ্যা। এই রক্তবীজই শুম্ভের শেষ সেনাপতি। ইহার পর একমাত্র নিশুম্ভ অবশিষ্ট থাকিল, তাহাকে আর সেনাপতি বলা যায় না। সে যাহা হউক, এই রক্তবীজবধের রহস্য অতি বিচিত্র। একটু ধীরভাবে এ তত্ত্বে অবগাহন করিতে হইবে। মা আনন্দময়ী মহাশক্তি, তুমি ধীরূপে—ধারণাবতী মেধারূপে আত্মপ্রকাশ কর। তোমার এই অতিগহন লীলারহস্য আমাদের এই ক্ষীণ বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হউক। তোমার কৃপায়, ততোঽধিক তোমার স্নেহে এই দুরধিগম্য মধুচক্র হইতে আনন্দময় বিজ্ঞান-মধু পান করিয়া আমরা ধন্য হই। জগতের লোক তোমার এই অপূর্ব্ব লীলা-রহস্য অবগত হইয়া, তোমাকে সরলপ্রাণে মা বলিয়া ডাকিতে শিখুক। দুঃখ-সন্তাপময় বিশ্ব আবার আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হউক।

"আমি জীব" এই ভাবটির নাম রক্তবীজ। আমি অর্থাৎ আত্মরূপী বীজটী যখন জীবত্বরূপ বিশেষণদ্বারা রক্ত অর্থাৎ রঞ্জিত হয়, তখনই উহাকে রক্তবীজ বলা হয়। বীজ একমাত্র পরমাত্মা মা আমার। তাঁহাতে যখন জীবত্বরূপ—দ্বৈতজ্ঞানরূপ ভাবের রঞ্জনা হয়, তখনই বিশুদ্ধ বোধ বস্তুটী সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদ-বিশিষ্ট হইয়া পড়েন ; নিরঞ্জন বীজের এই যে অভিরঞ্জনভাব, ইহারই নাম রক্তবীজ। রক্তবীজের ইহাই বিশেষত্ব যে, ইহার শরীর হইতে একবিন্দু রক্ত ভূপতিত হইবামাত্র অপর একটী রক্তবীজ উৎপন্ন হয়। রক্ত অর্থাৎ রঞ্জিত হওয়ারূপ ভাবটী যখনই ভূপতিত হয়,—পার্থিবভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে—স্থূল ভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখনই আবার জীব-ভাবটী ফুটিয়া উঠে। রঞ্জিত হওয়ার ভাবটী যতদিন থাকিবে, ততদিন উহা ভূপতিত হইবেই সুতরাং নিরঞ্জন বীজকেও অভিরঞ্জিত করিবেই। সহস্র সাধনা, সহস্র জ্ঞানালোচনা, সহস্র অনুভূতিও "আমি জীব" এই বোধটীকে সম্যক্‌রূপে বিলয় করিতে পারে না। অদ্বৈত-তত্ত্ব-প্রতি-পাদক "একমেবাদ্বিতীয়ম্, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যের যথাযথ অনুশীলনের ফলে, সাধক যখন জীব ব্রহ্মের ভেদ-ভ্রান্তির

পরপারে চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হয়, অর্থাৎ অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে যত্নবান্ হয়, তৎক্ষণাৎ এই রক্তবীজ আবির্ভূত হইয়া—"আমি জীব" রূপে ফুটিয়া উঠে। এই জীবত্বরূপ অজ্ঞানই সাধকের সেই অদ্বয়গতিকে নিরুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। সাধকগণ নিজ নিজ জীবনে ইহা অহর্নিশ অনুভব করিয়া থাকেন। মায়ের বিশেষ কৃপা ব্যতীত এই ভয়ঙ্কর অসুর নিহত হয় না। যাঁহারা যথার্থ অদ্বয়তত্ত্ব-উপলব্ধির নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, যাঁহারা অস্মিতাকে বা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসকেও অসুর বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এই রক্তবীজ-রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আরে, "আমি জীব" এই ভাবটীকে বিচারের সাহায্যে সহস্রধা বিনষ্ট করিলেও উহা যেমন ছিল, আবার ঠিক তেমনই ফুটিয়া উঠে। কেবল বিচার কেন, যোগবলে চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়াও এই রক্তবীজের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। যে মুহূর্ত্তে নিরোধ হইতে ব্যুত্থান হয়, সেই মুহূর্ত্তেই "আমি জীব" এই ভাবটী সর্ব্বাগ্রে ফুটিয়া উঠে। আবার যেই আমি, সেই আমি। পরাভক্তি বা অকৈতব প্রেমের বলে আত্মসঙ্গত হইলেও, আত্মহারা হইলেও, আবার পরক্ষণেই ঐ ভাবটী ফুটিয়া উঠে। অমনি "আমি জীব" বলিয়া আত্মা হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িতে হয়, আপনাকে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে ; ইহাই রক্তবীজের অত্যাচার। এইরূপে সাধক, তুমি বিচারের পথেই অগ্রসর হও, অথবা যোগবলে চিত্ত নিরুদ্ধই কর, অথবা পরাভক্তির সাহায্যে আত্মহারাই হও, এই রক্তবীজের অত্যাচার সর্ব্বত্র সমানভাবে দেখিতে পাইবে। উহার বিনাশ কিছুতেই হয় না। "আমি জীব" এই ভাবটী কিছুতেই সম্যক্ বিস্মৃত হওয়া যায় না। সাধারণ কথায়ও বলে—"যেন রক্তবীজের ঝাড়।" রক্তবীজ কিছুতেই বিনষ্ট হইতে চায় না। যাঁহারা রুদ্র-গ্রন্থিভেদের সাধক, কেবল তাঁহারাই এই রক্তবীজ অসুরের অনির্ব্বচনীয় অত্যাচার মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারেন। অপরের নিকট এ সকল কথা প্রহেলিকার মত মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নহে।

শুন—তোমরা কথায় বল, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। বাস্তবিক আত্মা আত্মামাত্রই। তাঁহাতে জীব বা পরম কোন বিশেষণই নাই। এই আত্মায় যখন জীবভাবটী পরিকল্পিত হয়, তখনই তিনি রক্ত হন অর্থাৎ রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পান। আর যখন কোনরূপ ভাবরঞ্জনা থাকে না তখনই তিনি শুদ্ধ নিরঞ্জন পরমাত্মা নামে অভিহিত হন। বাস্তবিক কিন্তু আত্মার কোন নাম কিংবা বিশেষণ নাই, থাকিতে পারে না। এই আত্মা যতদিন জীবভাবকে প্রকাশিত করিবেন, বুঝিতে হইবে,—ততদিন রক্তবীজ নিহত হয় নাই। যতদিন দেহ আছে, মন আছে, ইন্দ্রিয় আছে, ততদিন রক্তবীজও আছে, তবে কথা এই যে, যদিও ইহা খুবই সত্য, তথাপি অদ্বয়জ্ঞানরূপিণী মায়ের বক্ষে সম্যক্ আত্মহারা হইবার পর রক্তবীজের পারমার্থিক সত্তা কিন্তু একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। উহা ক্ষীণরক্ত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়। সে সকল কথা ইহার পরেই পাওয়া যাইবে।

মা গো, এতদিন এই রক্তবীজকে দেখিতেই পাই নাই, এতদিন যে এই অজেয় অসুর আমারই বক্ষে অবস্থান করিয়া আমারই রক্ত শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমিই যে মা, আমিই যে তুমি, আমিই যে আত্মা, এই কথাটা তোমার কৃপায় যত স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিতেছি, যতই তোমার প্রজ্ঞালোকে হৃদয়াকাশ উদ্‌ভাসিত হইতেছে, ততই যেন এই অসুরের অত্যাচার বিশেষভাবে মর্ম্মপীড়াদায়ক হইতেছে। আমি যে নির্ম্মল, আমি যে শুদ্ধ, আমি যে বুদ্ধ, আমি যে মহান্, আমি যে নিত্যমুক্ত, আমি যে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ, আমাতে যে কোন বিশিষ্টতা নাই, কোন মলিনতা নাই, আমাতে যে কোন গুণের সম্বন্ধ নাই, রোগ শোক জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই, আমাতে যে সংসার বলিয়া, স্বর্গ নরক বলিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই ব্রহ্মত্বই যে আমার যথার্থ স্বরূপ, আমি যে ব্রহ্মই—অন্য কিছুই নহে, ইহা সহস্রবার শুনিয়া, সহস্রবার মনন করিয়াও আবার আমি জীবরূপে প্রতিভাত হইয়া পড়ি। কেন মা এমন করিয়া স্বরূপ হইতে বিচ্যুত

হইতে হয় ? কেন মা এমন করিয়া অসুর অত্যাচার সহ্য করিতে হয় ? কেন মা আমি ব্রহ্ম হইয়াও ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা নিয়া থাকিব ? কেন মা আমি পূর্ণ জ্ঞানময় হইয়াও অল্পজ্ঞ জীবরূপে অবস্থান করিব ? কেন মা আমি শাশ্বত নিত্য নিরাময় হইয়াও রোগ শোক জন্ম মৃত্যুর মধ্যে অবস্থান করিব ? মা গো, যতদিন বুঝিতে পারি নাই, ততদিন এ যাতনার অনুভবই হয় নাই। কিন্তু এখন যে আর এক মুহূর্ত্তও সহ্য হয় না। মা মা, মা আমার ! জীবত্ব ব্রহ্মত্বের এত বিভিন্নতা দেখিয়া বুঝিয়া উপলব্ধি করিয়া, আর যে এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না ! আহা ! যেখানে তোমার পূর্ণ আনন্দময় ভেদাতীত নিরঞ্জন স্বরূপটী নিত্য বিরাজিত, সেইখানে যাইবার জন্য, সেইখানে নিত্য অবস্থানের জন্য বড়ই ইচ্ছা হয় মা ! আমায় নিয়ে চল মা, নিয়ে চল ! এই অসুর অত্যাচার হইতে, এই জীবত্বের বন্ধন হইতে আমায় চিরতরে মুক্ত করিয়া দেও মা ! আর যে আমার বলিতে কেহ নাই ! আর যে কাহাকেও দেখিতে পাই না ! শুধু তুমি,—শুধু তুমি আমার মা, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি আমার আমি, আমায় নিয়ে চল। আমি নিজে অগ্রসর হইতে পারি না, আমি বহুদিন এই রক্তবীজের অত্যাচার সহ্য করিয়া উহাকেই প্রেয়ঃ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছি। এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, তোমাকে ছাড়িয়া এই রক্তবীজকে নিয়া থাকিতেই ভালবাসি। তুমি আর একটু নামিয়া এস, তুমি নিজে আসিয়া আমার হাত ধ..য়া নিয়া যাও ; আমি চিরতরে রক্তবীজের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করি। আমি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া ধন্য হই, তোমাকে মা বলিয়া ডাকা সার্থক হউক। মা মা মা !

সাধক, যদি যথার্থ ই আপনাকে রক্তবীজের অত্যাচারে উৎপীড়িত বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে এমনই করিয়া কাঁদ—কাঁদিতে পারিলেই মা স্বয়ং আসিয়া রক্তবীজ নিধন করিবেন। কিন্তু এ সকল অন্য কথা।

যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ ॥৪১॥
কুলিশেনাহতস্যাশু বহু সুস্রাব শোণিতম্।
সমুত্তস্থুস্ততোযোধাস্তদ্রূপাস্তৎ-পরাক্রমাঃ ॥৪২॥

অনুবাদ। সেই মহাসুর রক্তবীজ গদাহস্তে ইন্দ্রশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রাণীও স্বকীয় বজ্রদ্বারা রক্তবীজকে আহত করিতে লাগিলেন। বজ্রাহত রক্তবীজের দেহ হইতে বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব হইতেছিল, সেই রক্ত হইতে তাদৃশ পরাক্রমশালী এবং সেইরূপ আকারবিশিষ্ট অসুরগণ উত্থিত হইতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। ক্রমে অষ্টমাতৃকা-শক্তির সহিত রক্তবীজের যুদ্ধ বর্ণিত হইবে। প্রথমেই ইন্দ্রাণীর সহিত ইহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তিনি বজ্রদ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে— পাণীন্দ্রিয়ের অধিপতি ইন্দ্র। পাণি শব্দের অর্থ—আদান-শক্তি, এবং বজ্র—তড়িৎ-শক্তি। "আমি জীব" এই ভাবটী পাণি প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই প্রকাশ পায়। সাধনা-বলে—মায়ের কৃপায় সাধকের পাণিপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি যখন পরমাত্মভাবে পরিভাবিত হইতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার জীবভাব ক্রমে ক্রমে বিশীর্ণ হইতে থাকে। ইহাই ইন্দ্রাণীর বজ্রপ্রহারে রক্তবীজের দেহ হইতে বহু রুধিরস্রাবরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও মন্ত্রে সকল ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ নাই, তথাপি একমাত্র পাণীন্দ্রিয় দ্বারাই সকল ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। আসল কথা এই যে, ইন্দ্রিয় গুলিকে আশ্রয় করিয়াই জীবভাব পরিপুস্ট হয়। কিন্তু মায়ের কৃপায় উহারা যতই সত্তা-হীন হইতে থাকে জীবভাবও ততই বিশীর্ণ হইতে আরম্ভ করে। তবে এস্থলে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যতই বিশীর্ণ হউক না কেন, যতই রক্তপাত হউক না কেন, জীবভাব যেমন, ঠিক তেমনই থাকিয়া যায়। একটীমাত্র ইন্দ্রিয়ের বিলয়ে বা সংহরণে জীবভাব

কিছুতেই বিশীর্ণ হয় না—বিলয় প্রাপ্ত হয় না। কেবল একটীমাত্র কেন, সকল ইন্দ্রিয়ের বিলয় হইলেও, অর্থাৎ প্রজ্ঞালোকের দ্বারা জীবভাবটী সহস্রধা ক্ষত বিক্ষত হইলেও "আমি জীব" এই দ্বৈতপ্রতীতি নিঃশেষিত হইতে চায় না।

———

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা যাতাস্তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। তাহার (রক্তবীজের) দেহ হইতে যত রুধিরবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, ততই রক্তবীজের ন্যায় বীর্য্য, বল এবং বিক্রমসম্পন্ন পুরুষ অর্থাৎ অসুর-সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। যে মুহূর্ত্তে পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি পরমাত্মসত্তায় বিলীন হইতে আরম্ভ করে, সেই মুহূর্ত্তেই ইন্দ্রাণী প্রভৃতিশক্তির সহিত রক্তবীজের এইরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইন্দ্রাণী প্রভৃতি মাতৃগণ আজ প্রলয়শক্তিরূপে আবির্ভূতা; সুতরাং নানাভাবে রক্তবীজকে নিহত করিতে উদ্যতা। ইন্দ্রাণীর বজ্রপ্রহারে—আদানশক্তির সম্পূর্ণ সংহরণে, রক্তবীজ যতই আহত অর্থাৎ জীবভাব যতই বিশীর্ণ হইতে থাকে ততই রুধিরস্রাব অর্থাৎ রঞ্জিত হওয়ার ভাবটী বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইতিপূর্ব্বে যে এইরূপ রঞ্জিত হইত না, তাহা নহে; তবে সে সময় এই বহুভাবরঞ্জনারূপ ব্যাপারটী পরিলক্ষিত হইত না। এখন প্রজ্ঞার আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাই এই সূক্ষ্মতম দোষরাশিরূপ অসুরকুলকে লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য হইয়াছে। একবিন্দু রুধির হইতে আবার যে তাদৃশ শক্তিমান্—তাদৃশ বীর্য্য বল ও বিক্রমসম্পন্ন অসুরের উদ্ভব কিরূপে হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বীর্য্য শব্দের অর্থ প্রভাব; বল—শারীরিক শক্তি এবং বিক্রম—উৎসাহ। সে যাহা হউক, বিষয়টা জটিল করিয়া কিছু লাভ নাই। "আমি জীব" এই ভাবটী নানা উপায়ে পুনঃ পুনঃ বিশীর্ণ হইলেও আবার পরক্ষণেই দেখা যায় যে, ঠিক পূর্ব্বের মতনই বল বীর্য্য এবং বিক্রমসম্পন্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। "আমি জীব" এইরূপ বিশিষ্ট-

ভাবের উদয় হয় বলিয়াই সাধক ব্রহ্মক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। শুধু এই একটি কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই রক্তবীজের যুদ্ধরহস্য সহজবোধ্য হইবে।

তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্র-শস্ত্রপাতাতিভীষণম্ ॥ ৪৪ ॥
পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। সেই রক্তসম্ভূত অসুরগণ অতি উগ্র অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে মাতৃগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইন্দ্রাণী পুনরায় বজ্রপ্রহারে ইহার শিরোদেশ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন; তখন তাহা হইতে বহু রক্তস্রাব হইতে লাগিল, পুনরায় সেই রক্ত হইতে সহস্র সহস্র অসুর উৎপন্ন হইল।

ব্যাখ্যা। অসুরগণ অতিভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। অতি উগ্র অস্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগের তাৎপর্য্য—দুরপনেয় দ্বৈত সংস্কারের সম্বন্ধ। সাধকগণ যখন বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে আত্মসত্তা উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পায়, তখন পুনঃ পুনঃ জীবত্ব সংস্কার—ভেদ জ্ঞানের সংস্কার ফুটিয়া উঠিতে থাকে এবং সাধককে অদ্বয়সত্তা হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলে; ইহাই রক্তবীজের ভীষণ যুদ্ধের রহস্য।

ইন্দ্রশক্তি এক এক বার বজ্রপাত করেন, অমনি অসুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধিরস্রাব হইতে থাকে। পুনরায় তাহা হইতে অসংখ্য রক্তবীজ উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে "আমি জীব" এই ভাবটীকে যতই ক্ষত বিক্ষত করা হউক না কেন, উহা কিছুতেই বিনষ্ট হইতে চায় না; বরং সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়। যদিও এই বুদ্ধিটা অজ্ঞান অবস্থার তুলনায় খুব বেশী নহে, তথাপি জ্ঞানালোক যত সমুজ্জ্বল হইতে থাকে, জীবভাবের অনিষ্টকারিতা ততই তীব্রভাবে অনুভূত হইতে

থাকে; তাই মন্ত্রে সহস্র সহস্র অসুর উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সাধক! "আমি জীব" এই বোধটীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে—সহস্র সহস্র রক্তবীজ উৎপন্ন হয় কি না? আত্মজ্ঞান যত সমুজ্জ্বল হইতে থাকে, রক্তবীজের সংখ্যা যেন ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনুভূতির কথা ভাষায় আর কত বলা যাইতে পারে?

বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্ ॥৪৬॥
বৈষ্ণবী-চক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ ॥
সহস্রশো জগদ্‌ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ ॥ ৪৭॥
শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। ইন্দ্রাণী যেরূপ অসুরশ্রেষ্ঠ রক্তবীজকে বজ্রাঘাতে বিতাড়িত করিতেছিলেন, বৈষ্ণবীশক্তিও সেইরূপ যুদ্ধস্থলে ইহাকে চক্রের দ্বারা আহত এবং গদাপ্রহারে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবীর চক্রে বিদীর্ণ রক্তবীজের দেহ হইতে যে রুধিরস্রাব হইতেছিল, তাহা হইতে তৎপ্রমাণ মহাসুরগণ সমুত্থিত হইয়া সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিল। তখন কৌমারী শক্তি-অস্ত্রপ্রয়োগে, বারাহী অসির আঘাতে এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূলাঘাতে রক্তবীজগণকে নিহত করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। বিষ্ণুশক্তি এবং তাঁহার গদা ও চক্রের রহস্য পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চিতিশক্তির বিভিন্ন প্রকাশসমূহ যখন জীবভাবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, তখন তাহাদিগের প্রবল আকর্ষণে উহা সহস্রধা বিখণ্ডিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু অনাদিজন্ম-সঞ্চিত জীবত্বের যে বিশিষ্ট সংস্কার, তাহা কিছুতেই সহসা দূরীভূত হইতে চায় না। ঐটীকে আশ্রয় করিয়াই অস্মিতা নিজ বিশিষ্ট সত্তাটী অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পায়।

রক্তবীজের দেহ হইতে যে রুধিরস্রাব হইতেছিল, তাহা হইতে অসংখ্য রক্তবীজ উদ্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। প্রজ্ঞার আলোকে "আমি জীব" এই ভাবটী যতই বিশীর্ণ হইতে থাকে, ততই ঐ জীবভাব যেন অমিতবল ও সর্ব্বব্যাপিরূপে প্রকাশ পায়। কারণ, এ পর্য্যন্ত জীবভাবাতিরিক্ত অপর কোন ভাব প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই—বিশোকাজ্যোতিই বল, বুদ্ধিতত্ত্বই বল, কিংবা মহৎ-তত্ত্বই বল, সকল ভাবগুলিই জীবভাবের সহিত অন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইত; তাই এতদিন জীবভাব একটীমাত্ররূপেই লক্ষিত হইত; কিন্তু এখন মায়ের কৃপায় একটু একটু করিয়া বিশুদ্ধবোধ উদ্ভাসিত হইতেছে, ক্ষণপ্রভা-রেখার ন্যায় অদ্বয় জ্ঞানালোক আসিয়া নিমেষার্দ্ধকালের জন্যও জীব-ভাবকে বিলয় করিয়া দিতেছে; এখন বিভিন্ন ভাবগুলিকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য হইয়াছে; তাই এখন জীবভাবের প্রতি লক্ষ্য পড়িলেই, উহা অসংখ্য এবং অমিতবলশালী রূপে প্রতীত হইতে থাকে। জীবভাব বাস্তবিক একটী হইলেও উহা ক্ষণে ক্ষণে উদয় হয় বলিয়া উহাকে অসংখ্য এবং জগদ্ব্যাপী বলা হয়। জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, জগতের যে কোন ভাবই গ্রহণ করি, সকলের মধ্য দিয়াই "আমি জীব" এই ভাবটী সর্ব্বাগ্রে ফুটিয়া উঠে, তাই রক্তবীজ অসংখ্যরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে।

যাহা হউক, রক্তবীজের সংখ্যা এরূপ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেও, মাতৃশক্তিসমূহ স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগে রক্তবীজকে ক্ষয় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৌমারীদেবী শক্তিঅস্ত্র প্রয়োগে, বারাহী অদ্বয়জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে এবং মাহেশ্বরী আনন্দময় ত্রিপুটীরূপ ত্রিশূলাঘাতে রক্তবীজের সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মা আমার নানাভাবে আবির্ভূত হইয়া, নানা শক্তিমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া, অনাদিজন্ম সঞ্চিত জীবভাবটীকে বিশীর্ণ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ধন্য মায়ের দয়া, এ দয়া ভাষায় পরিব্যক্ত হয় না; ইহাই যথার্থ মাতৃত্ব। আমার কোথায় কি

ভেদজ্ঞান আছে, আমার কোথায় কি ক্ষত আছে, তাহা দূর করিবার জন্য, আমাকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় মাতৃ-অঙ্কে স্থান দিবার জন্য, এরূপ যত্ন, এরূপ প্রয়াস একমাত্র মা ব্যতীত আর কে করিয়া থাকে ? ওরে, আমি যে মাতৃ-অঙ্কস্থিত নগ্নশিশু !

স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বাএবাহনৎ পৃথক্ ।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৪৯॥
তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি ।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ ॥৫০॥

অনুবাদ। সেই মহাসুর রক্তবীজও তখন কোপাবিষ্ট হইয়া গদাদ্বারা মাতৃশক্তিসমূহকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আঘাত করিতে লাগিল। (আবার অন্যদিকে মাতৃশক্তিনিক্ষিপ্ত) শক্তি শূলাদি অস্ত্রের দ্বারা বহুধা আহত হওয়ায়, তাহার শরীর হইতে যে রক্তপ্রবাহ ভূতলে নিপতিত হইতেছিল, তাহা হইতে শত শত (অর্থাৎ অসংখ্য) অসুর উৎপন্ন হইতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। ঐন্দ্রী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী প্রভৃতি দেবশক্তিসমূহ প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জীবভাবের সম্যক্ বিলয় করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত্রপ্রয়োগে রক্তবাজকে নিধন করিতে চেষ্টা করিলেন। রক্তবীজ কিন্তু কিছুতেই বিলয় প্রাপ্ত হইতে চায় না। বিশেষ অধ্যবসায়-প্রয়োগে কিছুক্ষণের জন্য অব্যক্তভাবে থাকিলেও ব্যুত্থানদশায় আবার "আমি জীব" এইরূপ একটি ব্যক্তভাব ফুটিয়া উঠে। অষ্টমাতৃকাশক্তির প্রবল আকর্ষণে বিশুদ্ধ বোধময়স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখার ফলে, জীবভাবটী কিছুক্ষণের জন্য অব্যক্ত ক্ষেত্রে মিলাইয়া যায় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার "আমি জীব" এই ব্যক্ত-ভাবটী প্রকাশ পায়। ইহাই রক্তবীজের গদাপ্রহার। গদ্ ধাতুর অর্থ ব্যক্ত বাক্য। প্রাচীন টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তীও একস্থানে

গদা শব্দের ব্যক্তবাক্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। মাতৃকাগণ পৃথক্ পৃথক্-ভাবে রক্তবীজকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন; রক্তবীজও তাঁহাদের নিকট স্বকীয় ব্যক্ত ভাবটি পুনঃ পুনঃ ফুটাইয়া তুলে। যাহা হউক, রক্তবীজকে নিধন করা ত দূরের কথা, অস্ত্রাঘাতে তাহার শরীর হইতে যে রুধির প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে অসংখ্য অসুর আবির্ভূত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তিমন্ত্রে এই রুধির হইতে অসুর আবির্ভাবের রহস্য বলা হইয়াছে। স্থূল কথা এই যে, জীবভাবকে যতই বিলয় করিতে চেষ্টা কর না কেন, সে কিছুতেই সম্যক্ বিলয় প্রাপ্ত হইতে চায় না; বরং আরও যেন পরিবর্দ্ধিত এবং বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া প্রকাশ পায়। পুরুষকার প্রয়োগে জীবত্ববিলয় একান্তই অসম্ভব। তবে যে স্থলে স্বয়ং মাই পুরুষকাররূপে প্রকাশিত হন, সে স্থানের কথা স্বতন্ত্র।

তৈশ্চাসুরাসৃক্‌সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীত্ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্ ॥৫১॥

অনুবাদ। রুধিরসম্ভূত সেই রক্তবীজ নামক অসংখ্য অসুর কর্ত্তৃক সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া দেবতাগণ অতিশয় ভীত হইলেন।

ব্যাখ্যা। দেবতাগণ—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ জগদ্‌ব্যাপী রক্তবীজ-অসুরের সত্তা দেখিতে পাইয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, যে দিকে অবধান প্রয়োগ করা যায়, সেই দিকেই অসংখ্য রক্তবীজ, সেই দিকেই "আমি জীব" এই দ্বৈতভাবটীর দ্বারা বিশুদ্ধ চৈতন্যের উৎপীড়ন লক্ষিত হয়। যখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও এই দুরপনেয় জীবভাবের হাত হইতে কোনরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, তখন যথার্থই প্রবল ভয় এবং অত্যন্ত নৈরাশ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ভয় ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া সাধক-হৃদয়ে একটা তীব্র বিরহ ফুটিয়া উঠে। সে বিরহ যথার্থ অসহ্য বলিয়াই বোধ

হইতে থাকে। যখন দেখিতে পাওয়া যায়, প্রিয়তমের সহিত কিছুতেই মিলিত হওয়া যায় না, কিছুতেই পরমপ্রেমাস্পদের বুকে বুক মিলাইয়া আপনাকে হারাইতে পারা যায় না, তখন সাধকের কষ্ট যথার্থই অসহনীয় হইয়া উঠে। অতি স্বচ্ছ বুদ্ধিরূপ প্রাচীরের অন্তরাল হইতে প্রিয়তমকে দেখা যায়, বুদ্ধির আড়াল হইতেই প্রিয়তমের অপরূপ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, প্রিয়তমকে লাভ করিবার আশা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, অথচ সেই বুদ্ধির প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া প্রিয়তমের চরণে সর্ব্বতোভাবে আমিটীকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না; সুতরাং দিন দিন বিরহ বেদনা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং এই জীবত্বকে অসহনীয় যাতনাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। ওগো, সে যে অতি পবিত্র অতি বিশুদ্ধ, সে যে আমার সর্ব্বভাবাতীত নিরঞ্জন, সে যে আমার পরম প্রেমময় আত্মা, সে যে আমার আনন্দময় জীবনবল্লভ, সে যে আমার মধুময় জীবনসর্ব্বস্ব, আমি তাহাতে কিরূপে মিলাইয়া যাইব! তিনি ব্রহ্ম, আমি ক্ষুদ্র জীব। আমি কি করিয়া তাহাতে মিলাইয়া যাইব! দুইটি অসমান বস্তুর মিলন হয় কি? "আমি জীব" এই বোধটি যতদিন সম্যক্ অপনীত না হইবে, ততদিন বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত পরম প্রিয়তমের সহিত কিছুতেই মিলাইয়া যাইতে পারিব না। আধুনিক কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধক ভগবানের সহিত ভক্তের মিলন একান্ত অসম্ভব ও নিতান্ত অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহারা যদি বেদের "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য-চতুষ্টয়ের অর্থের প্রতি একটু বিশেষভাবে প্রণিধান করেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ বাক্যচতুষ্টয়ের মধ্য দিয়াই পরমপ্রেম সূচিত হইয়াছে। ধন্য সেই ঋষিগণ! যাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে এই অপূর্ব্ব সম্বেদন ফুটিয়া উঠিয়াছিল; যাঁহারা পরম প্রেমাস্পদের চরণে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছিলেন। বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞান থাকিতেও যে প্রেমের পূর্ণতা হয় না, হইতে পারে না, ইহা বুঝিতে পারিয়াই, উপনিষদের ঋষিগণ "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" বলিয়া ব্রহ্মসমুদ্রে স্বকীয় পৃথক্

সত্তাটি সম্যক্‌ভাবে মিলাইয়া দিতেন। আজ তাঁহাদের মুখোচ্চারিত সেই পবিত্র মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, কত যুগ যুগান্তর পরেও জীব পরম প্রেম ও পরমজ্ঞানের সন্ধান পাইয়া জীবন ধন্য করিতেছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রবর্ণিত গোপীপ্রেম এবং রাধাপ্রেম যে কি বস্তু, এইখানে না আসিলে, কিছুতেই তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না।

সাধক! যতদিন 'আমাকে'—মাকে, আত্মাকে যথার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিবে, যতদিন মায়ের স্বরূপ সম্যক্ উদ্ভাসিত না দেখিবে, ততদিন বিরহবেদনা কিছুতেই দূর হইবে না। আমি জীব, এইরূপ দ্বৈতপ্রতীতি থাকিতে কিছুতেই মিলন হয় না। মনে রাখিও, অদ্বয়জ্ঞানই মিলন এবং ভেদজ্ঞানই বিরহ। যাহাদের কখনও প্রিয়তমের সহিত মিলন সংঘটিত হয় নাই—প্রিয়তমের বিরহ যে কি বস্তু, তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু সে অন্য কথা।

উপনিষৎ বলেন, "দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি"। দ্বৈতজ্ঞান হইতেই ভয় আপতিত হয়। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—দেবতাগণ অগণিত রক্তবীজ অসুর দেখিতে পাইয়া ভীত হইয়াছিলেন। এইখানে উপনীত হইতে পারিলে, এই রক্তবীজ-সমরে উপস্থিত হইবার সামর্থ্য লাভ করিলে, তবে এই উপনিষদ্‌বাক্যের রহস্য বুঝিতে পারা যায়, ভয় যে কিরূপ বস্তু, তাহার উপলব্ধি হয়। ওগো! জগতে যে তোমরা ভয় ভয় করিয়া সঙ্কুচিত হও, উহা আর কতটুকু ভয়! উহা ভয়ের আভাস মাত্র, ভয়ের অতিদূরবর্ত্তী ছায়ামাত্র। যথার্থ ভয় এইখানে আসিলে বুঝিতে পারা যায়। ঐ একটুখানি ভেদ, ঐ একটুখানি দ্বৈত, উহা কিছুতেই অপসৃত হয় না! তাই ভয়ও দূর হয় না।

মন্ত্রে 'ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্' কথাটির মধ্যে আর একটু রহস্য আছে। এখানে ভয়কে উত্তম বলা হইয়াছে; জাগতিক যাবতীয় ভয় অধম। একমাত্র এই জীবব্রহ্ম মিলনের সন্ধিক্ষণে জীবত্বরূপ ভেদজ্ঞান হইতে যে ভয় আপতিত হয়, তাহাই উত্তম ভয় নামে প্রসিদ্ধ। সাধক! কবে তুমি প্রিয়তমের তীব্র আকর্ষণে দেহ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া

বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে উপনীত হইবে, কবে বিজ্ঞানের পরপারস্থিত পরমাত্মার লোকাতীত স্বরূপ দেখিতে পাইয়া একান্ত মুগ্ধ হইবে, কতদিনে অভয়াকে স্মরণ করিয়া, এই উত্তম ভয়ের স্বরূপ অবগত হইয়া অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে ?

তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহ সত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু ॥৫২॥

অনুবাদ। দেবতাগণকে এইরূপ বিষণ্ণ দেখিয়া চণ্ডিকা সত্বর হইয়া বলিলেন, (হে দেবতাগণ, তোমরা বিষণ্ণ হইও না)। তারপর কালীকে বলিলেন—হে চামুণ্ডে ! তোমার বদন বিস্তৃত কর।

ব্যাখ্যা। "আমি জীব" এই ভাবটি কিছুতেই অপনীত হইতে চায় না ; কিছুতেই নিষ্কল ব্রহ্মসমুদ্রে অবগাহন করা যায় না— ইহা দেখিতে পাইয়া দেবতাগণ একান্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই মা আমার বিষণ্ণ দেবতাগণকে, "মা বিষীদত" তোমরা বিষণ্ণ হইও না বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন। এইরূপ যখন দেবতাগণ দ্বৈতজ্ঞানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, বিষাদগ্রস্ত হয়, তখনই অদ্বয়জ্ঞানরূপিণী মা আমার এইরূপ অভয়বাণীতে দেবতাগণের হৃদয় হইতে বিষাদশল্য বিদূরিত করিয়া দেন।

এই মন্ত্রটিতে প্রাহ এবং উবাচ, এই দুইটি সমানার্থ-বোধক শব্দ থাকায়, কোন কোন প্রাচীন টীকাকার 'মা বিষীদত' এই বাক্যটীর অধ্যাহার করিয়া অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। তত্ত্বপ্রকাশিকা কিন্তু "প্রাহসত্বরা" একটি সমস্তপদ স্বীকার করিয়া, প্রাহ শব্দের অর্থ করিয়াছেন যুদ্ধ।

সে যাহা হউক, মা একদিকে যেমন অভয়বাণীতে দেবতাবৃন্দের বিষাদ বিদূরিত করিলেন, অন্যদিকে তেমন রক্তবীজবধেরও উত্তম

করিলেন। উভয়ের প্রথমেই চামুণ্ডাশক্তিকে বদন বিস্তৃত করিবার আদেশ করিলেন। এই বদন বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা পরবর্ত্তী মন্ত্রে বর্ণিত হইবে।

মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রে নানেন বেগিতা ॥৫৩॥
ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্ মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যং ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥৫৪॥
ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে ॥৫৫॥

অনুবাদ। আমার অস্ত্রাঘাতসম্ভূত রক্তবিন্দুগুলিকে এবং রক্তবিন্দুসম্ভূত অসুরগুলিকে তুমি সবেগে এই (বিস্তৃত) মুখের মধ্যে গ্রহণ কর। এইরূপে রক্তবিন্দুসম্ভূত অসুরবৃন্দকে ভক্ষণ করিতে করিতে রণস্থলে বিচরণ কর। এই প্রকারে দৈত্য রক্তবীজ ক্ষীণরক্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তোমাকর্ত্তৃক এইরূপ ভক্ষিত হইলে আর কোন অসুরই উগ্রভাবাপন্ন থাকিতে পারিবে না, এবং অপর অভিনব অসুরকুলও সমুৎপন্ন হইতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা। চণ্ডিকাদেবী প্রলয়ঙ্করী কালীশক্তিকে বদন বিস্তারপূর্ব্বক অস্ত্রদ্বারা ক্ষত-বিক্ষত রক্তবীজের রুধিরবিন্দুগুলিকে এবং রুধিরোৎপন্ন অসুরগুলিকে গ্রাস করিবার আদেশ করিলেন। যথার্থই সংহারিণী শক্তি জীবভাবকে সমূলে গ্রাস না করিলে আর এই রক্তবীজবধের উপায় হয় না। জীবভাবের বীজটি পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে হইবে। যদিও যতক্ষণ শুম্ভবধ না হয়, ততক্ষণ জীবভাবের সূক্ষ্মবীজ থাকিয়া যায়, তথাপি যে ব্যক্তভাবটি সাধককে জীবরূপে প্রতিভাত করিয়া ফেলে, অদ্বয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে, সেই ব্যক্ত জীবভাবটীকে সর্ব্বতোভাবে এইখানেই বিলয় করিতে হইবে। ইহাই চামুণ্ডার প্রতি মায়ের আদেশ। সংহারিণী শক্তি যদি অসুরদিগকে এইরূপে গ্রাস

করিতে থাকেন, তবে আর রক্তবিন্দুগুলির ভূতলে পতনের অবকাশ থাকিবে না; সুতরাং ভূপতিত রক্তবিন্দু হইতে আর অভিনব অসুরের উত্থানও সম্ভব হইবে না। এইরূপে রক্তবীজ ক্ষীণরক্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

খুলিয়া বলি,—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, 'আমি জীব' এই যে প্রতীতি, ইহার ঐ আমিটি হইতেছে বীজ এবং জীবত্ব হইতেছে রক্ত। কোন না কোন বিশিষ্ট ভাব থাকে বলিয়াই ত আমিরূপী বীজটি জীবত্বরূপ রক্তদ্বারা অভিরঞ্জিত হয়। এখন প্রলয়ঙ্করী চামুণ্ডা মা যদি কৃপা করিয়া আমাদের যাবতীয় বিশিষ্টতাকে গ্রাস করেন অর্থাৎ অনাদি-জন্মসঞ্চিত এই জীব-ভাবটিকে কোনও বিশিষ্টতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে না দেন (বিশিষ্টতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই রক্তবিন্দুর ভূপতন) তবে আর জীবভাবের বা রক্তবীজের পরিবর্দ্ধনশক্তি থাকে না। জীবভাব ফুটিয়া উঠিয়া, কোনও বিশিষ্টতার আশ্রয় লইয়া, আমিটিকে রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বেই যদি চামুণ্ডার করাল কবলে প্রবেশ করে, তবে আর রক্তবীজের অস্তিত্ব থাকে না। একটু গভীর রহস্য। শারীরকভাষ্যে যে যুষ্মৎ এবং অস্মৎ প্রত্যয় গোচর বিষয় এবং বিষয়ীর পরস্পর অধ্যাস বর্ণিত হইয়াছে, সেই অধ্যাসের প্রকৃতস্বরূপটী এই রক্তবীজসমরে উপনীত সাধকের নিকটই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অহং-প্রতীতি-গোচর বস্তুর স্বরূপ সম্যক্ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বেই অনাত্মভাব বা জীবভাব ফুটিয়া উঠে, শত চেষ্টায়ও এই অনাত্ম-প্রতীতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়না, ইহাই ত রক্তবীজের সমর। মনে কর—তুমি অদ্বয়স্বরূপে উপনীত হইতে উদ্যত। সেই সময় পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারবশে তোমাকে বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ হইতে বিশিষ্টচৈতন্যে অবতরণ করিতে হয়। সে বিশিষ্টতা মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়রূপ সূক্ষ্মই হউক, অথবা দেহ কিংবা রূপরসাদি বিষয়রূপ স্থূলই হউক, তোমাকে কিন্তু সে বিশুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে বিশিষ্টতায় নামিয়া আসিতেই হয়। সে অদ্বয়ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার উপায় নাই। আরে, "মাকে দেখিতেছি" "মায়ের ধ্যান করিতেছি," "পরমাত্মার

সাক্ষাৎকার লাভ করিতেছি”—ঐ গুলিও ত দ্বৈতজ্ঞান। উহারাও ত জীবভাব। আমি পরমাত্মা হইতে একটি পৃথক্—এইরূপ একটু সূক্ষ্মভাব থাকে বলিয়াই ত পূর্ব্বোক্তরূপ ভেদজ্ঞানগুলি ফুটিয়া উঠে। উহারাই ত রক্তবীজ। উহাদের বিলয় করিতে হইলে সর্ব্বভাবের একান্ত বিলয় আবশ্যক। নতুবা কোনরূপ কিছু বিশিষ্টতা থাকিলেই আমিত্বটি রঞ্জিত হইয়া পড়িবে। সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক, ঐ রঞ্জনভাবকে অর্থাৎ রক্তবিন্দুগুলিকে বিলয় করিয়া শুদ্ধ আত্মারূপে অব্যয় বীজরূপে অবস্থান করিতে হইবে, একাকী হইতে হইবে। এইরূপ হইলেই রক্তবীজ অসুর বিনষ্ট হয়; তখন অস্মিতা ও মমতা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এস সাধক! আমরা “জয় কালী” বলিয়া প্রলয়ঙ্করী চামুণ্ডা শক্তির শরণাগত হই। তিনি স্বকীয় সর্ব্বগ্রাসী বদনমণ্ডল বিস্তারিত করিয়া রুধির সহ রক্তবীজগুলিকে গ্রাস করিবেন। তখন আমরা জীবভাবের হাত হইতে সম্যক্ পরিত্রাণ লাভ করিয়া অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হইব। আমাদের জন্মমৃত্যুরূপ সংসারপ্রবাহ চিরতরে নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে।

ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্।
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্ ॥৫৬॥

অনুবাদ। কালীকে এইরূপ আদেশ করিয়া চণ্ডিকাদেবী স্বয়ং রক্তবীজকে শূলাঘাত করিলেন। কালিকাদেবীও তখনই স্বকীয় বিস্তৃত মুখে তাহার শোণিতগুলি পান করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। মায়ের শূলাঘাত কথাটির তাৎপর্য্য—আনন্দময় জ্ঞানালোকসম্পাত। শূল শব্দের তাৎপর্য্য ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শূলই মায়ের প্রধান অস্ত্র। দ্বৈতপ্রতীতিরূপ অসুরকুল একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক ব্যতীত অন্য কিছুতেই সমূলে বিনষ্ট হয় না। সাধক! মনে করিও না, জ্ঞানের এক মুহূর্ত্তমাত্র প্রকাশেই তোমার সকল অজ্ঞান চিরতরে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে এবং

জ্ঞানময় অবস্থাটি সহজ হইবে; তাহা হয় না। একটু একটু করিয়া জ্ঞান প্রকাশ হয়, একটু একটু করিয়া জ্ঞান দৃঢ়ভূমিক হয়, একটু একটু করিয়া অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। তবে যে শুনিতে পাও, "হাজার বছরের অন্ধকার ঘর একটিমাত্র দীপশলাকায় আলোকিত হয়" ইহার তাৎপর্য্য এই যে—একবার মাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রকাশ পাইলে, জীব আর কখনও অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিতে পারে না। দিন দিন সেই ক্ষণদৃষ্ট জ্ঞানালোকের দিকেই তীব্র পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইতে থাকে। আর কখনও ভ্রান্তিজ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হয় না।

অজ্ঞান যে ধীরে ধীরে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ভগবানের বাক্য দ্বারাও ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। তিনি বলিয়াছেন—"সমিদ্ধ অগ্নি যেরূপ ইন্ধনসমূহকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও সেইরূপ সর্ব্ব কর্ম্মকে অর্থাৎ অজ্ঞানকে ভস্মীভূত করিয়া দেয়।" এই বাক্যটীর মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইন্ধনসমূহের সহিত অগ্নিসংযোগ হইবামাত্রই উহা যেরূপ ভস্মরূপে পরিণত হয় না, সম্যক্ ভস্মীভূত হইতে কিছু সময়ের আবশ্যক হয়, জ্ঞানাগ্নি-সংযোগে অজ্ঞান-ইন্ধনও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা এ কথা স্বীকার করিবেন না, তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিবেন—যতক্ষণ দেহ এবং জগৎ ভাণ হয়, ততক্ষণ অতি অল্পমাত্র হইলেও, আভাসমাত্র হইলেও, বাধিতানুবৃত্তি হইলেও, অজ্ঞান আছে, উহার সম্যক্ বিলয় হয় নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। জ্ঞানের কিন্তু এমন একটী সমুজ্জ্বলতম অবস্থা আছে, যেখানে উপনীত হইলে, আর কখনও দেহাদি অনাত্মবস্তুর ভাণই হয় না। যোগবাশিষ্ঠ ইহাকে পদার্থাভাবিনীরূপ ষষ্ঠ ভূমিকা এবং তৎপরবর্ত্তী তুরীয়গারূপ সপ্তম ভূমিকা নাম দিয়াছেন। যদিও বর্ত্তমান কালে ঐরূপ উচ্চ ভূমিকার সাধক একান্ত দুর্ল্লভ, তথাপি বলিতে হয়—উক্তরূপ জ্ঞান একান্ত অসম্ভব নহে। মায়ের কৃপায় সাধকের তীব্র পুরুষকার এবং বৈরাগ্যের ফলে উক্তরূপ সমুজ্জ্বল জ্ঞানের প্রকাশ হওয়া খুবই সম্ভব।

যাহা হউক, আমরা প্রসঙ্গক্রমে একটু দূরে আসিয়াছি। এস, আবার প্রস্তাবিত বিষয়ের নিকটস্থ হই। ইতিপূর্ব্বে বলিতেছিলাম, মা শূলাঘাতে রক্তবীজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। এবং প্রলয়ঙ্করী কালী স্বকীয় বদন বিস্তৃত করিয়া সেই ক্ষতনিঃসৃত রুধিরগুলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সত্য সত্যই সাধক, এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয়। একদিক্ দিয়া অদ্বয়জ্ঞানের আলোক ক্ষণকালের জন্য প্রকাশিত হইয়া ভেদজ্ঞানকে—জীবত্ব বুদ্ধিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়, আবার অন্যদিক্ দিয়া কালীশক্তি সর্ব্বগ্রাসিনীমূর্ত্তিতে সর্ব্বভাবকে—জীবভাবকে গ্রাস করিতে থাকেন। জীবত্বরূপ শোণিত থাকে বলিয়াই ত পুনঃ পুনঃ রক্তবীজের আবির্ভাব হয়। কিন্তু এবার মা আমার স্বয়ং কালীমূর্ত্তিতে সেই শোণিতরাশি কবলিত করিতেছেন; সুতরাং এইবার রক্তবীজবধ অবশ্যম্ভাবী এবং আসন্ন হইয়াছে।

ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্।
ন চাস্যা বেদনাং চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি ॥৫৭॥

অনুবাদ। অনন্তর সেই রক্তবীজ যুদ্ধস্থলে চণ্ডিকা দেবীকেও গদাঘাত করিয়াছিল। কিন্তু সেই গদাঘাতে দেবীর অতি অল্পমাত্রও বেদনা হয় নাই।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে রক্তবীজ অষ্টমাতৃকাশক্তিকে গদার প্রহার করিয়াছিল, এইবার চণ্ডিকাদেবীকেও গদাঘাত করিল। কিন্তু মায়ের এমনই মহিমা, তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র বেদনা অনুভব করিলেন না। আসুরিক ভাবসমূহ যতই বিশিষ্টতা নিয়া প্রকাশিত হউক, "আমি জীব" এই ভাবটী যতই পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হইয়া উঠুক, তাহাতে মায়ের অঙ্গে—অদ্বয়ক্ষেত্রে—বিশুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপে কোনরূপ বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় না বলিয়াই কোনরূপ বেদন অর্থাৎ অনুভূতি ফুটাইতে পারে না। মা আমার যেমন নিত্যশুদ্ধা নিরঞ্জনা নির্ব্বিকারা,

ঠিক তেমনই আছেন, বিন্দুমাত্র বিকারভাব তাঁহাতে স্পর্শ করে না। বুদ্ধিময় ক্ষেত্রের যত কিছু বিশিষ্টতা, তাহা চিৎক্ষেত্রে কখনই উপস্থিত হইতে পারে না। বেদনা শব্দের অর্থ বিশিষ্ট অনুভূতি। জীবভাবটী যতই বলবান্ হউক, যতই আত্মাকে জীবত্বের মোহে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করুক, তাহাতে সেখানে—সেই বিশুদ্ধ পরমাত্মক্ষেত্রে কিন্তু কোন সংক্ষোভই উপস্থিত হয় না। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মায়ের অঙ্গে অতি অল্পমাত্র বেদনাও প্রকাশ পায় নাই।

সাধক! প্রথম হইতেই এই বেদন কিংবা অনুভূতির কথা বলিয়া আসিয়াছি। অনুভূতি ধরিয়া তবে সাধনারাজ্যে অগ্রসর হইতে হয়। অনুভূতিই আত্মা, অনুভূতিই মা। প্রথমে বিশেষ বিশেষ ভাবের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ অনুভূতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। তারপর এখানে আসিলে, এই রুদ্রগ্রন্থিভেদের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, অনুভূতির ঐ যে বিশিষ্টতা, তাহা দূরীভূত হইয়া যায়; কেবল অনুভূতিই থাকে। ঐ অনুভূতিটী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়; উহাতে কোনরূপ বিশিষ্টতা থাকে না।

শুন—যদি প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত হইয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই বেদন বা অনুভূতি বলিয়া জিনিষটা বুঝিতে পারিয়াছ। আচ্ছা, এইবার দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, ক্ষিতি অপ্ তেজ প্রভৃতি তত্ত্ব, কিংবা রূপ রসাদি বিষয়, এ সকলই যে এক এক প্রকার অনুভূতিমাত্র, ইহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি—অনুভূতি ধরিয়া বিষয়ের দিকে আসিতে হয়, আবার বিষয় ধরিয়া অনুভূতির দিকে যাইতে হয়। কিছু দিন এইরূপ অভ্যাস করিলে গ্রাহ্য এবং গ্রহণগুলি অর্থাৎ বিষয় এবং ইন্দ্রিয়গুলি অনুভূতিময় হইয়া উঠিবে। তখন দর্শন বলিলে—বোধের দর্শন, শ্রবণ বলিলে—বোধের শ্রবণ, এইরূপ অনুভব হইতে থাকিবে। ঐ অবস্থাটী বেশ একটু পরিপক্ক হইলে, তখন ঐ দর্শন শ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ ভাবগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অনুভূতি—কেবল বোধ ধরিয়া থাকিতে

চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথম প্রথম এই নির্ব্বিশেষ বোধকে ধরিতে গেলেই পশ্চাৎপদ হইতে হইবে, একটা ভয়ানক বৈদ্যুতিক শক্তি যেন জোর করিয়া সে স্থান হইতে সরাইয়া দিবে; তথাপি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিবে, এবং "মা কোলে নাও, মা কোলে নাও" বলিয়া কাতর প্রাণে কাঁদিতে থাকিবে। তখন মায়ের কৃপায় উহাতে ক্ষণকাল স্থিতি লাভ করিতে পারিবে, "কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি" গুরু যে কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারিবে। পূর্ব্বে যে অনুভূতির বিশিষ্টতা বলিলাম, উহাই জ্ঞানের গ্রন্থি। ঐ গ্রন্থি ভেদ করিতে হইলে এইরূপ তীব্র প্রযত্ন এবং মায়ের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয়। এই রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হইলে যে কি হয়, তাহা আর পুস্তকে লিখিয়া জানাইবার আবশ্যকতা নাই। সাধক নিজেই তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিবে। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি—জীবন্মুক্তি নামে যে একটা কথা শুধু পুস্তকে পড়িয়া এবং লোকের মুখে শুনিয়া আসিতেছ, তাহা নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। কিন্তু এ সকল অন্যকথা—

তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্ ।
যত স্তত স্তদ্‌বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি ॥৫৮॥
মুখে সমুদ্‌গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ ।
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্ ॥৫৯॥

অনুবাদ। (মাতৃশূলাঘাতে) আহত রক্তবীজের শরীরের যে যে স্থান হইতে শোণিতস্রাব হইতেছিল, চামুণ্ডা সেই সেই স্থানেই স্বকীয় মুখের দ্বারা ঐ শোণিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন; এবং তাহার (চামুণ্ডার) মুখমধ্যে রক্তপাতবশতঃ যে সকল অসুর উদ্ভূত হইতেছিল, চামুণ্ডা তাহাদিগকেও ভক্ষণ এবং রক্তবীজের রুধির পান করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। যেখানে রুধির ক্ষরণ, সেইখানেই চামুণ্ডার করালমুখ। জীবত্বের দ্বারা যেইমাত্র বিশুদ্ধ বোধটী উপরঞ্জিত হইতে আরম্ভ হয়,

অমনি করালবদন ব্যাদান করিয়া প্রলয়ঙ্করী কালী সেই ভাবকে গ্রাস করিতে থাকেন। একদিকে যেমন প্রজ্ঞার আলোক আসিয়া পড়িতে থাকে, অন্যদিকে তেমনই সর্ব্বভাব—জীবভাব প্রলয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িতে থাকে। এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্যই এই কয়েকটী মন্ত্রে প্রায় একই কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। ইহাতে পুনরুক্তি দোষ নাই; এই ব্যাপারটী—এই প্রজ্ঞালোক-সম্পাত এবং অনাত্মভাবের বিলয়, বাস্তবিকই পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে।

চণ্ডিকার শূলাঘাতে আহত রক্তবীজের দেহ হইতে নির্গত রুধির-প্রবাহ চামুণ্ডার মুখমধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল; কারণ তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার করালমুখ অতিশয় বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুখগহ্বরে নিপতিত রুধির হইতে যে সকল অসুর উৎপন্ন হইতেছিল, চামুণ্ডা তাহাদিগকে গ্রাস করিতে লাগিলেন। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রক্তবিন্দু ভূমিতলে নিপতিত হইলেই রক্তবীজের তুল্য বল ও বিক্রমশালী অসুর উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু এখানে বলা হইল, চামুণ্ডার মুখমধ্যে নিপতিত রুধির হইতেও অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল; ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, চামুণ্ডার মুখেও ভূমির সত্তা অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বের অংশ আছে; সুতরাং চামুণ্ডার মুখমধ্যেও অসুরগণের উৎপত্তি একান্তই সম্ভব। আর বাস্তবিক পক্ষে "রক্তবিন্দুর্যদাভূমৌ" ইত্যাদি মন্ত্রে ভূমি শব্দটী বিশিষ্টতা মাত্রকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং কোনরূপ বিশিষ্টতা পাইলেই রক্তবীজ উৎপন্ন হইতে পারে। অথবা সেস্থলে ভূমি শব্দের অর্থ পার্থিব দেহ। এইরূপ অর্থ বুঝিয়া লইলে আর কোন সংশয়ই থাকে না। যতদিন পার্থিব দেহ আছে, ততদিন জীবত্ব বোধ ফুটিবেই। পার্থিব ভাবের সম্বন্ধ বশতঃই বিশুদ্ধ চিদ্‌বস্তুটী বিশিষ্টভাবে বা জীবভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যদিও এখানে মা আমার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া করালমুখ বিস্তারপূর্ব্বক রক্তবীজের রক্তকে ভূতলে পতিত হইতে দিতেছেন না, যদিও জীবত্ব-প্রতীতিকে

স্থূল দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে দিতেছেন না, যদিও জীবত্ববোধ ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতেই গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন, তথাপি ঐ যে একটুখানি জীবভাব, ঐ যে একটুখানি বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়, উহা পার্থিব দেহের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই প্রকাশ পায়। এইরূপ যতদিন পার্থিব-দেহবিষয়ক বোধ থাকিবে, ততদিন রক্তবীজের রক্ত ভূমিতলে নিপতিত হইবেই। রুধিরসমূহ চামুণ্ডার মুখমধ্যে অর্থাৎ প্রলয়কবলে নিপতিত হইবার কালে পার্থিব দেহবিষয়ক বোধের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই নিপতিত হয়, সেইজন্যই মন্ত্রে চামুণ্ডার মুখমধ্যেও অসুরোৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে।

দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভি ঋষ্টিভিঃ।
জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্ ॥৬০॥

অনুবাদ। চামুণ্ডা রক্তবীজের রুধির পান করিয়া লইলেন, চণ্ডিকাদেবী শূল বজ্র বাণ অসি এবং ঋষ্টি অস্ত্রের দ্বারা রক্তবীজকে আহত করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। এইবার রক্তবীজ ধ্বংসের মুখে আসিয়াছে। একদিকে যেমন পুনঃ পুনঃ প্রজ্ঞার আলোক-সম্পাতরূপ মায়ের শূল বজ্রাদি অস্ত্রপ্রয়োগ হইতেছে; অন্যদিকে তেমন ভাবরঞ্জনা হইতে না হইতেই প্রলয়ঙ্করী শক্তি সর্ব্বভাবকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। মন্ত্রে যে শূল বজ্র বাণ অসি এবং ঋষ্টি, এই পাঁচটি অস্ত্রের উল্লেখ আছে, উহাদের আধ্যাত্মিক অর্থ—বিশ্বাস অনুভব যুক্তি শাস্ত্র এবং কৃপা। এই পাঁচটীই রক্তবীজ-নিধনের যথার্থ অস্ত্র। উহাদের এক একটী দ্বারাই এই মহাসুর নিহত হয় না। যুগপৎ এই সকল অস্ত্রের প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। একদিকে অস্ত্রপ্রয়োগ, অন্যদিকে সংহারিণী-শক্তির আকর্ষণ, এইরূপ উভয়দিক হইতে রক্তবীজকে আক্রমণ করিতে পারিলে, তবেই ইহার নিধন অবশ্যম্ভাবী।

সাধক! তুমি সর্ব্বপ্রথমে "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এই জ্ঞানে বজ্রবৎ দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিবে; ইহাই প্রথম অস্ত্র। তারপর বুদ্ধিতত্ত্বে অবস্থানপূর্ব্বক স্বপ্রকাশস্বরূপা চিতিশক্তির দিকে পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিবে, অর্থাৎ বিশিষ্ট অনুভূতিকে ধরিয়া নির্ব্বিশেষ অনুভূতিতে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিবে। ইহাই দ্বিতীয় অস্ত্র; তারপর যুক্তির সাহায্যে, বিচারের সাহায্যে বুঝিবে যে বাস্তবিক সত্তা একমাত্র চিতি-শক্তিরই আছে। দৃশ্যরূপে জ্ঞেয়রূপে বিশিষ্টরূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, সে সকল পারমার্থিক সত্তাবিহীন এক প্রকার ব্যবহার মাত্র। যাহা ব্যবহার, তাহার বস্তুত্ব হইতে পারে না। ব্যবহারের পৃথক্ অস্তিত্ব তিন কালেই নাই, থাকিতে পারে না। এইরূপ এবং অন্যান্য নানারূপ যুক্তির সাহায্যে বিশিষ্ট সত্তাবিষয়ক প্রতীতি বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। বেদান্তশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিচার, এইখানে উপস্থিত হইতে পারিলে অর্থাৎ রক্তবীজ সমরে উপনীত হইতে পারিলে তবে উপযোগী হইয়া থাকে। অন্যথা উপযুক্ত অধিকার লাভের পূর্ব্বে ঐরূপ বিচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে প্রায়ই অনর্থ সংঘটিত হয়; সাধকের উন্নতির পথ—যথার্থ সত্যবস্তু লাভের পথ বিঘ্নপূর্ণ হইয়া পড়ে। তাই মনে রাখিও সাধক, মাত্র রক্তবীজ বধের জন্যই ব্রহ্মবিচার রূপ অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক। সে যাহা হউক, ইহাই তৃতীয় অস্ত্র। অতঃপর শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যে অদ্বয়স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সহিত স্বকীয় অনুভবের তুল্যতা আছে কি না, ইহা লক্ষ্য করা সাধকমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য-চতুষ্টয়, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "নেহ নানাস্তিকিঞ্চন" ইত্যাদি একত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্য অবলম্বনে স্বকীয় অদ্বয়স্বরূপটীর সম্যক্‌রূপে পরিগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইবে। ইহাই চতুর্থ অস্ত্র। আর পঞ্চম অস্ত্র কৃপা। মায়ের বিশিষ্ট কৃপা লাভ করিবার জন্য, যে কাতর প্রার্থনা প্রথম হইতে অবলম্বন করিয়াছ, তাহাই শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে।

কৃপাই শরণাগতভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল। আত্মলাভের পক্ষে আত্ম-কৃপাই প্রধান অবলম্বন। কৃপার উপলব্ধি হইলে আর যাহা কিছু, তাহা অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী প্রায়ই ব্যুৎক্রমে ফলদায়ক হয়। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে মায়ের কৃপার অনুভব হইতে থাকে; তারপর বিশ্বাস দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়; পরে শাস্ত্রবাক্যের অর্থপ্রতীতি হয়; অতঃপর যুক্তি বা বিচারের সামর্থ্য জন্মে; সর্ব্বশেষে অনুভূতিকে লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বিশেষ স্বরূপে উপনীত হইবার যোগ্যতা লাভ হয়। যাহা হউক, এই পঞ্চবিধ উপায়, পূর্ব্বোক্ত শূলাদি পঞ্চবিধ অস্ত্ররূপে যথাযোগ্য বুঝিয়া লইলেই এই মন্ত্রের রহস্য অতি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে। তবে একটি কথা এখানে বিশেষ স্মরণযোগ্য—"চামুণ্ডাপীতশোণিতম"। চামুণ্ডা যতক্ষণ রক্তবীজের শোণিত পান না করেন, ততক্ষণ কাহারও সাধ্য নাই যে, উহাকে নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হয়। তাই প্রাণপণে প্রলয়ঙ্করী শক্তির কৃপার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে—সাধকের পুরুষকার মায়ের কৃপার দ্বারাই সম্যক্ প্রকটিত হয়।

স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ।
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৬১॥

অনুবাদ। হে মহীপাল! এইরূপে শস্ত্রসঙ্ঘদ্বারা সমাহত হইয়া ক্ষীণরক্ত মহাসুর রক্তবীজ মহীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস অনুভব যুক্তি শাস্ত্রপ্রমাণ এবং কৃপারূপ শস্ত্রসঙ্ঘদ্বারা সমাহত হইয়া রক্তবীজ মহীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল—জড়ত্বে পরিণত হইল, অর্থাৎ নিহত হইল। জড়ত্ব এবং দৃশ্যত্ব একই কথা। জীবভাবটি এতদিন আমিরূপ চেতনবস্তুর সহিত যুক্ত হইয়া কর্ত্তা ভোক্তা সাজিয়াছিল—যাহা স্বরূপতঃ জড় বা দৃশ্য, তাহাও এতদিন চেতনরূপে—দ্রষ্টারূপে প্রতিভাত হইতেছিল;

কিন্তু আজ চৈতন্যের যথার্থ স্বরূপটী প্রকটিত হওয়ায়, উহা দৃশ্যকে পরিণত হইল। আমি বস্তুটী এখন আর দৃশ্য বা জীব নহে। আমি দ্রষ্টা—চেতন। এতদিন বিপর্য্যয়জ্ঞান ছিল, তাই বীজরূপা আত্মা বিপর্য্যস্তভাবে জীবরূপে প্রতিভাসিত হইতেছিলেন। কিন্তু এবার মা আমার সর্ব্বপ্রথমেই ধূম্রলোচন বধ করিয়া সেই বিপর্য্যয় জ্ঞানটী বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে আজ জীবভাবটীরও অবসান হইল।

শুন—বাস্তবিক জীব বলিয়া পৃথক্ কিছু নাই, দৃশ্য বলিয়া পৃথক কিছু নাই, কখনও ছিল কিংবা থাকিবে, ইহাও হইতে পারে না। একমাত্র বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ বস্তুটীই নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা পূর্ণ আনন্দময়, চিরমধুময় এবং সর্ব্বথা অমৃতময়। পূর্ণজ্ঞান ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ বস্তুতে অজ্ঞান ও নিরানন্দ কখনও নাই, থাকিতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই রক্তবীজবধ; কারণ ঐরূপ জ্ঞানের উদয়ে আর জীবভাব বলিয়া কিছুই থাকে না। তখন আর বীজরূপী আমি বস্তুটী জীবত্বদ্বারা অভিরঞ্জিত হয় না। অজ্ঞানতাবশতঃই ঐরূপ জড় চৈতন্যের সংমিশ্রণরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। সাধক! মায়ের কৃপায় এতদিনে তোমার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, চৈতন্য স্বকীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; সুতরাং জীবরূপে আর কিছুই প্রতিভাত হইবে না।

মহর্ষি মেধস এখানে রাজা সুরথকে মহীপাল বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সাধক! তুমিও মহীপাল হও। চৈতন্যস্বরূপ তোমার আশ্রয়ে থাকিয়াই ত, মহী বা জড়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, তুমিই যে মহীকে পালন করিতেছ, রক্ষা করিতেছ, অর্থাৎ অজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিতেছ, ইহা ভালরূপ বুঝিতে পারিলে দেখিতে পাইবে—মহী বলিয়া আর কিছুই নাই; একমাত্র চৈতন্যস্বরূপবস্তু—তুমিই স্বয়ং নিত্য উদ্ভাসিত রহিয়াছ; কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বরূপ ব্যবহার তোমাতে কোনকালেই ছিল না, এখনও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। সাধক! কবে তুমিও সুরথের ন্যায়

মহীপালত্বের মিথ্যা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ মহীপাল হইবে? কবে তোমার রক্তবীজ অসুর নিহত হইবে? কবে তুমি এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইবে?

ততস্তে হর্ষমতুলমবাপস্ত্রিদশা নৃপ।
তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্ত্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ॥ ৬২॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে
রক্তবীজ বধঃ।

অনুবাদ। হে নৃপ! তখন দেবতাগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং মাতৃগণও রক্তবীজের অসৃক্-পানজনিত আনন্দে উদ্ধত-নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয়
দেবী-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে রক্তবীজবধ।

ব্যাখ্যা। বাস্তবিকই আজ দেবতাগণের আনন্দ অতুলনীয়। বহুকালের সঞ্চিত জীবত্বরূপ মলিনতার সংস্পর্শ হইতে দেবতাগণ বিমুক্ত হইয়াছেন, জড়ত্বের সংস্পর্শ কাটিয়া গিয়াছে, শুভ্র আত্মজ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং বিশিষ্ট চৈতন্যসমূহ নির্ব্বিশেষ অখণ্ড আনন্দময় সত্তার সম্বন্ধ লাভ করিয়া অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। আর ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃশক্তিগণও অসৃক্মদোদ্ধত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অসৃক্ শব্দের অর্থ রক্ত; তাহাই মদ অর্থাৎ হর্ষ বা আনন্দ। জীবভাবরূপ অসৃক্ অর্থাৎ ভাবরঞ্জনাসমূহ আনন্দময়ী চিতিশক্তির সম্বন্ধ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে, মাতৃশক্তিগণের প্রলয়লীলা সার্থক হইয়াছে; তাই তাঁহারা উদ্ধত ভাবে তাণ্ডব-নৃত্য করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বিভিন্ন শক্তিসমূহ নির্ম্মল বোধপ্রবাহরূপে অভিব্যক্ত হইতে লাগিলেন।

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেই জীবভাব অবস্থিত, অর্থাৎ ব্রহ্মই যেন

জীবরূপে প্রকটিত হইয়া রহিয়াছেন ; সাধক এতদিন এইরূপ জ্ঞানে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত ছিল ; কিন্তু আজ মায়ের কৃপায় এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যে স্থানে আর জীবত্ব বলিয়া কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জীবভাবীয় পরিচ্ছিন্নতার দ্বারা আনন্দের যে একটা সীমাবদ্ধ ভাব ছিল, এই রক্তবীজ-বধে তাহার সম্যক্ অবসান হইয়া গিয়াছে। রক্তবীজবধ হইলেই আনন্দের পরিচ্ছিন্নতা বিদূরিত হয়। আর পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ব্যষ্টিভাবের ভিতর দিয়া বিন্দু বিন্দু আনন্দের সন্ধান লইতে হয় না। সর্ব্ববিধ বিশিষ্টতা পরিত্যাগপূর্ব্বক আনন্দস্বরূপ আত্মাই সর্ব্বথা প্রকাশিত হইতে থাকেন। তখন বিশ্বময় কেবল আনন্দ ! অসীম আনন্দ ! নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। আনন্দ ব্যতীত কোথাও কিছু নাই। এক আনন্দস্বরূপ আমি, পরম প্রিয়তম আমি, অমৃতময় আমি সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত রহিয়াছি। আমার—আনন্দের আদি নাই, অন্ত নাই, উদ্বেলন নাই ; আমি—মহান্ প্রশান্ত, ধীর স্থির। সাধকের এইরূপ অনুভূতি লাভ হয়। সে অবস্থায় জীব জগৎ, জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক, চন্দ্র সূর্য্য, আকাশ নক্ষত্র, সকলই একটা ঘন আনন্দময় সত্তার দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে থাকে ; সুতরাং দেবতাগণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দের অতুল আনন্দ উপস্থিত হয় ; এবং মাতৃগণ—ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তিগণ আনন্দে উদ্দাম নৃত্য করিতে থাকেন। এস সাধক ! তুমিও এই আনন্দের সন্ধান লইয়া আনন্দময় হও—ধন্য হও। সত্যে ও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, এইবার আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় স্বরূপটী উপলব্ধি করিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে আনন্দ বিতরণ করিয়া বেড়াও। শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ তোমাদিগকে ধন্য করিয়া এইরূপ বিশ্বমঙ্গলে প্রণোদিত করুক ! নিরানন্দ জগতে আবার আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠুক !

ইতি সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায়

রক্তবীজবধ।

সাধন-সমর

বা

দেবী মাহাত্ম্য।

রুদ্রগ্রন্থি ভেদ।

—:০:—

নিশুম্ভবধ।

—*—

রাজোবাচ।

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ॥ ১ ॥
ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে।
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। রাজা (সুরথ) বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি রক্তবীজবধ-প্রসঙ্গে দেবীর এই বিচিত্র চরিত-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। (তাহাতে) পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়—রক্তবীজ নিহত হইলে অতি কোপন শুম্ভ এবং নিশুম্ভ কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। যথার্থ ই এই রক্তবীজবধ অতি বিচিত্র। দেবীর এই অভূতপূর্ব্ব চরিত-মহত্ত্ব শ্রবণ করিয়া জীবভাব-বিলয়কামী সাধকগণ নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। যে চরিতে একা অদ্বিতীয়া মা আমার বহুশক্তি-রূপে প্রকটিত হইয়া জীবভাবকে প্রলয়কবলিত করেন, যে চরিতে মা আমার স্বয়ং নির্ব্বিকল্পা হইয়াও শূলাদি অস্ত্রপ্রয়োগে অসুরকুলকে বিমথিত করেন, যে চরিতে মা আমার অনাদিজন্মসঞ্চিত সংস্কাররাশিকে উন্মূলিত করিয়া দেন, সেই অপূর্ব্ব চরিত যতই শ্রবণ করা যায়, ততই

বিস্ময়ে বিহ্বল হইতে হয়। তাই রাজা সুরথ "বিচিত্রমিদমাখ্যাতং দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যম্" বলিয়া, ইহার বিচিত্রতা প্রতিপাদন করিলেন। কেবল যে মায়ের এই চরিতমাহাত্ম্যই বিচিত্র, তাহা নহে; ইহার বক্তা বিচিত্র, ইহার শ্রোতাও বিচিত্র। আরও বিচিত্র তিনি—যিনি ইহার উপলব্ধি করেন। তাই উপনিষৎ বলেন—"আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্যলব্ধা"। ভগবান্ স্বয়ং বলেন—আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং, আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ"। যথার্থই এই তত্ত্বের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই বিচিত্র। বক্তব্য বিষয়টী কিন্তু তদপেক্ষাও আরও বিচিত্র—আশ্চর্য্য। এমন সহজ সরল স্বপ্রকাশ বস্তুকে লাভ করিতে হইলে, কত বৈচিত্র্যময় ঘটনানিচয়ের মধ্য দিয়া জীবকে যাইতে হয়, তাহা ভাবিতে গেলেও বিস্মিত হইতে হয় না কি? যিনি ছাড়া আর কিছুই নাই, যিনি নিত্য প্রকটিত, যিনি একান্ত সহজ, তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে যে এত অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়—ইহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় না কি? আরে, "আমি আছি" ইহা কত সহজ, কত স্বাভাবিক, কত প্রকাশশীল! আনন্দময়ী মা আমার ঠিক এমনই সহজ এমনই স্বাভাবিক, এমনই স্বপ্রকাশ। অথচ স্বকীয় স্বরূপটী উদ্ভাসিত করিবার জন্য আমাদিগকে লইয়া তাঁহার কতই না লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে হয়। ধন্য তিনি—যিনি অতি সুপ্রকট হইয়াও চিরলুক্কায়িত। এই নিত্যসিদ্ধ বস্তুকে লাভ করিবার জন্য, এই প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপ বুঝাইবার জন্য কত সহস্র গ্রন্থ, কতরূপ উপদেশ, কত রকমের শিক্ষা ও সাধন প্রণালী জগতে প্রচলিত হইয়াছে, হইতেছে, তাহা ভাবিতে গেলেও বিস্মিত হইতে হয়। ধন্য তিনি, আর ধন্য তাঁহার অচিন্তনীয় লীলারহস্য!

সে যাহা হউক, রক্তবীজনিধনের পরেও যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, কিরূপে তাহারও অবসান হয়, তাহা জানিবার জন্য সাধকের কৌতূহল পরিবর্দ্ধিত হয়; তাই মহারাজ সুরথ "ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং" বলিয়া নিশুম্ভ ও শুম্ভের নিধনরহস্য শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ

প্রকাশ করিলেন। রাজা সুরথ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রথমে যখন মহর্ষি মেধসের নিকট উপস্থিত হন, তখন তিনি যে "ভগবন্" সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহা গুরুর নিকট সমুদাচারমাত্র সূচনা করিয়াছিল। আর আজ এখানে যে "ভগবন্" শব্দের প্রয়োগ করিলেন, তাহা যথার্থ ই ভগবদ্ দর্শনের সূচনা করিতেছে। ঠিক এইরূপেই শিষ্য যত উন্নত হইতে থাকে, ততই গুরুর মধ্যে ভগবৎসত্তা বিশেষরূপে দর্শন করিবার সামর্থ্য লাভ করে। অথবা গুরুতে ভগবদ্‌জ্ঞান যত বেশী সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, শিষ্য ততই উন্নত হইতে থাকে।

ঋষিরুবাচ।

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষন্যেষু চাহবে ॥৩॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—রক্তবীজ ও অন্যান্য অসুরগণ যুদ্ধে নিহত হইলে, শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুর অতুলনীয় কোপ প্রকাশ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। শুম্ভ নিশুম্ভের—অস্মিতা ও মমতার যাহারা প্রধান অবলম্বন, একে একে সে সকলই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে; আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতে পারে, এমন আর কেহই নাই। এ অবস্থায় তাহাদের নৈরাশ্য অবসাদ ও অবর্ণনীয় দুঃখ উপস্থিত হওয়াই উচিত; কিন্তু তাহা হইল না। অতুলনীয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। এ ক্রোধ অতুলনীয়ই বটে। যে ক্রোধ আত্মস্বরূপ প্রকাশের হেতু, জগতে সে ক্রোধের তুলনা কোথায়? ভগবান্ বলিয়াছেন—"কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে" কামনা হইতেই ক্রোধের আবির্ভাব হয়। শুম্ভ ও নিশুম্ভ অম্বিকাকে কামনা করে, নানা কারণে তাহাদের সে কামনা পূর্ণ না হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইতেছে, তাই ক্রোধের আবির্ভাব হইল। এই ক্রোধই উহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বিলয় করিয়া দিবে। কামনা হইতে যে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে কিরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য

দিয়া পরিণামে বিনাশে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়, তাহাও ভগবান্ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—"ক্রোধাদ্‌ভবতি সম্মোহঃ"। ক্রোধ হইতে সম্মোহ উপস্থিত হয়। আত্মার স্বপ্রকাশত্ব আনন্দময়ত্ব দর্শনে অস্মিতা একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ে। নিজ অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়াও আত্মাকে লাভ করিবার জন্য একান্ত লালায়িত হয়। ইহারই নাম সম্মোহ। "সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ"। মোহ হইতেই স্মৃতিবিভ্রম উপস্থিত হয়। পরম প্রেমময় পরমাত্মস্বরূপে একান্ত মুগ্ধ হইলে, নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব-বিষয়ক স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। "স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ" স্বকীয় সত্তার বিস্মৃতি হইলেই বুদ্ধিনাশ হয়। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াহৃত বিষয়সমূহের প্রকাশক মাত্র। যখন চিত্তে আর কোন প্রকার বৃত্তিপ্রবাহ চলে না, প্রকাশ্যরূপে কিছুই থাকে না, তখন প্রকাশক যে বুদ্ধি, তাহারও অবসান হয়। এইরূপে স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয়। "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"। বুদ্ধিনাশ হইলেই প্রণাশ অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে নাশ উপস্থিত হয়—অস্মিতার যে আত্মাতিরিক্ত পৃথক্ সত্তা, তাহা সম্যক্ বিলুপ্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি—বুদ্ধি ও অস্মিতা অভিন্ন; সুতরাং বুদ্ধিনাশ এবং অস্মিতানাশ একই কথা। ক্রোধ হইতেই এই প্রণাশ বা বুদ্ধিনাশের সূচনা হয়। তাই ঋষি বলিলেন—শুম্ভ নিশুম্ভ অতুলনীয় কোপ প্রকাশ করিয়াছিল। যে কোপে আমিত্বের বিলয় হইয়া যায়; জগতে তাহার তুলনা হয় না। সে যাহা হউক, "আমি জীব" এই ভাবটীর বিলয় হইবার পরই আত্মাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য অস্মিতা-ক্ষেত্রে একবার শেষ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাহারই বহির্লক্ষণ—ক্রোধ। ফল কিন্তু বিপরীত—আত্মা অস্মিতার আত্মসাৎ না হইয়া, অস্মিতাই আত্মার আত্মসাৎ হইবে। ক্রমে আমরা ইহাই দেখিতে পাইব।

হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া ॥৪॥
তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ ॥৫॥

অনুবাদ। মহাসৈন্যগণকে নিহত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত নিশুম্ভ প্রধান অসুর-সৈন্যসমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ অভিধাবিত হইল। তাহার অগ্রে পশ্চাতে এবং উভয় পার্শ্বে ক্রুদ্ধ মহাসুরগণ ওষ্ঠ দংশন-পূর্ব্বক দেবীকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্থান করিল।

ব্যাখ্যা। শুম্ভ নিশুম্ভ উভয় ভ্রাতার মধ্যে নিশুম্ভই প্রথম যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিল। অস্মিতা ও মমতা—এই উভয়ের মধ্যে মমতাই প্রথমে আত্মলাভে অগ্রসর হয়—"আমার আত্মা" বলিয়া অম্বিকাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়। নিশুম্ভের—মমতার অগ্রভাগে আত্মলাভের বাসনা, পৃষ্ঠদেশে জগদ্‌ভোগের বাসনা, উভয় পার্শ্বে অনন্ত ঐশ্বর্য্য বিকাশের বাসনা ইহারাই মুখ্য অসুর, এই অসুর সৈন্যগণ ক্রোধে ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক দেবীর সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে অভিধাবিত হইল। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে—ইতিপূর্ব্বে রক্তবীজ বধে জীবভাব পর্য্যন্তের বিলয় হইয়া গিয়াছে, আবার সম্মুখে পৃষ্ঠে পার্শ্বে এই বাসনারূপী অসুর-সকল কোথা হইতে আসিল? তাহার সমাধান এই যে—মধুকৈটভ হইতে আরম্ভ করিয়া রক্তবীজ পর্য্যন্ত যে সকল অসুরনিধনের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে জীবভাবীয় যাবতীয় সংস্কারবিলয়ের রহস্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইবার ঈশ্বর-ভাবীয় সংস্কারনাশের কথা বলা হইবে। সুতরাং নিশুম্ভের অগ্রে পশ্চাতে এবং পার্শ্বদেশে যে সকল অসুরসৈন্যের কথা বলা হইয়াছে, উহাদিগকে ঈশ্বরভাবীয় সংস্কাররূপে বুঝিয়া লইলে, আর কোনও সংশয় উপস্থিত হইবে না। সাধক! বিশেষভাবে মনে রাখিও—এই নিশুম্ভ ও শুম্ভবধে ঈশ্বরত্ব বিষয়ক সংস্কারক্ষয় বর্ণিত হইবে। পরমাত্মস্বরূপে

উপনীত হইবার পক্ষে জীবভাবীয় সংস্কারগুলি যেরূপ অন্তরায়, ঈশ্বরত্বের সংস্কারও ঠিক সেইরূপই প্রতিবন্ধক। জীবত্ব এবং ঈশ্বরত্ব এই উভয়ের বিলয় সাধন করিতে পারিলেই অম্বিকাকে লাভ করা যায়। যথার্থই যাহারা মুক্তিকামী, যথার্থই যাহারা ইহামুত্র ফলভোগবিরাগী, অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত যাহাদের নিকট উপেক্ষিত, কেবল তাহারাই এই অদ্বয় অমৃতময় আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ।

সে যাহা হউক, নিশুম্ভ সদলবলে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। "আমার আত্মা" বলিয়া আত্মার সহিত আত্মীয়তা করিয়া নিজের বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে উদ্যত হইল। উদ্দেশ্য এই যে—আত্মাকে আত্মীয় করিতে পারিলেই ঈশ্বরত্ব লাভ হয়; স্বাধীনভাবে মুক্তপ্রাণে জগদ্রূপ ঐশ্বর্য্য-বিলাস সম্ভোগ করা যায়। ইহাই নিশুম্ভের যুদ্ধাভিযানের রহস্য।

সাধক! এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলে, বুঝিতে পারিবে—ঈশ্বরত্ব কি এবং প্রেম ভক্তিই বা কি; সাধারণতঃ তোমরা যেখানে প্রেমভক্তির আলোচনা কর, তাহা যথার্থ প্রেম ভক্তির স্থান নহে। ওগো, যতদিন তোমরা নিশুম্ভের মত "আমার আত্মা" বলিয়া আত্মার সহিত আত্মীয়তা করিতে না পারিবে, যতদিন আত্মস্বরূপের আভাস না পাইবে, ততদিন প্রেম ভক্তির বিষয় আলোচনা করিবার অবসর কোথায়? "আমার আত্মা" এই কথাটী বলিবার—বুঝিবার সামর্থ্য তখনই হয়, যখন আমার বলিবার আর কিছুই থাকে না। সর্ব্বভাবের বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত, চিত্তের ভাবস্রোত নিরুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত, আমার ভগবান্, আমার মা, আমার আত্মা প্রভৃতি আত্মীয়তা-বোধক বাক্যপ্রয়োগের সার্থকতা উপলব্ধি হয় না। সাধকের যখন একমাত্র আত্মাই লক্ষ্য হইয়া পড়ে, আর কিছুই বোধময় ক্ষেত্রে ফুটিবার অবকাশ পায় না, তখনই আত্মার সহিত আত্মীয়তা করিবার সামর্থ্য লাভ হয়। এবং তখনই যথার্থ প্রেম ভক্তির অপূর্ব্ব রসাস্বাদের যোগ্যতা লাভ হয়।

দেখ সাধক! নিশুম্ভের প্রায় সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি

"আমার অম্বিকাকে আমি চাই" বলিয়া সে কিরূপ তীব্র বেগে অগ্রসর হইয়াছে। ঠিক এমনই করিয়া তুমি আকুল আগ্রহে অগ্রসর হও। ঈশ্বরত্বের লালসা রাখিও না। লাভ ক্ষতির বিচার করিও না, শুধু প্রেমে আত্মহারা হইতে চেষ্টা কর। তুমিও নিশুম্ভের ন্যায় "আমার আত্মা, আমার মা" বলিয়া অগ্রসর হও, নিশ্চয়, মাকে পাইবে 'আমার' শব্দটী একেবারেই ভুলিয়া যাইবে এবং কেবল আত্মস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আজগাম মহাবীর্য্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈর্ব্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ ॥৬॥

অনুবাদ। মহাবীর্য্য শুম্ভও স্বকীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে মাতৃগণের সহিত চণ্ডিকাকে নিহত করিবার জন্য সক্রোধে (সমর ক্ষেত্রে) আগমন করিল।

ব্যাখ্যা। মমতার সঙ্গে সঙ্গে অস্মিতাও যুদ্ধযাত্রা করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মমতা ও অস্মিতা পরস্পর সহভাবী। ঈশ্বরত্বের—নানাবিধ ঐশ বিভূতির সংস্কাররূপ অসুর-সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ং শুম্ভও নিশুম্ভের সহিত সক্রোধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইল। শুম্ভ অম্বিকার পাণিগ্রহণাভিলাষী। অম্বিকার শরীর হইতে নির্গত অষ্টমাতৃ-শক্তিসহ চণ্ডিকাদেবীকে নিহত করিতে পারিলেই অম্বিকাদেবী একাকিনী হইবেন, এবং তাহা হইলেই হয়ত শুম্ভের সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে; তাই মন্ত্রে "নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ" এইরূপ উল্লেখ আছে।

শুন—অস্মিতা হইতে পৃথক্ আত্মা নামে একজন আছেন, তিনিই যথার্থ ঈশ্বর, তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই যথার্থ ঈশ্বরত্ব লাভ হয়, ইহা বুঝিতে পারিয়াই অস্মিতার এত তীব্র আগ্রহ, এত দৃঢ়প্রযত্ন। অস্মিতা আপনাকেই আত্মা বা ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের আভাস দেখিতে পাইয়া স্বকীয় স্বরূপের

অপূর্ণতা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকে; তাই আত্মাকে লাভ করিয়া সেই অপূর্ণতা দূর করিয়া স্বয়ং পূর্ণ হইতে চায়। তাহার অভিপ্রায় এই যে, আমি ছাড়া আবার যে একজন "আমির" সত্তা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে কিছুতেই পৃথক্‌ভাবে থাকিতে দেওয়া হইবে না; হয় ঐ আমি এই আমিতে মিলিয়া এক হইয়া যাইবে, না হয় এই আমি ঐ আমিতে চিরতরে মিলাইয়া যাইবে। দুইটী আমির সত্তা কিছুতেই সহ্য করা যায় না। অস্মিতা ক্ষেত্রে উপনীত মুমুক্ষু সাধক না হইলে এ সকল কথা বুঝিতে পারিবে কি? যতক্ষণ আত্মস্বরূপের আভাস না পাওয়া যায়, ততক্ষণ অস্মিতাই আত্মা-রূপে অবভাসিত হইতে থাকে। উহা যে বাস্তবিক আত্মা নহে, ইহা প্রথমে কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। ক্রমে যত আত্মসান্নিধ্য লাভ হয়, ততই তাহাকে আয়ত্ত করিতে আগ্রহ উপস্থিত হয়।

———

ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্দেব্যা শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। অনন্তর দেবীর সহিত শুম্ভ ও নিশুম্ভের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জলবর্ষণকারী মেঘদ্বয়ের ন্যায় তাহারা উভয়ে অতি প্রবলবেগে শরবর্ষণ করিতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। মমতা "আমার আত্মা" বলিয়া আত্মাকে আত্মীয় করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল; আর অস্মিতা "আমিই আত্মা" বলিয়া যথার্থ আত্মসত্তার নিরাস করিতে প্রয়াস পাইল। ইহাই শুম্ভ নিশুম্ভের সমর-রহস্য, যাঁহারা "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা এই অস্মিতা মমতার অতিসূক্ষ্ম অথচ ভীষণ আক্রমণ লক্ষ্য করিতে পারিবেন। যথার্থই যাহাকে চরমতত্ত্ব এবং পরম-ধাম বলিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে, তাহাকে যতক্ষণ আমার মধ্যে আনিতে না পারা যায়, ততক্ষণ সাধকের কিছুতেই শান্তি বা বিশ্রাম নাই। সেই জন্যই সাধকগণ এই ক্ষেত্রে আসিয়া আত্মলাভ করিবার জন্য বিপুল

অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ" তীব্রসংবেগ সম্পন্ন সাধকগণের পক্ষেই আত্মলাভ আসন্ন হইয়া থাকে। আর বাস্তবিক অনুভূতি ক্ষেত্রেও দেখা যায়—এইরূপ তীব্র সংবেগ একান্তই স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। নদী যেখানে সমুদ্রের সন্নিহিত, সেখানে স্রোতের বেগ বড়ই প্রবল। সাধক যত আত্মসান্নিধ্য লাভ করিতে থাকে, তাহার অধ্যবসায়ও তত প্রবল হয়। ইহাই শুম্ভ নিশুম্ভকর্ত্তৃক অতি উগ্র শরবর্ষণের রহস্য। মন্ত্রে মেঘের সহিত ইহাদের উপমা করা হইয়াছে। ইহারও একটু উদ্দেশ্য আছে। মেঘ যেরূপ অনবরত জল বর্ষণ করিয়া নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলে, অস্মিতা মমতাও সেইরূপ তীব্রবেগে অধ্যবসায় প্রয়োগরূপ শরবর্ষণ করিয়া অচিরে আপনাদের সত্তা হারাইয়া ফেলিবে। তখন একমাত্র আত্মসত্তাই বিদ্যমান থাকিবে। অস্মিতা ও মমতা বলিয়া কিছুই থাকিবে না। ক্রমে আমরা তাহাই দেখিতে পাইব।

চিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাশু শরোৎকরৈঃ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ ॥৮॥

অনুবাদ। অসুরদ্বয়নিক্ষিপ্ত বাণগুলিকে চণ্ডিকা দেবীও শীঘ্র শরসমূহের দ্বারা ছিন্ন করিতে লাগিলেন, এবং নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগে অসুরাধিপতিদ্বয়ের অঙ্গ জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। নিশুম্ভ ও শুম্ভ বহুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিয়াছিল, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল; যেহেতু চণ্ডিকা মা আমার স্বকীয় শর প্রয়োগে সে সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু চণ্ডিকার অস্ত্রাঘাতে অসুর-দ্বয়ের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। এই শর প্রয়োগের রহস্য যদিও পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে, তথাপি এস্থলে পুনরুল্লেখ আবশ্যক বলিয়াই মনে হয়। "প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ ॥" এই উপনিষৎ প্রতিপাদ্যশরনিক্ষেপের চরম

উৎকর্ষতা এইখানে—এই শুম্ভ-নিশুম্ভ-সমরেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাধক যতই প্রণবধনু অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মলক্ষ্যে আত্মশর নিক্ষেপ করিতে থাকে, ততই সাধকের নিজ পৃথক্ সত্তাটী ক্ষীণ হইতে থাকে। যথার্থ সত্তার সন্ধান যতই পাওয়া যায়, জীবভাবীয় পৃথক্ সত্তাটীর মূল ততই বিনষ্ট হইতে থাকে। অসুরাধিপতিদ্বয়ের শর ব্যর্থ হওয়া এবং অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হওয়ার তাৎপর্য্য ইহাই। চণ্ডিকার শর প্রয়োগ বলিতে চিতি সত্তার পুনঃ পুনঃ ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ বুঝিয়া লইলেই এ রহস্য সম্যক্ উপলব্ধি যোগ্য হইবে। নিষ্কর্ষ এই যে আত্মা মা, নিত্যস্বস্থ নিত্য-নির্ব্বিকার তাঁহাকে "আমার" করিবার জন্য যতই চেষ্টা করা যায়, আমিটী ততই ক্ষীণ হইতে থাকে। আত্মার সেই নিতান্ত নির্ম্মল স্বরূপের আভাস যতই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপে সাধকের নিকট প্রকাশিত হইতে থাকে, অস্মিতা মমতাও ততই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। সাধক এই তত্ত্বটীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে পারিলেই শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধরহস্য বুঝিতে পারিবে।

নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গং চর্ম্ম চাদায় সুপ্রভম্।
অতাড়য়ন্ মূর্দ্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥৯॥

অনুবাদ। (তখন) নিশুম্ভ শাণিত অসি এবং অত্যুজ্জ্বল চর্ম্ম (ঢাল) গ্রহণপূর্ব্বক দেবীর উত্তম বাহন সিংহের মস্তকে আঘাত করিল।

ব্যাখ্যা। মহিষাসুর-যুদ্ধেও একবার সিংহের মস্তকে এইরূপ আঘাত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। নিশুম্ভও শাণিত অসি এবং চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিংহের মস্তকে সেইরূপ আঘাত করিল। মাতৃশক্তি-পরিচালক যন্ত্রটীকে অর্থাৎ জীবরূপী সিংহকে অকর্ম্মণ্য করাই নিশুম্ভের অভিপ্রায়। জীব-সিংহকে উদ্যমবিহীন করিতে পারিলেই অম্বিকা নিশুম্ভের অধীনতা স্বীকার করিবেন; ইহাই তাহার উদ্দেশ্য।

একটী আপত্তি হইতে পারে যে, এখানে আবার জীবসিংহ কোথা

হইতে আসিল ? রক্তবীজবধেই ত জীবভাবের বিলয় হইয়াছে। বিশেষ কথা—বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত যে চিৎ, তাহাই ত জীবের যথার্থ স্বরূপ ; তাহাই এখানে শুম্ভাসুররূপে বর্ণিত, তবে আবার দেবীর বাহন সিংহ কোথা হইতে আসিবে ? এ আপত্তি সত্য বটে। ইহার উত্তর এই যে, যদিও বাস্তবদৃষ্টিতে চিদাভাস হইতে অতিরিক্ত জীব বলিয়া কিছুই নাই ; তথাপি যতক্ষণ অস্মিতা ও মমতা আছে, ততক্ষণ এমন একটা শক্তি থাকে, যাহা ঐ দুটিকেও বিলয় করিতে চেষ্টা করে। সেই যে শক্তি, যদিও তাহাতে 'আমি জীব' বলিয়া কোনরূপ অভিমান নাই, তথাপি উহা যে আত্মারই একটী বিশিষ্ট প্রকাশ, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সেই বিশিষ্টতাটুকুই এই স্থলে দেবীর বাহন—সিংহ।

এই মন্ত্রে বাহনের একটী বিশেষণ আছে—উত্তম। ইতিপূর্ব্বে দেবীর যে বাহন ছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত স্থূলাভিমানী, কিন্তু ইহা আনন্দময় কোষের অতিসূক্ষ্মতম শক্তিপ্রবাহ। এখানে কোনরূপ স্থূলত্বের অভিব্যক্তি নাই। তাই ইহাকে উত্তম বাহন বলা হইয়াছে। শুন, সুষুপ্তিকালে জীব আনন্দময় কোষে অবস্থান করে, সেই সময় স্থূল কিংবা সূক্ষ্মবিষয়ক কোন জ্ঞানই থাকে না, কিন্তু অজ্ঞান-বিষয়ক যে জ্ঞানটুকু থাকে, উহাকে ধরিতে পারিলেই দেবীর এই উত্তম বাহন সিংহের রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে।

তাড়িতে বাহনে দেবী ক্ষুরপ্রেণাসিমুত্তমম্।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্ ॥১০॥

অনুবাদ। বাহন আহত হইলে দেবী ক্ষুরপ্র নামক অস্ত্রদ্বারা নিশুম্ভের উত্তম অসি ও অষ্টচন্দ্র-চিহ্নিত চর্ম্মও ছেদন করিলেন।

ব্যাখ্যা। দেবীর উত্তম বাহন সিংহকে আহত হইতে দেখিয়া ক্ষুরপ্র নামক অস্ত্রপ্রয়োগে দেবী নিশুম্ভের উত্তম অসি এবং অষ্টচন্দ্র-চিহ্নিত চর্ম্ম ছিন্ন করিয়াছিলেন। ক্ষুরপ্র—ক্ষুর সদৃশ একপ্রকার শাণিত

অস্ত্রবিশেষ। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ আত্মস্বরূপ-প্রকাশক শক্তিবিশেষ। যে প্রকাশ শক্তির প্রভাবে ঈশ্বরভাবীয় বিক্ষেপসমূহ নিবারিত হয়, তাহাই এস্থলে ক্ষুরপ্র নামক অস্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে চিক্ষুর নিধনে যে বিক্ষেপ নিবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে উহা জীবভাবীয় বিক্ষেপ। আর এই অস্মিতাক্ষেত্রে যে বিক্ষেপ নিবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে উহা ঈশ্বরভাবীয় বিক্ষেপ বুঝিতে হইবে; কারণ এই অস্মিতাক্ষেত্রে জীবভাবীয় বিক্ষেপের কোন সম্ভাবনাই নাই। সে যাহা হউক, দেবী ক্ষুরপ্র অস্ত্র প্রয়োগে নিশুম্ভের উত্তম অসি এবং চর্ম্ম উভয়ই ছিন্ন করিলেন। অসি—শব্দে এস্থলে ভেদজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বর-ভাবীয় বিক্ষেপ শক্তি এবং চর্ম্ম শব্দে আত্মস্বরূপ আবরক শক্তিবিশেষ বুঝিতে হইবে।

মন্ত্রে চর্ম্মটীকে অস্টচন্দ্র-চিহ্নিত বলা হইয়াছে, উহারও একটু রহস্য আছে। ইতিপূর্ব্বে যে অস্টপাশের বিলয় বর্ণিত হইয়াছে উহাদের শেষ চিহ্নস্বরূপ যে সূক্ষ্মতম বীজ তাহাই এস্থলে অষ্টচন্দ্র চর্ম্ম নামে উক্ত হইয়াছে। সাধারণ কথায় চর্ম্মঅস্ত্রকে ঢাল বলা হয়। ইহা আবরণ শক্তিরই নামান্তর মাত্র। স্বপ্রকাশ আত্মশক্তি যখন নিশুম্ভকে—মমত্বকে বিলয় করিতে উদ্যত হয় তখন সে সূক্ষ্মতম বীজরূপী আবরণশক্তিপ্রভাবে নিজেকে আবৃত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে; ইহাই মমতার স্বভাব। মা এইবার তাহাও বিনষ্ট করিয়া দিলেন।

ছিন্নে চর্ম্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্ ॥১১॥

অনুবাদ। চর্ম্ম এবং খড়্গ ছিন্ন হইলে, সেই অসুর শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। দেবার অভিমুখে আগত সেই অস্ত্রকেও দেবী চক্র অস্ত্র প্রয়োগে দ্বিধা করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা। অসি ও চর্ম্ম ছিন্ন হইল দেখিয়া নিশুম্ভ শক্তিঅস্ত্র

প্রয়োগ করিল। দেবী তাহাও চক্রদ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বোক্ত আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি যাহা হইতে উদ্ভূত হয়, সেই মূল অজ্ঞানস্বরূপ পদার্থও যে শক্তিবিশেষ, ইহা বলাই বাহুল্য। অজ্ঞানের শক্তিস্বরূপতা বেদান্তশাস্ত্রেও বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক অজ্ঞানরূপ মূল শক্তি হইতে প্রকাশিত আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয় যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন নিশুম্ভ শেষবারের মত তাহার সমস্ত অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়া সেই মূল-অজ্ঞান-শক্তিকেই ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। মন্ত্রে ইহাই শক্তিঅস্ত্র প্রয়োগরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মা চক্র অস্ত্রপ্রয়োগে তাহাও ব্যর্থ করিয়া দিলেন। চক্র শব্দের অর্থ সুদর্শন চক্র অর্থাৎ জগৎ চক্র। পূর্ব্বে এই চক্ররহস্য বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সে যাহা হউক, মমতা যখনই আমার আত্মা বলিয়া আত্মাকে পরিগ্রহ করিতে অগ্রসর হয় তখনই মা আমার এই জগৎচক্র সম্মুখে ধরিয়া উহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দেন। তাৎপর্য্য এই যে, সাধক যখন অজ্ঞানবশতঃ "আমার" বলিয়া আত্মাকে ধরিতে চেষ্টা করে, তখনও ঠিক আত্মাকে ধরা যায় না। আত্মার বিভূতিসমূহ অর্থাৎ ঈশ্বরভাবীয় সংস্কার সমূহ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং উহাদের উপরই মমত্ব জন্মে। কিন্তু অনাত্মভাবসমূহের প্রতি যে মমত্ব, তাহা ইতিপূর্ব্বে সম্যক্ বিলুপ্ত হইয়াছে, পরবৈরাগ্যের প্রভাবে জীবভাবীয় এবং ঈশ্বরভাবীয় যাবতীয় বিভূতিই যে ত্যাগ বা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হইয়াছে। মমতা একমাত্র আত্মাকেই চায়, অন্য কোন প্রলোভনই আর তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না; তাই মা যতই জগৎচক্র বা আত্মবিভূতির প্রলোভন দেখাইয়া মমত্বের অগ্রগতিকে নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন মমত্ব ততই উল্লাসে তীব্র উৎসাহে আত্মাভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। যদিও মমত্বের এই প্রয়াস অর্থাৎ আত্মাকে আত্মীয় করিবার প্রযত্ন প্রায় নিষ্ফলই হইয়া যায়, তথাপি এইরূপ চেষ্টারও একটা বিশেষ উপকার আছে। সাধক মূল অজ্ঞানশক্তি প্রভাবে যতবার আত্মাকে আত্মীয় করিতে চেষ্টা

করে, ততবারই একটু একটু করিয়া মমত্ববোধ ক্ষীণ হইতে থাকে; সুতরাং মন্ত্রে যে মায়ের চক্র অস্ত্র প্রয়োগে নিশুম্ভের শক্তিহীনতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা সাধক মাত্রেরই সূক্ষ্ম অনুভবযোগ্য বিষয়। উন্নত-স্তরের অনুভূতি সম্পন্ন সাধকগণ স্বকীয় অনুভব বিশ্লেষণ করিলেই এই রহস্যের সন্ধান পাইবেন।

কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ।
আয়ান্তং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥ ১২ ॥
আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি।
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা ॥ ১৩ ॥
ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। অনন্তর নিশুম্ভদানব কোপপ্রজ্বলিত হইয়া শূল গ্রহণ করিল। দেবীও সেই শূল আসিতে আসিতেই মুষ্টিপাতের দ্বারা চূর্ণ করিয়া দিলেন। নিশুম্ভ তখন গদা ঘূর্ণিত করিয়া চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবীর ত্রিশূলাঘাতে সেই গদাও বিদীর্ণ এবং ভস্মীভূত হইল। অনন্তর পরশুহস্তে সমাগত সেই দৈত্যপুঙ্গবকে দেবী বাণ-সমূহের দ্বারা আহত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।

ব্যাখ্যা। এই তিনটী মন্ত্রেও নিশুম্ভ এবং চণ্ডিকা দেবীর পরস্পর অস্ত্রপ্রয়োগ বর্ণিত হইয়াছে। নিশুম্ভ শূলাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, দেবী মুষ্টিপাতে তাহা চূর্ণ করিলেন। নিশুম্ভ গদা নিক্ষেপ করিলে, দেবী ত্রিশূলাঘাতে তাহাও ব্যর্থ করিলেন। নিশুম্ভ পরশুর আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, দেবী বাণ-প্রয়োগে তাহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। শূল—স্বরূপবিষয়কজ্ঞান, গদা—ব্যক্তবাক্য প্রয়োগ স্তোত্রাদিপাঠ মহত্ত্বকীর্ত্তন প্রভৃতি, পরশু—দ্বৈতপ্রতীতি। এই সকল অস্ত্র শস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। স্থূল কথা এই যে, মমতা বারংবার নানাবিধ উপায়ে

নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া আত্মাকে আত্মীয় করিতে চেষ্টা করে। "আমি থাকি, আর আমার বলিতে একমাত্র তুমিই থাক" এই যে ভাব, ইহাই নিশুম্ভের নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাধক-জীবনে যদি কাহারও এইভাবটী সত্য সত্যই উপনীত হয়, তবে তিনি যে ধন্য ইহা মুক্ত কণ্ঠেই বলা যায়। প্রেমভক্তি অনুশীলনের ইহাই যে চরম অবস্থা, এ কথা সত্য, কিন্তু এখানে থাকিলেও চলিবেনা, আরও অগ্রসর হইতে হইবে; তাই নিশুম্ভ যতই চেষ্টা করুক, যতই প্রেমভক্তির অনুশীলন করিয়া আত্মরস আস্বাদন করিতে চেষ্টা করুক, স্বকীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে যতই প্রয়াস পাউক, মা তাহা ব্যর্থ করিয়া দিবেনই; তাই দেখিতে পাই চণ্ডিকা দেবীও নানা অস্ত্রপ্রয়োগে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অদ্বয় জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে, মমতার সেই বিশিষ্টতা বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। তাহারই ফলে অর্থাৎ আত্মার স্বপ্রকাশত্ব-শক্তিপ্রভাবে মমতার বিশিষ্ট প্রকাশ ক্রমে ক্ষীণবল হইয়া মূর্চ্ছিত হয়—দ্বৈতপ্রতীতি কিছুক্ষণের জন্য বিলয় প্রাপ্ত হয়। মমতার যে একটা পৃথক্ সত্তা আছে, তাহা অনুভব করিতে না পারিয়াই সে মূর্চ্ছিত হয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রেও প্রেমধর্ম্ম অনুশীলনের পরিণামে এইরূপ মূর্চ্ছার কথা বর্ণিত আছে। ভক্তিশাস্ত্র-বর্ণিত অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের শেষ ভাব—এই মূর্চ্ছা। যখন "আমার আমার" বলিয়া আত্মাকে ধরিতে গিয়া 'আমার' বোধটী বিলুপ্ত হইয়া যায়, কেবল আত্মস্বরূপটী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখনই যথার্থ প্রেমের উদয় হয়। সাধক, এখানে মূর্চ্ছা শব্দে চৈতন্যের বিলোপ বুঝিও না। স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপের সমীপস্থ হইলে জীব কখনও চৈতন্যহীন হইতে পারে না। যদি দেখিতে পাও—কেহ ভগবানের নাম স্মরণ বা কীর্ত্তন করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে, তবে বুঝিও—সে এখনও চৈতন্যবস্তুর স্বরূপ বুঝিতেই পারে নাই, তাঁহার নিকটস্থ হওয়া ত দূরের কথা। যাহারা চৈতন্যময়কে স্মরণ করিতে গিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তাহারা মনোময় ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া একটুও উপরে উঠিতে পারে নাই, ইহাই স্থির বুঝিয়া লইও।

তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে।
ভ্রাতর্য্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্ ॥ ১৫॥

অনুবাদ। ভীমবিক্রম ভ্রাতা নিশুম্ভ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইলে শুম্ভ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকাকে হত্যা করিতে গমন করিল।

ব্যাখ্যা। নিশুম্ভ ভীমবিক্রমই বটে। সাধক, এই মমত্বই একদিন স্থূলে—সংসারে, কামিনী-কাঞ্চনে আকৃষ্ট ছিল। কত চেষ্টা, কত কঠোর প্রযত্নে এবং কত দীর্ঘকালে উহাকে সে আকর্ষণ হইতে ছাড়াইয়া ধর্ম্মের ভিতর আনিয়াছিলে; তখন এই মমতা ধর্ম্মকেই আমার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তারপর বহুদিনে—বহুজন্মের পর মায়ের কৃপায়, শ্রীগুরুর অহৈতুক অনুপ্রেরণায় সেই ধর্ম্ম-সংস্কার ছাড়াইয়া মমতাকে যথার্থ সাধনারাজ্যে উপস্থিত করিলে, সে তখন সাধনাকেই আমার বলিয়া বুঝিয়া লইল। তারপর বহু সুকৃতির ফলে এতদিনে সে আত্মস্বরূপের সন্ধান পাইয়া আত্মাকে আমার বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে। দেখ সাধক, এই মমতা কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছে; সমস্ত প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া কারণতত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; কত নিম্ন অবস্থা হইতে কত উচ্চ অবস্থায় আসিয়াছে; তথাপি মমতার যে স্বভাব, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। মমতা এখন আত্মা ব্যতীত আর কিছুই চায় না, জগৎ সংসার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আত্মলাভে প্রয়াসী হইয়াছে। কিন্তু ইহাও ভেদজ্ঞানমাত্র; তাই মা আমার উহাকেও নিধন করিবেন। সাধক! একটা কথা এখানে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই রুদ্রগ্রন্থির স্তরে প্রবেশের পর যে সকল স্থলে ভেদজ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহাতে স্বগতভেদ মাত্রই লক্ষিত হইয়াছে, সজাতীয় কিংবা বিজাতীয় ভেদের কোন কথাই এ স্তরে হইতে পারেনা। সে যাহা হউক, এখন নিশুম্ভ মায়ের অদ্বয়স্বরূপ-প্রকাশে কিছুকালের জন্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; অর্থাৎ মমত্বের আর বিকাশভাব রহিল না। তাই শুম্ভ—

অস্মিতা নিজেই অতি সত্বর অম্বিকাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। আত্মাকে হনন করিতে পারিলেই অস্মিতা ও মমতা, উভয় ভ্রাতাই নিরুপদ্রবে অবস্থান করিতে পারে। কিন্তু হায়! সে যে অসম্ভব।

স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ॥ ১৬॥

অনুবাদ। সেই শুম্ভাসুর রথে আরোহণ করিয়া অতুলনীয় অষ্টসংখ্যক হস্তদ্বারা নানারূপ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল।

ব্যাখ্যা। শুম্ভ রথস্থ। রথ—দেহ। দেহ ত্রিবিধ—স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ। শুম্ভের রথ বলিতে এখানে কারণ-দেহই বুঝিতে হইবে, যে হেতু, স্থূল বা সূক্ষ্মদেহে যে আত্মাভিমান, তাহা অনেক পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে! অষ্টভুজ—অষ্ট সাত্ত্বিকভাব। আকাশমণ্ডল—বিজ্ঞানময় ব্যাপক আকাশ। অস্মিতা কারণ-দেহের আশ্রয়ে অষ্ট সাত্ত্বিক-ভাবসমন্বিত হইয়া বিজ্ঞানময় আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। প্রেম ভক্তির অনুশীলন জন্য পুলক অশ্রু কম্প প্রভৃতি অষ্টবিধ সাত্ত্বিক লক্ষণের প্রকাশ হইয়া থাকে। মনে রাখিও সাধক! ইহা স্থূলে নয় অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে। সে যাহা হউক, "ব্যাপ্যাশেষং বভৌনভঃ" ইহাই শুম্ভের অর্থাৎ অস্মিতার যথার্থ স্বরূপ। অস্মিতাক্ষেত্রে উপনীত হইলে সাধকের ঠিক এই অবস্থাটী উপস্থিত হয়—অতি স্বচ্ছ চৈতন্যময় সর্ব্বব্যাপক আকাশ আমিত্বময় হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহবিষয়ক প্রতীতিই থাকে না। অতুলনীয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সে আমিত্ব বোধটা যেন একেবারেই ডুবিয়া যাইতে চায়; তাই সাত্ত্বিক লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেই আত্মার—অম্বিকার মায়ের আমার পরমরূপ দূর হইতে প্রত্যক্ষ হইতে থাকে; সর্ব্বভাবের সহিত অন্বিত আমি কখনও এই অম্বিকার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে

পারে না। সর্ব্বভাব হইতে একান্ত বিবিক্ত না হইলে—উলঙ্গ আমি না হইলে, ভাবাতীতা দিগম্বরী মায়ের অঙ্কে আরোহণ করা যায় না। কিন্তু সে অন্যকথা—

তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীব দুঃসহম্ ॥১৭॥
পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্ত দৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥১৮॥

অনুবাদ। তাহাকে (শুম্ভকে) আসিতে দেখিয়া দেবী শঙ্খধ্বনি ও ধনুর অতীব দুঃসহ জ্যাধ্বনি করিলেন। এবং সমস্ত দৈত্য-সৈন্যের তেজোনাশক স্বকীয় অসাধারণ ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বতোব্যাপী অস্মিতাকে দেখিতে পাইয়া দেবী চাণ্ডকা শঙ্খ, ঘণ্টা এবং জ্যাধ্বনি করিলেন। শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি—অনাহত-নাদ। ধনুর জ্যাধ্বনি—প্রণব-নাদ। নাদ এখানে বৈখরী নহে, মধ্যমা পশ্যন্তী প্রভৃতি সূক্ষ্ম নাদের কথাই এখানে বলা হইতেছে। যতক্ষণ দ্বৈত প্রতীতি আছে, ততক্ষণ নাদ থাকিবেই। তবে প্রভেদ মাত্র স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব নিয়া। সে যাহা হউক, দৈত্য-সৈন্যগণের তেজোবীর্য্য বিনাশ করিতে এই সূক্ষ্ম নাদত্রয় বিশেষ অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকে। যখনই আসুরিক ভাবের দ্বারা উৎপীড়িত হইতে হয়, তখনই অনাহত-নাদে অভিনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক একতানে প্রণবাদি মন্ত্র জপ করিতে থাকিলে, সে অত্যাচার প্রশমিত হয়। দেবীমাহাত্ম্যের প্রথম হইতেই এই কথা বলা হইতেছে। স্থূল অসুর—কাম ক্রোধাদি বৃত্তি, কিংবা সূক্ষ্ম অসুর—অস্মিতা প্রভৃতি, সকলই অনাহত-নাদ সমন্বিত প্রণবধ্বনিতে অভিভূত হইয়া পড়ে—উহাদের তেজোবীর্য্য হ্রাস পায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মা স্বয়ংই যুদ্ধ করেন, এই সকল মন্ত্রেও তাহাই স্পষ্টভাবে

উল্লিখিত হইয়াছে। ধ্যানাদি করিতে আরম্ভ করিলে কিংবা আসুরিক বৃত্তি নিচয়ের দমন করিতে চেষ্টা করিলে শরণাগত সাধকগণ নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন—অন্তর হইতে মা-ই সময়ানুরূপ সাধনা করিতে থাকেন, অর্থাৎ উপায় সকল যেন আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে, মনে রাখিও সাধক! উহাই দেবীর প্রতীকার বা মাতৃ সমর।

ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ।
পূরয়ামাস গগনং গাস্তথোপদিশো দশ ॥১৯॥
ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ।
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ ॥২০॥

অনুবাদ। অনন্তর সিংহ হস্তীর মহামদনাশক ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহাতে আকাশ, পৃথিবী এবং দশদিক্ পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর কালী আকাশে উৎপতিত হইয়া করদ্বয়দ্বারা পৃথিবীকে বিতাড়িত করিলেন; সেই তাড়ন-ধ্বনিতে পূর্ব্বোত্থিত শব্দসকল তিরোহিত হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা। অনাহত-নাদ এবং প্রণবধ্বনির সহিত সিংহনাদ বা জীবের স্বকীয় উল্লাসসূচক জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া ধরণী ও গগন মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে ব্যোমতত্ত্ব পর্য্যন্ত সকল তত্ত্বই বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। এখানে স্থূল ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের কথা বলা হয় নাই। অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহরূপ ক্ষিতি প্রভৃতির অতি সূক্ষ্মতম অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে ধরণী ও গগনমণ্ডল কথাটী বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে সিংহনাদ শব্দটীর একটী বিশেষণ আছে—"ত্যাজিতেভমহামদৈঃ।" হস্তীর মহামদনাশক। ইভ—হস্তী অর্থাৎ মন। তাহার যে মহামদ—মত্ততা অর্থাৎ চঞ্চলতা, তাহা জীব-সিংহের ভীষণ নিনাদে 'ত্যাজিত' অর্থাৎ বিদূরিত হইয়া গেল।

সাধক, যখন দেখিতে পাইবে—সূক্ষ্মতম অনাহত-নাদের সহিত

পরম সূক্ষ্ম প্রণবধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তখন তুমিও মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া মনোরূপ মত্ত হস্তীর দুর্দ্দমনীয় চঞ্চলতাকে বিশীর্ণ করিয়া দিও। তোমার আশা পূর্ণ হইবে। সে যাহা হউক, যখন এইরূপ বিভিন্ননাদ-সমন্বয় ধরণী এবং গগনমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করিয়াছিল, তখন কালী—সংহারিণী শক্তি, স্বকীয় করদ্বয়দ্বারা ক্ষিতিতল সন্তাড়িত করিলেন। অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্বীয় বোধকে বিলয় করিয়া দিলেন—বোধের যে ক্ষিতিতত্ত্বাত্মক বিকাশ বা স্ফুরণ, তাহাকে প্রহত করিলেন। সেই তাড়নধ্বনিতে পূর্ব্বকথিত সমুদয় ধ্বনি তিরস্কৃত হইয়াছিল। কারণ, ক্ষিতিতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় ভাব বা ধ্বনির বিকাশ হয়; যখন সেই ক্ষিতিতত্ত্ব কালীর করপ্রহারে স্বয়ং বিশীর্ণ হয়, তখন তদাশ্রিত বিশেষ বিশেষ ভাব বা ধ্বনিসমূহ আপনা হইতেই নিরস্ত হইয়া যায়। তাই মন্ত্রে "প্রাক্‌স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ" এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক! এখানে ক্ষিতিতত্ত্ব শব্দে অস্মিতার স্থূল বোধাত্মক স্ফুরণমাত্র বুঝিও; তাহা হইলেই এই সকল কথা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

অট্টট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ ॥২১॥

অনুবাদ। শিবদূতী অমঙ্গলজনক অট্টহাস্য করিলেন। সেই শব্দে অসুরগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল, এবং শুম্ভ অতিশয় কোপান্বিত হইল।

ব্যাখ্যা। শিবদূতী—যিনি ইতিপূর্ব্বে ঈশানকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়া শুম্ভকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই চণ্ডিকাদেবী অসুরপক্ষের অমঙ্গলজনক অট্টহাস্য করিলেন। সেই ভীষণ হাস্যধ্বনিতে অসুরগণ বিত্রস্ত এবং শুম্ভ কোপান্বিত হইয়াছিল। হাস্য—আনন্দময় আত্মরূপের বিকাশ। বিদ্যুদ্‌রেখাবৎ—চকিতের ন্যায় সেই বাক্যমনের অগোচর পরমাত্মসত্তার ক্ষণিক বিকাশই

শিবদূতীর হাস্য। এই হাস্যই অসুরগণের পক্ষে অশিব অর্থাৎ বড়ই অমঙ্গলজনক, যেহেতু ঐ হাস্যই অসুর ভাবসমূহকে বিলয় করিয়া দেয়। পরমাত্মার এইরূপ ক্ষণিক বিকাশেই উহারা একান্ত সন্ত্রস্ত ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়ে; কারণ, ক্ষণকালের জন্য আপনাদের বিশিষ্ট সত্তা হারাইয়া ফেলে। সে কি ভীতিদায়ক অবস্থা! অসুরগণ যখন এইরূপ স্বকীয় সত্তা হারাইতে বসে, তখন প্রাণপণে আপনাদের বিশিষ্ট সত্তাটী ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করে।

সাধক! এমন করিয়া এক একবার মায়ের হাসি প্রকাশ পাইলেই, জীবের পৃথক্ সত্তাবিষয়ক প্রতীতি বিলুপ্ত হইতে থাকে, এবং আসুরিক-ভাবসমূহ সন্ত্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে সমুদয় আসুরিকভাবের কেন্দ্রস্বরূপ শুম্ভের অর্থাৎ অস্মিতার ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়া উঠে; যে আত্মপ্রকাশ তাহার বিশিষ্ট সত্তাকে বিনাশ করিতে উদ্যত, তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য সে তখন বদ্ধপরিকর হয়।

দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥২২॥

অনুবাদ। "হে দুরাত্মন্! তিষ্ঠ তিষ্ঠ"; অম্বিকা যখন শুম্ভকে এই কথা বলিতেছিলেন, তখন আকাশস্থিত দেবতাবর্গ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ব্যাখ্যা। মা শুম্ভকে "দুরাত্মন্" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অস্মিতা আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র হইয়াও আত্মস্বরূপে পরিচিত হইতে চায়, ইহাই অস্মিতার দুষ্টভাব; তাই মা ইহাকে 'দুরাত্মা' বলিলেন। "তিষ্ঠ তিষ্ঠ"—থাক থাক, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, শীঘ্রই তুমি বিলয় প্রাপ্ত হইবে—মায়ের বাক্য হইতে এই ভাবটীই প্রকাশ পাইতেছে। মা যখন এইরূপ অচিরকাল মধ্যে শুম্ভের বিনাশ সূচনা করিলেন, তখন বিজ্ঞানময় আকাশমণ্ডলে অবস্থিত বিশিষ্ট চৈতন্যবর্গরূপী

দেবতাবৃন্দ মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অচিরেই তাঁহারা অসুরের অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হইবেন, আর তাঁহাদের অস্মিতারূপ দুর্জ্জয় অসুরের অধীনে থাকিতে হইবে না। অমৃতময় আত্মসত্তা সম্ভোগের শুভদিন আগতপ্রায়; এই উল্লাসেই দেবতাগণের জয়ধ্বনি।

সাধক! সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইতে এইরূপ শুভলক্ষণ সমূহ দেখিতে পাইলেই বুঝিও—তোমার আশা পূর্ণ হইতে বিলম্ব নাই। দেবতাগণ যতদিন আত্মাভিমুখী না হন, তোমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ যতদিন মহোল্লাসে অমৃত-সম্ভোগের অভিলাষী না হন, ততদিন আত্ম-লাভের আশা বিড়ম্বনামাত্র। যখন দেখিতে পাইবে—ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বুদ্ধি একস্বরে সম্মিলিত হইয়া মহোল্লাসে আত্মাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তখনই বুঝিও তোমার মাতৃলাভ অবশ্যম্ভাবী। শুধু মা মা বলিয়া কাঁদিতে থাক, আর বল—"কাছে এসে হাতে ধ'রে, নিয়ে যাও মা কোলে ক'রে। আমি দুবাহু তুলে মা মা বলে, ঘরের ছেলে যাই মা ঘরে।" সরলপ্রাণে এমন করিয়া বলিতে পারিলেই মা আসিবেন, দেবতাবর্গ তোমার সহায় হইবেন। তোমার আমিত্বের বিলয় হইবে—মাতৃবক্ষে চিরতরে মিলাইয়া যাইবে।

শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্ম্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া ॥২৩॥
সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্।
নির্ঘাতনিঃস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ॥২৪॥

অনুবাদ। শুম্ভ দেবীর নিকটে আগমনপূর্ব্বক অতি ভীষণ অগ্নিশিখা-বিশিষ্ট শক্তিঅস্ত্র প্রয়োগ করিল। বহ্নিরাশির ন্যায় সেই অস্ত্র আসিতে আসিতেই দেবীর মহোল্কাকর্ত্তৃক নিরস্ত হইল। শুম্ভ তখন সিংহনাদে ত্রিলোক পরিপূর্ণ করিল; কিন্তু হে অবনীপতে! দেবীর ভীষণ বজ্রধ্বনি তাহার সে ধ্বনিকে অভিভূত করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। এই দুইটী মন্ত্রে শুম্ভের ভাগ্যবিপর্য্যয় বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার শক্তি-অস্ত্র এবং ভীষণ সিংহনাদ উভয়ই ব্যর্থ হইয়াছিল। অস্মিতা স্বকীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া আত্মাকে সর্ব্বভাবের মধ্যে আনিয়া বিশেষভাবে ভোগ করিতে চায়, ইহাই শুম্ভের শক্তি-অস্ত্র প্রয়োগের রহস্য। এই শক্তি ভীষণ বহ্নিরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হয়; কারণ, যখন এই অস্মিতার প্রকাশ হয়, তখন সর্ব্বব্যাপী একটা আমিত্বময় ঘনসত্তা আত্মস্বরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু আত্মার স্বপ্রকাশ-ভাবটী তদপেক্ষাও ঘন এবং সমুজ্জ্বল, তাই ক্ষণকালের জন্য সেই আত্ম-স্বরূপের আভাস অস্মিতার উপরে নিপতিত হইয়া উহাকে নিরস্ত করিয়া দেয়। ইহাই মায়ের মহোল্কা প্রয়োগের রহস্য। যখনই অস্মিতা স্বকীয় বিশিষ্ট সত্তাকে তীব্র অধ্যবসায়ের সহিত ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তখনই আত্মার স্বপ্রকাশস্বরূপটী ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হয়; সুতরাং তাহার সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া যায়।

শক্তিঅস্ত্র ব্যর্থ হইতে দেখিয়া শুম্ভ ভীষণ সিংহনাদ করিয়াছিল। মায়ের বজ্রধ্বনিতে তাহাও ব্যর্থ হইয়া গেল। যথার্থই শুম্ভের আমিত্ব-ধ্বনির দ্বারা ত্রিলোক পরিপূর্ণ হয়। অস্মিতা দেখিতে পায়—"আমিছাড়া আর কোথাও কিছুই নাই, সর্ব্বভাবে আমিই আছি।" ইহাই ত শুম্ভের সিংহনাদ। কিন্তু হে অবনীপতে সুরথ! এবার প্রকৃতি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, নির্ঘাতনিঃস্বন উত্থিত হইয়াছে। অন্তরীক্ষে বজ্রধ্বনিবৎ আকস্মিক ভীষণ নিঃস্বন উত্থিত হইয়া, শুম্ভের সে সিংহনাদকে নির্জ্জিত করিয়া দিয়াছিল। এই আকস্মিক বজ্রধ্বনি আর কিছুই নহে, বিদ্যুদ্-বিকাশবৎ ক্ষণস্থায়ী আত্মবিকাশ মাত্র। আত্মার বিকাশেই অস্মিতা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, নিজের অস্তিত্বে সংশয় আসে, "আমি আছি" অর্থাৎ 'অস্তি' বলিয়া যে একটী প্রতীতি হইতেছে, এই অস্তিত্ব আমার না আত্মার; এইরূপ জ্ঞানের আভাস আসিতে থাকে। যে পরিমাণে এইরূপ জ্ঞান প্রকাশ হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই অস্মিতা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্ষণকালের জন্যও নিত্য-অস্তিত্বের

বিকাশ হইলে, প্রতিবিম্বস্বরূপের অস্তিত্ব ক্ষীণবল না হইয়া থাকিতে পারে না। যাঁহারা সাধক, তাঁহারা এই সকল কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিবেন।

শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্ দেবী শুম্ভস্তৎ প্রহিতাঞ্ছরান্।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২৫॥
ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্।
স তদাভিহতোভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ ॥২৬॥

অনুবাদ। দেবী শুম্ভনিক্ষিপ্ত শত সহস্র বাণসমূহকে এবং শুম্ভও দেবীকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণসমূহকে স্বকীয় অত্যুগ্র শরপ্রয়োগে ছিন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর চণ্ডিকা দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া শুম্ভকে শূলের দ্বারা আঘাত করিলেন, শুম্ভ আহত হইয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় ভূতলে নিপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। আত্মা এবং অস্মিতায় যুদ্ধ। বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের সমর। সাধক! লক্ষ্য কর—তোমার সর্ব্বভাবের সহিত অন্বিত ঐ যে আমিত্বটী উহা কিছুতেই আপনস্বরূপকে হারাইতে চায় না; নানাভাবে নানা আশ্রয়ে "আমিকে" রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়। ইহাই শুম্ভের শত সহস্র শরনিক্ষেপ। আবার দেবী চিতিশক্তিও মুহুর্ম্মুহু স্বকীয় স্বরূপ প্রকটিত করিয়া অস্মিতার সে বিশিষ্ট আশ্রয়গুলিকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন, ইহাই মায়ের সহিত শুম্ভের সমর-রহস্য।

অনন্তর চণ্ডিকা দেবীর শূলাঘাতে শুম্ভ মূর্চ্ছিত হইল। শূলাঘাত শব্দের তাৎপর্য্য জ্ঞানময় সত্তার বিকাশ, ইহা পূর্ব্বেও অনেকবার বলা হইয়াছে। "আমি" যে 'জ্ঞ'স্বরূপ বস্তু, ইহাতে জ্ঞাতা জ্ঞেয়াদি বিশিষ্ট কোন ভাব নাই, এইরূপ উপলব্ধিকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে শূলাঘাত শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে এইরূপ অনুভব প্রকাশ পায়, সেই মুহূর্ত্তেই অস্মিতা মূর্চ্ছিত বা অদৃশ্য হয়।

ক্ষণকালের জন্য অস্মিতার বিভুত্ব ব্যাপকত্বাদি ধর্ম্ম তিরস্কৃত থাকে—এমনই মায়ের আমার আত্মবিকাশ। তাঁহার বিকাশে সর্ব্বভাব বিলয় প্রাপ্ত হয়, কিছুই থাকে না, কি যে থাকে, তাহাও ভাষায় ঠিক ঠিক বলা যায় না, সে যে 'আমি'বর্জ্জিত আমি! অথবা আমিরই যথার্থ স্বরূপ! সেই যে যথার্থ আমি, সেই ত "সোঽহং," সেই যে আত্মা; সেখানে চন্দ্র সূর্য্যের বিকাশ নাই, সেখানে গ্রহ নক্ষত্রাদির বিকাশ নাই, সেখানে বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় না অগ্নিও সেখানে প্রকাশহীন, এমনই 'জ্ঞ'স্বরূপ, কেবলানন্দস্বরূপ সেই আত্মা—আমি। ইঁহার চকিতবৎ বিকাশ হইলেই অস্মিতা কিছুক্ষণের জন্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

ততো নিশুম্ভঃ সম্প্রাপ্য চেতনামাত্তকার্ম্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দ্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥২৭॥
পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনাময়ুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্ ॥২৮॥

অনুবাদ। অতঃপর নিশুম্ভ চেতনা লাভ করিয়া ধনুর্ধারণপূর্ব্বক শরসমূহের দ্বারা কালীকে এবং কেশরীকে আহত করিতে লাগিল। পুনরায় দনুজাধিপতি দিতি-তনয় নিশুম্ভ অযুতবাহু প্রসারিত করিয়া চক্রায়ুধদ্বারা চণ্ডিকাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। নিশুম্ভ এতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিল। মায়ের শূলাঘাতে শুম্ভ মূর্চ্ছিত হওয়ার পর নিশুম্ভের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল; সে ধনুর্ধারণ-পূর্ব্বক কালী এবং কেশরীকে লক্ষ্য করিয়া শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। অস্মিতা ও মমতা ঠিক এইরূপভাবেই সাধককে উৎপীড়িত করিতে থাকে। একটি নির্জ্জিত হইলেই অপরটীর প্রভাব বিস্তৃত হয়। "আমার আত্মা" বলিয়া আত্মাভিমুখে অগ্রসর হওয়াই মমতার শর প্রয়োগের রহস্য। নিশুম্ভের বিশেষ ক্রোধ সংহারশক্তির উপর এবং

দেবীর বাহন সিংহের উপর। কারণ ঐ সংহার-শক্তির জন্যই ত কোথাও কিছুই নাই; ঐ কালীই ত "আমার" বলিয়া ধরিয়া রাখিবার মত কোথাও কিছুই রাখেন নাই, সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াছেন। আর কেশরীও একান্তভাবে জীবভাব হননেচ্ছু; সুতরাং এই উভয়ের প্রতি নিশুম্ভের শরপ্রয়োগরূপ আক্রমণ চলিতে লাগিল।

এই মন্ত্রে নিশুম্ভকে দনুজাধিপতি এবং দিতিজ বলা হইয়াছে। দনু এবং দিতি একেরই বিভিন্ন নাম—ইনি কশ্যপ-পত্নী। খণ্ডনার্থক "দো" ধাতু হইতে দনু এবং দিতি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে শক্তি অখণ্ড বোধকে খণ্ডিত করে, অর্থাৎ ভেদজ্ঞানকে ধরিয়া রাখে, তাহাই দিতি বা দনু। কশ্যপ শব্দের অর্থ পশ্যক অর্থাৎ দ্রষ্টা। ব্যাকরণ-বিধি অনুসারে অক্ষর-বিপর্য্যয় হইয়া পশ্যক শব্দটী কশ্যপরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা নহে, বৈদিক নিরুক্তকার স্বয়ংই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কশ্যপের দুই পত্নী—দিতি এবং অদিতি। সর্ব্বভাবপ্রকাশক ব্রহ্মের দ্বিবিধ শক্তি; এক বহির্ম্মুখী, অপর অন্তর্ম্মুখী। দনু বা দিতির সন্তানদিগকে দানব বা দৈত্য এবং অদিতির সন্তানদিগকে আদিত্য বা দেবতা বলা হয়। এক-দল বহির্ম্মুখ, অন্যদল অন্তর্ম্মুখ। একদল আত্মভাবকে খণ্ডিত করে, অপরদল আত্মসত্তায় যুক্ত থাকে।

সে যাহা হউক, "আমার" এই জ্ঞানটীই ভেদজ্ঞানের সর্ব্বপ্রথম বীজ। বাস্তবিক আমি ব্যতীত কোথাও কিছু নাই, ইহাই সত্যজ্ঞান। কিন্তু যে কোন কারণে ঐ অখণ্ড আমির উপর যখন একটী "আমার" বোধ ফুটিয়া উঠে, তখনই আমি ছাড়া আর একটা কিছু দ্বিতীয় বস্তুর ভাণ হইতে থাকে। অর্থাৎ অনাত্মবস্তুর সত্তা-বিষয়ক প্রতীতি হইতে থাকে; ইহাই যাবতীয় অসুরভাবের স্বরূপ। তাই অসুরদিগকে দিতিজ বা দনুজ বলা হয়। মমতা যাবতীয় ভেদজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াই নিশুম্ভকে এস্থানে দনুজেশ্বর বলা হইয়াছে।

নিশুম্ভ অযুত অর্থাৎ দশ সহস্র বাহু বিস্তারপূর্ব্বক চক্রায়ুধদ্বারা

চণ্ডিকাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কথাটা একটু ভাবিবার বিষয়। মমতার শেষ আক্রমণ—আত্মার প্রতি মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধ হইতেই আধুনিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমার প্রভু, আমার পিতা, আমার সখা, আমার বন্ধু, আমার পতি ইত্যাদি প্রকারে পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক যে সাধনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার পরিসমাপ্তি এইখানে—এই নিশুম্ভবধে। আমার বলিয়া আর কিছুই থাকে না, সব "আমি" হইয়া যায়। যতদিন "আমার" শব্দ বলিতে গেলে আত্মা ব্যতীত আরও কিছু থাকে, ততদিন ত সাধকের 'আমার' শব্দটী ঠিক ঠিক বলাই হয় না। যখন সর্ব্বভাব বিলয় প্রাপ্ত হয়, যখন সম্মুখে স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হয়, তখনই আত্মার প্রতি যথার্থ মমত্ববোধ ফুটিয়া উঠিতে পারে। তৎপূর্ব্বে যে মমত্ববোধের ভাব দেখা যায়, উহা প্রবর্ত্তক অবস্থামাত্র। এই যথার্থ মমত্ববোধই অযুত হস্তে চক্র অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া চণ্ডিকাকে আচ্ছন্ন করিতে উদ্যত হয়। দশ ইন্দ্রিয়পথে সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য ভাবের সাহায্যে আত্মাতে মমত্ব বোধ স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। ঐরূপ মমত্ব বোধের সাহায্যে আত্মাতে যে সকল ভাব অর্পিত হয়, তাহা আবার আপনা হইতেই মমত্ববোধে ফিরিয়া আসে, পুনরায় আত্মাভিমুখে প্রেরিত হয়, আবার মমত্ব প্রতীতির মধ্যেই ফিরিয়া আসে। এইরূপ চক্রাকার গতি লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে "চক্রায়ুধেন" কথাটী উক্ত হইয়াছে। ঠিক ঠিক ধ্যানাবস্থা আসিলেই এ কথাগুলির সত্যতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। আত্মার স্বরূপ দর্শন, আত্মার আহ্বান শ্রবণ, আত্মার সুগন্ধ গ্রহণ, আত্মরস আস্বাদন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ব্যাপারগুলিকে অবলম্বন করিয়াই—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" শব্দহীন স্পর্শহীন রূপহীন পরমাত্মার অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। এইরূপ অযুত বাহুবিস্তার করিয়াই ভাবাতীত স্বরূপকে আক্রমণ করিতে হয়। সাধক! এ সকলই কিন্তু বৈষ্ণবের ভাষায় অপ্রাকৃত ক্ষেত্রের কথা। যদিও অস্মিতা মমতা প্রভৃতি সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলিও প্রকৃতিরই অন্তর্গত, তথাপি ইহা এত বেশী চৈতন্যধর্ম্মী

যে ইহাকে অপ্রাকৃত বলায় কিছু ক্ষতি হয় না। এক্ষেত্রের দর্শন শ্রবণাদির ব্যাপারগুলি যে সাধারণ ইন্দ্রিয় ব্যাপার নহে, ইহা ধীমান্ সাধকের নিকট বলাই বাহুল্য মাত্র।

ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্ ॥২৯॥

অনুবাদ। দুর্গমে নিপতিত জনগণের কাতরতাহারিণী ভগবতী দুর্গা দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া নিশুম্ভনিক্ষিপ্ত চক্র এবং বাণসমূহকে স্বকীয় শরপ্রয়োগে ছিন্ন করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা। দুর্গত সন্তান দুর্গা বলিয়া, আর্ত্তিহরা মা বলিয়া ডাকিয়াছে; অসুর-অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া, সর্ব্বাশ্রয়া মাকে সরল প্রাণে দুর্গা বলিয়া ডাকিয়াছে; তাই ভগবতী ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মা আমার ক্রুদ্ধা চণ্ডিকামূর্ত্তিতে মমতার যাবতীয় অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন। মায়ের অস্ত্র—স্ব-শর, অর্থাৎ আত্মশর। আত্মস্বরূপ-প্রকাশরূপ শর নিক্ষেপ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মা আমার এক একবার চপলার ন্যায় যখন স্বয়ং উদ্ভাসিত হয়েন, তখনই অসুরের যাবতীয় অস্ত্রপ্রয়োগ ও উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়। কারণ আত্মার এমনই স্বরূপ যে তাঁহার উদয়ে আর কাহারও সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সর্ব্বসত্তার বিলয়কারী আত্মসত্তার বিকাশ হইলেই মমতাদি ভেদজ্ঞানাত্মক বৃত্তিপ্রবাহগুলি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়। যোগশাস্ত্রকার ইহাকে "প্রক্ষীণ ক্লেশাবস্থা" বলিয়াছেন। যাঁহারা চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া, এই অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশকে তনু অর্থাৎ ক্ষীণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উপায় স্বতন্ত্র। আমরা কিন্তু চিরপুরাতন একটী পথের সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারা গিয়াছে—যতই মায়ের আমার আত্মপ্রকাশ হইতে থাকে, ততই ক্লেশসমুহ প্রক্ষীণ হইয়া যায়। মায়ের এই আত্মপ্রকাশ আবার

শরণাগত ভাবের ভিতর দিয়াই অতি সহজে হইয়া থাকে। সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাই এইরূপ সাধনার একমাত্র ভিত্তি। কিন্তু এ সকল, এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক কথা।

ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ ॥ ৩০ ॥
তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে ॥৩১॥

অনুবাদ। অতঃপর নিশুম্ভ দৈত্যসেনা পরিবেষ্টিত হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক চণ্ডিকাকে হত্যা করিবার জন্য বেগে অভিধাবিত হইল। (গদাহস্তে) আপতিত নিশুম্ভের সেই গদাকে তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা চণ্ডিকা শীঘ্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নিশুম্ভ তখন শূলাস্ত্র গ্রহণ করিল।

ব্যাখ্যা। গদা শূল প্রভৃতির অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্থূল কথা—মমতা পুনঃ পুনঃ 'আমার' বলিয়া আত্মাকে পরিগ্রহ করিতে চায়, চণ্ডিকাও স্বকীয় স্বরূপ-প্রকাশরূপ তীক্ষ্ণধার খড়্গাঘাতে মমতার সে সকল উদ্যম বিনষ্ট করিয়া দেন। ভেদ-জ্ঞাননাশক বিশুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞানের প্রকাশকেই এস্থলে তীক্ষ্ণধার খড়্গ বলা যায়। পুরাণাদি শাস্ত্রে বিজ্ঞানই অসিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অতি অল্পকালের জন্যও "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইলে, যাবতীয় ভেদজ্ঞান তৎক্ষণাৎ নিরস্ত হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় নিপতিত হইয়া মমতা অগত্যা তাহার সর্ব্বশেষ অস্ত্র শূল গ্রহণ করে। যে জ্ঞান-সত্তায় মমতারূপ অজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, সেই জ্ঞানকেই এখানে ত্রিশূল বলা হইয়াছে। ত্রিপুটীজ্ঞানই এই ত্রিশূল। "আমার আত্মাকে আমি সাক্ষাৎ করিতেছি" এইরূপ ভাবটীর মধ্যে যে স্বগত-ভেদময় ত্রিপুটী জ্ঞান বিদ্যমান, উহাই নিশুম্ভের শূলাস্ত্র।

শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দ্দনম্ ।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা ॥৩২॥
ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ ।
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্ ॥৩৩॥

অনুবাদ। অমরবিজয়ী নিশুম্ভ শূলহস্তে আগমন করিতেছে দেখিয়া, চণ্ডিকা অতিবেগে স্বকীয় শূল নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। শূলাঘাতে তাহার (নিশুম্ভের) হৃদয়দেশ এইরূপ বিদীর্ণ হইলে, তথা হইতে অপর এক মহাবল ও মহা বীর্য্যসম্পন্ন পুরুষ "তিষ্ঠ" এই কথাটী বলিতে বলিতে নির্গত হইল।

ব্যাখ্যা। নিশুম্ভের শূল অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিপুটীজ্ঞান ব্যর্থ করিয়া, চণ্ডিকা মা আমার শূলাঘাতে—অদ্বয়াত্মস্বরূপ প্রকাশে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। ওগো, এমন করিয়া হৃদয় বিদ্ধ না করিলে, এমন করিয়া দ্বৈতজ্ঞানকে বিদীর্ণ না করিলে, এমন করিয়া অদ্বয়তত্ত্ব উদ্ভাসিত না করিলে, আমাদের যে আর কোন উপায়ই থাকে না। মা! আজ তুমি এই মুক্তিমন্দিরের দ্বারে আসিয়া যে অদ্বয় শূলাঘাতে ভেদজ্ঞানের হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, এই শূলাঘাত কবে কোন্ অতীতযুগে আরম্ভ হইয়াছে, কোন স্মরণাতীত কাল হইতে এ হৃদয় কত ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, তথাপি জাগে নাই। ওগো, আমি যখন 'আমার' বলিয়া বড় আদরে ধনৈশ্বর্য্যকে জড়াইয়া ধরিতাম, তখন বুঝি নাই যে, ঐ ধনৈশ্বর্য্যরূপেই তুমি—মা আমার। আমি ভেদজ্ঞানে জড়পদার্থ বলিয়া উহাকে ধরিতাম; আর তুমিও ঠিক এমনই করিয়া তীব্র যাতনাদায়ক অথচ জ্ঞানময় শূলের আঘাতে ঐগুলিকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া দিতে। আমি তখন "হা হতোঽস্মি" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতাম। তারপর যখন স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে আমার বলিয়া ধরিয়া রাখিতাম, তখনও বুঝি নাই—উহাও মা তুমি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; তাই তুমি সে গুলিকেও ঐরূপ শূলাঘাতে সরাইয়া দিয়া, আমার হৃদয়দেশ ক্ষতবিক্ষত

করিয়া দিতে। সেই অবসরে পরম প্রিয়তম আত্মা আমার, তুমি একটু একটু করিয়া এই বিশীর্ণ হৃদয়ের এক কোণে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিতে। এইরূপ একদিন নয়, কতদিন কত জন্ম ধরিয়া তোমার শূলাঘাত বক্ষ পাতিয়া লইয়াছি। কাঁদিয়াছি, অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়াছি, তথাপি আবার ভেদজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়াছি—তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি। আবার তুমি আমাকে জাগাইবার জন্য শূলাঘাত করিয়াছ। আবার বুক পাতিয়া সেই ক্ষতবিক্ষত বক্ষে তোমার শূলাঘাত সহ্য করিয়াছি। তোমার সেই কৃপাকঠোর মূর্ত্তি তখন দেখিয়াও দেখি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই। জড়ত্বের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া তোমার কৃপা উপেক্ষা করিয়া কতই না বহির্ম্মুখে ধাবিত হইয়াছি। তখন তোমার সেই শূলাঘাতগুলি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক ছিল। আজ কিন্তু তোমার এই শূলাঘাত একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়াই হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছি। আর বলিবার কিছু নাই মা; শুধু মা, শুধু মা বলিতেই আমাদের কণ্ঠ যেন এমনই করিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

সে যাহা হউক, এই মমত্ব প্রথমে জড় পদার্থের আশ্রয়ে প্রকাশ পায়; ক্রমে জড়াশ্রিত চৈতন্যে, পরে বিশুদ্ধ চৈতন্যে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপে মমত্ব যখন বিশুদ্ধ চৈতন্যাভিলাষী হয়, তখনই যথার্থ ভক্তি বা প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন হইতে থাকে। ক্রমে আত্মপ্রেম যত গভীরতা লাভ করে, ততই মমত্ববোধটী ঢাকিয়া যায়। যখন মাত্র বিশুদ্ধবোধরূপ আত্মসত্তা প্রকাশ পায়, তখনই এই মমতা নিহত হয়। চণ্ডিকার শূলাঘাতে নিশুম্ভের হৃদয়বিদারণের ইহাই সংক্ষিপ্ত রহস্য।

মন্ত্রে আর একটী কথা আছে—নিশুম্ভ নিহত হইলেও তাহার হৃদয়দেশ হইতে মহাবলসম্পন্ন আর একটী পুরুষ নির্গত হইয়াছিল। ঐ পুরুষটী অন্য কেহ নয় মমতাধিষ্ঠিত চৈতন্য। যে চৈতন্য-সত্তায় অধিষ্ঠিত হইয়া মমত্বরূপ একটা বিশিষ্টভাব প্রকাশ পায়, সেই বিশিষ্ট চৈতন্যই নিশুম্ভের হৃদয়নিঃসৃত পুরুষ। মমত্বরূপ বিশিষ্টভাবটী বিনষ্ট হইলেও তদধিষ্ঠিত চৈতন্যের বিলয় হয় না। বিশেষতঃ সে

নির্গত হইয়াই দেবীকে "তিষ্ঠ" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে থাকে। অভিপ্রায় এই যে—আমি যতক্ষণ রহিয়াছি, ততক্ষণ হে দেবি, তুমি যত নিশুম্ভই নিহত কর না কেন, আমি ইচ্ছা করিলে আবার এইরূপ সহস্র নিশুম্ভ সৃষ্টি করিতে পারি। সাধক! বীজ থাকিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে কতক্ষণ?

তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবত্ততঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ভুবি ॥৩৪॥

অনুবাদ। তখন দেবী অট্টহাস্য করিয়া খড়গদ্বারা সেই হৃদয়-নিষ্ক্রান্ত পুরুষের শিরশ্ছেদ করিলেন। সে ভূতলে নিপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। চণ্ডিকার খড়গাঘাতে—অদ্বয়জ্ঞানালোকসম্পাতে, মমতাধিষ্ঠিত চৈতন্যের শিরশ্ছেদ অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইল.। "আমি মমতাময়" এইরূপ অভিমান নাশের নামই নিশুম্ভের হৃদয়নিঃসৃত পুরুষের শিরশ্ছেদ। শুম্ভের যে নিশুম্ভবিষয়ক অভিমান, তাহা ঠিক এইরূপেই বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ শুম্ভ যে মনে ভাবে—"আমার নিশুম্ভ নামক ভ্রাতা আছে," সেই ভাবটী দূরীভূত হইল। আরে, মমতাও ত অস্মিতারই একপ্রকার বিশিষ্ট ভাবমাত্র! মায়ের স্বরূপপ্রকাশ বা অদ্বয় জ্ঞানের উদয়রূপ শাণিত খড়্গের আঘাতে এই বিশিষ্টতাও বিদূরিত হয়, মমতা চিরতরে বিলয় প্রাপ্ত হয়। এইবার শুম্ভ সম্যক্‌রূপেই নিঃসহায় হইয়া পড়িল। সাধক, পূর্ব্বে..বলিয়া আসিয়াছি—সম্পূর্ণরূপে একাকী হইতে না পারিলে, সেই পরম এক'কে ধরিতে পারা যায় না। দেখ, আজ এতদিন পরে শুম্ভ যথার্থ ই একাকী হইতে পারিয়াছে; সুতরাং এইবার অদ্বয়তত্ত্বে উপনীত হইতে আর বিলম্ব হইবেনা। মমতাই যাবতীয় ভেদজ্ঞানের অর্থাৎ নিরানন্দের মূল। এইবার সে মূল বিনষ্ট হইয়াছে; সুতরাং আনন্দময়স্বরূপে উপনীত হওয়া একান্তই সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয় সাধক,—এইবার উল্লাসে গাও দেখি—"আনন্দে

জগৎ ভরা, আনন্দময় হেরি ধরা, তাই মা দিয়েছে ধরা, কি আনন্দ দেয় গো ঢেলে। মা আমার আনন্দময়ী, আমি মায়ের আহ্লাদে ছেলে, আনন্দময় হেরি ভুবন নিরানন্দ দূরে ফেলে ॥"

ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্র দংষ্ট্রাক্ষুণ্ণশিরোধরান্ ।
অসুরাংস্তাংস্তদা কালী শিবদূতী তথাপরান্ ॥৩৫॥

অনুবাদ। অনন্তর সিংহ নিশুম্ভের সৈন্যগুলিকে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাদ্বারা গ্রীবাদেশ বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন শিবদূতীও সেইরূপ অপর অসুরগুলিকে ভক্ষণ করিলেন।

ব্যাখ্যা। দেবীর উত্তম বাহন জীবরূপী সিংহ মমতার অনুচরগুলিকে চর্ব্বণ করিতে লাগিল। দেবী শিবদূতীও অন্যান্য অসুরভাবসমূহকে গ্রাস করিতে লাগিলেন। মমতা বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তদাশ্রিত যাবতীয় সংস্কার যে এইরূপে অনায়াসেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি—ঈশ্বরভাবীয় সংস্কারসমূহই শুম্ভনিশুম্ভের সৈন্যদল। ঈশ্বরত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা—বিরাট ঐশ্বর্য্যভোগের বাসনা এতদিন মমতার অন্তর্নিহিত ছিল, এইবার বিশুদ্ধ অদ্বয়তত্ত্বের প্রকাশ হওয়ায়, বিশিষ্টভাবে ঈশ্বরত্বভোগের স্পৃহাও সম্যক্ বিলুপ্ত হইল। এই ঈশ্বরভাবীয় সংস্কার গুলিকে নষ্ট করিবার জন্য সাধক স্বয়ং এবং শিবদূতী ও ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অষ্টশক্তি, সকলেই একসঙ্গে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই অসুরসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তিমন্ত্রে অষ্টশক্তির অসুরনিধন বর্ণিত হইয়াছে।

কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ ॥৩৬॥
মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি ॥৩৭॥
খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্র-বিমুক্তেন তথাপরে ॥৩৮॥

অনুবাদ। কতকগুলি মহাসুর কৌমারী দেবীর শক্তি-অস্ত্রে বিদীর্ণ হইল। অপর কতকগুলি ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপূত জলের দ্বারা নিরাকৃত হইল। এইরূপ কতকগুলি মাহেশ্বরীর ত্রিশূলাঘাতে, কতকগুলি বারাহীর তুণ্ডাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। আবার বৈষ্ণবীশক্তি চক্রাস্ত্র প্রয়োগে দানবগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাণী শক্তিও স্বহস্তে বজ্রনিক্ষেপ করিয়া অপর অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। মমতা নিপতিত; তদাশ্রিত অসুরকুল মাতৃকাগণ কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত। যদিও মন্ত্রে কৌমারী ব্রহ্মাণী মাহেশ্বরী বারাহী বৈষ্ণবী ও ইন্দ্রাণী, এই ছয়টী শক্তির উল্লেখ আছে, তথাপি উপলক্ষণবশতঃ এস্থলে অষ্টশক্তিই বুঝিতে হইবে। ইঁহারাই ইতিপূর্ব্বে রক্তবীজবধের সময়ে ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি অষ্টপাশরূপী অষ্টবিধ অসুরকুলকে নিহত করিয়াছেন; আবার এখানেও ঈশ্বরত্বের যে অষ্ট ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ শ্রেষ্ঠ বিভূতি লাভের বাসনারূপ সূক্ষ্ম সংস্কাররূপী অসুর সমূহ, তাহাদিগকেও বিলয় করিলেন। যথার্থ আত্মজ্ঞানের পক্ষে ঈশ্বরত্বাভিমানও প্রবল অন্তরায়। ঈশ্বরত্বের প্রতি বৈরাগ্য না আসিলে মমতারূপী নিশুম্ভ নিহত হয় না। অনেক সাধক এইখানে আসিয়া অষ্ট-ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে—ঈশ্বরত্বের আকাঙ্ক্ষায় মুগ্ধ হইয়া পড়েন। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানকে সুষুপ্তিবৎ একটা মূঢ় অবস্থা মনে করিয়া উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। বহু সুকৃতির বলে, শ্রীগুরুর অহৈতুকী কৃপায়,

মায়ের অতুলনীয় স্নেহে সাধক এই ঐশ্বর্য্য-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পায়। যতক্ষণ মমতা থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বরত্বের প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। মায়ের বিশিষ্ট কৃপা না হইলে, মা ঐরূপ অষ্টশক্তি মূর্ত্তিতে প্রকটিত না হইলে, সাধকের অষ্ট ঐশ্বর্য্যের প্রতি প্রলোভন কিছুতেই বিদূরিত হইতে পারে না। জীবভাবের প্রতি বৈরাগ্য একান্ত দুর্লভ নহে, কারণ উহা অনাদিজন্ম হইতে ভোগ করা হইতেছে। যাহা বহুদিন যাবৎ উপভোগ করা যায়, তাহার প্রতি স্বতঃই একটা বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরত্ব অতি দুর্লভ। সমষ্টি-বুদ্ধিতে বা মহত্তত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইতে না পারিলে, ঈশ্বরত্বের স্বরূপও উপলব্ধি হয় না। সাধক যখন তীব্র আগ্রহে কেবল পরমাত্মসত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হয়, তখন পথিমধ্যে এই অপূর্ব্ব ঈশ্বরত্ব ভোগের সুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এমন সাধক জগতে খুব কমই আছেন, যাঁহারা এই ঈশ্বরত্বকেও তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন। একমাত্র মহাশক্তিরূপিণী মা যাঁহাদের হৃদয়ে অমিতবল এবং পরবৈরাগ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এই দুর্দ্দমনীয় প্রলোভনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। সাধনসমরের সাধকগণ প্রথম হইতেই মাতৃচরণে শরণাগত সন্তান; তাহারা জীবত্ব জানে না, ঈশ্বরত্ব জানে না, তাহারা বন্ধন জানে না, মুক্তি জানে না, তাহারা জ্ঞান জানে না, ভক্তি জানে না, জানে শুধু "মা"। তাহারা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে মাতৃ-অঙ্কস্থ নগ্ন শিশু। তাই মা আমার বিশিষ্টভাবে প্রকটিত হইয়া—আপনাকে অষ্টশক্তি মূর্ত্তিতে বিভক্ত করিয়া, তাহাদের অষ্ট ঐশ্বর্য্যের প্রতি প্রলোভনকে সম্যক্ দূরীভূত করিয়া দেন; সুতরাং তাহারা ঈশ্বরত্ব-সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া জগৎতৃণীকৃত করিয়া মহোল্লাসে পরমানন্দময় পরমাত্মক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। চণ্ডীতত্ত্বে ইহাই সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ।
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালী-শিবদূতী-মৃগাধিপৈঃ ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে
নিশুম্ভ-বধঃ।

অনুবাদ। কতকগুলি অসুর যুদ্ধে নিহত হইল, কতকগুলি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইল, আর অবশিষ্ট অসুরগুলি কালী শিবদূতী এবং সিংহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয়
দেবী-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে নিশুম্ভবধ।

ব্যাখ্যা। শুম্ভ ব্যতীত আর সকল অসুরই বিধ্বস্ত হইল। এই মন্ত্রে অসুরগণের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—কতকগুলি অসুর নিহত, কতকগুলি পলায়িত এবং অবশিষ্ট কালী শিবদূতী ও সিংহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা নিহত, তাহারা আর পুনরাবর্ত্তন করিবে না। তাৎপর্য্য এই যে কতকগুলি আসুরিক-সংস্কার চিরতরে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহাদের আর বাধিতানুবৃত্তি ন্যায়ে পুনরাবর্ত্তন হয় না। অপর কতকগুলি সংস্কার (আহার-বিহারাদি) ব্যুত্থিত অবস্থায় পুনরাবর্ত্তিত হয়; ইহাদিগকেই মন্ত্রে পলায়নকারী সৈন্যদল বলা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেও স্থানে স্থানে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে; তাহাতে পুনরুক্তি দোষ হয় না। অত্যন্ত গহন এ তত্ত্ব, অতি দুরধিগম্য এ অদ্বয়তত্ত্বের উপলব্ধি, সুতরাং এ সকল কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনাই আবশ্যক। অদ্বয়তত্ত্বে উপনীত হইলে যাবতীয় সংস্কার বিলুপ্ত হইয়া যায়। পুনরায় তাহা হইতে ব্যুত্থিত হইলে, জীবভাবীয় কতকগুলি সংস্কার প্রকাশ পায়। যতদিন স্থূল দেহ থাকে, ততদিন উহারা থাকে বটে, কিন্তু কিছুই অনিষ্ট সংঘটন করিতে, অর্থাৎ পুনরায় ভ্রান্তিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না; কারণ উহাদের পারমার্থিকত্ব-বুদ্ধি একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। আর কতকগুলি সংস্কার থাকে,

তাহারা (ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা জ্ঞানদান লোকশিক্ষা প্রভৃতি) সর্ব্বতোভাবে মাতৃ-ইঙ্গিতে মাতৃ-ইচ্ছায় পরিচালিত হয়, মায়ের বিশিষ্ট প্রেরণা ব্যতীত সে সকলের বিশেষ কোনও কার্য্যকারিতা প্রকাশ পায় না। এইরূপ সংস্কারগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে শিবদূতীকর্ত্তৃক অসুরভক্ষণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মা শিবদূতী যাহাদিগকে গ্রাস করিলেন—আবশ্যক হইলে অর্থাৎ মহতীশক্তির বিশেষ প্রেরণা হইলে, সে সকল সংস্কারও প্রাদুর্ভূত হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের কোনরূপ অনিষ্টকারিতা থাকে না; যেহেতু, উহা সর্ব্বতোভাবে মহতী ইচ্ছারই অনুবর্ত্তন করে। সুতরাং সাধককেও বিশিষ্টভাবে মুগ্ধ করিতে পারে না। স্থূল কথা এই যে—একবার অদ্বয়তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে সাধকের ভেদভ্রান্তি বন্ধনভয় মৃত্যুভয় চিরতরে দূরীভূত হইয়া যায়। তারপর যতদিন স্থূলদেহ থাকে, ততদিন সাধক মাত্র প্রারব্ধ সংস্কারক্ষয়ের অপেক্ষা করিতে থাকে; এবং প্রারব্ধক্ষয়ে বিদেহ কৈবল্য লাভ করে।

এস সাধক, এইবার আমরা মায়ের চরণ স্মরণ করিয়া শুম্ভবধরহস্য অবগত হইবার জন্য চেষ্টা করি। প্রবল প্রারব্ধ সংস্কার বিদ্যমান থাকিতে শুম্ভবধ হয় না—যথার্থ অদ্বৈততত্ত্ব উদ্ভাসিত হয় না। এস আমরা মা বলিয়া কাঁদি। এস, আমরা কেবল মাকে দেখিবার জন্যই আরও আগ্রহান্বিত হই। এস, আমরা ঈশ্বরত্ব-ভোগের স্পৃহা পর্য্যন্ত সংযত করিয়া অকৈতব প্রেমে আত্মহারা হইতে যত্ন করি। কৃপাময়ী মা নিশ্চয়ই আমাদিগকে স্নেহময় বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাঁহার সেই নিরঞ্জনক্ষেত্রে লইয়া যাইবেন। আমাদের সকল আশা পূর্ণ হইবে।

ইতি সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায়

নিশুম্ভবধ সমাপ্ত।

সাধন-সমর

বা

দেবী মাহাত্ম্য।

রুদ্রগ্রন্থি ভেদ।

শুম্ভবধ।

—*—

ঋষিরুবাচ।

নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥১॥
বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥২॥

অনুবাদ। প্রাণতুল্য ভ্রাতা নিশুম্ভ নিহত এবং সৈন্যবল বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, শুম্ভ ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল—হে দুর্গে! তুমি বলগর্ব্বে অতিশয় উদ্ধত হইয়াছ। গর্ব্ব করিও না। যেহেতু, তুমি অতিমানিনী (গর্ব্বিতা) হইয়াও অপরের বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ।

ব্যাখ্যা। শুম্ভের প্রাণপ্রতিম সহোদর নিশুম্ভ নিহত হইয়াছে, অস্মিতার একান্ত সহায় মমতা যাবতীয় দ্বৈতসংস্কারসহ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইবার অস্মিতা সহায়হীন—একামাত্র; তথাপি হতাশভাব নাই, অবসাদ নাই, আছে উৎসাহ, আছে প্রতিহিংসার প্রতিদানের বা আত্মদানের তীব্র আগ্রহ। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে শুম্ভ ক্রোধভরে দেবীকে বলিল হে বলাবলেপ-দুষ্টে—হে বলগর্ব্ব-জনিত-উদ্ধতভাবাপন্নে!

হে দুর্গে! তোমার অতিশয় বলগর্ব্ব দেখিতে পাইতেছি বটে, কিন্তু এরূপ গর্ব্ব করিবার মত তোমার ত কিছুই নাই! কারণ, অন্যের বলে তুমি বলীয়সী। ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃকাশক্তিগণের বলকে আশ্রয় করিয়াই তুমি যুদ্ধ করিতেছ এবং অসুর-নিধনে সমর্থ হইতেছ তোমার নিজের তাহাতে মহত্ত্ব কি আছে, যাহাতে তুমি আপনাকে অতিমানিনী—অতিশয় গর্ব্বিতা বলিয়া মনে করিতে পার ?

দেবীর প্রতি প্রযুক্ত শুম্ভের বাক্যগুলি কি সুন্দর! আত্মা—চিতিশক্তি মা আমার যথার্থই অতিগর্ব্বিতা। আর দ্বিতীয় কেহই ত নাই! আত্মার গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ করিবে, এরূপ কিছুই ত নাই! আত্মাই ত যথার্থ আমি! যিনি যথার্থ আমি, গর্ব্বই ত তাঁহার স্বরূপ। মায়ের এরূপ গর্ব্ব কেন, তাহা পরবর্ত্তিমন্ত্রে নিজেই বলিবেন। সাধক! সাধন-সমরের প্রারম্ভে দেবীসূক্তে যে "আমিকে" অন্বেষণ করিবার ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, নানাস্তরের ভিতর দিয়া নানারূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া আসিয়া এতদিনে সেই আমির সমীপে উপস্থিত হইয়াছ! আজ আমিরূপিণী মায়ের অক্ষুণ্ণ প্রভাব, অক্ষুণ্ণ গৌরব দেখিতে পাইতেছ ধীরে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হও।

এক—প্রতিবিম্ব আমি, এবং অন্য—বিম্ব আমি। এক অস্মিতা, অন্য আত্মা বা চিতিশক্তি। এক চিদাভাস, অন্য স্বয়ং চিৎ। এতদিনের পর এই উভয় পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। ওগো প্রিয়তম সাধক! কতযুগ যুগান্তর কত জন্ম জন্মান্তর অক্লান্ত সাধনার ফলে—না না, মায়ের—গুরুর—আমার প্রবল স্নেহের আকর্ষণে আজ তুমি অম্বিকার মায়ের আত্মার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। অহো ধন্য তুমি! ধন্য তোমার পুত্রত্ব! কিন্তু সে অন্যকথা—

শুন—অস্মিতার স্বভাব এই যে, সে আপনাকেই মহান্‌রূপে ঈশ্বররূপে দেখিতে চায়। পক্ষান্তরে আত্মাকে অনণু অস্থূল অহ্রস্ব অদীর্ঘ ইত্যাদি সর্ব্ববিশেষ বিবর্জ্জিত কিম্ভূত কিমাকার বস্তু বলিয়া বুঝিয়া লয়। এইরূপ অবস্থায় সে আপনভাবে বিচার করিতে থাকে—সর্ব্বভাবাতীত বাক্যমনের

অগোচর বস্তুকে জড় বলিলেই বা ক্ষতি কি আছে? তাহার আবার গর্ব্ব করিবার কি থাকিতে পারে? কিন্তু আত্মাকে একেবারে জড় পদার্থই বা কিরূপে বলা যায়! যাবতীয় শক্তি যে তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা ত প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ শক্তিগুলি যদি না থাকে—অর্থাৎ কোনরূপ শক্তির প্রকাশ যদি না থাকে, তবে আত্মা খুব সম্ভব জড়বৎ হইয়া পড়িবে, তখন হয় ত উহাকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ বিচার করিয়াই শুম্ভ দেবীকে অন্যের বলে বলীয়সী বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছিল। অভিপ্রায় এই যে—অসুরনাশিনী বিভিন্ন শক্তির আশ্রয় না লইলে, চিতিশক্তি সম্ভবতঃ পরিগ্রহযোগ্যা হইতে পারে।

শুম্ভ দেবীকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহাতে শুম্ভের আর একটী গূঢ় অভিপ্রায়ও প্রকাশ পাইয়াছে। তত্ত্বপ্রকাশিকা সে অভিপ্রায়টীর উদ্‌ভেদ করিয়াছেন। প্রথমে মন্ত্রটীর অন্বয় করা যাউক। "হে বলাবলে, হে অপদুষ্টে, হে দুর্গে ত্বং মা, সুতরাং গর্ব্বং আবহ। যা ত্বং অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে, অতএব অতিমানিনী।" এইবার শব্দগুলির অর্থ করা যাউক—বলান্ অবলয়তি যা সা বলাবলা, তস্যাঃ সম্বোধনে বলাবলে। যিনি বলবান্‌কেও অবল অর্থাৎ হীনবল করিতে সমর্থা, তিনিই বলাবলা; তাঁহার সম্বোধনে "বলাবলে" পদটীর প্রয়োগ হইয়াছে। যে মা আমার অতি প্রবল অহঙ্কারাদি ভাবনিচয়কে সম্যক্ ক্ষীণবল করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ বলাবলা। এবং যাবতীয় দুষ্টভাব—ভেদভাব যাঁহার নিকট হইতে সম্যক্ অপগত হয়, তিনিই অপদুষ্টা; তাঁহার সম্বোধনে "অপদুষ্টে" পদটীর প্রয়োগ হইয়াছে। আর দুর্গা শব্দের অর্থ দুর্গতিহরা অথবা দুর্জ্ঞেয়তত্ত্বস্বরূপা তাঁহার সম্বোধনে দুর্গে; ত্বং মা—তুমিই মা; যে হেতু সর্ব্বভাবের ধারণ এবং পোষণ তুমিই করিয়া থাক, মাতৃত্বধর্ম্ম পূর্ণভাবে একমাত্র তোমাতেই সম্যক্ প্রকটিত; সুতরাং ত্বং গর্ব্বং আবহ—তুমিই যথার্থ গর্ব্ব করিতে পার। তোমার প্রকাশেই সর্ব্বভাব প্রকাশিত। তোমার সত্তাদ্বারাই

সর্ব্বভাব সত্তাময়, তোমার চৈতন্যদ্বারাই সর্ব্বভাব সঞ্জীবিত; সুতরাং গর্ব্ব করিবার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে।

অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে—তুমি অন্যের বল আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ কর, তুমি স্বয়ং সর্ব্ববিকার-বিবর্জ্জিত, তুমি নির্গুণ নিষ্কল; তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইলেই পরবল আশ্রয় করিতে হয়, অর্থাৎ পরা প্রকৃতির আশ্রয় লইতে হয়। গীতায় ভগবান্‌ও এই পরবলকেই "আত্মমায়া" বা স্বকীয়া প্রকৃতি বলিয়াছেন—যথা, "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।" নির্গুণ নিরঞ্জন আত্মাকে যুদ্ধ করিতে হইলে, অর্থাৎ দ্বৈতপ্রতীতির মধ্যে আসিতে হইলে প্রকৃতির বা স্বকীয় শক্তির আশ্রয় লইতে হয়। আমাদের যেমন কোনও বস্তুর রূপ গ্রহণ করিতে হইলে দৃক্‌শক্তির আশ্রয় লইতে হয়, শব্দ শ্রবণ করিতে হইলে শ্রবণশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, ঠিক তেমনই নিরঞ্জন আত্মাকে ভাবরঞ্জনাময় অবস্থায় আসিতে হইলেই শক্তির আশ্রয় লইতে হয়। এই শক্তিসমূহ আত্মার আশ্রয়েই প্রকাশ পায় এবং আত্মা হইতেই সমুদ্‌ভূত হয়। এ কথা ইতিপূর্ব্বে দেবীর শরীর হইতে চণ্ডিকা প্রভৃতি শক্তির নিষ্ক্রমণ-প্রস্তাবে বিশেষভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে। যে মা আমার সর্ব্বশক্তির সম্ভবস্বরূপা, যে মা আমার সর্ব্ব শক্তির একান্ত আশ্রয়স্বরূপা, তিনি অতিমানিনী কেন না হইবেন? মান্ ধাতুর অর্থ পূজা। মা আমার অতিশয় পূজ্যা অতিশয় গৌরবিতা। মা ব্যতীত আর কাহারও গর্ব্ব করিবার অধিকার নাই। আরে, গর্ব্ব ত "আমিকে" নিয়া! আমি যখন একমাত্র মা, আর কেহ যখন আমি নয়, আমি বলিবার অধিকার যখন আর কাহারও নাই, তখন যিনি আমি, তিনিই ত গৌরবিণী—তিনিই ত অতিমানিনী।

বুঝিতে পারিলে পাঠক, যাঁহারা মাকে পান, যাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ হন, তাঁহাদের অহঙ্কার থাকে না কেন? যিনি যথার্থ অহংরূপিণী, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেই মিথ্যা অহংটী—প্রতিবিম্ব অহংটী চিরদিনের তরে অস্তমিত হয়। তাই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষগণ সর্ব্বতোভাবে

অহঙ্কারশূন্য হইয়া থাকেন। মনে রাখিও—মাকে অহংকে না দেখিলে কিছুতেই অহঙ্কার দূরীভূত হয় না। অহঙ্কার দূর করিবার জন্য আপনাকে দীন হীন পতিত বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিও না; ঐরূপভাবের ভিতরেও অহঙ্কার থাকে। যথার্থ অহংকে দেখ—মিথ্যা অভিমান আপনি পলায়ন করিবে।

দেব্যুবাচ।

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ ॥৩॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—এ জগতে একমাত্র আমিই ত আছি, আমা হইতে অপর দ্বিতীয় আর কে আছে? ওরে দুষ্ট! দেখ, আমার বিভূতিসমূহ আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।

ব্যাখ্যা। এতদিনে মা আমার নিজের স্বরূপ নিজমুখে পরিব্যক্ত করিলেন। যত শাস্ত্রগ্রন্থই আলোচনা করা যাউক, যত কঠোর সাধনাই করা যাউক, মা স্বয়ং যতদিন স্বকীয় পরিচয় প্রদান না করেন, ততদিন কাহারও সাধ্য নাই যে, মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। মাকে পাইতে হইলে—মায়ের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, মাকে বরণ করিতে হয়, মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। কন্যা যেমন বরকে বরণ করে—সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে, ঠিক তেমনভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, তবেই মা আমার স্বকীয় স্বরূপটী উদ্ভাসিত করেন। এই কথাটী নানাভাবে নানাস্থানে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। যাঁহারা প্রাণপণপ্রযত্নে উহার অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাঁহাদের নিকটই মায়ের আত্মপরিচয় প্রদানের সার্থকতা। সে যাহা হউক, মা বলিলেন—অত্র জগতি—এই জগতে, একৈবাহং—একমাত্র আমিই (আছি)। দ্বিতীয়া কা মমাপরা—আমা হইতে অপর দ্বিতীয় আর কে আছে।

"অত্র জগতি" এই অধিকরণবোধক পদের প্রয়োগ দেখিয়া অনেক ব্যাখ্যাকার অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন, আমরা সে সকল সূক্ষ্ম বিচার কোলাহলের মধ্যে যাইব না। সহজ কথায় যাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। "এই জগৎ" রূপে যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, সে সকলই একমাত্র আমি—মা। যতক্ষণ জগৎ-প্রতীতি আছে, ততক্ষণ জগৎকে পৃথক্ কিছু না বুঝিয়া আমিরূপেই বুঝিয়া লইব। বাস্তবিক আমির সত্তা ব্যতীত জগতের পৃথক্ সত্তা নাই। এই জগৎ আমিরই স্থূল রূপ। সাধক! জগৎ বলিতে মন বুদ্ধি প্রভৃতিকেও বুঝিয়া লইও।

"দ্বিতীয়া কা মমাপরা" এই বাক্যটীর দ্বারা সর্ব্ববিধ দ্বৈতের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। শ্রুতির "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্যটী যেরূপ সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত-ভেদরহিত এক অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতিপাদক, মায়ের এই "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" বাক্যটীও ঠিক সেইরূপ; তবে একটু বিশেষত্ব আছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া সর্ব্বভেদবিবর্জ্জিত একটি বস্তুর সত্তামাত্র বুঝিতে পারা যায়, সে বস্তুটীর স্বরূপ যে কি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। বস্তুর স্বরূপ বুঝিবার জন্য আবার—"অস্থূলমনণু" প্রভৃতি, এবং "সত্যং জ্ঞানমানন্দং" প্রভৃতি পরোক্ষ বাক্যের, এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি, তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বাক্যের সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু দেবীর আত্মপরিচয় প্রদান-বাক্যে "একা এব অহং" এইরূপ প্রত্যক্ষতা বোধক শব্দের উল্লেখ থাকায় সত্তা এবং স্বরূপ, উভয়ই যুগপৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে। মাকে কেবল বাক্য মনের অগোচরা বলিয়া ছাড়িয়া দিলে ত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারা যায় না। সন্তান যে মাকে দেখিতে চায়, বুঝিতে চায়, ধরিতে চায়! সুতরাং "অস্থূল অনণু অহ্রস্ব" বলিলে ত সন্তানের আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হয় না! তাই মা আমার "অহং" বলিয়া একান্ত প্রত্যক্ষ আত্মস্বরূপটী প্রকাশ করিলেন। অতি দুরাচার ব্যক্তিও ইহাকে জানে এবং অনুভব করে। মা কখনও কাহারও নিকট

আত্মগোপন করেন না। তিনি সকলেরই প্রত্যক্ষ। তাই গীতায় দুরাচার ব্যক্তিরও ভগবদ্‌ভজনের যোগ্যতা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সে অন্য কথা—

সাধক! দেবী-সূক্তের প্রারম্ভে "অহং রুদ্রেভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে যে অহংএর সূচনা করা হইয়াছিল, নানাভাবের ভিতর দিয়া—সত্য প্রাণ এবং আনন্দ-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া, সেই একই আমির নানারূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলিয়াছে। কিন্তু সেই অহংএর যথার্থ স্বরূপ যে কি, তাহা এতদিন ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যায় নাই, তাই মা আমার স্বয়ং কৃপা করিয়া সেই অজ্ঞান দূর করিয়া দিতেছেন, নিজের স্বরূপ নিজেই প্রকটিত করিতেছেন। শ্রুতি যাহাকে "একম্ এব" বলিয়াছেন, মা তাহাকে "একা এব" বলিলেন। অদ্বিতীয় অহং বস্তুটী যে শক্তি স্বরূপ তাহা "একা" এই স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে "অত্র জগতি" পদের দ্বারা তাঁহার শক্তিস্বরূপতাই বিশেষভাবে সমর্থিত হইল। ইহা শুধু আমাদের কথা নহে; শ্রুতি এবং দর্শন-শাস্ত্রও ইঁহাকে চিতিশক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেক বিচার করা হইয়াছে। এস সাধক! এবার আমরা বিচারের দিকে না গিয়া মাতৃবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লই। যতক্ষণ আমরা "অত্র জগতি" এই জগতে আছি, অর্থাৎ যতক্ষণ জগৎ বলিয়া একটা জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে, ততক্ষণ মাকে শক্তিরূপিণী বলিয়াই বুঝিয়া লই। এই শক্তি বহু নহে, একা অদ্বিতীয়া। এই জগতের যে দিকে তাকাইবে, সেই দিকেই দেখ—মা আমার একা অদ্বিতীয়া। প্রত্যেক জীবেই তিনি "অহং" রূপে নিত্য প্রকাশিত। ঐ অহংটী অদ্বিতীয়। উহার দ্বিতীয় কেহ নাই। কেবল জীব কেন—প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক পত্র, প্রত্যেক বালুকাকণার দিকে তাকাও, দেখ সকলেই এক অদ্বিতীয়। স্থূলে আসিয়া ভেদজ্ঞানের মধ্যে আসিয়াও মায়ের একত্ব অদ্বিতীয়ত্ব কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। জড়ক্ষেত্র ছাড়িয়া চৈতন্য-রাজ্যে প্রবেশ করিলে, সেখানে ত ভেদের লেশমাত্রও অনুভূত হয় না;

তাই, কি স্থূলে কি সূক্ষ্মে কি কারণে, সর্ব্বত্রই মা আমার একা অদ্বিতীয়া "অহং" স্বরূপে নিত্য বিরাজিতা। ইহাই মায়ের স্বরূপ।

"দ্বিতীয়া কা মমাপরা" এই অংশটীর আর এক প্রকার অর্থও হইতে পারে। "মমাপরা দ্বিতীয়া কা"। আমা হইতে অপর দ্বিতীয় যাহা কিছু প্রতীত হয়, তাহা "কা" তুচ্ছা পরিহার্য্যা, অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর। অহং ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীত হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিহারযোগ্য। যেহেতু উহা কোন বস্তু নয়; উহা অহংএর ব্যবহার মাত্র। অহংই একমাত্র বস্তু। আর যাহা কিছু অহংএর সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা বস্তু নহে—ব্যবহার। ব্যবহার কখনও বস্তু হয় না, হইতে পারে না। তোমার আহার বিহারাদি ব্যাপারগুলি যেরূপ কোন বস্তু নহে, তোমারই একপ্রকার ব্যবহার মাত্র; ঠিক সেইরূপ পরিদৃশ্যমান এই জীব জগৎ অহংএর—আত্মার—মায়ের আমার ব্যবহার মাত্র। তাই বেদান্তবাদিগণ জগতের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না, ব্যবহারিক সত্তামাত্র বলিয়া থাকেন। সত্যই এ জগতের কোন বাস্তবিক সত্তা নাই।

সে যাহা হউক, এইবার আমরা দেবী-বাক্যের অপরার্দ্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিব। দেবী বলিলেন—"পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ" ও দুষ্ট! পশ্য, মদ্‌বিভূতয়ঃ ময়ি এব বিশন্তি। "বিশন্তি" এইটী ক্রিয়াপদ এবং "ও" এইটী সম্বোধনসূচক অব্যয়। "ওরে দুষ্ট! দেখ—আমার বিভূতিসকল আমাতেই প্রবেশ করিতেছে!" অস্মিতা প্রতিবিম্বস্বরূপ হইয়া বিম্বের ধর্ম্ম আত্মসাৎ করিতে চায়—অহং না হইয়াও অহংরূপে পরিচিত হইতে চায়, ইহাই তাহার দুষ্টভাব; তাই মা তাহাকে, ও দুষ্ট বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

মদ্‌বিভূতি—আমার বিভূতি আত্মবিভূতি। যত কিছু বহুত্ব, যত রকম শক্তি, সে সকলই আত্মবিভূতি! বিভূতি কখনও আশ্রয়ের সত্তা ব্যতীত পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট বস্তু হয় না। যেরূপ কোন বাগ্মী পুরুষের বক্তৃতাশক্তি উক্ত পুরুষের সত্তা ব্যতীত পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট কোন বস্তু

নহে, উহা ঐ পুরুষেরই এক প্রকার বিভূতি বা ব্যবহারমাত্র; ঠিক সেইরূপ এই জগৎ, এই অনন্ত শক্তি, আত্মার বিভূতি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, তাঁহারই এক প্রকার ব্যবহারমাত্র; একা অদ্বিতীয়া অম্বিকা মা আমার যখন বিভূতিময়ী হইয়া প্রকাশ পান, তখনই তাঁহাতে বহুত্ব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবিক কিন্তু তিনি—একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

দেবীর এই বাক্যটীদ্বারা শুম্ভকে ইহাও বলা হইল যে, "আমিই ত একমাত্র 'আমি', আমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহ ত 'আমি' নাই! অতএব হে শুম্ভ! তুমি আবার একটা পৃথক্ আমি কিরূপে হইলে?"

যাহা হউক, শুম্ভ যখন ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিবর্গের বিকাশ দেখিয়া অম্বিকার বহুত্বে সংশয়াপন্ন হইয়াছে, তখন মা আমার কৃপাপূর্ব্বক স্বকীয় বিভূতিসমূহ সংহরণ করিয়া শুম্ভকে বলিলেন—দেখ, আমার বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করিল!

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা ॥৪॥

অনুবাদ। অনন্তর সেই ব্রহ্মাণীপ্রমুখ শক্তিসমূহ দেবীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন অম্বিকা একাই রহিলেন।

ব্যাখ্যা। মায়ের ইচ্ছামাত্র অষ্টশক্তিরূপ বিভূতিসমূহ দেবীর শরীরে লীন হইল। চিতিশক্তি হইতে প্রসৃত নানা শক্তি স্বকীয় কারণে অর্থাৎ চৈতন্যেই বিলীন হইয়া গেল। ব্যবহার নিবৃত্ত হইল। এইবার মা আমার একা অদ্বিতীয়া সর্ব্বভেদরহিতা, পূর্ণা আনন্দস্বরূপা স্বস্থা। এখনও কিন্তু শুম্ভ আছে, দেবী বাক্য আছে! পাঠক! ইহাতে দ্বৈতভাবের আশঙ্কা করিও না। মাকে ভাষার মধ্যে নিয়া আসিলে, বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেই, তিনি দ্বৈত হইয়া পড়েন। বাস্তবিক কিন্তু দ্বৈত বলিয়া কিছু নাই। কিরূপে এক অখণ্ড

আনন্দস্বরূপ বস্তু স্বকীয় একত্ব সম্যক্ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বহুরূপে—বিশ্বরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। আধুনিক মায়াবাদিগণের সহিত এইখানে আমরা একমত হইতে পারি না, তাঁহারা এই মদ্‌বিভূতি অর্থাৎ আত্মবিভূতিস্বরূপ এই বহুত্বকে "ভ্রান্তি" বা মিথ্যা বলিয়া প্রচার করেন, আর আমরা উহাকে আত্মবিলাস আত্মমহত্ত্ব বলিয়া বুঝিয়া থাকি। যতক্ষণ দ্বৈত প্রতীতি আছে, ততক্ষণ সহস্রবার ভ্রান্তি বলিলেও উহা উড়িয়া যায় না; আবার যখন অদ্বয়স্বরূপটী উদ্‌ভাসিত হয় তখন মিথ্যা বা ভ্রান্তি বলিবার মত কিছুই থাকে না। সুতরাং যতক্ষণ সাধনা বলিয়া, উপলব্ধি বলিয়া, মহাবাক্যার্থ-বিচার বলিয়া কিছু থাকে, যতক্ষণ বুঝিবার বা বুঝাইবার কিছু থাকে, ততক্ষণ ইহাকে ভ্রান্তি না বলিয়া লীলাবিলাস বলিয়া বুঝিতে পারিলেই সর্ব্ব-সামঞ্জস্য হয়। উপনিষৎ এবং বেদান্তসূত্রও এই বহুত্বকে লীলাকৈবল্য রূপেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু মিথ্যা কিংবা ভ্রান্তি, এরূপ শব্দ কখনও প্রয়োগ করেন নাই। নির্গুণ বস্তুতে লীলাবিলাস কিরূপে থাকে, এরূপ আশঙ্কা ঋষিদের প্রাণে কখনই জাগিত না। তাঁহাতে যে কি নাই, এবং কি থাকিতে পারে না, তাহা কে বলিবে?

সাধক! তোমরা দেবী-মাহাত্ম্যের অপূর্ব্ব এই বাণী স্মরণ রাখিও—সাধনার পথ সুগম হইবে। এই জগৎকে, এই বহুত্বকে "মদ্‌বিভূতি" বলিয়া জানিও। আমারই ইচ্ছা বহুরূপে অভিব্যক্ত; তাই, আমি বহুত্বদর্শী। আবার যখন আমি একত্বাভিলাষী হইব, তখন আর বহু বলিয়া কিছু থাকিবে না। সকল ভেদ আমাতেই বিলীন হইয়া যাইবে। ইহাই সত্য জ্ঞান।

দেব্যুবাচ।

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥৫॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—আমি বিভূতিবিশিষ্ট হইয়া যে

বহুরূপে অবস্থান করিতেছিলাম, তাহা সংহরণ করিলাম। এখন আমি একাই অবস্থিত। (হে শুম্ভ! তুমি) এই যুদ্ধে স্থির হও।

ব্যাখ্যা। দেবী যখন একা অদ্বিতীয়া, তখনও কিন্তু তাঁহার বাক্য অসম্ভব নয়, সে বাক্য যে কিরূপ তাহা তত্ত্বদর্শিগণ বুঝিতে পারিবেন। যদিও মা আমার "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্, তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ" যদিও মা আমার "মহতঃ পরং ধ্রুবম্" তথাপি তাঁহার বাক্যপ্রয়োগ এবং শুম্ভের সহিত সমর একান্ত অসম্ভব নহে। আরে, যখন অতি স্বচ্ছ মহৎতত্ত্বে আত্মবোধ উপসংহৃত করিয়া চিতিশক্তিরূপিণী অম্বিকার দিকে লক্ষ্য করা যায়, তখন তাঁহা হইতে যে প্রজ্ঞার আলোক আসিয়া মহত্তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত চিদাভাসে নিপতিত হইতে থাকে, তাহাই ত মাতৃ-বাক্য বা মাতৃসমরাভিনয়। সাধক, এক একবার প্রজ্ঞালোক-সম্পাতে অনেক ধাঁধা সরিয়া যায়, অনেক অসুর নিপাতিত হয়, অনেক অভূত-পূর্ব্ব তথ্য আবিষ্কৃত হয়।

সে যাহা হউক, দেবী শুম্ভকে বলিলেন—আমি বিভূতি বিস্তার-পূর্ব্বক যে বহুরূপে বিরাজ করিতেছিলাম, এইবার তাহার সংহরণ করিলাম। দেখ, এখন আমি একা; কিন্তু সাবধান, তুমি এই যুদ্ধে স্থির হও। মায়ের এ বাক্যের তাৎপর্য্য অতি স্ফুট। মা বলিলেন—সন্তান, তুমি আমার বহুত্ব-দর্শন প্রয়াসী ছিলে; তাই আমি তোমারই ইচ্ছায় বিভূতিময়ী হইয়া বহুরূপে বিরাজ করিতেছিলাম। এতদিন তুমি আমাকে চাহ নাই, আমার বিভূতি চাহিয়াছিলে, তোমার কল্পিত আমিটীকে ভালরূপ সাজাইতে চাহিয়াছিলে; তাই আমি "বহুভিরূপৈঃ আস্থিতা" ছিলাম, তোমারই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য আমাকে বহুত্ববিভূতি বিস্তার করিতে হইয়াছিল; কিন্তু আজ এত দিনের পর তোমার সকল সাধ মিটিয়াছে, বহুত্ব-সম্ভোগের বাসনা বিদূরিত হইয়াছে আজ তুমি ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত তৃণীকৃত করিয়া, শুধু আমাকেই চাহিতেছ। এখন আর তুমি আমার বিভূতি চাও না, শুধু আমাকেই চাও। এত ভালবাসা, এত প্রেম তোমার প্রাণে! ধন্য তুমি, কেবল আমার

জন্য আমাকে চাহিতে পারিয়াছ! এস—দেখ, এই আমি একা অদ্বিতীয়াস্বরূপে প্রকটিত হইলাম, আমার বহুত্ব সংহৃত হইল। কিন্তু তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধ কর দেখি?

মায়ের এই "স্থির হও" কথাটির মধ্যে একটু রহস্য আছে। এখানে আসিয়া—এই একত্বের সমীপস্থ হইয়া স্থির থাকা বড় দুরূহ ব্যাপার। সকল প্রকার বিশিষ্টতা এখানে বিশীর্ণ হইয়া পড়ে। যদিও সর্ব্বত্ব—বহুত্ব বিদূরিত হইয়াছে, তথাপি অস্মিতারূপ যে বিশিষ্টতাটুকু রহিয়াছে, তাহা ত এখনও বিলয়প্রাপ্ত হয় নাই। আত্মার সন্নিহিত হইলে, সে বিশিষ্টতাটুকুও বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং এখানে স্থির থাকা সহজসাধ্য নয় বলিয়াই মা আদর করিয়া বলিলেন—"স্থিরোভব।" অস্মিতা যতক্ষণ স্থির থাকিতে পারিবে, স্বকীয় বিশিষ্টতাটুকু যতক্ষণ বজায় রাখিতে পারিবে, ততক্ষণই মায়ের আনন্দ-বিলাস—এই সাধন-সমরের অভিনয় চলিবে; সুতরাং শুম্ভের এখন স্থির হওয়াই একান্ত আবশ্যক; কিন্তু সে আর কতক্ষণ!

ঋষিরুবাচ।

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥৬॥
শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ভূয়ঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥৭॥

অনুবাদ। অনন্তর দেবাসুরগণের সম্মুখে দেবী এবং শুম্ভ, এই উভয়ের দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুনঃ পুনঃ দারুণ শরবর্ষণ এবং শাণিত অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগরূপ সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। দেবী এবং শুম্ভের যুদ্ধ দারুণ ও সর্ব্বলোকভয়ঙ্করই বটে! একদিকে অস্মিতা স্বকীয় বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী,

অন্যদিকে আত্মার স্বপ্রকাশত্ব সে বিশিষ্টতাকে বিলয় করিতে উদ্যত। এক প্রতিবিম্ব, অপর বিম্ব, এই উভয়ের যুদ্ধ দারুণই হইয়া থাকে। প্রতিবিম্ব যতদিন নিজেকে প্রতিবিম্ব বলিয়া বুঝিতে না পারে, ততদিনই বিম্বের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বয়ং পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট বস্তুরূপে প্রতিপন্ন হইতে চেষ্টা করে। সুতরাং এ দারুণ যুদ্ধ অনিবার্য্য।

দেবী এবং শুম্ভের যুদ্ধ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর। সর্ব্বরূপে যাহা কিছু আলোকিত বা প্রকাশিত হয়, তাহাই সর্ব্বলোক। যথার্থই এই যুদ্ধ সর্ব্বলোকের পক্ষে ভীষণ হইয়া থাকে; কারণ অস্মিতার সত্তায়ই সর্ব্বলোকের সত্তা। অস্মিতা না থাকিলে সর্ব্ব বলিয়া কিছু থাকে না। যদিও ইতিপূর্ব্বে যাবতীয় অসুরভাবের নিধন বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে—যদি অস্মিতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে আবার সেই বিনষ্ট অসুরভাবগুলির পুনরায় আবির্ভাব হইতে বিলম্ব হইবে না; উহারা যে অস্মিতারই বিভিন্ন স্ফুরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এ পর্য্যন্ত অসুরভাবসমূহের নিধনে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উহাদের বিশিষ্ট কোন সত্তা নাই। বিভিন্ন স্ফুরণগুলি বিনষ্ট হইয়া অখণ্ড অস্মিতারূপে মিলিয়া গিয়াছে। কিন্তু অস্মিতা থাকিলে, আবার স্ফুরণ উঠিবার একান্ত সম্ভাবনা আছে। পাতঞ্জল দর্শন ঠিক এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—"যাহারা প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে, তাহাদের পুনরায় আবির্ভাব হয়।" প্রকৃতি পর্য্যন্তের বিলয় করিতে না পারিলে যথার্থ আত্মস্বরূপ প্রকটিত হয় না, জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অস্মিতা-বিলয় এবং প্রকৃতি-লয় একই কথা। মহত্তত্ত্বের অতি সূক্ষ্মতম বীজাবস্থাই সাঙ্খ্যদর্শন-কথিত প্রকৃতি। সর্ব্বভাব সূক্ষ্মরূপে প্রকৃতিতেই অবস্থান করে। আমরা এখানে অস্মিতার যে স্বরূপটী দেখিতে পাইতেছি,' উহাকে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি বলিলেও কিছুই ক্ষতি হয় না। সাঙ্খ্যের ভাষায় শুম্ভের সহিত দেবীর এই যুদ্ধকে পুরুষের

সম্মুখভাগ হইতে প্রকৃতির পলায়নোদ্যম বলা যায়। বেদান্তের ভাষায় ইহাকে মায়ার অধ্যাসনিবৃত্তি বলা যায়। ভক্তের ভাষায় ইহাকে ভক্ত এবং ভগবানের একান্ত মিলন বলা যায়। যাহাই হউক ইহা যে অতি দারুণ এবং সর্ব্বলোকের পক্ষে একান্তই ভয়ঙ্কর একথা খুবই সত্য। ———

দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎপ্রতীঘাতকর্ত্তৃভিঃ ॥৮॥
মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্রহুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ ॥৯॥

অনুবাদ। অতঃপর অম্বিকা যে শতশত দিব্য অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিলেন, দৈত্যরাজ শুম্ভ প্রতিঘাতকারী স্বকীয় অস্ত্রপ্রয়োগে তাহা ভগ্ন করিয়া দিল। আবার অসুরাধিপতি যে সকল দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, পরমেশ্বরী সেই সকল অস্ত্রকে প্রচণ্ড হুঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা অনায়াসে ভগ্ন করিলেন।

ব্যাখ্যা। অম্বিকার অস্ত্রসকল দিব্য—স্বপ্রকাশ। আত্মসত্তা যতই প্রকাশিত হইতে থাকে, অস্মিতা নিজের সত্তাবিলয়ের আশঙ্কায় ততই অস্থির হইয়া পড়ে; এইরূপ অবস্থায় সে নানা উপায়ে নানাভাবে স্বকীয় বিশিষ্টতা অক্ষুন্ন রাখিতে প্রয়াস পায়, অর্থাৎ আত্মার স্বপ্রকাশত্বকে নানা উপায়ে আবৃত রাখিতে চেষ্টা করে; সুতরাং দেবীর অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া যায়। আরে, জীব কি সহসা ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিতে চায়! সে প্রাণপণে নিজের বিশিষ্টতা, নিজের ভেদপ্রতীতি রক্ষা করিতে চায়। অস্মিতা যখন আত্মস্বরূপের দিকে লক্ষ্য করে, তখন ক্ষণকালের জন্য আত্মার স্বয়ংপ্রকাশভাব প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের বিশিষ্ট অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। আবার যখন নিজের বিশিষ্ট সত্তার প্রতি লক্ষ্য করে, তখন আত্মার ঐ স্বপ্রকাশ-ভাবটী যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। ইহাই দেবী ও শুম্ভের যুদ্ধ রহস্য।

পরবর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্রেও ইহা নানাভাবে বিভিন্ন অস্ত্র প্রয়োগরূপে বর্ণিত হইবে; সুতরাং এই কথাটী বিশেষভাবে স্মরণ রাখিলে, পাঠকগণের পক্ষে দেবী ও শুম্ভের সমররহস্য বুঝিয়া লইতে কোন কষ্ট হইবে না।

মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—দেবী হুঙ্কার-উচ্চারণে শুম্ভ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল ব্যর্থ করিয়াছিলেন। হুঙ্কার—প্রলয়াত্মক বীজ। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। যদিও এই পরমাত্মক্ষেত্রে প্রলয়শক্তির কোনরূপ বিশিষ্ট বিকাশ নাই, তথাপি উহা স্বভাবতঃই ভেদজ্ঞানের পক্ষে প্রলয়াত্মক; কারণ, স্বপ্রকাশ আত্মসত্তা উদ্ভাসিত হইলে, অস্মিতার প্রলয় অবশ্যম্ভাবী। তাই, মন্ত্রে প্রলয়সূচক হুঙ্কারাদি উচ্চারণে দেবীকর্ত্তৃক শুম্ভের অস্ত্র ব্যর্থ হইবার কথা বলা হইয়াছে। স্থূল কথা এই যে, প্রতিবিম্ব যখন বিম্বের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলে, আবার নিজের বিশিষ্ট সত্তার প্রতি লক্ষ্য করিলে, বিম্বস্বরূপটী তাহার নিকট আবৃত থাকে। ইহাই পরস্পরের অস্ত্রপ্রয়োগ-রহস্য।

ততঃ শরশতৈর্দ্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥১০॥
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্ ॥১১॥
ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥১২॥
তস্যাপতত এবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্ম্মুক্তৈঃ শিতৈর্ব্বাণৈশ্চর্ম্ম চার্ককরামলম্ ॥১৩॥

অনুবাদ। অতঃপর সেই অসুর শত শত বাণ প্রয়োগে দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেবীও কুপিত হইয়া বাণের দ্বারা

অসুরের ধনুঃ ছেদন করিলেন। ধনুঃ ছিন্ন হইলে দৈত্যরাজ শক্তি-অস্ত্র গ্রহণ করিল, কিন্তু দেবী অসুরের করস্থিত সেই শক্তিঅস্ত্রকেও চক্রপ্রয়োগে ছেদন করিলেন। তখন অসুরাধিপতি খড়গ ও অতি উজ্জ্বল শতচন্দ্র নামক চর্ম্ম (ঢাল) গ্রহণ করিয়া দেবীর প্রতি অভিধাবিত হইল। সে (খড়গ চর্ম্মধারী শুম্ভ) আসিতে না আসিতেই চণ্ডিকাদেবী ধনু হইতে মুক্ত শাণিত শরপ্রয়োগে অতি শীঘ্র সেই খড়গ এবং সূর্য্যকিরণবৎ নির্ম্মল চর্ম্মখানা ছিন্ন করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা। এই চারিটী মন্ত্রেও দেবী এবং মহাসুর শুম্ভের পরস্পরের প্রতি বিভিন্ন অস্ত্রপ্রয়োগ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে শুম্ভ শত শত বাণপ্রয়োগে দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। দেবী কুপিত হইয়া শুম্ভের ধনুঃ ছেদন করিয়াছিলেন। অস্মিতা প্রণবধনুতে স্বকীয় বিশিষ্ট আত্মবোধরূপ শর সংযুক্ত করিয়া ব্রহ্মলক্ষ্যে নিক্ষেপ করিতেছিল। যদিও পূর্ব্বে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি এখানে উহাও অসুরের অস্ত্রপ্রয়োগরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐরূপ প্রণব-ধনু হইতে আত্মশর-নিক্ষেপ ব্যাপারটীর মধ্যে দ্বৈতপ্রতীতি অবস্থিত; সুতরাং প্রণবাদি মন্ত্রের উচ্চারণ এবং আত্মশর-নিক্ষেপ, ইহাও অসুর-অত্যাচারমাত্র। আত্মা মা আমার এতটুকু ভেদজ্ঞানও রাখিতে দিবেন না। তাই স্বকীয় স্বপ্রকাশ শক্তি-রূপ শরপ্রয়োগে ক্ষণকালমধ্যে শুম্ভের প্রণব-ধনুঃ ছিন্ন করিয়া দিলেন। শুম্ভের উদ্যম ব্যর্থ হইল। ঠিক এইরূপই মুমুক্ষু সাধক যখন বিশিষ্ট সাধনার সাহায্যে স্বকীয় পৃথকত্ব রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, তখন মা আমার সে বিশিষ্টতাও বিনষ্ট করিয়া দেন।

অতঃপর শুম্ভ শক্তি-অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। "আমিই আত্মা" এইরূপ বোধশক্তিকে দৃঢ় প্রযত্নে ধরিয়া রাখার নামই শুম্ভের শক্তি-গ্রহণ। কিন্তু হায়! দেবী তাহাও ছিন্ন করিয়া দিলেন। যথার্থ আত্ম-প্রকাশ ঠিক এমনই সর্ব্বতোভেদী যে, বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞানও সেখানে থাকিতে পারে না। যাহা হউক, দেবীর সুদর্শন বা দিব্যদৃষ্টিরূপ চক্র

অস্ত্র-প্রয়োগে অর্থাৎ সর্ব্বতোভেদী প্রকাশ-সত্তার প্রভাবে, অস্মিতার যে বিশিষ্ট আত্মবোধ, তাহা সম্যক্ অভিভূত হইয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থায় শুম্ভ হতাশ হইয়া খড়্গ এবং চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, দেবী ধনুর্ম্মুক্ত শরপ্রয়োগে তাহাও ছিন্ন করিয়া দিলেন। খড়্গ—ভেদজ্ঞান; চর্ম্ম—আবরণ। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। একান্তই যখন অস্মিতা আত্মপ্রকাশের সম্মুখে স্বকীয় বিশিষ্টতা লইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, তখন অগত্যা ভেদজ্ঞান ও আবরণের আশ্রয় গ্রহণ করে। একদিক হইতে আত্মাভিমুখী লক্ষ্য পরিত্যাগ করে, অন্যদিক হইতে স্বকীয় পৃথকৃত্ব ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে; ইহাই শুম্ভের চর্ম্ম ও খড়্গ-প্রয়োগের রহস্য। অস্মিতার ভাব এই যে, "আত্মা আছেন থাকুন, তাঁহার প্রকাশেই আমি প্রকাশিত, তাহাও স্বীকার করি; তথাপি আমার যে বিশিষ্ট সত্তাটুকু আছে, তাহা কেন পরিত্যাগ করিতে যাইব! আমি বেশ আছি। দূর হইতে অম্বিকার সর্ব্বমনোহর রূপ দেখিয়া আনন্দে মুগ্ধ থাকিব; তাঁহার সমীপস্থ হওয়ার—তাঁহাতে আত্মসত্তা মিলাইয়া দিবার কি প্রয়োজন?" ঠিক এইরূপ অনেক বৈষ্ণব সাধকও এইখানে আসিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা কিছুতেই ভগবানের সহিত মিলাইয়া যাইতে চান না। সান্নিধ্যমাত্র লাভ করিয়া ভগবৎরসাস্বাদনকেই তাঁহারা পরম পুরুষার্থ মনে করেন। বাস্তবিক কিন্তু রসাস্বাদও মুক্তিপথের বিঘ্ন। শাস্ত্রে আত্মজ্ঞানলাভের পথে যে সকল অন্তরায়ের উল্লেখ আছে, 'রসাস্বাদ' তাহার অন্যতম বিঘ্ন। যদিও নিশুম্ভবধেও ইহা বলা হইয়াছে, তথাপি এখানে যে পুনরুক্তি দোষ হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। শুম্ভ ও নিশুম্ভ একটী বিশিষ্ট বোধেরই দ্বিবিধ প্রকাশ মাত্র। সে যাহা হউক, বিশিষ্টভাবে ভগবৎরসের আস্বাদনকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিলে, সহসা অদ্বয়তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয় না। আবার এই অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলেও জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যাঁহারা বলেন—মুক্তি বাঞ্ছনীয় নয়, ভগবৎপ্রেম-রসের আস্বাদনই একান্ত

বাঞ্ছনীয়, তাঁহারা জানেন না যে, যতক্ষণ মুক্ত হওয়া না যায়, ততক্ষণ যথার্থ প্রেম হইতেই পারে না। অনন্য-ভক্তিই যথার্থ প্রেম। কিন্তু এ সকল অন্য কথা। যাঁহারা প্রথম হইতেই আত্মসমর্পণ যোগের অনুশীলন করেন, তাঁহারা এখানে আসিয়া এই চিদাভাসরূপে—এই অস্মিতারূপে অবস্থান করিয়া, স্বকীয় বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য দৃঢ় প্রযত্ন করিলেও স্নেহ-বিহ্বলা মা আমার সে প্রযত্ন ব্যর্থ করিয়া দেন। স্নেহের সন্তানকে যতক্ষণ না সম্যক্ আত্মসাৎ করিতে পারেন, ততক্ষণ কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দেন না। শুম্ভের পুনঃ পুনঃ অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হওয়ার ইহাই রহস্য।

শুম্ভ যে শতচন্দ্র নামক চর্ম্ম (ঢাল) গ্রহণ করিয়াছিল, মন্ত্রে উহাকে সূর্য্যকিরণের ন্যায় নির্ম্মল বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই এই অস্মিতা-ক্ষেত্রের আত্মস্বরূপ-আবরক ভেদজ্ঞান অতিশয় উজ্জ্বল। পূর্ব্বে মহিষাসুর প্রভৃতিও এইরূপ খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু শুম্ভের খড়্গচর্ম্ম তদপেক্ষাও অতিশয় নির্ম্মল। যেহেতু, অস্মিতার সহিত আত্মার যে ভেদ, উহা অতি সামান্য—ভেদের আভাসমাত্র; সাধারণতঃ উহা প্রায় অভেদরূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে। তাই, ইহাকে উজ্জ্বল ও নির্ম্মল বলা যায়। যেরূপ কোন কাচাধারের মধ্যস্থিত অগ্নিশিখার উত্তাপে ও আলোকে স্বচ্ছ কাচাধারটীও অতিশয় উত্তপ্ত ও আলোকিত হইয়া থাকে, এবং দূর হইতে ঐ কাচাধাররূপ আবরণটীই অগ্নিরূপে প্রতিপন্ন হইতে থাকে, ঠিক সেইরূপ পরমাত্মার একান্ত সান্নিধ্যবশতঃ অতিশয় স্বচ্ছ অস্মিতাও বহুল পরিমাণে আত্মধর্ম্মী হয়, এবং স্বয়ংই আত্মারূপে প্রতিপন্ন হইতে প্রয়াস পায়। এইভাবটী বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রে "চর্ম্ম চার্ককরামলম্" বলা হইয়াছে। সাধক, একটু ধীরভাবে স্বকীয় অনুভূতির দিকে লক্ষ্য করিলেই এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ ॥১৪॥
চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্ ॥১৫॥

অনুবাদ। অশ্বহীন ছিন্নধনু এবং সারথিবিহীন সেই অসুর অম্বিকা-নিধনে উদ্যত হইয়া ঘোর মুদ্গর ধারণ করিল। সেই মুদ্গর আসিতে আসিতেই দেবী শাণিত শরাঘাতে ছিন্ন করিয়া দিলেন। তথাপি সে (শুম্ভ) মুষ্টি উদ্যমনপূর্ব্বক দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল।

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রিয় অশ্ব, প্রণব ধনুঃ এবং বুদ্ধি সারথি, এ সকলই বিনষ্ট হইয়াছে। সকল প্রয়োগই ব্যর্থ হইয়াছে—ইন্দ্রিয়সমূহ অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যূহ হইয়াও এখন আর অস্মিতার সহায়তাকল্পে উপস্থিত হয় না। প্রণবাদি মন্ত্রের উচ্চারণ; তাহাও নিরুদ্ধ হইয়াছে। তারপর সারথি—নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপা বুদ্ধি, তাহারও আর প্রকাশ নাই। বিষয় থাকিলে, তবে না বুদ্ধির প্রকাশ বুঝিতে পারা যায়। এখানে বিষয় বলিতে কিছুই নাই, সুতরাং বুদ্ধিও বিলুপ্ত। এইবার অসুর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ঘোর মুদ্গর গ্রহণ করিল, অর্থাৎ অস্মিতা মূঢ়ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। "আমি কিছুতেই আত্মাভিমুখী হইব না, আত্মার নিকট কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিব না, যেমন আছি, তেমনই থাকিব; তথাপি নিজ সত্তাকে কখনও আত্মসত্তায় বিলীন হইতে দিব না।" অস্মিতার এইরূপ যে দৃঢ় প্রত্যয়, উহাকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে শুম্ভের মুদ্গর-গ্রহণ বলা হইয়াছে। "এইরূপ মূঢ় অবস্থায় অবস্থান করিতে পারিলেই স্বকীয় বিশিষ্ট সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে; পক্ষান্তরে, আত্মস্বরূপটীও আবৃত থাকিবে।" অস্মিতার এই ভাবটীকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে "অম্বিকানিধনোদ্যতঃ" পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। আত্মস্বরূপকে আবৃত রাখিবার উদ্যমকেই অম্বিকা-নিধনের উদ্যম বলা হইয়াছে।

অস্মিতা এইরূপে আপনাকে অজ্ঞানাবৃত রাখিতে চাহিলেও, মা কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দেন না ; তিনি নিশিত শরপ্রয়োগে অর্থাৎ যাবতীয় দ্বৈতপ্রতীতি বিলয়কারক আত্মস্বরূপ-প্রকাশে শুম্ভের সে ঘোর মুদ্গর—অস্মিতার সে মূঢ়ভাব বিনষ্ট করিয়া দিলেন। মা যে আমার এখন অতি কোপনা চণ্ডিকা—তাঁহার ক্রোধের উদয় হইয়াছে ; সুতরাং আমিত্বকে—অস্মিতাকে কিছুতেই পৃথক্‌ভাবে থাকিতে দিবেন না। অস্মিতা নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার জন্য সহস্র চেষ্টা করিলেও চণ্ডিকা মা আমার তাহা ব্যর্থ করিয়া দিবেনই ; কারণ, একদিন এই 'আমিই' মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। যতক্ষণ সে সমর্পণের পরিসমাপ্তি না হয়, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না। সাধক ! বিপদে পড়িয়াই হউক, অশক্ত হইয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, একদিন যখন "মামেকং শরণং" নিয়াছিলে, আত্মার—মায়ের আমার শরণাগত হইয়াছিলে, তখন আর কিছুতেই রক্ষা নাই। যিনি যথার্থ আমি, তিনি প্রকাশিত হইবেনই। তোমার কল্পিত আমিত্বকে যে কোন প্রকারে বিনষ্ট করিবেনই ! ইহাই চণ্ডী-তত্ত্বের বিশেষ রহস্য। চণ্ডিকাদেবীর ইহাই বিশেষ কৃপা। তাই দেখ, অস্মিতার মূঢ় অবস্থারূপ শুম্ভের মুদ্গর-প্রয়োগও, চণ্ডিকার স্বপ্রকাশ-শক্তিপ্রভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল।

এত বিফলতায়ও কিন্তু আমিত্ব হতাশ বা নিষ্ক্রিয় হয় নাই। মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মুদ্গর-প্রয়োগ ব্যর্থ হইল দেখিয়া শুম্ভ তখন মুষ্টি উদ্যমনপূর্ব্বক দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল। মুষ্টি—বিক্ষেপ শক্তি। অস্মিতা বিক্ষেপ-শক্তি-প্রভাবে আত্মসত্তাকে দূরে সরাইয়া দিতে চায়। আত্মসত্তা দূরীকৃত হইলেই অস্মিতা স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে। সাধক ! এখানে যে বিক্ষেপের কথা বলা হইল, উহা চিত্তক্ষেত্রের বিক্ষেপ নহে। ইহা অস্মিতা ক্ষেত্রের বিক্ষেপ—অতি সূক্ষ্ম। চিত্ত-বিক্ষেপরূপ চিক্ষুর অসুরের নিধন-বিবরণ মহিষাসুরবধ প্রসঙ্গেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এখানে বৈষয়িক স্পন্দনরূপ বিক্ষেপের কথাই নাই। সাংখ্যের

ভাষায় এই অস্মিতার বিক্ষেপকে প্রকৃতির পরিণাম ধর্ম্মের সূক্ষ্মতম বীজ অবস্থা বলা যাইতে পারে; বেদান্তের ভাষায় ইহাকে অজ্ঞানের—মায়ার সূক্ষ্মতম অধ্যাসধর্ম্মের বীজ বলা যায়। স্থূল কথা এই যে, কোনরূপে বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞানের সূক্ষ্মতম বীজ থাকিলে, সময়ে উহাই আবার স্থূলে ঘনীভূত হইয়া ভেদজ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতে পারে; তাই মা আমার সে সূক্ষ্মতম বীজটুকু পর্য্যন্ত রাখিবেন না। তাই তিনি স্বয়ংই শুম্ভকে মুষ্টি উদ্যত করিয়া নিজের অভিমুখে অভিধাবিত হওয়ার জন্য প্রেরণা করিলেন, অর্থাৎ অস্মিতার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতম বিক্ষেপ-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করাইয়া দিলেন। ওগো, মায়ের আমার স্বপ্রকাশ-স্বরূপের নিকট কিছুই যে লুকাইয়া থাকিতে পারে না!

স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ ॥১৬॥
তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ ॥১৭॥

অনুবাদ। দৈত্যপুঙ্গব শুম্ভ দেবীর হৃদয়দেশে সেই মুষ্টি নিপাতিত করিল। দেবীও তাহার বক্ষঃস্থলে করতলদ্বারা আঘাত (চপেটাঘাত) করিলেন। করতল-প্রহারে অভিহত হইয়া দৈত্যরাজ ভূতলে নিপতিত হইল এবং পুনরায় উত্থিত হইল।

ব্যাখ্যা। আত্মাভিমুখী তীব্র আকর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া, সূক্ষ্মতম বিক্ষেপ-শক্তির আশ্রয়ে অনাত্মবোধরূপী অস্মিতার স্বকীয় সত্তা রক্ষা করিবার চেষ্টাই দেবীর হৃদয়ে অসুরের মুষ্টি-প্রহার। আত্মাকে দূরস্থ করাই অস্মিতার উদ্দেশ্য; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। অস্মিতা যতই আত্মাকে দূরস্থ এবং উৎপীড়িত করিতে প্রয়াস পায়, আত্মা ততই সন্নিহিত হইতে থাকেন। শুম্ভ দেবীর হৃদয়ে মুষ্টিপ্রহার করিল,

দেবীও শুম্ভের বক্ষঃস্থলে করতল প্রহার করিলেন। উভয়ে উভয়ের হৃদয়স্থান আহত করিল। হৃদয় বলিতে এখানে কেন্দ্রস্থান বুঝিতে হইবে। অনন্ত শক্তির যাহা কেন্দ্র, তাহাই মায়ের হৃদয়দেশ; এবং ব্যাপক অস্মিতা যে সূক্ষ্ম কেন্দ্র হইতে প্রকাশ পায়, তাহাই শুম্ভের বক্ষঃস্থল বা হৃদয়। এই উভয় হৃদয় যতক্ষণ এক হৃদয়ে পরিণত না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই ভেদ প্রতীতি দূরীভূত হয় না। হৃদয়ের মিলন না হইলে শুধু অঙ্গসংস্পর্শে বিরহ-বেদনা দূরীভূত হয় না। বেদান্ত-দর্শন হৃদয় শব্দের অর্থ আত্মাই করিয়াছেন। (হৃদি অয়ম্ ইতি হৃদয়ম্) প্রত্যক্ষ অনুভূত আত্মা হৃদয়দেশেই বিশেষভাবে প্রকটিত; তাই, আত্মার অন্য নাম হৃদয়। সুতরাং হৃদয়ের মিলন বলিলে, আত্মমিলনই বুঝা যায়। যতক্ষণ আত্মায় আত্মসাৎকৃত না হওয়া যায়,, ততক্ষণ হৃদয় মিলন হয় না; হৃদয়মিলন না হইলে অনাদিজন্মের বিরহজ্বালা বিদূরিত হয় না।

মা গো! কতদিন হইতে— জান্ স্মরণাতীত কাল হইতে তোরই বুকে আমার বুকখানা মিলাইয়া দিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছি, একবার শুধু মা বলিয়া তোর হৃদয়দেশে প্রবেশ করিব বলিয়া, কত লক্ষ লক্ষ জন্ম মৃত্যু, কত রোগ শোকের যাতনা সহ্য করিয়া আসিতেছি, কিন্তু পারি নাই। কিছুতেই তোমাতে আত্মহারা হইতে পারি নাই, ওগো আমার চির-বিশ্রাম, হে আমার চিরশান্তি, কিছুতেই তোমাতে মিলাইয়া যাইতে পারি নাই; শুধু বিরহের দাবানল জ্বালিয়া এই সংসারসন্তপ্ত হৃদয়খানা আরও বিদগ্ধ করিয়াছি। তোমার বক্ষে বক্ষোমিলনের যে কি শান্তি, তাহা অনুভব করিবার যোগ্যতা পর্য্যন্ত লাভ হয় নাই! মা গো, এইবার শেষ কর। এইবার বহুদিনের সঞ্চিত মিলন-বাসনা পূর্ণ কর; এইবার এতদিনের পর এস, তুমি আমি এক হইয়া যাই। যথার্থই মা, তোমার বিরহ আর আমরা ভোগ করিতে চাই না। তোমার বিরহের যে কি মর্ম্মভেদী পীড়া, তাহা বুঝিতে আর বাকি নাই মা! এইবার শুম্ভের মত আমাদের হৃদয়দেশেও করতল-প্রহার কর। আমাদের

হৃদয়ের যত কিছু মলিনতা, তাহা দূর হইয়া যাউক; তোমার পবিত্র অঙ্গস্পর্শে এ হৃদয়ও পূত হউক। আজ, শুম্ভ ধন্য; ধন্য শুম্ভের সমরাভিনয়। আজ তুমি মা, কর-প্রহারচ্ছলে শুম্ভের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছ। শুম্ভ আর বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হইবে না। তোমার পবিত্র স্পর্শে সেও পবিত্র হইয়া তোমাতে মিলাইয়া যাইবে। শুম্ভ যে যথার্থই তোমার জন্য তোমাকে চায়! সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তথাপি তোমায় চায়; তাই মা শুম্ভের প্রতি তোমার এই বিশিষ্ট কৃপা।

শুন, অস্মিতা বাস্তবিক আত্মাকেই চায়, আত্মায় মিলাইয়া যাইতে পারিলেই, তাহার যথার্থ শান্তি লাভ হয়। তবে, এই যে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রপ্রয়োগরূপ সমরাভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়, উহা পূর্ব্বসঞ্চিত ভেদজ্ঞানমূলক দুরপনেয় সংস্কারের সূক্ষ্মতম প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এ পার্থিব জগতেও অনেক সময় দেখা যায়—যে যাহার একান্ত প্রিয়, সময় বিশেষে সে তাহার সন্নিহিত হইলেও, প্রাণে প্রাণে তাহার সহিত মিলনের একান্ত বাসনা থাকিলেও, কার্য্যতঃ কিন্তু স্বয়ং দূরস্থ হইতে প্রয়াসী হয়; ঠিক এইরূপই শুম্ভ, অম্বিকার সর্ব্বমনোহর রূপে মুগ্ধ অস্মিতা, সত্য সত্যই আত্মাকে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত; কিন্তু বহুজন্ম সঞ্চিত অভ্যাসবশতঃ স্বকীয় সেই বিশিষ্টতাটুকু পরিত্যাগ করিতে পারে না; তাই আত্মপ্রেম আত্মসমররূপে পরিণত হয়। অতি অপূর্ব্ব এ তত্ত্ব।

সাধক দেখ, তোমরাও শুম্ভের ন্যায় মাতৃহৃদয়ে কতই মুষ্টিপ্রহার করিয়া মাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাও। কিন্তু একটু পশ্চাৎপদ হইলেই—মায়ের দিক হইতে একটু মুখ ফিরাইলেই বুকের মধ্যে কেমন একটা অব্যক্ত জ্বালা হইতে থাকে। আবার মাতৃআকর্ষণ অনুভব কর। আবার সে অপরূপ রূপ দেখিবার জন্য লালায়িত হও। রাগ করিয়া, অভিমান করিয়া, প্রহার করিয়া দূরে সরাইয়া দাও; আর "তোমায় দেখিব না" বলিয়া নয়নদ্বয়

মুদ্রিত কর; আবার কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হও। তাঁহাকে একটীবার না দেখিয়া থাকিতে পার না। কেন এরূপ হয়? মায়ের আকর্ষণ। মা যে তোমায় ছাড়েন না, তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেও তিনি তোমায় আত্মলীন করিতে চান; তাই এমন হয়।

সে যাহা হউক, অস্মিতার উপর আত্মার স্বপ্রকাশ-স্বরূপটীর বিশেষ উদ্ভাসনকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে দেবীর করতল-প্রহার কথাটী বলা হইয়াছে। এখানে একটু সাধনার কথাও বলিয়া রাখিতেছি—গুরুর হৃদয়ের সহিত স্বকীয় হৃদয় মিলাইয়া দিতে পারিলেই, এই দেবী এবং শুম্ভের পরস্পর হৃদয়দেশে আঘাতের রহস্য বুঝিতে পারা যায়। যথার্থই সে মিলনানন্দ দুঃসহ হইয়া উঠে—যেন আনন্দের যাতনা বলিয়া মনে হয়। তখন ইহাকে আনন্দের প্রহার বা পীড়ন না বলিয়া থাকা যায় না। অনুভব-সম্পন্ন সাধক ইহা সহজেই বুঝিয়া লইবেন।

উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা ॥১৮॥
নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্।
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্ ॥১৯॥

অনুবাদ। শুম্ভ উৎপতিত হইয়া দেবীকে গ্রহণপূর্ব্বক আকাশে অবস্থান করিতে লাগিল। চণ্ডিকা কিন্তু সেখানেও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আকাশে দৈত্য এবং চণ্ডিকা, পরস্পরের এরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহাতে সিদ্ধ মুনিগণেরও বিস্ময় জন্মিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। অস্মিতা যখন দেখিল যে, কোন উপায়েই আত্মাকে আত্মসাৎ করা যায় না, বরং নিজেকেই আত্মায় আত্মসাৎ হইয়া যাইতে হয়, তখন উপায়ান্তর অভাবে দেবীকে লইয়া শূন্যে উৎপতিত হইল, অর্থাৎ আত্মার শূন্যত্ব অনুভব করিতে চেষ্টা করিল। আত্মা বলিয়া

বাস্তবিক কিছুই নাই; আত্মা শূন্যমাত্র, অভাবই ত আত্মার স্বরূপ! যাহা অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ ইত্যাদি নেতি নেতি মুখে প্রতিপাদ্য; সর্ব্বভাবের অভাবই যাহার স্বরূপ, তাহা শূন্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে! (ইহা আধুনিক বৌদ্ধবাদ, পূর্ব্বে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে।) যথার্থই অধিকাংশ সাধক এখানে আসিয়াও আত্মাকে গাঢ় সুষুপ্তিবৎ একটা অভাবস্বরূপ বস্তু বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বভাব বিলয় করিয়া শূন্যরূপে অবস্থান করাই জীবের চরম পুরুষার্থ মনে করিয়া অভাবরূপে—শূন্যরূপে অবস্থানকেই আত্মস্থিতি বা ব্রাহ্মী-স্থিতি বলিয়া বুঝিয়া লয়েন। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে দেবীকে লইয়া শুম্ভের আকাশে উৎপতন বলা হইয়াছে। কিন্তু হায়! শূন্যে অবস্থান করিয়াও শুম্ভের পরিত্রাণ নাই; এখানে আসিয়াও দেবী শুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শূন্য বা অভাব বলিয়া আত্মার বারংবার নিষেধ করিলেও, সেই অভাবের বিজ্ঞাতৃরূপে যিনি থাকিয়া যান, তিনিই ত আত্মারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং শূন্য বলিয়াই বা পরিত্রাণ পাওয়া যায় কই! শূন্য যে আছে, এই কথাটা বলিয়া দিবার জন্য আত্মার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অস্মিতা আত্মাকে প্রতিষেধ করিতে চায়, আর আত্মা শূন্যের বিজ্ঞাতৃরূপে স্বয়ং পূর্ণ হইয়া শূন্যবাদকে নিরাকরণ করিয়া অবস্থান করেন, ইহাই দেবী এবং শুম্ভের পরস্পর আকাশযুদ্ধের রহস্য।

এই আকাশ-যুদ্ধ যথার্থই বিস্ময়কর। একদিকে আত্মা নিষিদ্ধ হইয়াও, শূন্যমাত্ররূপে পর্য্যবসিত হইয়াও, পূর্ণত্ব—স্বপ্রকাশত্ব লইয়া অভিব্যক্ত হইতে থাকেন। আর অন্যদিকে যাহার পরমার্থতঃ কোন সত্তাই নাই, সেই অস্মিতা স্বয়ং সত্তাবিশিষ্ট হইতে উদ্যত হয়। সুতরাং এ যুদ্ধ বড়ই বিস্ময়কর। অবশ্য সকলের পক্ষে বিস্ময়কর না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা সিদ্ধ, যাহারা মুনি, অর্থাৎ যাহারা আত্মলাভে চরিতার্থ, যাহারা মননশীল যোগী, তাহাদের নিকট এ যুদ্ধ বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তাই মন্ত্রে এ যুদ্ধকে "সিদ্ধমুনি-

বিস্ময়কারক” বলা হইয়াছে। সত্যই সাধক ব্যতীত এ যুদ্ধ-রহস্য কে বুঝিবে? একবার মনে হয়—আত্মা শূন্যমাত্র, আবার মনে হয়—না, আত্মা শূন্য নয়, আত্মাই পূর্ণ।

ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥২০॥
স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥২১॥

অনুবাদ। অনন্তর দীর্ঘকাল তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অম্বিকাদেবী শুম্ভকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপপূর্ব্বক ঘূর্ণন করতঃ ধরণী-পৃষ্ঠে নিপাতিত করিলেন। নিক্ষিপ্ত ও ভূমিতলপ্রাপ্ত সেই দুষ্টাত্মা শুম্ভ পুনরায় মুষ্টি উদ্যমনপূর্ব্বক চণ্ডিকাকে নিধন করিবার ইচ্ছায় সবেগে অভিধাবিত হইল।

ব্যাখ্যা। এই আকাশ-যুদ্ধ—এই শূন্যত্বের ধাঁধা দীর্ঘকাল চলে। অধিকাংশ সাধকই বাক্য মনের অগোচর বস্তুকে সুষুপ্তিবৎ, অজ্ঞানবৎ, শূন্যবৎ একটা কিছু বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। আত্মা যে স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু, তাঁহাকে সহস্রবার নাই নাই বলিলেও ঐ নিষেধের বিজ্ঞাতৃরূপে তিনি স্বয়ং থাকিয়া যান, ইহা প্রথমতঃ বুঝিতে না পারিলেও সাধকমাত্রেই শেষে ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। যে দিন আত্মার পূর্ণত্ব আনন্দময়ত্ব উদ্ভাসিত হয়, সেই দিনই এই শূন্যত্বের ধাঁধা চলিয়া যায়। সেইদিন হইতেই অস্মিতা নিজের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া পড়ে। আত্মার প্রতিষেধ ত কিছুতেই হয় না! তবে “আমি” বলিয়া যাহা বুঝিতেছি, উহা কি নাই? এইরূপ নিজের অস্তিত্ববিষয়ক সংশয় ও আশঙ্কা উপস্থিত হয়। মন্ত্রে ইহাই শুম্ভের শূন্যমার্গে ঘূর্ণনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অস্মিতার তখনকার অবস্থা যথার্থ বিঘূর্ণিতমস্তক-পুরুষের ন্যায় হইয়া পড়ে। “কি সর্ব্বনাশ। আমিটাই নাই! তবে আমিও কি স্থূল জগতের মত দৃশ্যমাত্র—কল্পনামাত্র!” এইরূপ ভাবটীকে লক্ষ্য করিয়াই

মন্ত্রে দেবীকর্ত্তৃক শুম্ভের ধরাতলে নিক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে। যখন আত্মসত্তা একটু বিশেষভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন প্রত্যেক সাধকের হৃদয়েই এইরূপ ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এইবার শুম্ভের শেষ চেষ্টা। দেবীকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ও ধরণীপ্রাপ্ত হইয়াও অর্থাৎ স্থূল জগতের ন্যায় দৃশ্য—কল্পিত—তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকররূপে প্রতীয়মান হইয়াও একবার নিজ সত্তাটী বজায় রাখিবার জন্য সেই দুরাত্মা—সেই মিথ্যাভিমানরূপী অস্মিতা আবার চণ্ডিকানিধনের ইচ্ছায় মুষ্টি উত্তোলন করিল। চণ্ডিকাকে নিধন করাই শুম্ভের অভিপ্রায়। কোনরূপে আত্মসত্তাকে তিরস্কৃত করিতে পারিলেই অস্মিতার স্বকীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে; তাই মন্ত্রে শুম্ভের পুনরায় মুষ্টি উদ্যমন কথিত হইয়াছে। যদিও চণ্ডিকাকে একেবারে নিধন করা একান্তই অসম্ভব; তথাপি যতটা সম্ভব উহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে পারিলেও অস্মিতার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সেই জন্যই শুম্ভের এই পুনরায় মুষ্টি-উদ্যমনরূপ বিশেষ প্রযত্ন প্রকাশ পাইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাই শুম্ভের চরম উদ্যম।

তমায়াস্তং ততো দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরম্।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি ॥২২॥

অনুবাদ। সেই সর্ব্বদৈত্যাধিপতি যখন (এইরূপভাবে) আসিতে লাগিল, তখন দেবী শূলের দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করতঃ ভূতলে নিপাতিত করিলেন।

ব্যাখ্যা। এতদিনে শুম্ভের অবসান হইল। অস্মিতা সর্ব্ববিধ দ্বৈতপ্রতীতির আশ্রয় বলিয়াই, এখানে শুম্ভকে সর্ব্বদৈত্যাধিপতি বলা হইয়াছে। যাবতীয় অনাত্মপ্রতীতি যে একমাত্র আমিত্বের আশ্রয়েই অবস্থিত ইহা একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। যদিও সাধারণভাবে আমি বলিলে—স্থূল দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত, এবং

পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমন্বিত একটা কিছু প্রতীয়মান হয়, তথাপি যাঁহারা অস্মিতা ক্ষেত্রের সাধক, তাঁহারা ঐ সর্ব্বভাবের সহিত অন্বিত অথচ একান্ত বিবিক্ত আমিত্বকে বিশেষভাবে ধরিতে বা বুঝিতে পারেন। যতদিন কেবলানন্দময় জ্ঞস্বরূপটীর আভাসও না আসে, ততদিন ঐ আমিত্বের বিকাশ হয় না। বহুজন্মসঞ্চিত সুকৃতির ফলে, শ্রীগুরুর অহৈতুক কৃপায়, মায়ের অতুলনীয় স্নেহে, সাধক বিশুদ্ধ বোধমাত্রস্বরূপে উপনীত হইয়া, এই মিথ্যা অভিমান বা অস্মিতারূপী অসুরের হাত হইতে চির পরিত্রাণ লাভ করেন। ইহাই শুম্ভবধের রহস্য।

দেবীর শূলাঘাতে মহাসুর শুম্ভ জগতীতলে নিপতিত হইল। কেবলানন্দময় বোধস্বরূপের সম্যক্ প্রকাশ হওয়াই দেবীর শূলাঘাত। পূর্ব্বে শূল শব্দের আনন্দময় ত্রিপুটীরূপ অর্থ করা হইয়াছিল। এখানে কিন্তু শূল শব্দে ত্রিপুটীবিহীন কেবলানন্দময় জ্ঞস্বরূপটী বুঝিতে হইবে। উহার উদয়ে অস্মিতা অর্থাৎ যাবতীয় অনাত্মভাবের বীজ সম্যক্ বিলয়প্রাপ্ত হয়। "জগত্যাং পাতয়ামাস"—মা শুম্ভকে জগতে নিপাতিত করিলেন। জগৎ অর্থাৎ দৃশ্য বা জড়বস্তু বলিয়া যেরূপ কিছুই নাই, কখনও ছিল না, কখনও থাকিবে না; ঠিক সেইরূপ আমিত্ব বলিয়া কিছুই নাই, ছিল না এবং থাকিবে না। যাহা আছে, অস্তিরূপে যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা আমি নহে—আত্মা। যে আমি এতদিন সর্ব্বাধিপতিরূপে প্রতীত হইত, যে আমি এতদিন সর্ব্বভাবের জ্ঞাতা এবং অধিষ্ঠাতৃরূপে প্রতীত হইত, সেই আমি নাই—তিনকালেই নাই।

সাধক! ইহাই শুম্ভবধ। যে আমিকে লইয়া কত লক্ষ লক্ষ জন্ম-মৃত্যুর পেষণ সহ্য করিয়াছ, যে আমিকে লইয়া কত স্বর্গ নরক ভ্রমণ করিয়াছ, যে আমিকে কতবার কত রকম সাজে সাজাইয়াছ, যে আমিকে বদ্ধ মনে করিয়া, উহাকে মুক্ত করিবার জন্য কত কঠোর সাধনা করিয়াছ, এইবার দেখ—সেই আমি নাই—তিন কালেই নাই। তুমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা। তুমি অভয় অমৃত সত্য! তুমি ব্রহ্মই! তোমাতে জন্মমৃত্যু নাই, বন্ধনমুক্তিও নাই। তুমি নিত্যমুক্ত। ইহাই পরমলাভ।

ইহাই পরম পুরুষার্থ। পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, আমিকে না হারাইলে মাকে পাওয়া যায় না। আজ এতদিনের পর আমিকে হারাইয়াছ, আজ আমি নিপতিত; মাতৃস্বরূপ—আত্মস্বরূপ স্বতঃ উদ্‌ভাসিত। ইহারই নাম মাতৃলাভ।

এইবার শুন—শুম্ভ শব্দের অর্থ নিত্য নিহত। পূর্ব্বে শুন্‌ভ ধাতুর অর্থ শোভা বলিয়া আসিয়াছি। ঐ শুন্‌ভ ধাতুর আরও একটী অর্থ হয়—বধ। যাহার বধ হইয়াই রহিয়াছে—যাহা নিত্যই নিহত অর্থাৎ যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার নাম শুম্ভ। শুম্ভকে দার্শনিকের ভাষায় অসম্ভব ভবিষ্যৎ বলা যায়। আমি এবং আমির আশ্রিত এই জগৎ নিতান্ত অসম্ভব বস্তু। ব্রহ্মে জগৎ বলিয়া কোন কিছুই নাই, কখনও থাকিবে না। ইহাই সত্য। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই যথার্থ সত্য-প্রতিষ্ঠা বা ব্রাহ্মীস্থিতি।

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নে জগতের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া শ্রীবশিষ্ঠদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইখানে একটু বলা আবশ্যক। "কোনও অরাজক রাজ্যে এক রাজা বাস করিতেন, তিনি অবিবাহিত, তাঁহার দুই পত্নী, উভয়ই বন্ধ্যা। তাঁহাদের দুইটী পুত্র মৃগয়া করিবার জন্য এক বৃক্ষহীন অরণ্যে প্রবেশ করিল"। ইত্যাদি উপাখ্যানটী যেরূপ কিছুই নহে, কেবল ধাত্রীক্রোড়স্থ অনাবিষ্ট শিশুকে শান্ত করিবার জন্য কতকগুলি শব্দমাত্র; ঠিক সেইরূপ এই জগৎ, এই আমি, এই চিদাভাস, এই অস্মিতা, ইহার কিছুই নাই। একমাত্র আত্মা—মা-ই আছেন। তিনিই সৎ, তিনিই চিৎ, তিনিই আনন্দ। আর কোথায়ও কিছু নাই।

সাধক, একদিন গীতাতত্ত্বের অবসানে শ্রীগুরুর মুখোচ্চারিত অপূর্ব্ব বাণী—'মামেকং শরণং ব্রজ' শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলে; তোমার আমিটীকে তাঁহারই চরণে শরণাগত করিয়াছিলে। এত দিনের পর তাহার সার্থকতা দেখিতে পাইলে। দেখ—তোমার সেই শরণাগত আমিটীকে কত বিভিন্ন ভাবের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে পবিত্র করিয়া, মা

আজ আত্মসত্তায় মিলাইয়া লইলেন। তোমার শরণাগতির যথার্থ ফল-লাভ হইল। জীব তুমি ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে। বল—"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম। ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দং বিভাতি মে স্পষ্টং। ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষতেঽদ্য। ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বস্য অজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি। ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্ত্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ। ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্ব্বমদ্য সম্পন্নম্।"

স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্ ॥২৩॥

অনুবাদ। দেবীর শূলাগ্রদ্বারা বিশেষরূপ আহত হওয়ায় সেই অসুর গতপ্রাণ হইয়া, সসাগরা সদ্বীপা সপর্ব্বতা সমগ্র পৃথিবীকে পরিচালিত করিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল।

ব্যাখ্যা। শুম্ভ যখন দেবীর শূলে আহত ও গতাসু হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইয়াছিল, তখন সমুদ্র দ্বীপ পর্ব্বতাদি সহ সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, ইহাই মন্ত্রের স্থূল অর্থ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—গুণত্রয়ের পরস্পর সংক্ষোভ-তারতম্য বশতঃ যে সপ্তধাভেদ হয়, তাহাই সপ্ত সমুদ্র; এবং মূলাধারাদি যে সাতটী বিশিষ্ট অনুভূতি কেন্দ্র, তাহাই সপ্তদ্বীপ; এবং স্থূল—জড়ত্ব বোধগুলিই পর্ব্বতস্থানীয়। অস্মিতার বিনাশে ইহারা সকলেই বিচলিত হইয়া উঠে। কারণ, এসকলই আমিত্বের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। আমিত্ব বিনষ্ট হইলে আর ইহাদের সত্তা কিরূপে থাকিবে?

যতদিন প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহের সম্যক্ নিঃশেষ না হয়, ততদিন এই দেহাদিবিষয়ক বোধ অর্থাৎ অনাত্মবোধের পুনরাবর্ত্তন হয়। সাধক যখন আত্মস্বরূপে অবস্থান করে, তখন উহাদের চিহ্নমাত্র থাকে না, কিন্তু আত্মস্বরূপ হইতে ব্যুত্থিত হইলেই আবার অনাত্মবোধ ফুটিয়া উঠে।

সর্পভ্রান্তির নিবৃত্তি হইলেও—রজ্জু বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান নিশ্চয় হইলেও সর্পজ্ঞান-সমকালীন উৎপন্ন ভীতি হৃৎকম্প প্রভৃতি লক্ষণ কিছু কাল থাকিয়া যায়। আত্মার প্রকাশে অস্মিতা অবধি অর্থাৎ প্রকৃতি পর্য্যন্ত যাবতীয় অনাত্ম-বস্তুর সত্তা সম্যক্ বাধিত হইয়া যায়; তথাপি যাবৎ-প্রারব্ধ উহাদের অনুবর্ত্তন হয়। তাহার ফলে স্থূলদেহ ধারণ, লোকশিক্ষা, উপদেশ, শাস্ত্র-প্রণয়ন, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যোগদর্শন ইহাকে "নির্ম্মাণ-চিত্তের ফল" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞ পুরুষ অস্মিতামাত্র হইতে বিশ্বমঙ্গলের জন্য অভিনব চিত্ত নির্ম্মাণ করিয়া, সেই নির্ম্মাণ-চিত্তের আশ্রয়ে নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যোগদর্শন যাহাকে নির্ম্মাণচিত্ত বলেন, বেদান্ত তাহাকেই বাধিতানুবৃত্তি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ উভয় মতে কিছুই বিরোধ নাই। সে যাহা হউক, সাধক যখন অস্মিতাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মস্বরূপে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, তখন যথার্থই পৃথ্বী সমুদ্র দ্বীপ এবং পর্ব্বত অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর কম্পিত হইয়া উঠে; কারণ, ইহারা যে চিরতরেই সত্তাহীন হইতে চলিয়াছে। কোন কোন সাধকের সমাহিত হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে দেহাদির অল্পাধিক কম্পন স্থূলেই পরিলক্ষিত হয়। সে যাহা হউক, যতদিন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি না হয়, ততদিন দেহাদি অনাত্মবস্তুর ভাণ হইবেই। প্রারব্ধ নিঃশেষরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, সাধক বিদেহ কৈবল্য লাভ করে, তখন আর অনাত্মবস্তুর ভাণও হয় না। প্রারব্ধ-সংস্কারের মধ্যে যেগুলি আত্মজ্ঞান লাভের পক্ষে বিশেষ অন্তরায়, তাহাদিগকেই আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রবল প্রারব্ধ বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছি। এই প্রবল প্রারব্ধ সংস্কারগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। ইহাকেই সাধনার ভাষায় রুদ্রগ্রন্থি ভেদ বলে। এই জগৎ, এই দেহাদি, ইহারা যে বিজ্ঞান মাত্র, এইরূপ প্রতীতির নামই রুদ্র-গ্রন্থি। ইহার ভেদ হওয়াকে রুদ্রগ্রন্থিভেদ কহে। বস্তুতঃ জগৎ বলিয়া, দেহ বলিয়া, অনাত্মা বলিয়া কোথাও কিছু নাই, কখনও ছিল না, কখনও থাকিবে না।

জগতের সত্তা তিন কালেই নাই। এক অদ্বিতীয় আত্মা—মা আমার নিত্য বিরাজিত। আত্মাতিরিক্ত কোথাও কিছুই নাই। এইরূপ উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার নামই রুদ্রগ্রন্থি ভেদ। যাহা চিন্মাত্রস্বরূপ তাহাতে চেত্য বলিয়া কিছু নাই, থাকিতে পারে না। যাহা অনুভূতিমাত্র-স্বরূপ, তাহাতে অনুভাব্য বলিয়া কিছু নাই, থাকিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে এই ক্ষেত্রে এই পরমাত্ম-স্বরূপে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কিছুই নাই। আত্মা নিত্য স্বচ্ছ, নিত্য নিরঞ্জন, নিত্য বিশুদ্ধ। বুঝিতে পারিলে কি সাধক! রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হয় বটে, কিন্তু সেজন্য রজ্জুতে কখনও সর্প বলিয়া কিছু থাকে না। রজ্জুর সর্পভাব যেরূপ কখনও নাই, ঠিক সেইরূপ আত্মায় জগদ্ভাব কখনও নাই। এইরূপ ভাবে আত্মোপলব্ধি হওয়ার পর, ব্যুত্থিত অবস্থায় আত্মার প্রতি যে স্বাভাবিক একান্ত অনুরাগ থাকে, উহাকেই অহৈতুক ভক্তি বলে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে আত্মারাম শ্লোকে এই অহৈতুক ভক্তির কথাই বর্ণিত হইয়াছে। আত্মার প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং জগতের সত্তাভাব-বিষয়ক নিশ্চয়জ্ঞান, এই উভয়ই সাধককে সর্ব্বথা নিস্পৃহ অর্থাৎ পর-বৈরাগ্যবান্ করিয়া রাখে। সে যাহা হউক, এইরূপে মায়ের কৃপায় সাধকের ব্রহ্ম-বিষ্ণু ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হয়, সাধক জীবন্মুক্ত হয়, তাহার সকল বন্ধন ঘুচিয়া যায়, সে নিত্য মুক্ততার আস্বাদ পায়।

উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥২৪॥

অনুবাদ। পূর্ব্বে যে সকল মেঘ উল্কাযুক্ত থাকিয়া উৎপাত-সূচক ছিল, শুম্ভাসুর নিপতিত হওয়ায়, এখন তাহারা প্রশান্তভাব ধারণ করিল এবং সরিৎসমূহ মার্গবাহিনী হইল। (পূর্ব্বে ইহারা উন্মার্গ গামিনী ছিল।)

ব্যাখ্যা। আমি নাই, সুতরাং উৎপাতও কিছু নাই। পূর্ব্বে যে

দুর্ব্বহ সংসারচিন্তার ভার ছিল, এখন আমির অভাবে তাহা সম্যক্ দূরীভূত হইয়াছে। সংসার চিন্তার কথা ছাড়িয়া দাও, পূর্ব্বে সাধনা-রাজ্যেরই কত দুশ্চিন্তা ছিল। কিরূপে এই দুর্জ্জয় মন ও দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গুলি বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপে সিদ্ধিশক্তিলাভ হইবে, কিরূপে অনাদি জন্ম সঞ্চিত কর্ম্মরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি কতই না দুশ্চিন্তা ছিল, ঐ দুশ্চিন্তারূপ মেঘসমূহ আবার কত হতাশ, কত অবিশ্বাস ও সন্দেহরূপ উল্কাযুক্ত ছিল; এখন তাহারা প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। আর ভাবিবার কিছু নাই, আর করিবার কিছু নাই, হতাশ বলিয়া কিছু নাই, আশা বলিয়াও কিছু নাই। আমিত্ববোধ বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল আপনা হইতেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে; তাই, মন্ত্রে উৎপাতসূচকমেঘসমূহের সৌম্যভাব ধারণ বর্ণিত হইয়াছে। আর সরিৎ সকল অর্থাৎ দেহস্থ শক্তিপ্রবাহ সমূহ নিজ নিজ পথে প্রবাহিত হইল। ইতিপূর্ব্বে সাধনার জন্যই হউক, আর সাংসারিক চিন্তার ভারেই হউক, উহারা উৎপথগামী ছিল; এখন আর দুশ্চিন্তা নাই, সুতরাং তাহারা স্ব স্ব পথে শান্তভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমিত্ব বিলয়ের পর সাধকের স্থূল শরীর পর্য্যন্ত অনেকটা প্রশান্তভাব ধারণ করে। যতদিন শুম্ভ থাকে, যতদিন অস্মিতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে, ততদিন নানারূপ উৎপাত, নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উহার বিলয়ে সকলই সৌম্যভাব ধারণ করে, সকলই প্রশান্ত হইয়া যায়। আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভের পর সাধকের যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই এই মন্ত্রে এবং পরবর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অনুভূতি সম্পন্ন সাধকগণ নিশ্চয়ই এ সকল লক্ষণ লক্ষ্য করিতে পারেন।

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলং চাভবন্নভঃ ॥২৫॥

অনুবাদ। সেই দুরাত্মা অসুর নিহত হওয়ায়, অখিল সংসার

প্রসন্নতালাভ করিল, জগৎ স্বাস্থ্য লাভ করিল এবং আকাশ অতিশয় নির্ম্মল হইল।

ব্যাখ্যা। অস্মিতা বিনষ্ট হইলে অখিল সংসার যথার্থই প্রসন্নতা লাভ করে। পূর্ব্বে—যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইত, সেই দিকেই যেন একটা অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্টিগোচর হইত; কারণ তখন "আমি কর্ত্তা" এই বোধ ছিল, এখন আর তাহা নাই; যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই প্রসন্নভাব পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র আত্মসত্তাই যে সর্ব্বত্র সম্যক্‌ভাবে উদ্ভাসিত, এইরূপ উপলব্ধিতে অবস্থান করিতে পারিলে, অপ্রসন্নতা বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। সাধক! তোমার আমিটাও যখন এইরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমিও অখিল সংসারকে প্রসন্নময় দর্শন করিবে।

"জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ"—জগৎ স্বাস্থ্যকে লাভ করিল। স্বতে অবস্থান করার নাম স্বস্থ, অর্থাৎ আত্মস্থ। স্বস্থের ভাবকে স্বাস্থ্য বলে। আত্মসত্তা সর্ব্বত্র সুপ্রকাশিত, সুতরাং জগৎটা স্বস্থভাবেই অবস্থিত। জগৎ বলিয়া এখন আর পৃথক্ কিছুই নাই, সকলই স্ব হইয়া গিয়াছে।

আকাশ নির্ম্মল হইল। বিজ্ঞানময় আকাশে আর কোনরূপ মলিনতা অর্থাৎ বিশিষ্টতা নাই। পূর্ব্বে বহুত্বের আবরণে বিজ্ঞানাকাশ মলিন ছিল, এখন অস্মিতা বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহুত্ব প্রতীতির উচ্ছেদ হইয়াছে; সুতরাং উহা সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হইয়াছে।

ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষ-নির্ভর-মানসাঃ।
বভুবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ ॥২৬॥
অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ ॥২৭॥

অনুবাদ। সেই অসুর নিহত হওয়ায় দেবতাগণ অতিশয়

হৃষ্টচিত্ত হইলেন, এবং গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর গান করিতে লাগিল। অপর কতিপয় গন্ধর্ব্ব বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল, পুণ্যবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং দিবাকর উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট হইলেন।

ব্যাখ্যা। শুম্ভের পতনে দেবতা গন্ধর্ব্ব অপ্সরা চন্দ্র সূর্য্য সকলেই আনন্দিত। সকলেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যরূপী দেবতাবৃন্দের আর উদ্বিগ্নতা নাই, ইন্দ্রিয়গণ প্রশান্ত হইয়াছে। চৈতন্যরাজ্য অক্ষুণ্ণ। দেবতাগণের যজ্ঞভাগ অপহৃত হইবার আশঙ্কা নাই; সুতরাং তাঁহারা হর্ষনির্ভর-মানস হইলেন। আর গন্ধর্ব্বগণ—নাদাধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ সুমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিল। আনন্দ-মঙ্গল গান করিয়া লব্ধ আনন্দকে আরও বিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল। এ যাবৎ গন্ধর্ব্বগণ শুম্ভের প্রভাবে অভিভূত ছিল; তাই তাহারা তান-লয়-হীন নানাবিধ শব্দের অভিঘাতে বিব্রত ছিল। এখন শব্দাধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দ প্রশান্ত হইয়া, শব্দগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

শুন—আত্মলাভের পর সাধকের উচ্চারিত শব্দগুলি মধুর হয়। তাহার কণ্ঠস্বরে একটা সুমধুর আকর্ষণভাব থাকে। পূর্ব্বে যে শব্দ যেরূপ ভাবে উচ্চারণ করিত, তাহা সকলের চিত্তাকর্ষক হইত না; কিন্তু এখন গালি দিলেও তাহা মধুর হইয়া থাকে, যাহাদিগকে গালি দেওয়া যায়, তাহারাও মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করে না, বরং অন্তরে অন্তরে আনন্দিত হইয়া থাকে। গন্ধর্ব্বগণের প্রসন্নতার ইহাই ফল।

অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল—পুলক এবং অঙ্গকম্পনাদিরূপ সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। যোগের প্রথম অবস্থায় ইহারা চিত্তবিক্ষেপের সহকারী বলিয়া সাধনার অন্তরায়স্বরূপ হয়; কিন্তু অস্মিতা-বিনাশের পর, স্বপ্রকাশ আনন্দময় আত্মস্বরূপে উপনীত হইবার সময়ে যে অঙ্গকম্পনাদি হইয়া থাকে, উহা আনন্দসূচক, বিক্ষেপকারক নহে। আত্মায় বিক্ষেপ বলিয়া কিছু নাই; বিক্ষেপ চিত্তেরই ধর্ম্ম;

সুতরাং এস্থলে অঙ্গকম্পনাদিরূপ বাহ্যবিক্ষেপ পরিলক্ষিত হইলেও তাহাতে আত্মোপলব্ধির কিছুই ব্যাঘাত হয় না, বরং বিশেষ আনন্দোপলব্ধির সূচনা করে।

ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ—পুণ্যবায়ু প্রবাহিত হইল। আত্মসাক্ষাৎকারের পর সত্য সত্যই বায়ুমণ্ডলকে পবিত্র ও আনন্দময় বলিয়া মনে হইতে থাকে, তখন মধুময় আনন্দময় প্রিয়তম আত্মার স্বরূপটী সর্ব্বত্র প্রতিভাত হইতে থাকে, তাই সত্যদর্শী ঋষিদিগের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—"মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।" একটী গানেও শুনিয়াছিলাম—"তোমাতে যখন মজে আমার মন, তখনি ভুবন হয় মধুময়।"

এইরূপ কেবল বাহ্য বায়ুমণ্ডলই যে পুণ্যময় আনন্দময় হয়, তাহা নহে, আভ্যন্তরিক প্রাণাদি পঞ্চবায়ুও তখন পবিত্র ও মধুময় হইয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে আমরা এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করিবার সুযোগ পাই নাই; সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এইখানেই সঙ্ক্ষেপে উহার আলোচনা করিতে হইল। আন্তর বায়ু পাঁচটি, যথা—প্রাণ অপান ব্যান উদান এবং সমান। সাধারণতঃ ইহারা বায়ুরূপেই পরিচিত। বাস্তবিক কিন্তু বায়ু ইহাদের অতিস্থূল রূপ। আমরা এখানে ঐ স্থূল রূপ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে যাইব না; কারণ, উহার স্বরূপ, ক্রিয়া এবং স্থান অনেকেই জানেন। কেবল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রাণাদির যে স্বরূপের উপলব্ধি হয়, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রাণাদি পঞ্চও করণবিশেষ। জীবের করণ দ্বিবিধ—অন্তঃ করণ এবং বাহ্য করণ। অন্তঃকরণ চারিটী—মন বুদ্ধি চিত্ত এবং অহঙ্কার। বাহ্য করণ ত্রিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি পঞ্চ। সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ হইতে যথাক্রমে উক্ত ত্রিবিধ করণ উৎপন্ন হয়। যেরূপ সত্ত্বগুণের করণ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিতে প্রকাশভাব প্রধান, এবং রজোগুণের করণ কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহে ক্রিয়াভাব প্রধান; সেইরূপ তমো-

গুণের করণ বলিয়াই প্রাণাদির ধৃতিভাব প্রধান। প্রাণ বলিলে বহিরাগত বোধবিশেষের ধৃতিভাব বুঝায়। অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শ হইতে যে আভ্যন্তরিক বোধবিশেষ ফুটিয়া উঠে, সেই বোধের যাহা অধিষ্ঠান, তাহাকে ধরিয়া রাখাই প্রাণের কার্য্য। মনে কর—তুমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপান করিতেছ। এ স্থলে ঐ জলরূপ বাহ্যবস্তুর সহিত কণ্ঠনালী প্রভৃতির সংস্পর্শবশতঃ পিপাসা নিবৃত্তিরূপ একটা বোধ ফুটিয়া উঠে; যে শক্তি ঐ বোধটীকে ধরিয়া রাখে, তাহাই প্রাণ।

শরীরস্থ মলাপনয়নের যে শক্তি, তাহার যে অধিষ্ঠান, তাহাকে ধারণ করাই অপানের কার্য্য। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার যে শক্তি, তাহার যে অধিষ্ঠান, তাহাকে ধারণ করাই ব্যানের কার্য্য। এইরূপ শরীরস্থ রস-রক্তাদি ধাতুগত যে বোধ, তাহার অধিষ্ঠানকে ধরিয়া রাখাই উদানের কার্য্য, এবং অন্ন পানীয় দ্বারা শরীর গঠন করিবার যে শক্তি, তাহার অধিষ্ঠানকে ধরিয়া রাখাই সমানের কার্য্য। এই পঞ্চবিধ ধৃতিশক্তিদ্বারাই এই স্থূল শরীর গঠিত স্থিত এবং লয়প্রাপ্ত হয়। আবার উহারা যখন প্রতিলোমভাবে ক্রিয়া করে, তখনই স্থূলশরীর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহারাও অস্মিতারই বিভিন্ন স্ফুরণ। এই পঞ্চপ্রাণশক্তিই প্রাণময় কোষের যথার্থ স্বরূপ।

সে যাহা হউক, মাতৃলাভের পর অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ হইতে ব্যুত্থিত হইলে যে কেবল চিত্তেরই প্রশান্ত ভাব হয়, তাহা নহে; চিত্তের প্রসন্নতা হেতু যেরূপ জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রাণাদি পঞ্চতত্ত্বেরও প্রসন্নতা লাভ হয়। তাহার ফলে স্থূল শরীরটী পর্য্যন্ত আনন্দঘনরূপে বোধ হইতে থাকে। শরীরের প্রত্যেক পরমাণুটী যেন আনন্দের কণা, এইরূপ প্রতীতি হয়। শরীরস্থ বায়ুপ্রবাহ পুণ্যময় হওয়ার ইহাই লক্ষণ।

ওগো, একবার আত্মবোধে উপনীত হইলে—একবার আমার আদরিণী মায়ের কোলে উঠিলে, সত্য সত্যই এমনটী হয়। প্রাণ মন ইন্দ্রিয়, এমন কি স্থূলদেহ পর্য্যন্ত এক অপূর্ব্বরসে রসময় হইয়া পড়ে।

অপার্থিব সে রস, অননুভূত তাহার আস্বাদন, বিস্ময়কর সে মিলন-রহস্য, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই তাহার স্বরূপ।

জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মহাত্ম্যে শুম্ভবধঃ।

অনুবাদ। হোমাগ্নি সকল শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং উৎপাতসূচক দিগ্‌নিস্বনসমূহ প্রশান্তভাব ধারণ করিল।

ইতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয়
দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শুম্ভবধ।

ব্যাখ্যা। হোমাগ্নি শরীরস্থ তেজস্তত্ত্ব। ইতিপূর্ব্বে উহা নানারূপ উৎপাত সূচনা করিত, এখন শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে বাসনার অভিঘাত সুখ দুঃখের অভিঘাত সাধকের চিত্তকে সর্ব্বদাই চঞ্চল করিয়া রাখিত। সুতরাং শরীরস্থ তেজস্তত্ত্ব নানাভাবে পরিভাবিত হইয়া নানারূপ উৎপাতের সূচনা করিত। এখন সকলই শান্ত হইয়াছে। আমিত্ব নাই; সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলতাও নাই। পূর্ব্বে এই বিশ্বযজ্ঞ, এই কর্ম্মযজ্ঞ অহংকর্ত্তৃত্বরূপ বোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুতরাং সকলই উচ্ছৃঙ্খল, সকলই অশান্ত ও উৎপাতসূচক ছিল। এখন আত্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হওয়ায়, সকলই ব্রহ্মযজ্ঞে পরিণত হইয়াছে। এখন কর্ম্মমাত্রই "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্" রূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে, এখন হব্য হোতা অগ্নি হোম এবং তাহার ফল, সকলই ব্রহ্মময়—সকলই আত্মময়; সুতরাং কর্ম্মযজ্ঞরূপ অনুষ্ঠানগুলি এখন আর অশান্তভাবে সম্পন্ন হয় না।

দিগ্‌নিস্বন—অমঙ্গলসূচক দূরাগত ধ্বনিবিশেষ। অহংবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে, আত্মবোধ সমুদিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র এক মঙ্গলময় আত্মা ব্যতীত অপর কিছুই নাই; সুতরাং দিগ্‌নিস্বন বা অমঙ্গলসূচক শব্দসমূহ সম্যক্ প্রশান্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে জাগতিক ঘটনা সমুহের ফলাফল বিচার এবং

তজ্জন্য মঙ্গলামঙ্গলের বিচার ছিল, এখন আর সেভাব নাই; সকলই মঙ্গলময়। সকলই আত্মময় সকলই আনন্দময়।

সাধক! ইহাই আনন্দপ্রতিষ্ঠা। দেখ এই পাঁচটী মন্ত্রে সর্ব্বত্র কেবল আনন্দের অভিব্যক্তিই বর্ণিত হইয়াছে। আনন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, ঠিক এইরূপ সর্ব্বত্র আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি হইতে থাকে। যতক্ষণ আমিত্ব বলিয়া একটা বিশিষ্ট জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ এই আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু মায়ের কৃপায় শুম্ভ নিহত হইলে—অস্মিতা বিলয় প্রাপ্ত হইলে, সাধকের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ হয়। কোন অবস্থায়ই এ আনন্দ বিচ্যুত হয় না। চিত্ত-বিক্ষেপ, ভোগ ত্যাগ, রোগ শোক, যে কোন অবস্থা আসুক না কেন, এ স্বরূপানন্দের বিচ্যুতি ঘটে না। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই। এক অভিন্ন পূর্ণ অথচ চির নবীন—নিত্য ভোগ করিয়াও ইহার নবীনত্ব অপনীত হয় না। এমন মধুর! ইহাই বৈষ্ণবের ভাষায় নিত্য বৃন্দাবনে নবঘনশ্যাম—নিত্য তরুণ, নিত্য লোভনীয়। এই আনন্দই সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম, উপনিষদের আত্মা, গীতার শ্রীকৃষ্ণ, দেবীমাহাত্ম্যের চণ্ডিকা, আর আমাদের মা।

দেখ সাধক, তুমি আনন্দময়, তোমার ভোগ্য জগৎ আনন্দময়। তোমার মন প্রাণ ইন্দ্রিয় স্থূল শরীর পর্য্যন্ত আনন্দময়। আনন্দ দ্বারাই তুমি এবং এই বিশ্ব গঠিত। আনন্দই তোমার এবং এই বিশ্বের উপাদান। কোন অবস্থায়ই তুমি আনন্দ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হও নাই! তুমি ধন্য! তুমি ধন্য! বল—"সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।"

ইতি সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায়

শুম্ভবধ।

সাধন-সমর

বা

দেবী মাহাত্ম্য।

রুদ্রগ্রন্থি ভেদ।

শুম্ভবধ।

—*—

ঋষিরুবাচ।

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভা-
দ্বিকাশিবক্ত্রাস্ত বিকাশিতাশাঃ ॥১॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—সেই যুদ্ধে দেবী কর্ত্তৃক অসুরশ্রেষ্ঠ শুম্ভ নিহত হইলে, অভীষ্ট পূর্ণ হওয়ায় অগ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ উৎফুল্ল আননে দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিয়া কাত্যায়নীর স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। বিশুদ্ধবোধস্বরূপে অবস্থানকালে দ্বৈতপ্রতীতির অভাব-বশতঃ স্তবাদি একান্ত অসম্ভব হইলেও, ব্যুত্থিত অবস্থায় বাধিতানুবৃত্তি-ন্যায়ে পুনরায় দেহাদি অনাত্মপ্রতীতি ফুটিয়া উঠে। সুতরাং সে অবস্থায় স্তব স্তুতি অসম্ভব নহে; বরং হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক।

শুম্ভ নিহত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবৃন্দরূপী দেবতাবৃন্দের অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, তাহাদের অপহৃত যজ্ঞভাগ পুনরায় করতলগত হইয়াছে; সুতরাং দেবতাবৃন্দের আনন্দের অবধি নাই। এখন তাহারা

বিশিষ্ট চৈতন্য হইয়াও অখণ্ড চৈতন্যের সহিত একান্ত অন্বিত, অখণ্ড আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ; তাই তাহাদের মুখমণ্ডলে হর্ষোৎফুল্লভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

যদিও ইন্দ্রই দেবতা প্রধান, তথাপি এস্থলে অগ্নিদেবকেই পুরোগামী করা হইয়াছে। অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি। স্তুতি বাক্যসমষ্টিমাত্র; সুতরাং বাগধিষ্ঠিত চৈতন্যকে অগ্রগামী করিতে পারিলেই স্তবাদি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপ স্থির করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ অগ্নিদেবকেই প্রধান ভাবে স্তুতির নেতা করিলেন। বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্ন না হইলে, স্তোত্রাদি পাঠ কখনও সত্য ও প্রাণময় হয় না।

সে যাহা হউক, দেবতাবৃন্দের পুষ্কল স্তোত্রধ্বনি দিক্‌সমূহকে পবিত্র করিয়া দিল, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের শুভ্র প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, দেবতাগণ ভক্তিবিনম্র মূর্ত্তিতে কাত্যায়নীর স্তব করিতে লাগিলেন। কাত্যায়নী—জগদীশ্বরী। ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণের একান্ত আশ্রয়ণীয় বলিয়াই মা আমার কাত্যায়নী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনিই সগুণ ব্রহ্ম। স্তবাদি সগুণ ব্রহ্মেরই ত হইয়া থাকে।

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য ॥২॥

অনুবাদ। হে দেবি! হে শরণাগত-জন-দুঃখহারিণি! তুমি প্রসন্ন হও। হে অখিল জগতের জননি! তুমি প্রসন্ন হও। হে বিশ্বেশ্বরি! তুমি প্রসন্ন হও। হে দেবি! তুমি এই বিশ্বকে রক্ষা কর। তুমিই যে চরাচরের (একমাত্র) অধীশ্বরী।

ব্যাখ্যা। মাগো! তুমি প্রপন্ন জনের আর্ত্তি হরণ করিয়া থাক। যাহারা তোমাকে একান্ত আশ্রয় জানিয়া তোমারই অভয় চরণে শরণ লয়, তাহারা যত বড় দুরাচার, যত বড় মূঢ়ই হউক্ না কেন, তুমি স্বয়ং তাহাদের সর্ব্ববিধ আর্ত্তি, সর্ব্ববিধ কাতরতা, দীনতা বিদূরিত করিয়া থাক। মা! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা যেন তোমারই চরণে আশ্রয় লইতে পারি। ওগো! আমাদের বুকে এমন বল নাই, আমাদের হৃদয়ে এমন বিশ্বাস নাই যে, তোমাকেই একান্ত আশ্রয় জানিয়া, নির্ব্বিচারে তোমার অঙ্কে মা বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি। তথাপি তুমি আমাদিগকে তোমার আশ্রিত করিয়া লও। আর কেন পার্থিব বস্তুর আশ্রয়ে মিথ্যাভিমানের কল্পিত আমিটীকে পরিপোষণ করিতে যাইব? যাহাতে সকল ছাড়িয়া একমাত্র তোমার শরণাগত হইতে পারি, তাহাই কর মা, তাহাই কর; তুমি প্রসন্ন হও!

ওগো, তুমি যে অখিল জগতের মা। সুতরাং আমাদের প্রতি তুমি প্রসন্ন হইয়াই রহিয়াছ। আমরা কুপুত্র বলিয়া তুমি ত আর কুমাতা হইতে পার না। আমরা অকপট প্রাণে মা বলিয়া তোমাকে ডাকি না, ডাকিতে পারি না। সেজন্য তুমি ত আর আমাদিগকে দূরে ফেলিয়া দিতে পার না। তুমি যে আমাদের মা। হে বিশ্বেশ্বরি! তুমি প্রসন্ন হইলেই আমাদের সকল অভীষ্ট পূর্ণ হয়। ওগো! কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া শুধু তোমার প্রসন্নতাবিধানের জন্য কত ঘাত প্রতিঘাত, কত পেষণ সহ্য করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু কই, তুমি যে নিত্যপ্রসন্না, নিত্যতৃপ্তা, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি কই! যতক্ষণ তোমার বহুভাবে আত্মপ্রকাশ দেখিতে পাই, ততক্ষণ তোমার প্রসন্নতা কিরূপে বুঝিব? মা গো! তোমার মুখ হইতে নির্গত শুধু একটী কথা শুনিবার জন্য কতকাল ধরিয়া, কত নৈরাশ্য হৃদয়ে লুক্কায়িত রাখিয়া, তোমার মুখপানে তাকাইয়া আছি—কত আঘাত সহ্য করিয়া জ্ঞানে অজ্ঞানে, কপটে অকপটে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়

মা বলিয়া ডাকিতেছি। তুমি প্রসন্ন হও মা! একবার বল—"আমি বহু নয়, আমি এক"। তোমার শ্রীমুখনির্গত এই একটী বাণী শুনিতে পাইলেই ত আমাদের জীবন ধন্য হয়, অনাদি জন্মের জীবত্ব-বন্ধন খুলিয়া যায়, তোমার প্রসন্নভাব আমাদের প্রতীতিযোগ্য হয়।

মা, তুমি বিশ্বেশ্বরী, তুমিই এ বিশ্বকে রক্ষা কর। এ বিশ্ব যে তোমায় দেখিতে না পাইয়া, তোমার সত্তা অনুভব করিতে না পারিয়া, তোমার প্রসন্নতা বুঝিতে না পারিয়া, বহির্ম্মুখে ধাবিত হইতেছে। দিন দিন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ওগো বাঁচাও! রক্ষা কর! রক্ষা কর! এই বহির্ম্মুখী তীব্রগতি হইতে এ বিশ্বকে বাঁচাও! ধ্বংস হইতে রক্ষা কর! কেন করিবে না, তুমি যে চরাচরের একমাত্র অধীশ্বরী। স্থাবর জঙ্গম যেখানে যাহা কিছু আছে, তুমিই যে, সে সকলের একমাত্র নিয়ন্ত্রী। তোমার জগৎকে তুমি রক্ষা না করিলে, আর কে করিবে মা? তাই কাতরপ্রাণে বলিতেছি, ঠিক এমনই করিয়া প্রতি জীবে শুম্ভবধ করিয়া ধ্বংসের মুখ হইতে এ বিশ্বকে রক্ষা কর।

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥৩॥

অনুবাদ। তুমিই জগতের একমাত্র আধারস্বরূপা। যেহেতু মহীস্বরূপে অবস্থান করিতেছ। আবার জলরূপে অবস্থান করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আপ্যায়িত করিতেছ। মা, তোমার বীর্য্য অলঙ্ঘনীয়।

ব্যাখ্যা। মা, তুমি যে আধার-শক্তি রূপিণী জগদ্ধাত্রী, তাহা তোমার মহীমূর্ত্তি দেখিয়াই আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি। মহীরূপে মৃত্তিকারূপে যাবতীয় পদার্থকে তুমি মায়েরই মতন বুকে করিয়া

রহিয়াছ। কোনও বিকার নাই, কোনও বিকল্প নাই; কোন্ অনাদি কাল হইতে তুমি মাটিরূপে মা-টী সাজিয়া, এই জীবজগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছ। শুধু তাহাই নহে, আবার জলময়ী মূর্ত্তিতে সকল জীবকেই আপ্যায়িত করিতেছ—স্নিগ্ধ করিতেছ। শস্যাদিরূপে ক্ষুধানিবৃত্তি, এবং জলরূপে তৃষ্ণানিবারণ করিয়া প্রতিনিয়ত মাতৃত্বের পরিচয় দিতেছ। মাতা যেরূপ স্তন্যপায়ী শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া, স্তন্যদানে তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা বিদূরিত করিয়া দেন, ঠিক সেইরূপ তুমিও মা মহীরূপে এই জীবজগৎকে বক্ষে ধারণ করিয়া অপ্‌রূপে—রসরূপে প্রত্যেক জীবকে আপ্যায়িত করিতেছ—পরিপুষ্ট করিতেছ। মা। একাধারে তুমি এই জগতের ধারণ এবং পোষণ করিয়া যে অতুলনীয় প্রভাবের পরিচয় দিতেছ, তোমার সে বীর্য্যপ্রভাবকে ঈশ্বরাদিও লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন না। মা, এইজন্যই তুমি অলঙ্ঘ্যবীর্য্যা।

স্ব ই তোমার রূপ। তুমি ত আত্মা! তথাপি তুমি মহীস্বরূপা, অপ্‌স্বরূপা। সর্ব্বভেদাতীত আত্মা তুমি, তথাপি স্বগত ভেদ-বিশিষ্ট হইয়া ক্ষিতি অপ্‌ প্রভৃতিরূপে জগতের ধারণ পোষণাদি কার্য্য সম্পন্ন কর। মা! তোমার বীর্য্য যথার্থই অলঙ্ঘনীয়।

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেত-
ত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥৪॥

অনুবাদ। তুমি বৈষ্ণবীশক্তি, তুমি অনন্তবীর্য্যা, তুমি বিশ্বের বীজ, তুমি পরমা মায়া। হে দেবি! তুমি এই সমস্ত জীবজগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ; আবার তুমি প্রসন্ন হইয়াই এ জগতের (জীবের) মুক্তি-হেতুস্বরূপা হও।

ব্যাখ্যা। মা! তুমি বৈষ্ণবীশক্তি—সর্ব্বব্যাপিনী জগৎপালন-

কারিণী মহতী স্থিতিশক্তি। এ বিশ্বের প্রতি পরমাণু তোমাতেই অবস্থিত। তুমি অনন্তবীর্য্যা। তোমার বীর্য্য বিভবের সীমা নাই। মাগো! যখন তুমি সর্ব্বব্যাপিনী বৈষ্ণবীশক্তিরূপে সন্তানের নিকট আত্মপ্রকাশ কর, তখন সত্য সত্যই তুমি অনন্তবীর্য্যারূপে প্রতিভাত হইতে থাক। তোমার সে বীর্য্যপ্রভাবকে তখন অতিক্রম করা বা ইয়ত্তা করা একান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তুমি যে শুধু এই ব্যক্তবিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবীশক্তি নামে অভিহিতা হও, তাহা নহে; এই বিশ্বের বীজরূপে, এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের আদিম কারণরূপে অব্যাকৃতরূপেও তুমি অবস্থিতা। বীজরূপে তুমি পরমা, এবং বৈষ্ণবীরূপে তুমি মায়া নামে অভিহিত হইয়া থাক। মা, এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চরূপে—ব্যক্ত বিশ্বরূপে তুমি মায়া, আর সৃষ্টির অব্যক্ত বীজস্বরূপে তুমি পরমা মায়া। সাংখ্যশাস্ত্র তোমার এই পরমা স্বরূপটীকেই মূলপ্রকৃতি বলিয়াছেন।

মা। এই দ্বিবিধস্বরূপে তোমার দুই প্রকার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তুমি মায়ামূর্ত্তিতে প্রকটিত হও, অর্থাৎ ব্যক্ত প্রপঞ্চরূপে আত্মপ্রকাশ কর, তখন "সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ" আর যখন পরমা মূর্ত্তিতে প্রকটিতা হও, তখন "ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।" এক মূর্ত্তিতে ভোগবতী, অন্য মূর্ত্তিতে তুমি মোক্ষদায়িনী। মায়া স্বরূপে তুমি সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখ—স্বকীয় স্বরূপটীর উপলব্ধি করিতে দাও না। তখন জীব নানাভাবে তোমার মায়িক মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, উহাকেই আয়ত্ত করিবার জন্য অভিধাবিত হয়। যাহারা রূপরসাদি কিংবা কামকাঞ্চনাদি বিষয়ের মোহে মুগ্ধ, তাহারা ত প্রত্যক্ষভাবেই তোমাকর্ত্তৃক সম্মোহিত। আর যাহারা তোমার শরণাগত না হইয়া, নানারূপ সাধনার অনুষ্ঠান করে, তাহারাও সিদ্ধি শক্তি যশ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কোন না কোন একটা লইয়া মুগ্ধ থাকে। মায়াবী মানুষ যেমন দুর্ব্বল মানুষকে সম্মোহনমন্ত্রে আবিষ্ট করিয়া রাখে, ঠিক সেইরূপেই কোন্ অনাদিকাল হইতে তুমি এই জীববৃন্দকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ।

তাহারা কিছুতেই ত তোমাকে চাহিতে পারে না; তোমার দেওয়া সাজগুলি, খেলনাগুলি লইয়াই জীবনকে কৃতার্থ মনে করে। তোমাকে চাহিবার যে একটা প্রয়োজন আছে, তাহা ভাবিতেও পারে না। এমনই অজেয় মোহ। মা গো, এ যে তুমি! তাই অজেয়। যদি তুমি ছাড়া অন্য কেহ এই মোহের রূপ ধরিয়া আসিত, তবে এত চেষ্টা এত কঠোরতা করিয়া জীব তাহাকে নিশ্চয়ই বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু এ যে অলঙ্ঘ্যবীর্য্যা মা তুমিই মোহরূপে দাঁড়াইয়া জীবের আত্মদর্শনের চক্ষু আড়াল করিয়া রাখিয়াছ। মা গো! কতকাল—কতকাল এমনই করিয়া "চোখবাঁধা বলদের মত" ঘুরাইবি? একবার তোর সন্তানদের "চোখের ঠুলি" খুলে দে, তাহারা তোর অভয়পদ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করুক।

মা গো, এই সম্মোহিনী মূর্ত্তিতে যে তুমি! তুমিই যে বিষয়ের সাজে, কাম কাঞ্চনের সাজে আসিয়া আমাদিগকে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করিতেছ, ইহা বুঝিতে পারিলেই তুমি প্রসন্ন হও—তুমি ধরা পড়। ধরা পড়িলেই তোমার মোহিনী মূর্ত্তি অপসৃত হয়, নিত্যপ্রসন্না মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়। তখন আর কোন বিপদ থাকে না, কোন ভয় থাকে না। তুমিই তখন পরমা প্রকৃতিরূপে জননীরূপে স্নেহের জীবকে বক্ষে ধরিয়া মুক্তি-মন্দিরে উপনীত হও। তাই ত দেখিতে পাই—দেবতাগণ তোমার স্তব করিতে গিয়া—একদিকে তোমার বিশ্বমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া "সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ" বলিলেন, আবার মোক্ষদায়িনী প্রসন্না মূর্ত্তি দেখিয়া "ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ" বলিয়া তোমারই চরণে প্রণত হইয়া পড়িলেন। মা, তুমি প্রসন্না হও! তুমি যে নিত্যপ্রসন্নামূর্ত্তিতে নিয়ত আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, ইহা বুঝিতে দাও! দেবতাদিগের মত আমরাও মা মা বলিয়া মুক্তিমন্দিরে উপনীত হই।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। হে দেবি! এ জগতে সমস্তই বিদ্যা, এ সকল তোমারই ভেদ, অর্থাৎ বিভিন্ন মূর্ত্তি; এ জগতে সকলই স্ত্রী, সকলেই তোমার অংশরূপে বিদ্যমান। একমাত্র তুমিই মাতৃস্বরূপে এ সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, অতএব তোমার আর স্তুতি কি? তুমি স্তব্যের পরে এবং উক্তির অর্থাৎ বাক্যেরও পরে অবস্থিতা (অথবা স্তব্যবিষয়ক পরাপরবাক্যরূপা যে স্তুতি, তাহা তোমার সম্বন্ধে একান্ত অসম্ভব)।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে—মায়ের প্রসন্নতা লাভ হইলেই সাধকের মুক্তিমার্গ উন্মুক্ত হয়। মা যখন প্রসন্ন হয়েন, তখন সাধক এ জগৎকে কিরূপভাবে দর্শন করে, এ মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

হে দেবি—দ্যোতনশীলে! "জগৎসু সমস্তা বিদ্যাঃ" এ জগতে সমস্তই বিদ্যা। উপনিষৎ বলেন "যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে সা বিদ্যা" যাহাদ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই বিদ্যা। 'জগৎসু'—অনন্ত জগতে, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে সমস্তই বিদ্যা। মাগো! যাহারা যথার্থ মুমুক্ষু হইয়াছে, যাহারা তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তি দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে, তাহারা সর্ব্বত্র তোমার বিদ্যাস্বরূপটীই দেখিতে পায়। জগতে অবিদ্যা নামে যাহা খ্যাত, তাহাও যে বিদ্যা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, বিদ্যাই যে স্বল্পভাবে প্রকাশিত হইতে গিয়া, অবিদ্যা নামে অভিহিত হয়, ইহা শুধু তাহারাই—তোমার তত্ত্বদর্শী সন্তানগণই উপলব্ধি করিতে পারে। তাই, তাহারা "বিদ্যাঃ সমস্তাঃ" বলিয়া এই সমস্তরূপিণী বিদ্যামূর্ত্তি তোমারই চরণতলে প্রণত হইয়া পড়ে। প্রশ্ন হইতে পারে—সমস্তই যদি বিদ্যা, তবে শাস্ত্র অবিদ্যা শব্দে কাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই দেবতাগণ বলিলেন "তব দেবি ভেদাঃ"। যাহা, অবিদ্যা তাহা বিদ্যারূপিণী তোমারই ভেদ মাত্র—বিভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। মাগো! আমরা যাহাকে অবিদ্যা বলিয়া বুঝিয়া লই, তাহা তোমারই বিভিন্ন মূর্ত্তি। একা অদ্বিতীয়া সর্ব্বভেদরহিতা তুমিই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে—বহুমূর্ত্তিতে সমস্তরূপে—জগৎরূপে নিত্য অবস্থিতা। মা! এ জগৎ তোমারই স্বগতভেদ। সুতরাং দেবতাদিগের নিকট সমস্তই বিদ্যারূপে (১) উদ্ভাসিত; তাই তাঁহারা অবিদ্যারূপে বিদ্যাবিরোধীরূপে কিছুই দেখিতে পান না।

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ" সমস্তরূপে জগৎরূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহা স্ত্রী অর্থাৎ তোমারই শক্তিমাত্র। বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র তুমিই পরমপুরুষ, আর সমস্তরূপে জগৎরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, সে সমস্তই স্ত্রী—সে সমস্তই তোমার প্রকৃতি, তোমার শক্তি, তোমার ইচ্ছা, তোমার ব্যবহার। শক্তি যেরূপ শক্তিমানের সহিত অভিন্নভাবে সংস্থিত, ঠিক সেইরূপ এই প্রকৃতিরূপী জগৎ, পরমপুরুষ তোমার সহিত সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গিত। বৈষ্ণবের ভাষায় ইহাই রাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলন।

মা! এ সমস্তই সকলা—তোমারই কলার অর্থাৎ অংশের সহিত নিত্য বিদ্যমান। সত্তারূপে চৈতন্যরূপে—অস্তি-ভাতিরূপে তোমারই কলা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তাই দেবতাগণ বলিলেন—সমস্তরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, তাহা সকলা। তোমার কলার সহিত বিদ্যমান না থাকিলে—তোমার সত্তা ও চৈতন্যদ্বারা উদ্ভাসিত না হইলে, সমস্ত বলিতে কিছুই যে থাকে না। যদিও মা, কলা বলিতে—অংশ বলিতে তোমাতে কিছুই নাই, তুমি নিত্য পূর্ণ, তুমি অনংশ—তোমাতে অংশাংশী ভেদ নাই, তথাপি যতক্ষণ বিশিষ্ট প্রতীতি আছে, ততক্ষণ উহাকে অংশই

(১) যাঁহারা বিদ্যাশব্দের অষ্টাদশবিদ্যারূপ অর্থ করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই। কারণ, তাঁহাদের অর্থ ব্যাপ্য, আমাদের অর্থ ব্যাপক।

বলিতে হয়। তাই, শ্রুতিও এ জগৎকে তোমার একাংশে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মাগো! এইরূপে যাহারা জগৎকে জগৎরূপে না দেখিয়া বিদ্যারূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, যাহারা এ সমস্তকে তোমারই ভেদরূপে, তোমার প্রকৃতিরূপে, তোমার কলারূপে অর্থাৎ অংশরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, কেবল তাহাদের নিকটই তোমার প্রসন্নময়ী মাতৃমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়। তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া থাকে—"ত্বয়ৈকয়া পূরিত-মম্বয়ৈতৎ"। মা তোমাকর্ত্তৃক এ সমগ্র বিশ্ব পরিপূর্ণ।

সাধক! এইবার প্রথম খণ্ডের লিখিত শক্তির কোলে সত্তাটীর বিষয় স্মরণ কর। দেখ, জগৎময় একটীমাত্র অখণ্ড সত্তা রহিয়াছে। বৃক্ষ আছে, ফল আছে, ফুল আছে, আমি আছি, তুমি আছ, সে আছে, এই যে খণ্ড খণ্ড অস্তিগুলি, উহারা সেই এক অখণ্ড অস্তিরই পরিচয় প্রদান করে। সেই যে অখণ্ড সত্তা, তিনিই চিতিশক্তি পুরুষ বা মা। ঐ সত্তাটী অজ্ঞেয়, অথচ 'জ্ঞ'স্বরূপ, অগ্রাহ্য অথচ গ্রহীতৃস্বরূপ। যখন আমরা বিশিষ্টভাবে উহাকে বুঝিতে যাই, তখন ঐ অখণ্ড সত্তার সঙ্গে সঙ্গেই একটী শক্তি অর্থাৎ স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাই। বৃক্ষ আছে—এস্থানে "বৃক্ষটি" শক্তি, আর "আছে" এইটী পুরুষ; এইরূপ সর্ব্বত্র। ঐ শক্তিটী কিন্তু পুরুষেরই শক্তি, অন্য কেহ নহে। সত্তা শক্তিমতী; অথবা শক্তিই সত্তাময়ী। আচ্ছা এইবার দেখ, ঐ বৃক্ষ—ঐ নামরূপাকারে আকারিত শক্তি বা মা এই জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ জীব! চারিদিকে মা ছাড়া আর কিছুই নাই; বল—ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ। এইরূপ দেখিতে পারিলেই অর্থাৎ চিন্ময়ী মহতীশক্তিকে এই অম্বারূপে—মারূপে দেখিতে পারিলেই ইহাঁর প্রসন্নতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। মাতৃপ্রসন্নতা বুঝিতে পারিলেই দেখিতে পাইবে "ভুবি মুক্তিহেতুঃ—ঐ মা-ই এ জগতে একমাত্র মুক্তির হেতু, ঐ মা-ই তোমায় কোলে করিয়া মুক্তিমন্দিরে উপনীত হইবেন। তুমি ধন্য হইবে।

এইরূপ স্তব করিতে করিতে দেবতাগণ বিশ্বময় মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাদের বলিতে হইল "কা তে স্তুতিঃ," ওগো! তোমার আবার স্তুতি কি করিব? সবই যে তুমি। তুমি ছাড়া কিছুই যে নাই; সুতরাং তুমি "স্তব্যপরা" স্তব্যের পরপারে অবস্থিতা। স্তুতির দ্বারা তোমার স্বরূপ বা আরোপিত গুণ বর্ণিত হয় না; কারণ তুমি যে ইহার অনেক উপরে। কেবল তাহাই নহে, স্তুতি করিতে হইলেই উক্তি বা বাক্যের প্রয়োজন; কিন্তু তুমি যে "পরোক্তিঃ" উক্তির অর্থাৎ বাক্যেরও পরপারে অবস্থিতা, অবাক্‌গোচরা —"ন তত্র বাক্ গচ্ছতি।" সুতরাং যে দিক্ দিয়াই যাই, তোমার স্তুতি একান্ত অসম্ভব। তথাপি কিন্তু মা! আমরা বাগ্‌বিশুদ্ধির জন্য তোমার স্বরূপ, তোমার মহিমা বালকের ন্যায় কথঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইতেছি। তুমি ক্ষমা কর, মা ক্ষমা কর!

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তি-প্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥৬॥

অনুবাদ। মা, তুমি যখন সর্ব্বস্বরূপা দ্যোতনশীলা স্বর্গমুক্তি-প্রদায়িনী, তুমি যখন নিত্যস্তুতা, তখন তোমার এমন কি স্তব সম্ভব হইতে পারে, যাহাতে সেই স্তুতি পরমোক্তি অর্থাৎ যথার্থ-বাক্যযুক্ত হইবে?

ব্যাখ্যা। মাগো! মনুষ্যপক্ষে, আরোপিত গুণবর্ণনার নাম স্তুতি। তোমাতে এমন কোন গুণের অভাব নাই, যাহার আরোপ করিয়া বর্ণনা করিতে হইবে। দেবতাপক্ষে, স্বরূপবর্ণনাই স্তুতি। তোমার পক্ষে, তাহাও অসম্ভব; কারণ, তোমার স্বরূপ তুমি ব্যতীত আর কেহ জানে না, জানিতে পারে না, অথবা জানিবার জন্য দ্বিতীয় কেহ থাকে না। "বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ" "স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা" তোমার স্বরূপবেত্তা দ্বিতীয় কেহই নাই। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই তোমার স্তুতি একান্ত অসম্ভব। তুমি সর্ব্বস্বরূপা দ্যোতনশীলা, স্বভাবতঃই তুমি স্বর্গমুক্তি-

দায়িনী, স্বভাবতঃই তুমি নিত্যস্তুতা ; তোমার আবার স্তুতি কি হইতে পারে ? বাক্যমনের অগোচরা তুমি ; সুতরাং তোমার সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিতে যাইব, তাহা কখনও "পরমোক্তি" হইতে পারে না।

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৭॥

অনুবাদ। হে দেবি নারায়ণি! তুমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বর্গ এবং মোক্ষদায়িনী, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মাগো! তোমার স্তব করিতে আমরা একান্ত অসমর্থ। তাই প্রণামের অভিনয় করিতেছি। যথার্থ প্রণাম যে কবে করিতে পারিব, তাহা তুমিই জান। কবে যে তোমাকে প্রণাম করিতে গিয়া, আর এ দেহ মন ইন্দ্রিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না, কবে যে তোমাকে প্রণাম করিতে গিয়া, তোমার পরম ধামে—কৈবল্যধামে স্থান লাভ করিব, তাহা তুমিই জান মা। যথার্থ প্রণাম না করিতে পারিলেও, আমরা প্রণামের অভিনয় করিতে চেষ্টা করিব, তারপর তোমার যেদিন ইচ্ছা হইবে, সেইদিন যথার্থ প্রণত করাইয়া লইও।

মা, তুমি সর্ব্বজীবের অন্তরে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা। যে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি একদিকে জগৎসংস্কার এবং অন্যদিকে নির্গুণ আত্মার প্রতিচ্ছায়া পরিগ্রহপূর্ব্বক সর্ব্ব জীবের অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই বুদ্ধিরূপেও তুমি মা! তোমাকে বুদ্ধিরূপে পাইবার জন্যই ত ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" বলিয়া তোমার নিকট ধী ভিক্ষা করিয়া থাকেন। এই বুদ্ধি যখন সত্ত্বগুণ-প্রধান হয়—নির্ম্মল হয়, তখন ইহার একদিকে স্বর্গ অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য, এবং অন্যদিকে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তিস্বরূপটী উদ্ভাসিত হয়! জীবন্মুক্ত সাধকগণ এই বুদ্ধিতে

অবস্থান করিয়াই একদিকে স্বর্গভোগ, অন্যদিকে জগদতীত সত্তার —অপবর্গের আভাস সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তাই, তুমি বুদ্ধিরূপে স্বর্গাপবর্গদায়িনী মা। তুমি নারায়ণী, প্রতিনরে—প্রতিজীবে এই বুদ্ধিরূপে তুমিই অবস্থান করিতেছ। নরসমূহ যাহাকে অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, সেই নারায়ণী তুমি। তুমি নারায়ণী তাই আমি নর। হে নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম—কায়মনোবাক্যে তোমার চরণে প্রণত হইতেছি। প্রণাম গ্রহণ কর মা, প্রণাম গ্রহণ কর।

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৮॥

অনুবাদ। তুমি কলা কাষ্ঠাদিরূপে (কাল-পরিচ্ছেদরূপে) জগতের পরিণাম সাধন করিয়া থাক। তুমিই এই বিশ্বের সংহারকারিণী শক্তি; তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, তুমি কালমূর্ত্তিতে নিয়ত এই বিশ্বের পরিণাম অর্থাৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছ। কলাকাষ্ঠাদি তোমার সেই অখণ্ড কালমূর্ত্তির কল্পিত বিভাগ। অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, এইরূপে পল দণ্ড মুহূর্ত্ত দিবস সপ্তাহ মাস ঋতু সংবৎসর যুগ কল্প প্রভৃতি, কতই না কল্পিত বিভাগ আছে। মা, তোমার কালমূর্ত্তি অখণ্ড—অপরিচ্ছিন্ন হইলেও, আমরা তাহার সত্তা উপলব্ধি করিবার জন্য, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কলা কাষ্ঠাদিরূপে কতই পরিচ্ছেদ করিয়াছি। সেই পরিচ্ছিন্ন কালরূপে তুমি এই জীব-জগতের নিয়ত পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছ। এই কালরূপে তুমি পরিণামের ভিতর দিয়া বিশ্বের উপরতি অর্থাৎ প্রলয় সাধন করিয়া থাক। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি ঈশ্বরগণেরও প্রলয়কারিণী তুমি। তোমার নিকট বিশ্বের উপরতি অতি তুচ্ছ। মা, তুমি অসীম-শক্তি-সম্পন্না হইয়াও প্রতিনরে নারায়ণী-মূর্ত্তিতে—ব্যষ্টি মাতৃমূর্ত্তিতে অবস্থান

করিতেছ; তুমি সমগ্র জগতের মা হইয়াও প্রতিনরের মা, তাই তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৯॥

অনুবাদ। তুমি সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলকারিণী, তুমি শিবা, (মঙ্গলময়ী) তুমি সর্ব্বাভীষ্টসাধিকা। তুমি শরণ্যা (আশ্রয়ণীয়া) তুমি ত্রিনয়না, তুমি গৌরী, তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মঙ্গল শব্দের অনেক অর্থ আছে। অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির নাম মঙ্গল, সকলের যাহা মঙ্গল, তাহাই মঙ্গল্য (স্বার্থে ষ্য প্রত্যয়)। অথবা এ জগতে যত কিছু মঙ্গল আছে, তাহাদেরও যিনি মঙ্গল বিধান করেন, তিনিই সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যা। লৌকিক মঙ্গল আটটী। ব্রাহ্মণ গো হুতাশন হিরণ্য সর্পিঃ আদিত্য অপ্ এবং রাজা; এই অষ্টবিধ মঙ্গলই সর্ব্বমঙ্গল শব্দের অর্থ। মা আমার এই সকলেরও মঙ্গল-বিধানকারিণী! অথবা সর্ব্ব শব্দের অর্থ শিব; তাঁহার মঙ্গলবিধায়িনী। এই সকল অর্থ ব্যতীত আমরা সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যা শব্দের আর একটী অর্থ বুঝিয়াছি—সর্ব্বই মঙ্গল, তাহার মঙ্গল-বিধায়িনী। সর্ব্বরূপে যাহা কিছু উপলব্ধ হয়, তাহা মিথ্যা হউক, ভ্রান্তি হউক, জড় হউক, তাহা যে চিৎ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, সাধক ইহা যখন বুঝিতে পারে, তখন তাহার নিকট সর্ব্বই মঙ্গলরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। একমাত্র চিৎ বস্তুই ত মঙ্গল, চিৎ ব্যতীত যাহা কিছু তাহা সমস্তই অমঙ্গল। চৈতন্যের বিকাশ থাকে বলিয়াই জীব জীবিত অবস্থায় মঙ্গলস্বরূপ; তাই জীবিত মনুষ্যের নামের পূর্ব্বে মঙ্গলসূচক শ্রী শব্দের প্রয়োগ হয়। গতপ্রাণ জীব যে অমঙ্গল-স্বরূপ, তাহা সকলেই জানেন। যাহা হউক, সর্ব্ব যখন চিৎস্বরূপে উদ্ভাসিত হয়, তখন সকলই মঙ্গলময় হয়। তখন আর অমঙ্গল বলিয়া কিছুই থাকে না।

সেই মঙ্গলের যিনি মঙ্গল বিধানকর্ত্রী,—যাঁহার মঙ্গলময় প্রকাশে "সর্ব্ব" প্রকাশিত তাঁহাকেই আমরা সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে বলিয়া আহ্বান করিতেছি। যাঁহার—যে সচ্চিদানন্দময়ীর অনুপ্রবেশে সর্ব্বের মঙ্গলময় ভাব, তিনি সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী হইয়াও স্বয়ং মঙ্গলময়ী; তাই দেবতাগণ শিবে বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। মাগো! জীব যখন তোমাকে এইরূপভাবে সর্ব্বাবস্থায় মঙ্গলময়ী মঙ্গলদায়িনী বলিয়া বুঝিতে পারে, তখনই সর্ব্বাভীষ্ট-সাধিকারূপে তোমার প্রকাশ হয়, জীবের অভীস্ট সিদ্ধি হয়। জীব তখন পূর্ণকাম হইয়া তোমাতে মিলাইয়া যায়।

মা! তুমিই শরণ্য—জীবের একান্ত আশ্রয়ণীয়। ত্র্যম্বকে! ত্রিনয়নে! চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নিরূপ ত্রিনেত্র লইয়া, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই ত্রিবিধ প্রকাশ লইয়া, নিত্যই তুমি বিরাজ করিতেছ। আবার স্মৃতি কল্পনা ও আশারূপ—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানরূপ কালত্রয়দর্শী ত্রিনেত্র বিশিস্ট হইয়া, তুমি নিত্যই বর্ত্তমান রহিয়াছ। মা তুমি গৌরী, অতি মনোহরা, অতি সুন্দরী, অতি সৌম্যা। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১০॥

অনুবাদ। মা, তুমি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তি-স্বরূপা, তুমি ত্রিগুণের আশ্রয়স্বরূপা হইয়াও স্বয়ং গুণময়ী। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। চৈতন্যময়ী মা! শক্তিই যে তোমার স্বরূপ, তাহা এই জগতের প্রত্যেক পদার্থে প্রতিক্ষণে তোমার সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়মূর্ত্তি দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তোমাকে ধরিবার বা বুঝিবার যদি কিছু থাকে, তাহা এই ত্রিবিধ প্রকাশ। তুমি সনাতনী, তুমি নিত্যা,—অব্যক্তস্বরূপা হইয়াও সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত রহিয়াছ। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত আছে—মহাকালী হইতেই;

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের জন্ম হইয়াছে, মা সত্যই ত তোমা হইতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়রূপ ত্রিবিধ শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। এই ত্রিশক্তি বাস্তবিক বিভিন্ন তিনটী শক্তি নহে, একই মহতী চিতিশক্তির ত্রিবিধ স্পন্দনমাত্র। সেই শক্তির স্বরূপটী যে কি, তাহা একান্ত অব্যক্ত হইলেও, এই ত্রিবিধ স্পন্দনদ্বারাই উহার সত্তা উপলব্ধিযোগ্য হয়। মাগো, তোমার এই অব্যক্ত শক্তিস্বরূপটী যেরূপে ব্যক্তভাবাপন্ন হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়াই দেবতাগণ বলিলেন—তুমি গুণাশ্রয়া, তুমি গুণময়ী। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণকে আশ্রয় করিয়াই তোমার এই ত্রিবিধ স্পন্দন। অথবা তোমার স্বেচ্ছাকৃত এই ত্রিশক্তিই ত্রিগুণ আখ্যায় অভিহিত হয়। গুণত্রয় যখন তোমার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তুমিই স্বয়ং গুণময়ী হইয়া নারায়ণী মূর্ত্তিতে আমাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখ। মা তোমাকে প্রণাম। মা গো! আমাদিগকে এই গুণময় অবস্থা হইতে তোমার সেই সনাতনস্বরূপে—যেখানে এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ত্রিবিধ আবর্ত্তন নাই, সেইখানে লইয়া চল মা, সেইখানে লইয়া চল।

শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১১॥

অনুবাদ। মা, তুমি শরণাগত দীন এবং আর্ত্তজনের পরিত্রাণ-পরায়ণা। তুমি সকলের আর্ত্তিহরণকারিণী দেবী, তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা গো! যে দিন জীব তোমার চরণে শরণাগত, তোমার অভাবে দীন এবং তোমার বিরহে আর্ত্ত হইতে পারে, সেই দিনই তোমার পূর্ব্বোক্ত ত্রিশক্তিময়ী ত্রিগুণময়ী স্বরূপটীর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সেই দিন তুমিও মা সত্য সত্যই পরিত্রাণপরায়ণা মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া জীবের সকল আর্ত্তি দূর করিয়া দাও। তখন জীবের জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারার্ত্তি, অনন্ত জীবনের কাতর ক্রন্দন, চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

মা, তোমার চরণে শরণাগত হইতে পারিলেই জীব তোমার প্রথম শক্তির অর্থাৎ সত্ত্বগুণময় স্বরূপটীর অবধারণ করিতে পারে। তুমিই যে একমাত্র আশ্রয়, তোমার সত্তায়ই যে জগতের সত্তা, ইহা বুঝিতে পারিয়া, সত্য সত্যই সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার শরণাগত হয়, তোমার সত্ত্বগুণময় স্বরূপটীর উপলব্ধি করিতে পারে।

তারপর জীবের দীনতা আসে। অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী তোমার—কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী তোমার লীলাবিলাস দর্শন করিলেই জীবের স্বকীয় দীনতা সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আমি যে কত দীন, কত অভাবগ্রস্ত, জীব তাহা বুঝিতে পারে। "আমার মা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী," ইহা বুঝিতে পারার নামই তোমার দ্বিতীয়শক্তির অর্থাৎ রজোগুণময় স্বরূপের উপলব্ধি। নিজের দীনতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আসিলেই, মাতৃ-ঐশ্বর্য্য বোধ করা যায়। না না, মাতৃ-ঐশ্বর্য্যের অনুভূতিই আত্ম-দীনতা প্রতীতির হেতু। মা, জীব সন্তানগণকে তোমার চিৎস্বরূপটী বিশেষভাবে উপলব্ধি করাইবার জন্যই ত তোমার রজোগুণময়ী এই ঈশ্বরী-মূর্ত্তির বিকাশ।

তারপর আর্ত্তি। তোমার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় স্বরূপটীর উপলব্ধি করিতে হইলে জীবকে আর্ত্ত হইতে হয়। এ জগতের কোন বস্তুতে যে আনন্দ নাই, আনন্দের খনি যে একমাত্র তুমি, ইহা বুঝিতে পারার বহির্লক্ষণই ত জীবের আর্ত্তভাব। তোমার অভাবজন্য যে বিরহবেদনা, তাহাই ত যথার্থ আর্ত্তি। ঐরূপ আর্ত্তভাব উপস্থিত হইলেই জীব তোমার আনন্দ-স্বরূপটী বা তমোগুণময়ী মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হয়, নিরানন্দের পরপারে চলিয়া যায়!

মা, যখন আমরা "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ" বলিয়া একান্ত নিরাশ্রয়বোধে তোমার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লই—শরণাগত হই, অর্থাৎ আমি যে তোমারই একান্ত আশ্রিত, এ কথাটা ভালরূপ বুঝিতে পারি, তখনই তোমার সৎস্বরূপটী আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হয়—আমরা সত্যপ্রতিষ্ঠ হই। তারপর ব্রহ্মাণ্ডময় তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্যবিলাস

প্রত্যক্ষ করিয়া, যখন আমরা স্বকীয় দীনতা বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারি, যখন উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার সেই ঐশ্বর্য্যসম্ভার লাভ করিবার জন্য লালায়িত হই, তখনই তোমার চিৎস্বরূপটী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন সর্ব্বত্র তোমাকে প্রাণরূপে—চৈতন্যরূপে দর্শন করিয়া আমরা প্রাণপ্রতিষ্ঠ হই। আর সর্ব্বশেষে যখন এই জন্ম মৃত্যু, এই দেহধারণ, এই চাঞ্চল্য যথার্থ ই প্রাণের ভিতর একটা আর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তখনই দেখিতে পাই—তুমি আনন্দঘন মূর্ত্তিতে নিত্যই উদ্ভাসিত রহিয়াছ। তোমাতে বা আমাতে আনন্দের অভাব বা চাঞ্চল্য কোন-কালেই নাই। তুমি বা আমি নিত্য স্থির, নিত্য আনন্দময়। হে আমার মা, হে নারায়ণি, হে আর্ত্তিহারিণি, তোমাকে প্রণাম। তুমি আমাদিগকে এইরূপে প্রথমে শরণাগত দীন এবং আর্ত্ত করিয়া লও, তারপর সত্যে প্রাণে ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের প্রণাম সার্থক হউক। মা গো! যতদিন আমাদের মধ্যে ঐ তিনটী লক্ষণ প্রকাশিত না হইবে, ততদিন ত তোমার পরিত্রাণ পরায়ণা মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার আশাই নাই! তাই তুমি এ অকৃতী সন্তানকে তোমার আত্মপ্রকাশের যোগ্য করিয়া লও—শরণাগত দীনার্ত্ত করিয়া লও।

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১২॥
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনী।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৩॥
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৪॥

অনুবাদ। মা, তুমি হংসযুক্ত বিমানে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মাণী রূপ ধারণপূর্ব্বক কমণ্ডলুস্থিত কুশপূত বারি ক্ষরণ করিয়া থাক। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম। তুমি ত্রিশূল, চন্দ্র এবং সর্প ধারণ করিয়া

মহাবৃষভে আরোহণপূর্ব্বক মাহেশ্বরীস্বরূপে আবির্ভূত হও। হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম। তুমি ময়ূরপুচ্ছ-পরিশোভিতা মহাশক্তি-ধারিণী কৌমারীরূপে প্রকাশিত হও। হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, তুমি ব্রহ্মাণী। বিরাট্ মনরূপে এই বিশ্বকল্পনা তুমিই ধারণ করিয়া রাখ। জীবভাবীয় ব্যষ্টি মন তোমার হংসযুক্ত বিমান। কৌশাম্ভঃ (কমণ্ডলুস্থিত কুশপূত বারি) ক্ষরণ করিয়া থাক। বিরাট্ কর্ম্মাশয় হইতে যেরূপ সঙ্কল্প-শক্তির অনুপ্রেরণা কর, জীব-কর্ম্মাশয় হইতে সেইরূপ কর্ম্মেরই স্ফুরণ হয়। তুমি জীবকে যখন যেরূপ কর্ম্মের সম্মুখীন কর, জীব তখন সেইরূপ কর্ম্মে অভিমান করে। তোমার এই কৌশাম্ভঃক্ষরণ ব্যতীত জীবের কর্ম্ম পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। তুমি দেবী দ্যোতনশীলা স্বপ্রকাশরূপা নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

মা গো! তুমি মাহেশ্বরী মূর্ত্তিতে ত্রিপুটীজ্ঞানরূপ ত্রিশূল, মনোরূপ চন্দ্র এবং কুলকুণ্ডলিনীরূপ অহি ধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মরূপী মহাবৃষভে আরোহণপূর্ব্বক আবির্ভূত হও। তুমি প্রতিনরেই এইরূপে আত্মপ্রকাশ কর, হে নারায়ণি তোমার চরণে কোটি প্রণাম।

মা, তুমি ময়ূর-কুক্কুটবৃতা—ময়ূরপুচ্ছ অথবা শ্রেষ্ঠ-ময়ূরপরিশোভিতা। (কুক্কুট শব্দের অর্থ পুচ্ছ অথবা শ্রেষ্ঠ) মা, জীব যখন ময়ূরধর্ম্মী হয় —কুটিলবৃত্তিরূপ ভুজঙ্গগুলিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তখন শ্রেষ্ঠ ময়ূর পরিশোভিত কৌমারীরূপে আবির্ভূত হইয়া, অমরসৈন্যগণের পরিচালনভার গ্রহণপূর্ব্বক অসুরকুল বিনাশ করিতে উদ্যত হও। জীবসন্তান তখন অসুরভীতি হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। মা তুমি স্বয়ং অনঘা—অঘরহিতা; তাই তোমার দর্শনে জীবও অনঘ হয়— নিষ্পাপ হয়। ভেদ জ্ঞানের নামই অঘ, দ্বৈতপ্রতীতিই যথার্থ পাপ। মা, তোমার দর্শনে জীবের দ্বৈতপ্রতীতির বিলয় হয়। জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। জীবত্বরূপ পাপ চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীত পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৫॥
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৬॥
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৭॥

অনুবাদ। মা, তুমি শঙ্খ চক্র গদা এবং শার্ঙ্গধনুরূপ শ্রেষ্ঠ আয়ুধধারিণী বৈষ্ণবী, তুমি প্রসন্ন হও। হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম। তুমি বরাহরূপে ভীষণ মহাচক্র ধারণ এবং দংষ্ট্রাদ্বারা বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছ। হে শিবে, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম। তুমি অতি উগ্র নৃসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক দৈত্যকুলকে নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তুমি ত্রৈলোক্যত্রাণকারিণী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, বৈষ্ণবী বারাহী এবং নারসিংহী, এই তিনরূপেই আমরা বিষ্ণুশক্তিরূপিণী তোমার বিশেষ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। মহাপ্রাণরূপিণী মহতী স্থিতিশক্তি তুমি শঙ্খ চক্র গদা এবং শার্ঙ্গ ধনুঃ ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, অর্থাৎ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত নাদময় এই সংসারচক্রকে স্নেহময় প্রণবাকর্ষণে দিন দিন মোক্ষাভিমুখী করিতেছ। সূরিগণ অহর্নিশ তোমার এই বিশ্বব্যাপী পরমপদকে আকাশব্যাপী দৃক্‌শক্তির ন্যায় অবলোকন করিয়া থাকেন। সাধকগণও আচমনের সাহায্যে স্বকীয় ব্যষ্টিভাবটিকে তোমারই পরমপদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট করিতে প্রয়াস পায়। তুমি নারায়ণী, প্রতি নর তোমারই একান্ত আশ্রিত, তোমার চরণে কোটি প্রণাম। প্রসীদ—তুমি প্রসন্ন হও।

মা, তুমি যদি বারাহী-মূর্ত্তিতে প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন এই বসুন্ধরাকে উদ্ধার না করিতে, অর্থাৎ অব্যক্ত—বিশ্ববীজকে ব্যক্ত অবস্থায় আনয়ন না করিতে, তবে এই বসুন্ধরা, এই চরাচর কতকাল যে অজ্ঞান-তিমিরে সুষুপ্ত থাকিত, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? জীবসমূহ কাম-

কর্ম্মময় এই স্থূলভাবকে অবলম্বন করিয়াই যে জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে মঙ্গলের দিকে—মোক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহা তোমারই কৃপা। তুমি শিবা—মঙ্গলময়ী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

মাগো! এই বারাহী মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তোমার নারসিংহী মূর্ত্তির স্বরূপটী আমাদের স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠে। ওঃ! সে কি উগ্ররূপ মা। দৈত্যকুল নিহত হইল, হিরণ্যকশিপুর স্থূল দেহটী পর্য্যন্ত তুমি স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলে, ত্রিলোক অসুর-অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল।

মা, একদিন তুমি প্রহ্লাদের প্রবল সত্যজ্ঞানের প্রভাবে জড় স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া স্বকীয় চৈতন্যময় স্বরূপটী উদ্‌ভাসিত করিয়াছিলে। আর আজ এই জড়ত্বের যুগে, এই অনুভূতিহীন প্রাণহীন মৃত-কর্ম্মানুষ্ঠানের যুগে, তুমি একবার সত্য মূর্ত্তিতে প্রকটিত হও। জীবের জড়বুদ্ধিরূপ স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া চৈতন্যময় আত্মস্বরূপটী উদ্‌ভাসিত কর, জীবের সংশয় তিরোহিত হউক। মানুষ জড়ত্বের মোহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হউক; আবার সত্যের প্রাণের এবং আনন্দের প্রবাহ আসিয়া জগৎকে পরিপ্লাবিত করিয়া দিউক। জগৎ আবার সত্য সত্যই দেবতাবৃন্দের ন্যায় তোমাকে নারায়ণী-মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা দর্শন করিয়া "নমোঽস্তু তে" বলিয়া প্রণত হউক! মা, সন্তানের এ আশা কত দিনে পূর্ণ হইবে?

কিরীটিনী মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৮॥
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৯॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২০॥

অনুবাদ। মা, তুমি কিরীটধারিণী, মহাবজ্রধারিণী, সহস্র-নয়ন-পরিশোভিতা বৃত্রপ্রাণ-হরণকারিণী ইন্দ্রাণী। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম। তুমি শিবদূতী-রূপ ধারণ করিয়া দৈত্যসেনা-গণকে নিহত করিয়াছ। তুমি ভয়ঙ্করী এবং ঘোর নিনাদকারিণী। তুমি নারায়ণী, তোমায় প্রণাম। হে চামুণ্ডে! তুমি দংষ্ট্রাকরাল-বদনা, তোমার বিভূষণ নরমুণ্ডমালা, তুমি মুণ্ডাসুর মথনকারিণী, তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, নির্ম্মল জ্ঞান-রত্নস্বরূপ কিরীট তোমার শিরোভূষণ; তাই তুমি কিরীটিনী। আবার তুমিই মহাবজ্রধারিণী। শ্রুতিও বলেন—"মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"। মা, তুমি মহদ্‌ভয়রূপ বজ্র উদ্যত করিয়া রাখিয়াছ। তোমারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, তোমারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, তোমারই ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, তোমারই ভয়ে মৃত্যু ধাবিত হয়, তোমারই প্রশাসনে এই বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত। এই ত মা তোমার বজ্রধারিণী মূর্ত্তির স্বরূপ।

তুমি সহস্র নয়নোজ্জ্বলা। অসংখ্য নেত্র তোমার—বিশ্বতশ্চক্ষু তুমি মা, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণুটী পর্য্যন্ত তোমার সে চক্ষুতে—সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত! তোমার অগোচর কোথাও কিছু নাই। মা, তোমার স্নেহের সন্তান মনুষ্যগণকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন সত্যচ্যুত হইয়া, অসত্যের আশ্রয়ে থাকিয়া, তোমাকে লুকাইয়া কোন কাজ না করে। তুমি যে বিশ্বতশ্চক্ষুরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশেও তোমার সর্ব্বপ্রকাশক দৃষ্টি প্রসারিত রহিয়াছে, এই কথাটা স্মরণ রাখিতে পারিলে, আর কেহ অসত্য পথে ধাবিত হইবে না, সকলেই সত্যপরায়ণ হইবে; সুতরাং সকলেরই হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া যাইবে।

মা, তুমি বৃত্রপ্রাণহারিণী ইন্দ্রাণী। অনাত্মবোধরূপী বৃত্রাসুর তোমারই বজ্রপ্রহারে নিহত। ব্রাহ্মণের অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত তোমার বজ্র। ব্রাহ্মণই মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্ম—জগতের একমাত্র ধর্ত্তা। মা, এই ব্রাহ্মণের অস্থি না

হইলে, তোমার বজ্র নির্ম্মিত হয় না। ব্রাহ্মণের স্থূল শরীরের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশটী পর্য্যন্ত নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে উদ্‌ভাসিত—বিশুদ্ধ। সুতরাং কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই যে ব্রাহ্মণগণ জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নহে; তাঁহাদের ভৌতিক দেহের অস্থি পর্য্যন্ত অসুরভাবের বিনাশ করিতে সমর্থ—জগতের মঙ্গল সাধনে সমর্থ। শুধু এই কথাটী বুঝাইবার জন্যই কি তুমি ব্রাহ্মণের অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া অসুর নিধন করিয়াছিলে? সত্যই মা ব্রাহ্মণের অস্থি ব্যতীত অসুরঘাতক বজ্র নির্ম্মিত হয় না। তাই ত জগতে অদ্যাপি একমাত্র ব্রাহ্মণগণই অসুরঘাতনে সমর্থ। ব্রহ্মজ্ঞানের আচার্য্যরূপে—আসুরিক ভাবসমূহের দলনকারীরূপে এ জগতে একমাত্র ব্রাহ্মণই নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। মা গো! ব্রাহ্মণই তোমার এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের গৌরবকেতন। তুমি যে মা, তাহা তোমার এই ব্রাহ্মণ-সন্তানদ্বারাই জগতে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত। তুমি ইন্দ্রাণী, তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমি শিবদূতী। শুম্ভবধের প্রাক্কালে তুমি ঈশানকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়া, জগতে শিবদূতী নামে আখ্যাত হইয়াছ। ভীষণ অসুর-সংগ্রামে তুমি অসংখ্য অসুর নিধন করিয়াছ। তোমার ঘোরামূর্ত্তি দর্শনে ও ভয়ঙ্করনাদ শ্রবণে একান্ত সন্ত্রস্ত অসুরভাবসমূহ অচিরে বিলয়প্রাপ্ত হয়। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমি চণ্ডমুণ্ডের নিধনকারিণী চামুণ্ডা। তোমার দংষ্ট্রাকরাল-মুখমণ্ডলে দ্বৈতপ্রতীতিরূপ দৈত্যকুল প্রবিষ্ট হইয়া, সাধকের অদ্বয়জ্ঞান-প্রকাশের সুযোগ করিয়া দেয়। তুমি পঞ্চাশন্মুণ্ডমালিনী। পঞ্চাশৎ-মাতৃকাবর্ণরূপ নরশিরোমালা তোমার কণ্ঠদেশে বিলম্বিত। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমি এইরূপে ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কৌমারী প্রভৃতি অষ্টশক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া, আমাদের ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি অষ্টপাশরূপী অসুর-কুলকে বিলয় করিয়া দাও। আবার অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষাকেও বিমর্দ্দিত করিয়া—সুদুর্লভ ঈশ্বরত্ব-লাভের প্রলোভনকেও

বিদূরিত করিয়া, আমাদিগকে অদ্বয়তত্ত্বে—বিশুদ্ধ বোধস্বরূপে উপনীত কর। মা, তোমার এই অষ্টবিধ শক্তির প্রকাশ জীবত্বের অষ্টপাশ ছিন্ন করিয়া, ঈশ্বরত্বের অষ্ট ঐশ্বর্য্যকে তৃণীকৃত করিয়া, আমাদিগকে মুক্তির হিরণ্ময় মন্দিরে উপনীত করে। তুমি প্রতি নরে এইরূপভাবে স্নেহময়ী জননীরূপে আত্মপ্রকাশ কর; তাই তুমি নারায়ণী। তোমার চরণে কোটি প্রণাম। আশা আছে—একদিন তুমি সত্য সত্যই প্রতি জীবে, এই নারায়ণী মূর্ত্তিতে দেখা দিবে।

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২১॥
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২২॥

অনুবাদ। তুমি লক্ষ্মী লজ্জা মহাবিদ্যা শ্রদ্ধা পুষ্টি স্বধা ধ্রুবা মহারাত্রি এবং মহা-অবিদ্যা। তুমি নারায়ণী তোমাকে প্রণাম। মা, তুমি মেধা সরস্বতী বরা ভূতী বাভ্রবী তামসী এবং নিয়তা, তুমি প্রসন্ন হও। হে ঈশে, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, তুমি লক্ষ্মী—প্রাণরূপিণী সৌন্দর্য্যরূপিণী, সম্পদ্‌-রূপিণী, তুমি লজ্জা—নিন্দিতকার্য্য-বৈমুখ্যরূপা, তুমি মহাবিদ্যা—কালী তারাদি দশমহাবিদ্যা, অথবা মহতী শ্রেষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি শ্রদ্ধা—সত্যনিষ্ঠা, গুরুবেদান্তবাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়রূপা, তুমি পুষ্টি—পঞ্চকোষের পরিপূর্ণতারূপিণী, তুমি স্বধা—শ্রাদ্ধাদি পিতৃকৃত্যরূপা, তুমি ধ্রুবা—নিশ্চলা, তুমি মহারাত্রি—প্রলয়রূপা অজ্ঞানরূপা, তুমি মহা-অবিদ্যা—অনাত্মপ্রত্যয়রূপা, তুমি নারায়ণী তোমাকে প্রণাম।

মা, তুমি মেধা—ধারণাবতী বুদ্ধি, ব্রহ্মবিদ্যাধারণের সামর্থ্যরূপা, তুমি সরস্বতী—বিশুদ্ধজ্ঞানরূপা ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি বরা—শ্রেষ্ঠা বরপ্রদা, তুমি ভূতি—সত্ত্বগুণস্বরূপা, তুমি বাভ্রবী—রজোগুণস্বরূপা, তুমি তামসী—তমোগুণস্বরূপা, তুমি নিয়তা—নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপা। মা তুমি

প্রসন্ন হও। তুমি ঈশা—ঈশ্বরী জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী হইয়াও, প্রতিনিয়ে বিশিষ্টভাবে নারায়ণীমূর্ত্তিতে বিরাজিতা। তোমার চরণে কোটি প্রণাম।

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥২৩॥

অনুবাদ। হে দেবি! তুমি সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বেশ্বরী, এবং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা। তুমি আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। হে দুর্গে দেবি! তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, দেবতাগণ তোমার স্তব করিতে গিয়া তোমার ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি, এবং লক্ষ্মী লজ্জা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছেন। "প্রসীদ" বলিয়া কাতর প্রাণে তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়াছেন। এইবার "সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে" বলিয়া তোমার প্রসন্নতার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। তুমি প্রসন্ন হইলে জীবের নিকট তোমার যে তিনটী স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়, এইবার তাহা স্মরণ করিয়া দেবতাগণ প্রণাম করিতেছেন।

মা, তুমি সর্ব্বস্বরূপা। আমাদের পরিদৃশ্যমান এই যে সর্ব্ব, অর্থাৎ প্রতিনিয়ত আমরা যে বহুত্বের বা সর্ব্বত্বের অনুভব করি, এই সর্ব্বই তোমার প্রথমস্বরূপ। ইহাই তোমার স্থূলদেহ। যে সন্তান তোমার এই সর্ব্বস্বরূপ মূর্ত্তিকে সত্য সত্যই তোমার স্থূলদেহরূপে পরিগ্রহ করিতে পারে, তাহারই নিকট তোমার দ্বিতীয় স্বরূপ সর্ব্বেশ্বরী মূর্ত্তিটী উদ্ভাসিত হয়। এই সর্ব্বের—এই বহুত্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী ঈশ্বরীরূপে তুমি তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ কর। ইহাই তোমার সূক্ষ্মশরীর। এইরূপে সন্তান তোমার ঈশ্বরী-মূর্ত্তির সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া, জীবত্বের—ক্ষুদ্রত্বের মোহ হইতে পরিত্রাণ পায়। তখন তুমি তোমার তৃতীয়মূর্ত্তি—সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত-স্বরূপটি উদ্ভাসিত কর। সর্ব্বরূপে যে শক্তি প্রকাশিত, এবং সর্ব্বের সৃষ্টিস্থিত্যাদিকর্ত্রীরূপে—সর্ব্বেশ্বরীরূপে

যে শক্তি প্রকাশিত, সে সমুদয় যে স্থানে সমন্বয় প্রাপ্ত হয়; যেখানে শক্তিরূপে কিছুরই বিকাশ নাই, অথচ সর্ব্বশক্তি যাহাতে সমন্বিত, তাহাই তোমার তৃতীয় স্বরূপ। সর্ব্বরূপে যাহার প্রতীতি হয়, উহা যে শক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, ইহা আমরা তোমার কৃপায় ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছি। মা! এই সর্ব্বশক্তিসমন্বিত স্বরূপটীকেই তোমার কারণ শরীর বলা যায়। উহাই ব্রহ্ম পরমাত্মা নিরঞ্জন ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত হয়। তোমার এই তিনটী স্বরূপই যুগপৎ তুল্য সত্য। উপনিষৎ অর্থাৎ শ্রুতি-বাক্যসমূহ তোমার এই তিনটী স্বরূপের কথাই তুল্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতাও ক্ষর অক্ষর এবং পুরুষোত্তমরূপে তোমার ত্রিবিধ স্বরূপের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে যে আধুনিক মায়াবাদিগণ তোমার নির্গুণ স্বরূপটীমাত্র সত্য স্বীকার করিয়া, অপর স্বরূপ দুইটীর মিথ্যাত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতেও কিছু ক্ষতি হয় নাই। সত্যই ত মা তোমার নিরঞ্জনস্বরূপে জগৎ বলিয়া কিছু নাই; সুতরাং জগদীশ্বর বলিয়াও কিছুই থাকিতে পারে না। আচার্য্য ভাষ্যকার এই নির্গুণ স্বরূপটীকে বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্যই প্রাণপণে অপর স্বরূপ দুইটীর অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, মা! তুমি আমাদের নিকট ত্রিবিধ স্বরূপেই তুল্য সৎ। "ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি" তুমি আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। আমার একার নহে; "নঃ"—আমাদের সকলের ভয় দূর কর মা, সকলের ভয় দূর কর। জন্মমৃত্যুক্লিষ্ট অল্পজ্ঞ সংসার-ভয়ে ভীত নিরাশ্রয় জীবগণের ভয় হরণ করিতে একমাত্র তুমিই সমর্থা, মা! তুমি দুর্গা—দুর্গতিহরা; আমাদের এই জীবত্বরূপ দুর্গতি হরণ কর। তোমার চরণে কোটি প্রণাম।

এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥২৪॥

অনুবাদ। মা, তোমার লোচনত্রয়-বিভূষিত এই মনোজ্ঞ

মুখমণ্ডল আমাদিগকে সর্ব্বভূত হইতে রক্ষা করুক। হে কাত্যায়নি! তোমাকে প্রণাম।

ব্যাখ্যা। মা, ত্রিলোকপ্রকাশক ত্রিকালদর্শী নয়নত্রয়ভূষিত কেবলানন্দস্বরূপ সর্ব্বমনোহর তোমার মুখমণ্ডল আমাদিগকে সর্ব্বভূত হইতে রক্ষা করুক। একমাত্র আনন্দস্বরূপ তুমিই যে স্থূলে সর্ব্বরূপে সূক্ষ্মে সর্ব্বেশ্বরীরূপে এবং কারণে সর্ব্বশক্তিসমন্বিত নিরঞ্জনস্বরূপে নিত্য প্রকাশিত, এই কথাটী জীব যখন তোমার কৃপায় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই তাহার সর্ব্বভূতের ধাঁধা কাটিয়া যায়। সর্ব্ব যে ভূত, এইরূপ অজ্ঞান বিদূরিত হয়। ভূত বলিয়া যে পৃথক কিছুই নাই, ইহা বুঝিতে পারে। আনন্দময়ী তুমিই যে সর্ব্বভূতরূপে অভিব্যক্ত, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই ভূতের ভয় চিরতরে বিদূরিত হয়। ওগো! তুমি আমাকে, আমাকে নয়—আমাদের সকলকে সর্ব্বরূপ ভূত হইতে রক্ষা কর। একমাত্র আনন্দ বস্তুই যে সর্ব্বরূপে প্রকটিত, ইহা আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দাও। মা! তুমি কাত্যায়নী, ব্রহ্মবিদ্ পুরুষগণের একান্ত আশ্রয়ণীয়া। কাত্যায়ন ঋষি যেরূপ তোমার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন, মা, আমাদিগের প্রতিও তুমি সেইরূপ প্রসন্ন হও। তোমাকে প্রণাম।

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥২৫॥
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব ॥২৬॥
অসুরাসৃগ্‌বসা পঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥২৭॥

অনুবাদ। হে ভদ্রকালি! জ্বালা-করাল (অগ্নিশিখাদ্বারা ভীষণ)

অতি উগ্র এবং অশেষ অসুরনাশকারী, তোমার ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক। যাহার ধ্বনি জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া দৈত্যকুলের তেজোক্ষয় করিয়াছিল, হে দেবি! তোমার সেই অনঃ অর্থাৎ মাতৃসদৃশী ঘণ্টা, আমাদিগকে পুত্রের ন্যায় পাপ হইতে রক্ষা করুক। অসুরগণের অসৃক্ এবং বসারূপ পঙ্কলিপ্ত তোমার করশোভিত খড়্গ আমাদের শুভদায়ক হউক। হে চণ্ডিকে! আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

ব্যাখ্যা। এই তিনটী মন্ত্রে ত্রিশূল ঘণ্টাধ্বনি এবং খড়্গ, এই ত্রিবিধ অস্ত্রের নিকট ভয় হইতে পরিত্রাণ এবং মঙ্গল প্রার্থনা করা হইয়াছে। ত্রিপুটীজ্ঞান, অনাহত-নাদ এবং অনাত্মপ্রতীতি-বিলয়কারক প্রজ্ঞা, এই তিনটীই বিশেষরূপে অসুরভাবসমূহকে বিনাশ করিয়া থাকে, তাই উহাদের নিকট দেবতাগণ মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।

মা! তুমি স্বয়ং আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র-সমূহও আমাদিগকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করুক। উহারাই ইতিপূর্ব্বে অসুরভাবসমূহকে বিনষ্ট করিয়া জীবত্বের মহানিগড় হইতে আমাদিগকে বিমুক্ত করিয়াছে। উহারা যেন সমস্ত প্রারব্ধ-ক্ষয় পর্য্যন্ত ঠিক এইরূপেই আমাদিগকে অসুর-অত্যাচার হইতে রক্ষা করে। মা! তুমি যখন স্বয়ং চণ্ডিকামূর্ত্তিতে প্রকটিত হও, তখনই তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তোমার বিভিন্নশক্তি আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অসুরকুলকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়; সুতরাং তোমার চণ্ডিকামূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা বিশেষভাবে প্রণত হইতেছি—"চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্।"

সাধক, এইরূপ অস্ত্রশস্ত্রের নিকট প্রার্থনা অস্বাভাবিক নহে বৈদিক যুগের সত্যদর্শী সরলপ্রাণ ঋষিবৃন্দের হৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনার ভাব স্বতঃই উদ্ভূত হইত। ইহাতে তাঁহারা সঙ্কীর্ণহৃদয় বা বদ্ধজীব বলিয়া পরিচিত হইতেন না। আজকাল কি এক নিষ্কাম শব্দের সুর উঠিয়াছে, উহা তামসিক-প্রকৃতি জীবের অলসতারই সূচনা করিতেছে। নিষ্কাম যে কি বস্তু, যাঁহারা তাহা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন,

তাঁহারাই সরল প্রাণে প্রার্থনা করিতে সমর্থ। অজ্ঞের বা সকাম ব্যক্তির প্রার্থনাই হয় না। প্রার্থনায় এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, প্রার্থনায় জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে, আবার প্রার্থনার ফলেই জগৎ আনন্দময় ব্রহ্মসত্তায় বিলীন হইয়া যায়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জীব জগৎ, বন্ধন মুক্তি, সকলই প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা ভিক্ষা নহে। প্রকৃষ্টরূপ অর্থনা করিতে পারিলে, সকল কামনাই সিদ্ধ হয়। যাহারা ঈশ্বরসত্তায় একান্ত বিশ্বাসবান্, যাহাদের ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তায় অবিচলিত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারাই প্রার্থনা করিতে সমর্থ। ঠিক ঠিক প্রার্থনা করিতে পারিলে, উহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। প্রার্থনায় সাধনার কিছুই ব্যাঘাত হয় না। প্রার্থনাই যথার্থ সাধনা। কিন্তু এ সকল কথা—এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥২৮॥

অনুবাদ। মা, তুমি তুষ্ট হইয়া অশেষ রোগ দূর কর, আবার রুষ্ট হইয়া সকল অভীষ্ট বিনাশ কর। তোমাকে আশ্রয় করিলে মানুষের কোন বিপদ্ থাকিতে পারে না, যাহারা তোমার আশ্রিত, তাহারাই যথার্থ আশ্রয়তা প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ অন্যের আশ্রয়নীয় হয়)।

ব্যাখ্যা। মা, তোমার তুষ্টি রুষ্টি উভয়ই আমাদের মঙ্গলদায়ক। যখন তোমার তুষ্টি হয়, অর্থাৎ নিত্যতুষ্টা তোমার তুষ্ট ভাবটী যখন আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, নিত্যপ্রসন্না মা, যখন তোমার প্রসন্নতা আমাদের প্রতীতিযোগ্য হইতে থাকে, তখনই আমরা অশেষরোগ হইতে বিমুক্ত হই। স্থূলদেহের রোগ ত্রিবিধ। আধ্যাত্মিক—বাত পিত্ত শ্লেষ্মার অসাম্য-নিবন্ধন, আধিদৈবিক—শীতোষ্ণ-বাতবর্ষাদি

নিবন্ধন এবং আধিভৌতিক—ব্যাঘ্রতস্করাদি দংশমশকাদি নিবন্ধন স্থূলদেহে যে সকল বিকার উপস্থিত হয়, তাহাই স্থূলদেহের ত্রিবিধ রোগ বলিয়া কথিত হয়। সূক্ষ্মদেহের রোগ—মানসিক। ইষ্টবিয়োগ এবং অনিষ্টপ্রাপ্তি বশতঃ যে সকল মানসিক বিকার উপস্থিত হয়, তাহাই সূক্ষ্মদেহের রোগ। অতঃপর কারণ দেহের রোগ। অজ্ঞানতা—আত্মবিস্মৃতিই ইহার স্বরূপ। এই ত্রিবিধ রোগকে লক্ষ্য করিয়াই দেবতাগণ অশেষ রোগ বলিয়াছেন। মা, তোমার প্রসন্নতা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সর্ব্ববিধ রোগই বিনষ্ট হইতে থাকে, তোমার তুষ্টি-মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষ করিবার ইহাই ফল। মা, যাহারা এ সকল বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহাদিগকে তুমি নিজ মুখে বলিয়া দাও—এ সকল অর্থবাদ-বাক্য নহে, যথার্থই অশেষ রোগ দূর হইয়া যায়। সত্যসত্যই মানুষ যখন ভগবৎপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিতে পারে, বুঝিতে পারে, তখন তাহার সর্ব্ব বিষয়ে শুভ হয়—অভ্যুদয় উপস্থিত হয়।

মা, তুমি রুষ্ট হইলে জীবের সকল কামনা, সকল অভীষ্ট বিনষ্ট হইয়া যায়; মন্ত্রে 'কামনা' এবং 'অভীষ্ট' একার্থবাচক দুইটী শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। বর্ত্তমান কাম্য বস্তুকে কামনা, এবং ভবিষ্যৎ কাম্য বস্তুকে অভীষ্ট বলা হয়। সে যাহা হউক, মানুষ যখন তোমার অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিতে থাকে—তোমার রোষরক্তনয়ন দেখিয়া ভীত হয়, তখনই তাহার যাবতীয় কাম্য এবং অভীষ্ট বিনষ্ট হইয়া যায়। যদিও স্থূল দৃষ্টিতে ইহা তোমার রোষের লক্ষণ বটে, তথাপি একটু ধীরভাবে দেখিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, তুমি যখন রোষান্বিত হইয়া আমাদের কাম্য এবং অভীষ্ট বিনষ্ট করিয়া দাও, তখনই আমরা যথার্থ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হই। আমাদিগকে বহু কামনা, বহু অভীষ্ট এবং অতি ইচ্ছার সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার জন্যই তোমাকে রুষ্টা চণ্ডিকা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতে হয়। আমাদের কাম্য ও অভীষ্টের বিনাশ না করিলে, আমরা চিরদিন এমনই জীবত্বের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতাম। তুমি রুষ্টা মূর্ত্তিতে আমাদের

সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের কামনাগুলি বিদূরিত করিয়া না দিলে, আমরা মহামঙ্গল-স্বরূপ হিরণ্ময় মন্দিরের সন্ধানই পাইতাম না; তাই বলিতে ছিলাম, মা! তোমার রোষ ও তোষ উভয়ই আমাদের পক্ষে যথার্থ মঙ্গলদায়ক। তাই বলিতে হয়, "ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং"। তোমাকে আশ্রয় করিতে পারিলে—তোমার শরণাগত হইলে জীবের আর কোন বিপদ্ই থাকে না। তোমার তুষ্টিতে অভীষ্টলাভ, রুষ্টিতে অভীষ্টনাশ; উভয়পক্ষেই জীবের মঙ্গল। মা! তুমি এই দ্বিবিধভাবে আত্মপ্রকাশ কর বলিয়াই সৃষ্টির এত বৈচিত্র্য, এত মাধুর্য্য! তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহাদের আর বিপদ্ বলিয়া ত কিছু থাকেই না, অধিকন্তু তাহারা অপরের আশ্রয়দাতা হয়। কত জীব তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া লয়। ইহাই তোমার বিশেষত্ব।

এই মন্ত্রে "নরাণাং" পদটী নর এবং নারী উভয়েরই বোধক। একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া ঐরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয়।

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥২৯॥

অনুবাদ। হে দেবি অম্বিকে! এই যে তুমি আপনাকে বহু মূর্ত্তিতে প্রকটিত করিয়া ধর্ম্মদ্বেষী মহাসুরদিগের বিনাশ সাধন করিলে, ইহা তুমি ব্যতীত আর কে করিতে পারে?

ব্যাখ্যা। মা, তুমি একা অদ্বিতীয়া বিশুদ্ধবোধস্বরূপা হইয়াও বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া—ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী কৌমারী প্রভৃতি বহুমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া, ধর্ম্মবিরোধী অসুরভাবসমূহকে কদন করিয়া থাক। যাহারা ইহা স্বীকার করিতে পারে না, যাহারা কেবল তোমার নিরঞ্জন স্বরূপটী স্বীকার করিয়া, বহুধা প্রকটিত মূর্ত্তিসমূহকে মিথ্যা বলিয়া

উড়াইয়া দিতে চায়, তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, যতক্ষণ জগৎ-প্রতীতি আছে, ততক্ষণ তোমার বহুরূপকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" বলিয়া উপনিষৎ তোমার সর্ব্বরূপ বহুরূপ স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বুদ্ধির মাপকাঠিদ্বারা তোমার পরিমাণ করিতে যাই বলিয়াই, তোমাতে একত্ব বহুত্বের সমন্বয় করিতে পারি না। বাস্তবিক কিন্তু তুমি এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজিতা। "কান্যা"—অন্যা কা। তুমি ছাড়া আর কে আছে? কেহই নাই; থাকিতে পারে না। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইহাই সত্য। এই অদ্বিতীয় সত্যবস্তু-ব্যতীত আবার আগন্তুক নূতন কেহ আসিয়া আত্মমূর্ত্তি বহুধা প্রকটিত করে না। সুতরাং একরূপেও তুমি; আবার বহুরূপেও তুমি মা। বিশেষত্ব এই যে, বহুরূপে প্রকটিত হইতে গিয়াও তোমার একত্বটী অক্ষুণ্ণই থাকে। ঘট সরাব উদকুম্ভ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে ও নামে পরিচিত হইলেও, মৃত্তিকাত্ব সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণই থাকে। আমাদের ক্ষীণ-বুদ্ধিতে একত্ব ও বহুত্বের সমন্বয় মীমাংসিত না হইতে পারে, তুমি কিন্তু এক হইয়াও বহু, আবার বহু হইয়াও এক। "একো বহুধা প্রকরোতি রূপম্।" একজন সাধারণ যোগিপুরুষ যদি স্বেচ্ছায় আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়াও, নিজের একত্বটী অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন; আর জগদীশ্বরী তুমি সগুণরূপে প্রকটিত হইয়াও নির্গুণত্ব যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে তাঁহাতে বিচিত্রতা কি আছে? তাই দেবতাগণ বলিলেন—"অনেকৈরূপৈঃ আত্মমূর্ত্তিং বহুধা কৃত্বা" এক আত্মমূর্ত্তি তুমিই অনেকরূপে প্রকাশিত হও। তুমি আত্মারূপে একা অদ্বিতীয়া, ঈশ্বররূপে স্বগতভেদময়ী বহুরূপা। তুমি ধর্ম্মদ্বেষী মহা-অসুরদিগের কদন অর্থাৎ নিধন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। মা তোমার চরণে কোটি প্রণাম।

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥৩০॥

অনুবাদ। মা, (একদিকে) বিদ্যা—সমস্ত শাস্ত্র ও বিবেকদীপসদৃশ সমস্ত আপ্তবাক্য এবং (অন্যদিকে) মহান্ধকারময় মমত্বরূপ গর্ত্ত, এই উভয়ত্র তুমি ভিন্ন আর কে এই বিশ্বকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইতে সমর্থ।

ব্যাখ্যা। মাগো! এই বিশ্বকে বিদ্যা অবিদ্যারূপে ঊর্দ্ধাধোভাবে একমাত্র তুমিই পরিভ্রমণ করাইয়া থাক। একদিকে বিদ্যা—ব্রহ্ম বিদ্যা, তৎসাধনভূত শাস্ত্রসমূহ এবং আত্মানাত্ম-বিবেকের পক্ষে দীপসদৃশ আপ্তবাক্যসমূহ, অর্থাৎ বেদ—উপনিষৎ। অন্যদিকে অবিদ্যা—মমত্বরূপ মহান্ধকারময় গর্ত্ত, অর্থাৎ পূর্ণ অজ্ঞান। একদিকে বিদ্যাপক্ষ—শাস্ত্র বিবেক উপনিষৎ, অন্যদিকে অবিদ্যাপক্ষ—মমত্বরূপ মহান্ধকারাচ্ছন্ন গর্ত্ত। এই উভয়পক্ষেই "কা ত্বদন্যা" তুমি ছাড়া আর কে আছে? মা! তুমিই ত অনাত্মপদার্থের দ্রষ্টা হইয়া তাহাতে মমত্ববুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞানহীন অন্ধকারময় গর্ত্তে কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছ! আবার তুমি স্বয়ং আত্মা—স্বপ্রকাশ-স্বরূপা হইয়াও তোমাকে পাইবার জন্য কত শাস্ত্র পাঠ, কত বেদ অধ্যয়ন এবং বিবেকখ্যাতির কতরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছ! মাগো, একদিকে দেখিতে পাই, তুমি আত্মহারা অজ্ঞান শিশু, আবার অন্যদিকে দেখিতে পাই, তুমি আপনাকে খুঁজিয়া পাইবার জন্য কতই অধ্যবসায়শীল পুরুষ! মা! তুমি সর্ব্বপ্রকাশরূপিণী চিন্ময়ী, তোমাতে বিন্দুমাত্র আবরণ নাই; তবু এ ভ্রান্তি, এ কল্পিত বিশ্ব-ভ্রমণ-লীলা বড়ই বিচিত্র! মা! তুমি বিদ্যা অবিদ্যা উভয়েরই ঈশিতা—বিদ্যা অবিদ্যা উভয় হইতেই পৃথক্, বাক্য মনের অগোচরস্বরূপ হইয়াও, বিদ্যা এবং অবিদ্যারূপে স্বয়ং ভ্রান্তবৎ এই বিশ্ব-পরিভ্রমণলীলা সম্পাদন করিতেছ। একদিকে তুমি

ঈশ্বররূপে সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অধিষ্ঠিত হইয়া মায়ার বশে সর্ব্বভূতকে পরিভ্রমণ করাইতেছ, আবার অন্যদিকে জীবরূপে অজ্ঞের মতন সেই ভ্রমণযন্ত্রে স্বয়ং নিষ্পেষিত হইয়া হাহাকার করিতেছ। একদিকে উজ্জ্বল আলো—বিবেকদীপ, অন্যদিকে মহান্ধকার—মমত্ব-গর্ত্ত। দুই দিকেই তোমার অভাব পরিস্ফুট। অথচ কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেহই নাই; "কা ত্বদন্যা" তোমার অভাব কোথাও নাই। ধন্য মা তোমার এই আনন্দলীলা!

মাগো! "বিভ্রাময়তি" পদটীর মধ্যে আমরা তোমার আর একটু বিচিত্র রহস্য দেখিতে পাই। তুমি স্বয়ং বিভ্রান্ত হইয়া—আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া, আবার সেই বহুরূপকেই বিভ্রান্ত করিয়া দাও—ভুলাইয়া দাও। নিজেই নিজেকে ভুলিয়া অজ্ঞান-অন্ধকারে নিপতিত হইয়া থাক, অথবা বিবেকের দীপ জ্বালিয়া নিজেকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর। নিত্যজ্ঞানময়ী তুমি, তোমার এ লীলা বড়ই বিচিত্র!

সাধক! এ স্থানে বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত একটী আত্ম-সম্বেদন-সঙ্গীতের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সত্য আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার প্রাণ!
কেন মা তোমার শুষ্ক বয়ান, কেন মা তোমার বদ্ধ ভান?
কেন মা তোমার হতাশ বক্ষে বহিছে বিষাদ অশ্রুধার?
তুমি যে মুক্ত বিরাট্ ব্রহ্ম, তুমি যে সত্য সারাৎসার।
কোথায় জন্ম, কোথায় মৃত্যু, কোথায় বন্ধন তোমার আর॥ ॥১॥

তুমি যে নিত্য মহান্ সত্য, তুমিই যে এই বিশ্ব-প্রাণ।
তুমি যে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, তুমি যে পূর্ণ মহাজ্ঞান।
আনন্দ তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব, তুমি গো জননি কামচার।
স্বেচ্ছায় তুমি হয়েছ ক্ষুদ্র, স্বেচ্ছায় বহিছ ত্রিতাপ-ভার ॥২॥

(কোথায় জন্ম ইত্যাদি)

তুমি যে সূর্য্য, তুমি যে চন্দ্র, তুমিই ধরেছ বিশ্ব-সাজ,
তুমিই আবার দর্শকরূপে "আমি" হয়ে বহু কর বিরাজ।
পুণ্য পূর্ণ পরম জ্যোতি তুমি গো সর্ব্ব বিকাশকার,
তুমিই আবার তোমায় না দেখে, স্বেচ্ছায় হেরিছ অন্ধকার ॥৩॥

(কোথায় জন্ম ইত্যাদি)

তোমারই আঁখির পলকমাত্র, ভাবিছ তুমি গো যুগান্তর।
প্রকাশ তুমি হ'য়ে প্রতিহত, হেরিছ কতই দেশান্তর।
কাল দিক্ মাগো. তোমারই ব্যাপ্তি, স্বেচ্ছায় অধীন তুমি গো তার,
স্বেচ্ছায় তুমি হয়েছ বদ্ধ, স্বেচ্ছায় বহিছ বিষাদ-ভার ॥৪॥

(কোথায় জন্ম ইত্যাদি)

হে আমার প্রাণ! জননি! তোমার স্বেচ্ছার খেলা সহে না আর,
দেখ্ চেয়ে মাগো, সন্তান তোর, কল্পিত অভাবে দীনের সার!
স্নেহ-দয়াময়ী জননী আমার, দাঁড়াও স্বরূপে দাঁড়াও একবার,
মহামায়া তুমি মায়ায় তোমার, ডুবাও আমার আমিত্ব-ভার ॥৫॥

(কোথায় জন্ম ইত্যাদি)*

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥৩১॥

অনুবাদ। মা! যেখানে রাক্ষসকুল, যেখানে উগ্রবিষ-সর্প-সমূহ, সেখানে অরিবৃন্দ যেখানে দস্যুবল, যেখানে দাবানল এবং যেখানে

* ঝিঁঝিট—একতালা; অথবা ইমন্—একতালা বা চৌতাল।

(বাড়বানল পূর্ণ) সমুদ্রমধ্য, সে সকল স্থানেও তুমি স্বয়ং অবস্থানপূর্ব্বক এই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ।

ব্যাখ্যা। মাগো! কেবল যে তুমি এই বিশ্বকে পূর্ব্বোক্তরূপে বিভ্রান্ত করিতেছ, তাহা নহে; সর্ব্বত্র স্বয়ং অব্যাহতভাবে অবস্থান পূর্ব্বক ইহাকে যথাযোগ্য রক্ষাও করিতেছ। রাক্ষসরূপী বিষয়ের প্রলোভন, উগ্রবিষ সর্পরূপী দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি, অরিরূপী কাম-ক্রোধাদি, দস্যুবলরূপী দম্ভ দর্প অভিমান, দাবানলরূপী শোক দুঃখাদি, এবং দুস্তর-সমুদ্ররূপী সংসার—যে সকল স্থানে রক্ষা করিবার আর কেহ নাই, যেখানে অজ্ঞানের পূর্ণ আবরণ, যেখানে আত্ম-অস্তিত্বনাশের পূর্ণ বিভীষিকা, যেখানে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর করাল কৃষ্ণ-চ্ছায়া, সেখানেও ত মা তুমি পরিপালিনী-মূর্ত্তিতে—স্নেহময়ী মাতৃ-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া স্নেহের সন্তান জীববৃন্দকে রক্ষা করিয়া থাক—বিশ্বকে রক্ষা করিয়া থাক! আবার স্থূল জগতেও পূর্ব্বোক্ত রাক্ষস সর্প শত্রু দস্যু দাবানল এবং বাড়বানল-পূর্ণ দুস্তর-সমুদ্রমধ্য প্রভৃতি ঘোর বিপৎসঙ্কুল স্থান সমূহে নিপতিত তোমার স্নেহের সন্তানকে তুমি যে কি অলৌকিক ভাবে কি বিস্ময়প্রদ উপায়ে রক্ষা করিয়া থাক, তাহা বারংবার দেখিয়াও মূঢ় আমরা তোমায় বুঝিতে চাই না; বুঝিলেও তোমার সত্তা মানিতে চাই না; মানিলেও সম্যক্ বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি যে সত্যই আছ, তুমি যে সত্য সত্যই জীবদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, ইহা আমরা নিঃসংশয়রূপে স্বীকার করিয়া লই না। আমরা স্বীকার না করিলেও তুমিই যে একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, তাহাতে কিন্তু কোন সংশয়ই নাই মা।

পক্ষান্তরে, যাহারা পূর্ব্বোক্তরূপ বিপদে নিপতিত হইয়া আমাদের চক্ষুতে রক্ষিত হয় না, অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহারাও যে তোমারই স্নেহময়-অঙ্কে চিররক্ষিত, ইহাতেও কোনরূপ বিচার বা সংশয়ের অবসর নাই। কারণ, "তত্র স্থিতা ত্বং" তুমি সেখানে অবস্থিতা। সেই বিপৎ-সঙ্কুল স্থানে—সেই বিনাশ-স্থানে ও কালে একমাত্র তুমিই রহিয়াছ;

সুতরাং জীবরূপী স্নেহের সন্তানগণ যদি বিপদে পড়িয়া সাধারণ দৃষ্টিতে বিনষ্ট হইয়াও যায়, তাহাতেও তাহাদের কিছুই হানি হয় না। তোমারই শান্তিময় কোলে স্থান পায়। ওগো তুমি যে সর্ব্বত্র অবস্থিতা মা, তুমি যে সর্ব্বত্র রক্ষাকর্ত্রী জননী! অতএব রক্ষা বা বিনাশ উভয় স্থলেই যে "বিশ্বং পরিপাসি" তুমি বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ; ইহা ধ্রুব সত্য। যাহারা তোমাকে এই বিশ্বরক্ষাকারিণী-মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র অবস্থিতা দেখিতে পায়, তাহারা কখনও কোন বিপদেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

"তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি" কথাটীর মধ্যে একটী সাধনারহস্য নিহিত আছে, সাধকগণ অবহিত হইবেন। হিরণ্যকশিপুর আদেশে প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে নিপতিত প্রহ্লাদ ভগবান্‌কে অনলবিহারী হৃদয়বিহারী প্রভৃতি নামে না ডাকিয়া বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি নামে ডাকিয়াছিলেন। আবার কুরুসভা মধ্যে দুঃশাসন কর্ত্তৃক বস্ত্রহরণ কালে দ্রৌপদীও ঐরূপ প্রাণনাথ প্রভৃতি নামে না ডাকিয়া দ্বারকাপতি প্রভৃতি নামে ভগবান্‌কে আহ্বান করিয়াছিলেন, উভয়ত্রই ভগবানের আগমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল, কারণ প্রহ্লাদ এবং দ্রৌপদী "তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি" কথাটীর রহস্য তৎকালে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ভগবান্ সর্ব্বত্র বিরাজিত, ঐ অগ্নিরূপেও তিনি, ঐ বস্ত্ররূপেও তিনি, আর সর্ব্বজীবের হৃদয়াধিষ্ঠিত প্রাণপতি রূপেও তিনিই বিরাজিত। অতএব যেখানে যেরূপ বিপদেই জীব নিপতিত হউক না কেন, সেইখানে এবং সেই বিপদরূপেও যে মা-ই উপস্থিত রহিয়াছেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে রাখিয়া মাকে স্মরণ করিতে পারিলেই জীব বিপদ হইতে অচিরকাল মধ্যে পরিত্রাণ পাইতে পারে। মা যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সন্নিহিতা, এই ভাবটী হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিলে, আর কোনরূপ বিপদেই জীবকে বিচলিত হইতে হয় না।

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্ ।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তি-নম্রাঃ ॥৩২॥

অনুবাদ। মা! তুমি বিশ্বেশ্বরী; তাই তুমি বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ। বিশ্বই তোমার শরীর; তাই, তুমি বিশ্বকে ধারণ করিতেছ। তুমি বিশ্বেশগণের বন্দনীয়া। যাহারা তোমার নিকট ভক্তিবিনম্র হয়, তাহারাও বিশ্বের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। মা! তুমি যে পূর্ব্বোক্ত রাক্ষসাদিরূপ মহাবিপদ হইতেও জীবগণকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করিয়া থাক, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ওগো, তুমি যে বিশ্বেশ্বরী—এই বিশ্বের অধিপতি। যে যাহার অধিপতি, সে তাহাকে ত রক্ষা করিবেই; তবে দেবতাগণ "বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং" কথাটী কেন বলিলেন—যাহারা তোমাকে বিশ্বেশ্বরী বলিয়া জানে, শুধু তাহারাই বুঝিতে পারে যে, একমাত্র তুমিই এই বিশ্বকে রক্ষা কর। আবার তুমিই যে এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, ইহাতেও বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই; কারণ, তুমি যে বিশ্বাত্মিকা। "একোঽহম্ বহু স্যাম" বলিয়া তুমিই যে বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছ। এই বিশ্বই যে তোমার শরীর; সুতরাং ইহাকে ধারণ করাই তোমার স্বভাব।

প্রসঙ্গক্রমে এইস্থানে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা নিতান্ত অন্যায় হইবে না। তন্মতাবলম্বিগণ বলেন—এই বিশ্বই ভগবানের শরীর। আমাদের এই স্থূল শরীর, এই মন বুদ্ধি আত্মা, এই সকলের সমষ্টি যেরূপ আমি; ঠিক সেইরূপ এই ব্যক্ত বিশ্ব, বিরাট মন, সমষ্টি বুদ্ধি এই সকল সমন্বিত পরমাত্মাই একমাত্র উপাস্য বা লভ্য। সাধনা জগতে এই মতটী বিশেষ আদরণীয় এবং পরিগ্রাহ্য! ইহা উপনিষদ্-বিরুদ্ধও নহে! উপনিষৎও অনেক স্থলে এই বিশ্বকে পরমাত্মার স্থূল

শরীর বলিয়াছেন; কিন্তু এই মতের একটী কথা বিশেষরূপ চিন্তনীয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ এই পরিদৃশ্যমান জড় অংশকে একেবারে অচিৎ-তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। অচিৎ শব্দের অর্থ জড় হইলে উহা শ্রুতি-বিরুদ্ধ হয়। কারণ, শ্রুতি এই জড় অংশকেও ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। অচিৎ শব্দে যদি চিৎএর স্বল্প প্রকাশরূপ অর্থ স্বীকার করা যায়, ঈষদর্থে নঞ্ সমাস করা যায়, তবে আর কোনরূপ সংশয়ের অবসর থাকে না।

সে যাহা হউক, মা তুমি বিশ্বেশবন্দ্যা। বিশ্বেশগণ—বিশ্বাধিপতিগণ—ঈশ্বরগণ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ নিয়ত তোমার বন্দনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে তোমারই শরণাগত; এবং তোমার শরণাগত হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহারা বিশ্বাধিপত্য লাভ করিয়াছেন। অতএব যাহারা "ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ" তোমাতে ভক্তিনত, তাহারা নিশ্চয়ই বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ হয়। বিশ্ববাসি জনগণ তাহার আশ্রয় লাভ করিয়া জ্ঞান ভক্তি ও শান্তি লাভ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়।

দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥৩৩॥

অনুবাদ। হে দেবি! তুমি প্রসন্ন হও। যেরূপ এখন অসুরবধ করিয়া আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে সদ্যোমুক্ত করিলে, সেইরূপ নিত্য আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে পরিপালন কর। আর এই জগতের সমস্ত পাপ এবং উৎপাতের পরিণাম স্বরূপ মহা-উপসর্গ সমূহ আশু প্রশমিত কর।

ব্যাখ্যা। মা! তুমি প্রসন্ন হও! তুমি যে আমাদিগের প্রতি নিত্যই প্রসন্না, ইহা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে দাও! আর

'নব" এইমাত্র যেরূপ অসুরদিগকে নিহত করিয়া আমাদিগকে ভয় হইতে মুক্ত করিয়া দিলে, এইরূপ নিত্য—আবহমান কাল তুমি আমাদিগের, (নঃ)—আমি বলিতে যত আছে, এই বহু আমির—অজ্ঞান কল্পিত আমিগুলির যে অরিভীতি—শত্রুভয় অর্থাৎ কামাদিরিপু কর্তৃক যে আচ্ছন্নভাব, তাহা বিদূরিত কর, আমাদিগকে পরিপালন কর।

মা! একবার দেখ—তোমার স্নেহের সন্তানগণ অরিভয়ে—কামাদিরিপুগণের উৎপীড়নে নিয়ত উৎপীড়িত। ঐ শোন মা, তাহারা অরির অত্যাচারে উপদ্রুত হইয়া, তোমাকে সুদুর্লভ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, কেহ বা তোমাকে নিষ্ঠুরা পাষাণী বলিয়া তিরস্কার করিতেছে, কেহ বা অরিভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কঠোর সংযম ও নানারূপ যোগ কৌশলাদি অবলম্বন করিতেছে। মা! শত্রুভয়ে ভীত তোমার এই সন্তানগণকে তুমি রক্ষা কর। তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" আমার শরণাগত হইলেই শত্রুভয় প্রশমিত হইয়া যায়। কেবল তাহাই নহে—"পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু" সর্ব্বজগতে পাপ নামক যে সংস্কার আছে, তাহাও আশু প্রশমিত কর। জীবের পাপবোধ কেন হয়? 'আমি' কর্ত্তা সাজিয়া কর্ম্ম করে, তাই কর্ম্মফলরূপ পাপ আমির সহিত জড়াইয়া যায়। (সাধারণ কথায় যাহাকে পুণ্য বলে, তাহাও এইরূপ পাপের অন্তর্গত।) মা! জীব যদি তোমার শরণে আগত হয়, তবে অল্পদিনেই তাহার কর্তৃত্বজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়; সুতরাং পাপ বলিয়া, কর্ম্মফল বলিয়া আর কিছুই থাকে না; তাই ত বলি মা, তোমার স্নেহের সন্তানগণকে বলিয়া দাও—"ঐ যে অহং, উহাই পাপ; অহংবোধ ছাড়, অহং যে আমি—তোমাদের মা। আমি ছাড়া তুমি আবার অহং হইতে যাইও না। আমার দিকে লক্ষ্য রাখ, আমার শরণাগত হও, দেখিবে অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের—জগতের যাবতীয় পাপ দূরীভূত হইয়া যাইবে।"

উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্। উৎপাত—উল্কাপাত, গন্ধর্ব্ব-নগর দর্শন, ধূমকেতুর উদয়, পরিবেশ (সূর্য্যের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভয়ঙ্কর

কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল) ইত্যাদি। এই উৎপাত সমূহের যে পাক, অর্থাৎ ফল-পরিণতি, তজ্জনিত যে উপসর্গ—দুর্ভিক্ষ মহামারী জলপ্লাবন অকালমৃত্যু প্রভৃতি, এইগুলি পাপেরই প্রত্যক্ষ ফল। অহংবোধে কার্য্য করিতে গিয়া বহির্ম্মুখ জীববৃন্দ এইরূপ বিবিধ উপসর্গে নিপতিত হয়। মা, তুমি জগতের এই পাপ দূর কর! এই উপসর্গ প্রশমিত কর! আনন্দময়ীর সন্তান আবার আনন্দের সন্ধান পাইয়া—অমরত্বের সন্ধান পাইয়া বিষম উপসর্গের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করুক!

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। হে দেবি! হে বিশ্বার্ত্তিহারিণি! তুমি প্রণত জনগণের প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি ত্রৈলোক্যবাসী জীবগণের স্তুতিযোগ্যা। তুমি সকল লোকের প্রতি বরদায়িনী হও।

ব্যাখ্যা। তুমি দেবী দ্যোতনশীলা স্বপ্রকাশ-রূপিণী। তুমিই বিশ্বের যাবতীয় আর্ত্তি হরণ করিয়া থাক, তোমাকে লাভ করিলেই জীবের সকল আর্ত্তি বিদূরিত হয়, প্রণত জনগণের প্রতি প্রসন্ন হওয়াই তোমার স্বভাব। অথবা যাহারা যথার্থ প্রণত হইতে পারিয়াছে, তাহারাই তোমার নিত্য-প্রসন্ন-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। মা আজ আমরাও তোমার চরণে প্রণত—প্রকৃষ্টরূপে নত হইতেছি, আমাদের আমিত্বের উচ্চশির তোমার চরণে অবনত হইয়াছে, তুমিই অবনত করাইয়া লইয়াছ; সুতরাং এইবার "প্রসীদ", এইবার তোমাকে প্রসন্ন হইতেই হইবে। মা ত্রিলোকবাসী সুর নর গন্ধর্ব্ব, যাহার যেরূপ সাধ্য, নিজ নিজ বাগ্‌যন্ত্রকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য সকলেই তোমার স্তব করিয়া থাকে, তাই তুমি ত্রৈলোক্য 'বাসিনামীড্যে"। তুমি সকলকেই বরদান কর, তাই তুমি "লোকানাংবরদা"। মা! তুমি বরদায়িনী মূর্ত্তিতে দাঁড়াও! আজ

সন্তানগণ নির্ভয়ে অকপটে তোমার নিকট হইতে সত্য-বর গ্রহণ করিয়া ধন্য হউক! জগৎ আবার সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হউক!

দেব্যুবাচ।

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—হে সুরগণ! আমি বরদায়িনী। জগতের উপকারের জন্য তোমাদের যে বর ইচ্ছা প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব।

ব্যাখ্যা। দেবতাবৃন্দের স্তোত্র-পাঠের ফলে, মা আমার বিশেষভাবে প্রসন্ন হইয়াছেন, বরদায়িনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া জগন্মঙ্গল-বিধায়ক বর প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন। সাধক! সত্যই এইরূপ হয়। এখনও—এই অবিশ্বাসের যুগেও এমন করিয়া সত্যই মা আসিয়া থাকেন, সত্যই সন্তানগণকে বরাভয় প্রদানে ধন্য করেন। সে বরে জগতের মঙ্গল সাধিত হয়; কারণ, সন্তান যখন জগদাত্মায় একীভূত হইয়া যায়, তখন জগতের মঙ্গল সাধনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য থাকে না। তাই নিষ্কাম সাধকগণের তপস্যার ফল জগতের সকল লোকই অল্পাধিক লাভ করিয়া থাকে। নিষ্কাম সাধকগণের সাধনার ফলেই বিশ্বমঙ্গল সাধিত হয়।

এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মীদিগের কর্ম্মফল বিভাগ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রুতি বলেন—আত্মজ্ঞপুরুষদিগের যাহারা সুহৃৎ, তাহারাই তাঁহাদিগের সুকৃত গ্রহণ করে। যাহারা বিদ্বেষী, তাহারা দুষ্কৃত গ্রহণ করে, আর যাহারা পুত্রাদি উত্তরাধিকারী, তাহারা দায় অর্থাৎ ধন বিত্তাদি লাভ করে।

উপনিষৎও অভ্যুদয়কামী জনগণকে আত্মজ্ঞ পুরুষদিগের অর্চ্চনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপে বিশ্বমঙ্গল সাধন করিবার জন্যই জগতে আত্মজ্ঞ পুরুষদিগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু সে অন্যকথা—

দেবা ঊচুঃ।

সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ ॥ ৩৬

অনুবাদ। দেবতাগণ কহিলেন—হে অখিলেশ্বরি! তুমি এখন যেরূপ আমাদের বৈরিকুল বিনাশ করিলে, এইরূপ ত্রিলোকের সর্ব্ব বাধা প্রশমিত কর।

ব্যাখ্যা। মা! আর চাহিবার কিছু নাই, তুমি ত্রিলোকের সর্ব্ব বাধা প্রশমিত কর। হে অখিলেশ্বরি জননি! কিছুদিন যাবৎ বিশ্বময় এ কি আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে—সর্ব্বই বাধা। সর্ব্বরূপ বাধাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, তোমাকে লাভ করা যায় না, একি মর্ম্মপীড়াদায়ক বাণী শুনিতে পাই! কার্য্যতঃ কিন্তু দেখিতে পাই—অতি অল্পলোকই সর্ব্ব ত্যাগ করিতে পারেন। যাঁহারা পারেন, তাঁহারা ত সর্ব্বকে বাধা বলিয়াই কীর্ত্তন করিবেন। আর যাঁহারা অকৃতকার্য্য হন, তাঁহারাও সর্ব্বকেই মাতৃলাভের অন্তরায় বলিয়া ঘোষণা করেন। সর্ব্ব যে বাস্তবিক বাধা নহে, সর্ব্বরূপে যে তুমিই বিরাজিত, এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই ত জীব তোমার সর্ব্বাতীত স্বরূপটীর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সর্ব্বই যে মা, জীব ইহা যতক্ষণ বুঝিতে না পারে, ততক্ষণই এই সর্ব্ব মাতৃলাভের অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান থাকে। তাই বলি মা! জগতে আবার সত্যের প্রতিষ্ঠা কর,—একমাত্র তুমিই যে সর্ব্বরূপে সত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছ, ইহা প্রত্যেক জীবহৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া দাও। সর্ব্ব যে বাধা নয়, মাতৃবক্ষ যে সর্ব্বরূপেই সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে, ইহা তোমার সন্তানগণের

মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দাও। আবার সকলে সত্যপ্রতিষ্ঠ হউক! তোমার সত্তায় বিশ্বাস করুক! তোমার সত্তায় বিশ্বাস হইলেই, এই সর্ব্ববাধা প্রশমিত হইয়া যাইবে। জগতের যাবতীয় অভাব অভিযোগ কাতর-ক্রন্দন বিদূরিত হইবে। জগৎ যথার্থ কল্যাণ লাভ করিবে।

দেব্যুবাচ।

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ ॥৩৭॥
নন্দগোপ গৃহে জাতা যশোদা গর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥৩৮॥

অনুবাদ। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম যুগে পুনরায় শুম্ভ নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে, (তখন) আমি নন্দগোপ-গৃহে যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিন্ধ্যাচলে অবস্থানপূর্ব্বক সেই অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিব।

ব্যাখ্যা। দেবতাবৃন্দের প্রার্থিত (ত্রৈলোকস্য সর্ব্বাবাধা-প্রশমনং) বর প্রদানে উদ্যত হইয়া, মা এস্থলে অনেক রহস্য প্রকটিত করিলেন। দেবীমাহাত্ম্যে যে তিনটী রহস্য বর্ণিত হইয়াছে, মা স্বয়ং এখানে তাহা পরিব্যক্ত করিলেন। দেবী-বাক্যরূপে এই অধ্যায়ে চতুর্দ্দশটী মন্ত্র আছে। উহার তাৎপর্য্য-নির্ণয় বড়ই দুরূহ ব্যাপার। তবে যাঁহার বাক্য, তিনি যদি কৃপাপূর্ব্বক সাধকগণের মোহাবরণ অপসৃত করিয়া দেন, তবেই উক্ত মন্ত্রগুলির রহস্য-নির্ণয় হইতে পারে। এস প্রিয় সাধকগণ! আমরা মাতৃচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রার্থনা করি —"মাগো! তোমার এই রহস্যময় বাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও। আমরা যেন "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" ন্যায়ে ভ্রান্তপথে পরিচালিত না হই। জয় মা! তুমি উদ্ভাসিত হও।"

বৈবস্বত মনু—সপ্তম মনু। এক মনুর অধিকৃত কালকে মন্বন্তর কহে। একসপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর হয়। সত্যাদি যুগচতুষ্টয়ে এক মহাযুগ হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প বা একবার প্রলয় হয়। বর্ত্তমান কল্পের নাম—শ্বেতবরাহ কল্প। এই কল্পের একাত্তরটী মহাযুগের মধ্যে সাতাইশটী অতীত হইয়াছে। অষ্টাবিংশতি মহাযুগের সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে; সম্প্রতি কলিযুগ চলিতেছে। ইহার আয়ুঃ-পরিমাণ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর, তন্মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে। এস্থলে আমরা প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় কাল-গণনার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার কাল নির্ণয় করিতে গিয়া, চারি পাঁচ হাজার কিংবা দশ বিশ হাজার বৎসরমাত্র সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রকার কালগণনা প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিবেন। যাঁহারা বলেন—"ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে, ভারত চিরপরাধীন, চিরদাস ইত্যাদি", তাঁহারা একবার হিসাব করিয়া দেখিবেন—ভারতবর্ষের যে আয়ুঃ-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার নিকট দুই এক হাজার বৎসর, কত অল্প, কত ক্ষুদ্র, বিন্দু সদৃশ; সুতরাং ভারতের দুরবস্থা দর্শন করিয়া শঙ্কিত বা ক্ষুব্ধ হইবার কোন হেতু নাই। কিছুদিন পরে এ দেশের এই শোচনীয় কাহিনী ঠাকুরমার রূপকথার মধ্যে পরিগণিত হইবে। যদিও এ সকল কথা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি ইহার আলোচনায় মঙ্গল আছে—অবসাদগ্রস্ত জনগণের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ, নূতন বল ও আশার সঞ্চার হয়। আরও একটা মহান্ উপকার আছে—জীবের অহঙ্কার নাশ হয়। অনন্ত কালসমুদ্রমধ্যে আমি কত ক্ষুদ্র, আমার সত্তা-টুকু কত অল্প সময়ের জন্য, এইরূপ চিন্তায় জীবের অহঙ্কার হ্রাস পায়।

যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মা বলিলেন, বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতিতম যুগে আবার শুম্ভ নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে, এবং তিনিও নন্দগোপ-গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বিন্ধ্যাচলে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন। এস্থলে

মা যে কালের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বর্ত্তমান যুগই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এই দেবীমাহাত্ম্য স্বারোচিষ অর্থাৎ দ্বিতীয় মন্বন্তরীয় উপাখ্যান। তৎকালাপেক্ষায় বর্ত্তমান কাল সুদূর ভবিষ্যৎ। তাই মন্ত্রে "উৎপৎস্যেতে" এই ভবিষ্যৎ কালবোধক ক্রিয়াপদের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান কালে অধিকাংশ মনুষ্যই শুম্ভ নিশুম্ভ অর্থাৎ অস্মিতা মমতা কর্ত্তৃক অভিভূত নির্জ্জিত। মা নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদা-গর্ভসম্ভবারূপে আবির্ভূত হইয়া এই অসুরদ্বয়ের বিনাশ সাধন করিবেন।

নন্দগোপ—আনন্দময় ব্রহ্মাভিমুখী মন। "গাঃ পাতি ইতি গোপঃ" গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়সমূহের পালন এবং রক্ষণ করে বলিয়া মনকে গোপ বলা হয়। এই মনরূপ গোপ যখন নন্দ অর্থাৎ আনন্দ-স্বরূপ আত্মার অভিমুখী হয়, তখনই তাহার নাম হয় নন্দগোপ। সর্ব্বতোভাবে আত্মাভিমুখী মনের আশ্রয়ে যে শক্তির বিকাশ হয়, অর্থাৎ যে প্রজ্ঞার প্রভাবে অস্মিতা মমতা বিনষ্ট হয়, তাঁহাকেই নন্দগোপগৃহে জাতা বলা হয়। ইনিই যশোদাগর্ভসম্ভবা। যশোদা—যশঃ দানকারিণী। মাতৃলাভের জন্য অধ্যবসায়শীল হইলেই মা আমার প্রথমে যশোদায়িনী মূর্ত্তিতে জীবকে অঙ্কে ধারণ করিয়া বসেন। তখন অজ্ঞাতসারে তাহার যশঃ চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইতে থাকে। সন্তান "যশোদেহি" বলিয়া মায়ের নিকট আব্‌দার করে; তাই মা যশোদারূপে প্রকটিত হইয়া নন্দাশক্তির পরিপুষ্টি বিধান করেন। এই যশোদার ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত আনন্দময়ী শক্তিই শুম্ভ নিশুম্ভের বিনাশ সাধন করেন, ইহাঁরই নাম নন্দা শক্তি। ইনি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী। বিন্ধ্যাচল—হৃদয়দেশ। হৃদয়স্থা আনন্দময়ী শক্তিকর্ত্তৃকই অস্মিতা মমতার বিনাশ হয়। তন্ত্রশাস্ত্র সুমেরু-পর্ব্বতকে মস্তক, বিন্ধ্যপর্ব্বতকে হৃদয়, এবং কুলপর্ব্বতকে মূলাধাররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্থূলকথা এই যে, মা বলিলেন, এই যুগেও জীব যখন বিশেষভাবে সত্যচ্যুত হইয়া পড়িবে, আমার সন্ধান না পাইয়া অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া পড়িবে, তখনই আমি জীবহৃদয়ে যশোদাগর্ভসম্ভবা নন্দাশক্তিরূপে

প্রকটিত হইয়া, তাহাদের অহঙ্কার বিনাশপূর্ব্বক তাহাদিগকে সত্যলোকে লইয়া আসিব। দ্বাপরযুগেও মা আমার শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়া এই নন্দগোপগৃহজাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা নন্দাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং কংস শিশুপাল প্রভৃতি অসুরকে বিনাশকরিয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মূর্ত্তিরহস্যে এই নন্দাদেবীই বিষ্ণুশক্তিরূপে— লক্ষ্মীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—"কমলাঙ্কুশপাশাব্জৈরলঙ্কৃত চতুর্ভুজা। ইন্দিরা কমলা লক্ষ্মীঃ সা শ্রীরুক্মাম্বুজাসনা" ইত্যাদি। ইনি যে বিষ্ণুশক্তি তাহা মধুকৈটভ বধেও উক্ত হইয়াছে। সেই প্রথম চরিতে এই নন্দাশক্তি এবং রক্তদন্তিকা বীজের উল্লেখ আছে। রক্তদন্তিকার বিষয় পরবর্ত্তি-মন্ত্রেই পাওয়া যাইবে। যে শক্তি বিষ্ণুরূপে প্রকটিত হইয়া তখন মধুকৈটভকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই শক্তিই এই যুগে নন্দাশক্তিরূপে প্রতি জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভকে নিহত করিবেন।

শুন—শক্তি বস্তুটী অদৃশ্য অনুভবগম্য কারণস্বরূপ। যখন উহা কার্য্যরূপে—দৃশ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সাধারণভাবে ঐ কার্য্যই শক্তিমান্‌রূপে ব্যবহারের বিষয় হয়। দেখ—একটী বৃক্ষ। উহা স্বয়ংই একটী শক্তিমাত্র হইলেও, আমরা কিন্তু "বৃক্ষের শক্তি", এইরূপই ব্যবহার এবং অনুভব করিয়া থাকি। বাস্তবিক এস্থলে শক্তি ও শক্তিমানের কোন ভেদই নাই। ঠিক এইরূপ এক অখণ্ড মহতী শক্তি চিতিশক্তি বা ব্রহ্ম যখন যে ভাবে আপনাকে প্রকাশিত করেন, তখন তিনি সেইরূপ ভাবে বিভিন্ন নামে ও রূপে পরিচিত হইয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার একত্বের কোনই হানি হয় না। তাই এ দেশের লোক তেত্রিশ কোটি দেবতা দর্শন করিয়াও অদ্বৈতবাদী। এই ধন্য দেশের জনগণ এমনই শক্তিবাদী ও চৈতন্যদর্শী যে, কোনও স্থানে কোনরূপ বিশিষ্ট শক্তির বিকাশ দেখিলেই, তাহাকে একটা জড় শক্তিমাত্র না দেখিয়া, উহাকেই দেবতা বলিয়া, ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। অন্যদেশের লোক ইহার বৈজ্ঞানিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা বুঝিতে না পারিয়া, হয়ত

ইহাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিবে; তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। এই পৌত্তলিকগণই বিশ্বে সর্ব্ব প্রথমে "তত্ত্বমসি" বাক্যে অদ্বয় জ্ঞানের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত করিয়াছিলেন। আবার এখন—এই পূর্ণ অবিশ্বাসের যুগেও এ দেশের লোক নানা দেবতার পূজা করিয়াই অভীষ্টফল-লাভপূর্ব্বক অদ্বয়-জ্ঞানের যোগ্য অধিকারী হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এস্থলে পুনরায় সাধন-সমরের পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, যদিও এই গ্রন্থে যাবতীয় দেব দেবীর আধ্যাত্মিক রহস্যই বিবৃত হইয়াছে, তথাপি উহাদের বিশিষ্ট মূর্ত্তির অপলাপ করা হয় নাই। এই নন্দা শক্তি প্রভৃতির বিশিষ্ট মূর্ত্তি যে হইতেই পারে না, অথবা এখন আর এইরূপ মূর্ত্তিসকল দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা যেন কেহই মনে না করেন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এই সত্য বাক্যটীর উপর লক্ষ্য রাখিলেই, মূর্ত্ত অমূর্ত্তবিষয়ক সংশয় বিদূরিত হইবে। মূর্ত্তিরহস্য "পূজাতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংশ্চ দানবান্ ॥৩৯॥
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ ॥৪০॥
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্ ॥৪১॥

অনুবাদ। আবার আমি অতিভীষণ আকারে পৃথিবীতে অবতরণ-পূর্ব্বক বৈপ্রচিত্ত নামক দানবগণকে নিহত করিব। সেই উগ্র বৈপ্রচিত্ত নামক অসুরগণকে ভক্ষণ করিয়া, আমার দন্তসমূহ দাড়িমী পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইবে। তখন স্বর্গে দেবতাগণ এবং মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ সতত স্তব করিতে করিতে আমাকে রক্তদন্তিকা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে।

ব্যাখ্যা। বেদবিদ্-ব্রাহ্মণকে বিপ্র বলে—"বেদপাঠাৎ ভবেদ্-বিপ্রঃ"। যাঁহাদের চিত্তে বেদ অর্থাৎ আত্ম-সম্বেদন প্রকাশ পায়, তাঁহারাই বেদবিৎ, তাঁহারাই বিপ্র, তাঁহাদের যে চিত্ত, তাহাই বিপ্রচিত্ত। এই বিপ্রচিত্তে যে ভাব বা বৃত্তিসকল প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে বৈপ্রচিত্ত নামক দানবগণ বলা যায়। ইহাদিগকে নিধন করিবার জন্য মাকে অতি উগ্ররূপে প্রকটিত হইতে হয়; কারণ, আত্ম-সম্বেদন-সম্পন্ন পুরুষগণের চিত্ত অতিশয় বীর্য্যশালী, উহাদিগকে বিলয় করিতে হইলে মাকেও অতি উগ্ররূপে আবির্ভূত হইতে হয়।

ইতিপূর্ব্বে যোগীদিগের নির্ম্মাণ-চিত্তের বিষয় বলিয়া আসিয়াছি। যোগশাস্ত্রে একটী সূত্র আছে—"নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ" আত্মবিৎ পুরুষগণ অস্মিতামাত্র হইতে নির্ম্মাণ-চিত্তসমূহের সংগঠন করেন। অর্থাৎ চিত্ত-বিলয়ের পর আবার অভিনব চিত্ত নির্ম্মাণ করেন। উদ্দেশ্য—বিশ্বহিত—লোকৈষণা। বিশ্বমঙ্গলের জন্য, যোগী পুরুষগণ যে অভিনব কর্ম্মাশয় গঠন করেন, ইহাকেও বিপ্রচিত্ত অসুর বলা যায়। মা আমার যথাসময়ে আবির্ভূত হইয়া তাহারও বিলয় সাধন করেন। কারণ উহাও কৈবল্যের বিরোধী।

এই বিপ্রচিত্ত নামক অসুরদিগকে বিনাশ করিতে হইলে, মাকে বিশেষ ভাবে পরাপ্রকৃতির রজোগুণাত্মক চিৎপ্রবাহরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। যিনি ইতিপূর্ব্বে নন্দাশক্তি নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনিই আবার বৈপ্রচিত্ত নামক ভীষণ অসুরগণের বিনাশ করিয়া রক্ত-দন্তিকা নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। দন্তই ভাবরাশিকে বিলয় করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। যখন সেই অতি সূক্ষ্ম উচ্চতমবৃত্তিগুলি সংহারের অঙ্কে বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন সত্যই মনে হয়—প্রলয়ঙ্করী মা যেন রক্তবর্ণ করাল দশন-পংক্তি বিস্তারপূর্ব্বক ভাবসমূহকে গ্রাস করিতেছেন। গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনও ঠিক এইরূপই দংষ্ট্রাকরাল মুখের মধ্যে সর্ব্বভাবের বিলয় দেখিয়াছিলেন। গীতার সেই "যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ"—প্রজ্বলিত অনলমধ্যে পতঙ্গ সমূহের ন্যায় রাজন্যবর্গের

বিলয় এবং এখানে দাড়িমী কুসুম সদৃশ রক্তবর্ণ দন্ত সমূহের দ্বারা বৈপ্রচিত্ত অসুরকুলের ভক্ষণ, এই উভয় ঠিক একই ভাবের প্রকাশক।

এই সময় হইতে দেবতাগণ এবং মানবগণ নন্দা শক্তিকে রক্তদন্তিকা বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকেন। মা যখন যেরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং যেরূপ কার্য্য সম্পন্ন করেন, দেবতাগণ ও মনুষ্যগণ মাকে তখন সেইরূপ ভাবে ও নামে স্তুতি করিয়া থাকেন; ইহাই স্বাভাবিক। ইনিই ইতিপূর্ব্বে মধুকৈটভ বধের শক্তি ও বীজস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যদিও সেখানে বিপ্রচিত্তের প্রলয়রূপে কিছু বলা হয় নাই, তথাপি বুঝিতে হইবে—বহুত্ব-স্পৃহার নাশই যাবতীয় চিত্তবিলয়ের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে। বহুভাবের আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হইলেই, অন্যান্য আসুরিক ভাবের বিলয় হয়। এই রক্তদন্তিকা দেবীর আবির্ভাবে বিপ্রচিত্ত নামক অসুর এবং যোগীগণের নির্ম্মাণ-চিত্ত পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। নির্ম্মাণ-চিত্তের মূলেও যে ঐ বহুত্ব-স্পৃহা সূক্ষ্মভাবে থাকে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদিও উহা বন্ধন জনক নহে, তথাপি ভেদজ্ঞান ত বটেই। সে যাহা হউক, এই বহুত্ব-স্পৃহার সম্যক্ বিলয় সাধন করিয়া সাধককে কৈবল্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই নন্দাশক্তি মায়ের রক্তদন্তিকামূর্ত্তিতে আবির্ভাব হইয়া থাকে।

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥৪২॥
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥৪৩॥

অনুবাদ। পুনরায় যখন শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি বশতঃ পৃথিবী জলশূন্য হইবে, তখন আমি মুনিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া অযোনিজারূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইব। যেহেতু তখন আমি শতনয়নে মুনিদিগকে

নিরীক্ষণ করিব, সেই হেতু সেই সময় হইতে মনুষ্যগণ আমাকে শতাক্ষী নামে কীর্ত্তন করিবে।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে নন্দা শক্তি এবং রক্তদন্তিকা বীজরূপে প্রথম চরিতের রহস্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইবার মধ্যম চরিতের রহস্য বর্ণনার উপক্রম হইতেছে। দেবী বলিলেন, "আবার আমি আবির্ভূত হইব। যখন শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিবশতঃ জগৎ জলশূন্য হইবে, অর্থাৎ আনন্দময় পরমাত্মরসের অভাবে জীবজগৎ শুষ্ক প্রাণহীন সাধনার কঙ্কালমাত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিবে, মুনিগণ—ব্রাহ্মণগণ সেই ধর্ম্মের গ্লানিময় অবস্থায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া আমার স্তব করিবে, তখন অকস্মাৎ 'ভূমৌ সম্ভবিষ্যামি' ভূমিতেই আমি প্রকটিত হইব—ভূমির অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থসমূহের জড়ত্বজ্ঞান তিরোহিত করিয়া চিৎসত্তার বা সত্যের প্রতিষ্ঠা করিব। সেই সময়ে আমি মুনিগণকে—মননশীল সাধকগণকে শতনেত্রে নিরীক্ষণ করিব, অর্থাৎ মননশীল সাধকগণ তখন আমাকে বিশ্বতশ্চক্ষুরূপে—বিশ্বব্যাপী দৃক্‌শক্তিরূপে দর্শন করিবে। সেই সময়ে মনুজগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, আমাকে শতাক্ষী নামে কীর্ত্তন করিবে। মানুষ তখন যেদিকে তাকাইবে, সেই দিকেই আমার দিব্যদৃষ্টি—স্নেহময় বিলোকন দেখিতে পাইবে, তাই শতাক্ষী নাম কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারিবে না। আমি তখন ভূমিতে অর্থাৎ জড়পদার্থসমূহে বিশেষভাবে সত্যরূপে চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিব, সর্ব্বত্র আমার সত্তা উদ্‌ভাসিত করিব, সেই হেতু মনুজগণ—মনুর সন্তানগণ সর্ব্বত্রই আমার বিশিষ্ট-প্রকাশ অবলোকন করিয়া অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইবে।"

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥৪৪॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি ॥৪৫॥

অনুবাদ। হে সুরগণ! তখন আমি আত্মদেহসমুদ্ভূত প্রাণধারক

শাকসমূহের দ্বারা বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত সমগ্র লোককে ভরণ অর্থাৎ প্রতিপালন করিব। সেই সময়ে পৃথিবীতে আমি শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হইব।

ব্যাখ্যা। দেবী বলিলেন—"হে দেবতাবৃন্দ! সেই শতাক্ষী আমিই আবার শাকম্ভরী নামে প্রসিদ্ধ হইব। কারণ, সেই অনাবৃষ্টি-সময়ে আত্ম-দেহসমুদ্ভূত প্রাণধারক শাকসমূহদ্বারা অখিল লোককে ভরণ অর্থাৎ প্রতিপালন করিব।" নাগোজী ভট্ট এই শাকম্ভরী মূর্ত্তির আবির্ভাব কাল নিরূপণ করিয়াছেন—চত্বারিংশত্তম মহাযুগ। অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষায় একাদশটী মহাযুগ অতীত হইলে, তবে সে কাল আসিবে। সে সময়ে দীর্ঘকাল ব্যাপী অনাবৃষ্টি বশতঃ শস্যাদির সম্পূর্ণ অভাব হইবে, তখন স্নেহবিহ্বলা মা স্বকীয় শরীরোৎপন্ন শাকের দ্বারা পুনরায় বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত জীব-সন্তানগণকে রক্ষা করিবেন। সেরূপ দুঃসময় উপস্থিত হইবার এখনও বহু বিলম্ব। বর্ত্তমানকালীয় জীবগণের অগণিত অধস্তন পুরুষদিগেরও সেরূপ বিপদাপন্ন হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

সে যাহা হউক, আমরা ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আত্মদেহসমুদ্ভূত শাক শব্দে ক্ষিতিতত্ত্বের রস বা জীবনীশক্তি বুঝায়। ক্ষিতিই আত্মার দেহ; তাহা হইতে সমুদ্ভূত যে প্রাণ-ধারক শাক অর্থাৎ জীবনী শক্তি, তাহাই আ-বৃষ্টিকাল জীবগণকে রক্ষা করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, যতদিন বৃষ্টি না হইবে, অর্থাৎ আনন্দময় ব্রহ্মপ্রজ্ঞার ধারায় সমগ্র বিশ্ব পরিপ্লাবিত না হইবে, (সাধক, সমগ্র বিশ্ব শব্দে এখানে সমগ্র বুদ্ধি বুঝিয়া লইও) যতদিন জীব আনন্দময় ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন মা শাকম্ভরী রূপে আত্মদেহ-সমুৎপন্ন প্রাণধারক শাকের দ্বারা জগতের পরিপোষণ করিবেন, অর্থাৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন করাইয়া ত্রিতাপ সন্তপ্ত জীবগণের হৃদয়ে শান্তির উৎস খুলিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন।

শুন—খুলিয়া বলিতেছি, মা বলিলেন—জগতে এমন একটা সময়

আসিবে, যখন অনাবৃষ্টিতে অর্থাৎ ব্রহ্মরসধারার অভাবে জীবগণ অতিশয় দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইয়া পড়িবে, যখন আর স্থূল জগতে আত্মরসের সন্ধান পাইবে না, আত্মাকে জগদতীত অজ্ঞেয় বস্তু বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবগণ একান্ত বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িবে, তখন আমি শাকম্ভরীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইব। এই বিশ্বই যে আমার দেহ, ইহা জীবগণকে বুঝাইয়া দিব। তখন তাহারা আমার এই বিশ্বশরীরে প্রাণধারক শাকের সন্ধান পাইবে। বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ ই যে প্রাণময়—একমাত্র চৈতন্যবস্তুই যে এই বিশ্বের উপাদান, ইহা তখন অনায়াসে জীববৃন্দের উপলব্ধিযোগ্য হইবে। তখন তাহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই প্রাণ-ধারক শাক দেখিতে পাইবে, অর্থাৎ চৈতন্যের সন্ধান পাইয়া স্বয়ং পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

এক কথায় বলিতে পারা যায়—প্রাণহীন, জড়ত্বমুগ্ধ, সংসারসন্তপ্ত মনুষ্যদিগকে আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠ করাই মায়ের শাকম্ভরীমূর্ত্তির কার্য্য। জড়পদার্থে চৈতন্য দর্শনই শাকের দ্বারা জীবন রক্ষার রহস্য। যাহা হউক, আমরা বুঝিলাম—মা শাকম্ভরীরূপে আমাদিগকে প্রাণপ্রতিষ্ঠ করাইয়া দেন। এই শাকম্ভরীই মধ্যম চরিত্রের শক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শাকের দ্বারা জীবগণকে ভরণ অর্থাৎ পোষণ করেন বলিয়াই মা এখানে ঐ নামে অভিহিতা। এই শাকম্ভরী শব্দের আর এক প্রকার অর্থ হইতে পারে—কঠোপনিষৎ "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবতি ওদনং" ইত্যাদি মন্ত্রে জীবগণকে অন্ন এবং মৃত্যুকে উপসেচন—ব্যঞ্জন অর্থাৎ শাকরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শাক-স্থানীয় মৃত্যুকে যিনি ভরণ করেন, অথবা আত্মদেহ সমুদ্ভূত শাকস্থানীয় মৃত্যু দ্বারাই যিনি জীবগণকে ভরণ করেন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুরূপ আহার্য্য দিয়াই যিনি জীবসন্তানগণকে পরিপুষ্ট করেন, তিনি শাকম্ভরী; অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ আত্মাই শাকম্ভরী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥৪৬॥

অনুবাদ। সেই সময় আমি দুর্গম নামক মহাসুরকে নিধন করিব। তখন হইতে আমার দুর্গাদেবী এই বিখ্যাত নাম প্রচলিত হইবে।

ব্যাখ্যা। মা বলিলেন, "সেই শাকম্ভরী মূর্ত্তিতেই আমি দুর্গম নামক অসুরকে নিধন করিয়া দুর্গাদেবী নামে বিখ্যাত হইব। যে আত্মতত্ত্ব বড়ই দুর্গম, যাহার উপলব্ধি নিতান্ত দুরূহ, শ্রুতি যাহাকে ক্ষুরধারার ন্যায় নিশিত দুর্গপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই দুর্বিজ্ঞেয় আত্মতত্ত্বকে সহজলভ্য করিয়া দিবার জন্যই আমি শাকম্ভরী শক্তিরূপে আবির্ভূ‌ত হইব। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাইয়া আত্মার সন্ধান দিব। তখন জীবের দুর্গ অর্থাৎ জীবত্বরূপ দুরবস্থা অনায়াসে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাই, সেই সময় হইতে সেই শাকম্ভরী আমিই দুর্গাদেবী নামে খ্যাত হইব।"

দুর্গ শব্দের উত্তর হননার্থক আ ধাতু হইতে দুর্গা শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। দুর্গাশব্দের অর্থ—দুর্গতিহারিণী জননী। এই দুর্গাই মধ্যম চরিতের বীজ। দুর্গতি-হরণই ইহার উদ্দেশ্য। তাই মধ্যম চরিতের উপোদ্‌ঘাতে শাকম্ভরী শক্তি ও দুর্গাবীজের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রন্থে "দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি" এই অংশটী নাই। প্রাচীন টীকাকারগণও উহার উল্লেখ করেন নাই। পুস্তকে উল্লেখ না থাকিলেও আমরা কিন্তু প্রতিজীবেই মায়ের দুর্গাদেবী-রূপে আবির্ভাব দেখিয়া থাকি—যখনই জীব দুর্গত হয়, দুর্গম অসুরের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া আত্মজ্ঞানাভিমুখে অগ্রসর হইতে অসমর্থ হয়, তখনই মা আমার দুর্গাদেবীরূপে আবিভূ‌র্ত হইয়া দুর্গম অসুরকে নিপাতিত করিয়া স্নেহের সন্তানের দুর্গতিহরণ করেন, এবং আত্মজ্ঞানের পথ সুগম করিয়া দেন। এই জন্যই বোধ হয় ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বহুপূর্ব্বকাল হইতেই দুর্গাপূজার প্রচলন হইয়াছে। এখন—এই অবিশ্বাসের যুগে—এই শ্রদ্ধাহীনতার যুগেও মানুষ দুর্গাপূজা করিয়া

"ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা, স্ত্রিয়োনরশ্চাপি পশুশ্চদুর্গা, যদ্ যদ্ হি দৃশ্যং খলুসৈব দুর্গা, দুর্গা স্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ" বলিতে বলিতে সর্ব্বত্র দুর্গাস্বরূপ দেখিয়া ধন্য হয়, কিন্তু সে অন্যকথা—

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥৪৭॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥৪৮॥

অনুবাদ। পুনরায় আমি যখন অতি ভয়ঙ্কররূপ ধারণপূর্ব্বক হিমাচলে অবতীর্ণ হইয়া মুনিগণের রক্ষার নিমিত্ত রাক্ষসগণকে ক্ষয় করিব, তখন মুনিগণ বিনম্রমূর্ত্তিতে আমার স্তব করিবে। তখন আমার ভীমাদেবী এই প্রসিদ্ধ নাম (প্রচলিত) হইবে।

ব্যাখ্যা। লক্ষ্মীতন্ত্রের প্রমাণ-অনুসারে এই ভীমা অবতারের কাল—বৈবস্বত মন্বন্তরীয় পঞ্চাশত্তম চতুর্যুগ। সে কাল আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব। এই সবে অষ্টাবিংশ মহাযুগ চলিতেছে, এখনও একুশটী মহাযুগ অতীত হইলে, তবে ভীমা-আবির্ভাবের কাল উপস্থিত হইবে। আমরা কিন্তু মায়ের এই ভীমামূর্ত্তিতে আবির্ভাব এ যুগেও মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিছুদিন অতীত হইল, পৃথিবীর পশ্চিম-ভাগে মা ভীমামূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বহুসংখ্যক রাক্ষসপ্রকৃতি জীবের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। জড়ত্বে মুগ্ধ জীবগণ যখন একে অন্যের মুখের গ্রাস অপহরণ করিতে উদ্যত হয়, তখনই বুঝিতে পারি—মা আমার রাক্ষসী প্রকৃতিতে তাহাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; এইরূপ জীবের বিনাশের জন্যই মাকে মধ্যে মধ্যে ভীমামূর্ত্তিতে—ভয়ঙ্করীরূপে আবির্ভূত হইতে হয়।

সে যাহা হউক, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাই—মুনিদিগের পরিত্রাণের জন্যই এই ভীমাশক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। মুনিগণ—

মননশীল সাধকগণ যখন রাক্ষসী প্রকৃতির দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া পড়েন, তখনই মা এইরূপ ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন। 'হিমাচলে' মায়ের আবির্ভাব হয়। জড়ত্ব বিমূঢ় জীবকেই হিমাচল বলা যায়। জীব যখন জড়ত্বে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ে, জড়ের উন্নতি সাধনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বুঝিয়া লয়, তখনই মা ভীমামূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া, দুর্ভিক্ষ মহামারী রাষ্ট্রবিপ্লব জল-প্লাবন প্রবল বাত্যা প্রবল ভূমিকম্প প্রভৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া, রাক্ষসপ্রকৃতি জীবগণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক, মননশীল সাধকগণকে রক্ষা করিয়া, জগতে আবার সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। এইরূপ ভীমামূর্ত্তিতে আবির্ভাবের সময় বিশ্বহিতের জন্য ধৃত-ব্রত-মুনিগণ নম্রমূর্ত্তিতে মায়ের স্তব করিয়া থাকেন। মা সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করেন। তখন আবার প্রশান্ত মূর্ত্তিতে—জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতের অশান্তি দূর করিয়া দেন।

যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্পদম্ ॥৪৯॥
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ ॥৫০॥

অনুবাদ। যখন অরুণাখ্য অসুর ত্রিলোককে অত্যন্ত উৎপীড়িত করিবে, তখন আমি ত্রিলোকের হিতের জন্য অসংখ্য ষট্পদপরিবৃত ভ্রামরী রূপ ধারণ করিয়া, সেই অরুণ নামক মহাসুরকে বধ করিব। সেই সময় লোকসমূহ আমাকে ভ্রামরী বলিয়া স্তব করিবে।

ব্যাখ্যা। লক্ষ্মীতন্ত্রের বাক্য অনুসারে বুঝিতে পারা যায়—এই ভ্রামরী অবতারের কাল—বর্ত্তমান মন্বন্তরীয় ষষ্টিতম যুগ। বর্ত্তমান যুগ হইতে একত্রিংশৎ মহাযুগ অতীত হইলে সেই কাল উপস্থিত হইবে।

সে সুদূর ভবিষ্যতের কথা ; বর্ত্তমানে সে কালের কল্পনাও করা যায় না। সে যাহা হউক এই মূর্ত্তির স্বরূপ বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে—"তেজোমণ্ডল দুর্দ্ধর্ষা ভ্রামরী চিত্রকান্তিভৃৎ। চিত্রভ্রমর-পাণিঃ সা মহামারীতি গীয়তে ॥" অসংখ্য ভ্রমর পরিবেষ্টিত অথবা বিচিত্র ভ্রমর-পাণি এই মূর্ত্তি অরুণ নামক অসুরকে হনন করিবেন।

এইবার আমরা ইহার আধ্যাত্মিক রহস্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিব। আত্মজ্ঞান উদয়ের পূর্ব্বাবস্থাকেই অরুণ নামক অসুর বলা যায়। যেরূপ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয় হয়, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানসূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই চিদাভাসরূপ অরুণের উদয় হয়। তাহা দেখিয়া যে সকল সাধক উহাকেই চরম জ্ঞান বলিয়া মনে করেন, বুঝিতে হইবে—তাঁহারা এই অরুণাসুর কর্ত্তৃক উৎপীড়িত। উত্তম চরিতে যাহা শুম্ভাসুর নামে আখ্যাত হইয়াছে, উহারই অপর নাম অরুণাখ্য অসুর। এই অরুণাসুর যথার্থই ত্রিলোকের উৎপীড়ক—ত্রিলোকের মহাবাধা—অতিশয় উৎপীড়ন সংঘটন করে। অহং আত্মা সাজিয়া অনেক কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ব্যাপার সমূহের আশ্রয় হইয়া থাকে। তাই মা আমার ভ্রামরীরূপে ভ্রমবিনাশিনীরূপে আবির্ভূত হইয়া, চিদাভাসের আত্মত্বভ্রম বিনষ্ট করিয়া দেন। অন্নময়াদি ষাট্‌কৌষিক দেহের নাম ষট্‌পদ। এখানে পদ শব্দের অর্থ স্থান। অনাত্মবস্তুতে আত্মত্বভ্রম এই ছয়টী স্থানেই প্রকাশ পায়। তাই চিন্ময়ী মা আমার ষটপদ পরিবৃতারূপে ভ্রামরী নামে অভিহিতা হন। যখন পরমাত্মা মা স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া এই দুরপনেয় ভ্রমের বিনাশ সাধন করেন, অর্থাৎ জ্ঞানাভাসরূপ ত্রিলোক উৎপীড়ক অরুণাসুরকে বিনাশ করেন তখন লোকসকল বিশুদ্ধ চৈতন্যের সন্ধান পাইয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভ্রম বিনাশিনী মাকে ভ্রামরী নামে নানাবিধ স্তব করিতে থাকে। তাই মন্ত্রে "ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ" এইরূপ দেবী বাক্যের উল্লেখ আছে। ঋষিচ্ছন্দে এই ভ্রামরীদেবীই উত্তম চরিত্রের বীজরূপে এবং ভীমাদেবী শক্তিরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।

যিনি ভীমাদেবীরূপে রাক্ষসী প্রকৃতিকে বিলয় করেন, তিনিই চিদাভাসরূপ অরুণাসুরকে বিনাশ করিয়া ভ্রামরী নামে অভিহিত হন আনন্দপ্রতিষ্ঠাই উত্তম চরিতের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এইবার আমরা সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র কয়েকটির সার মর্ম্ম বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিব। প্রথম—নন্দা শক্তি, রক্তদন্তিকা বীজ, ইহা মধুকৈটভ-বধ—সত্য প্রতিষ্ঠা বা ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদের সূত্র। দ্বিতীয়—শাকম্ভরী শক্তি, দুর্গা বীজ, ইহা মহিষাসুর-বধ—প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদের সূত্র। এবং তৃতীয়—ভীমা শক্তি, ভ্রামরী বীজ, ইহা শুম্ভনিশুম্ভ-বধ—আনন্দপ্রতিষ্ঠা বা রুদ্রগ্রন্থি ভেদের সূত্র। দেবীমাহাত্ম্যবর্ণিত তিনটী রহস্যের এই তিনটীই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কেবল অতীত যুগেই যে এইরূপ বিশিষ্ট আত্মপ্রকাশ হইয়াছিল, তাহা নহে; বর্ত্তমান কালেও প্রত্যেক সাধক-হৃদয়ে ঐরূপভাবে মায়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আবার ভবিষ্যতেও যে মা আমার ঠিক এইরূপেই আত্মপ্রকাশ করিবেন, এইখানেই তাহার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বর্ত্তমান সাধন-সমরে মা আমার যে সকল মূর্ত্তিতে যে সকল অসুর নিধন করিলেন, ভবিষ্যতেও এইরূপই করিবেন; সে সময়ে মূর্ত্তিসমূহের নাম ও রূপের বিভিন্নতা এবং অসুরগণেরও নাম ও কার্য্যপ্রণালীর বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী মন্ত্র হইতে এইরূপ তাৎপর্য্যই লক্ষিত হয়। ইহা একটু ভাবিবার বিষয়ও বটে। সুদূর ভবিষ্যৎকালে (১) সত্য সত্যই জীবসমূহ বর্ত্তমান কালীয় জীব অপেক্ষা অধিক বিমূঢ় এবং অনেক বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন হইবে। তখনকার আসুরিক বৃত্তিসকল যথার্থই বর্ত্তমান কালাপেক্ষা আরও ভীষণতর হইবে।

---

* (১) বর্ত্তমান কলিযুগের পর আবার সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ অতীত হইলে, দ্বিতীয় বার কলিযুগ আসিবে। এইরূপ একাদশটী কলিযুগ অতীত হইলে যে কলিযুগ আসিবে তাহাতে নন্দাশক্তি,—এইরূপ একবিংশতি কলিযুগ অতীত হইলে শাকম্ভরীশক্তি, এবং একত্রিংশ কলিযুগ অতীত হইলে ভীমাশক্তির আবির্ভাব হইবে। ইহা তন্ত্রের প্রমাণ হইতে জানিতে পারা যায়।

তখন অজ্ঞান এই জীবজগৎকে আরও আচ্ছন্ন করিবে। এইরূপ অজ্ঞান অন্ধকার যখন অত্যন্ত ঘন হইবে, জ্ঞানময়ী মাও তখন অধিক সুলভা হইবেন। তাই, মন্ত্রেও দেখিতে পাই, ভবিষ্যৎ যুগে সর্ব্বপ্রথমেই নন্দামূর্ত্তিতে শুম্ভনিশুম্ভবধ। তারপর শাকম্ভরী মূর্ত্তিতে অনাবৃষ্টি হইতে স্বদেহোৎপন্ন শাকের দ্বারা দেশরক্ষা, দুর্গারূপে দুর্গমাসুর বধ, ভীমামূর্ত্তিতে রাক্ষস-নিধন পূর্ব্বক মুনিদিগের রক্ষা এবং ভ্রামরীরূপে অরুণাসুর বধ। ইহাই মায়ের ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী।

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক-মন্বন্তরে দেবী মাহাত্ম্যে
দেব্যাঃ স্তুতিঃ।

অনুবাদ। এইরূপ যখন যখন দৈত্য কর্ত্তৃক উৎপীড়ন হইবে তখন তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া অরি-সংক্ষয় করিব।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয়
দেবীমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে দেবীর স্তুতি।

ব্যাখ্যা। ইহাই দেবীবাক্যের উপসংহার। দেবতাগণ ত্রৈলোক্যের সর্ব্ববাধা-প্রশমনরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, মা সেই বর প্রদানে উদ্যত হইয়া যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে সুদূর ভবিষ্যৎ কালেও যত প্রকার উৎপীড়ন হইবে, তাহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে বলিলেন—"যখন যখনই অসুর উৎপীড়ন উপস্থিত হইবে, তখন তখনই এইরূপ আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অরিকুল বিনষ্ট করিয়া দিব।" আত্মজ্ঞান লাভের পথে যত প্রকার বাধা—উৎপীড়ন আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, মাতৃচরণে একান্ত শরণাগত সন্তানগণের সে সকল বাধা বিঘ্ন মা স্বয়ং স্বহস্তে বিদূরিত করিয়া দেন। ইহাই আমাদের পক্ষে

একমাত্র আশার বাণী ও ভরসার স্থল। গীতায় শ্রীভগবানও কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। আত্ম সমর্পণ-যোগীর সকল ভার একমাত্র মাতৃ-অঙ্কে বিন্যস্ত; সুতরাং তাহারা সম্যক্ নিশ্চিন্ত, পূর্ণ আনন্দময়—মাতৃ-অঙ্কস্থ নগ্নশিশু। তাহাদের যত রকমের বাধাই উপস্থিত হউক না কেন, মা স্বয়ংই তাহা দূর করিয়া দেন, বর্ত্তমান কালে ভবিষ্যৎকালে এবং অতীত কালে ইহার অন্যথা কখন হয়না, হইতে পারে না। এস সাধক, আমরাও "শরণাগত-দীনার্ত্ত-পারত্রাণপরায়ণে। সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥" বলিয়া মাতৃচরণে শরণাগত হই। মা আমাদিগকে সর্ব্ববিধ অসুর-অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন।

মা এস্থলে "অবতীর্য্যাহং" বলিয়া যে অবতার-তত্ত্বের আভাস দিলেন, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে "শ্রূয়ু ভগবতী" ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তাহা সম্যক্ ব্যক্ত হইবে।

ইতি সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্য ব্যাখ্যায়
নারায়ণী স্তুতি সমাপ্ত।

সাধন-সমর

বা

দেবী-মাহাত্ম্য।

রুদ্রগ্রন্থি-ভেদ।

ফলশ্রুতি।

—•—

দেব্যুবাচ।

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥১॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই সকল স্তবের দ্বারা আমার স্তব করিবে, আমি নিঃসংশয়রূপে তাহার সকল বাধা প্রশমন করিব।

ব্যাখ্যা। দেবতাদিগের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া, মা সাধারণ ভাবে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই উপদেশ গুলিকে আমরা ফলশ্রুতি নামে অভিহিত করিলাম। মায়ের প্রথম কথা "এভিঃ স্তবৈঃ"। মধুকৈটভ বধে ব্রহ্মার স্তব (ত্বং স্বাহা ইত্যাদি), মহিষাসুর-বধে শক্রাদি স্তুতি, দেবীদূত-সংবাদে নমস্তস্যৈ স্তুতি এবং শুম্ভবধের অবসানে নারায়ণী-স্তুতি, এই সকল স্তবকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে "এভিঃস্তবৈঃ" বলা হইয়াছে।

মায়ের দ্বিতীয় কথা—সমাহিত। চিত্ত যদি সমাহিত অর্থাৎ আত্মস্থ হয়, তাহা হইলেই স্তবাদি পাঠের যথার্থ ফললাভ হইয়া থাকে। অবশ্য

সম্যক্‌ভাবে আত্মস্থ হইলে, তখন আর স্তব হইতে পারে না ; সে অবস্থায় জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি ত্রিপুটী জ্ঞানেরও বিলয় হইয়া যায় ; এস্থলে সেরূপ সমাহিত অবস্থার কথা বলা হয় নাই। এখানে সমাহিত শব্দে বুঝিতে হইবে—মায়ের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখা। মায়ের দিকে তাকাইয়া, চিত্তের বৃত্তি মাতৃমুখী করিয়া, স্তুতিবাক্য সমূহের যথাযথ অর্থ বোধ করিয়া, সেই অর্থানুযায়ী ভাবে ও রসে স্বয়ং ভাবুক ও রসিক হইয়া, যথাসাধ্য মাতৃ-মহত্ব কীর্ত্তন করিতে পারিলেই সমাহিত অবস্থায় স্তুতি পাঠ হইয়া থাকে। মহত্ব-কীর্ত্তন এবং নামকীর্ত্তন একই কথা। এমন কোন নাম নাই, যাহাতে মায়ের মহত্ব কীর্ত্তিত হয় না। হরি কৃষ্ণ রাম দুর্গা শ্যামা শিব শঙ্কর প্রভৃতি যে কোন নাম উচ্চারণ করা যাউক না কেন, সেই নামের যথার্থ অর্থের প্রতি অভিনিবেশ প্রয়োগ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় প্রত্যেক নামই মহত্ব জ্ঞাপক। যদি নামের সঙ্গে সঙ্গে সত্যার্থ-জ্ঞানরূপ সদ্‌গুরুর আবির্ভাব হয়, তবে নিশ্চয়ই ঐ সকল নাম প্রাণময় ও মহত্বময় হইয়া অভীষ্ট দেবতাকে সন্নিহিত করিয়া থাকে ; সুতরাং যাঁহারা সাধক, তাঁহারা নাম কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নামানুযায়ী ভাবে ও রসে ভাবময় ও রসময় হইয়া থাকেন। তাই, সর্ব্বাগ্রে মন্ত্রচৈতন্য-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা সাধকমাত্রেরই একান্ত আবশ্যক। মন্ত্রচৈতন্য না হওয়া পর্য্যন্ত স্তব স্তুতি পূজা জপ উপাসনা সকলই যেন প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। প্রথম খণ্ডে মন্ত্রচৈতন্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

যাঁহারা সমাহিত-চিত্তে স্তোত্রপাঠ করিতে পারেন, মা সত্য সত্যই তাঁহাদের সকল বাধা স্বয়ং প্রশমিত করিয়া থাকেন। কেন করিয়া থাকেন ? মনে কর, তুমি বলিতেছ—সমাহিত চিত্তে সত্যজ্ঞানে সরল প্রাণে বলিতেছ—"ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং", ঐরূপ বলিতে বলিতে অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ এবং পাপক্ষয়ের ভাব তোমার চিত্তে নিশ্চয়ই ফুটিয়া উঠিবে। কার্য্যতঃ তাহাই সংঘটিত হইবে ; কারণ, চিত্তে যে ভাবটী সম্যক্‌রূপে আহিত হয় কিছুদিন পরে ফলরূপেও তাহাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। চিত্তকে যেরূপ ভাবে গঠিত করা যায়, চিত্ত ঠিক সেইরূপ ফলই

আনয়ন করে। এ সকল বিষয় যুক্তির দ্বারা বুঝাইবারও কোন প্রয়োজন নাই; যেহেতু, ইহার ফল প্রত্যক্ষ। যখনই ঐরূপ অনুষ্ঠান করা যায় তখনই ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারা যায়। শুধু বাক্যে জানিয়া রাখিলে হয় না, কার্য্যে করিলে নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যায়।

মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুর-ঘাতনম্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥২॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥৩॥
ন তেষাং দুস্কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্ ॥৪॥

অনুবাদ। যাহারা একাগ্রচিত্তে অষ্টমী নবমী এবং চতুর্দ্দশীতে মধুকৈটভ-নাশ, মহিষাসুর-নিধন ও শুম্ভনিশুম্ভ-বধ-রূপ আমার উত্তম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, অথবা যাহারা ভক্তির সহিত শ্রবণ করে, তাহাদের কোনরূপ দুস্কৃত, অথবা দুস্কৃতজন্য কোন আপদ থাকে না; এবং দারিদ্র্য কিংবা ইষ্টবিয়োগ উপস্থিত হয় না।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে মন্ত্রে শুধু স্তব পাঠের ফল পরিব্যক্ত হইয়াছে, এই মন্ত্রগুলিতে সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য পাঠের ও শ্রবণের ফল কীর্ত্তিত হইল। অষ্টমী চতুর্দ্দশী প্রভৃতির আধ্যাত্মিক অর্থ কীলক স্তোত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এই সকল মন্ত্রে যে ফলশ্রুতির উল্লেখ আছে, উহা অর্থবাদমাত্র নহে। যথার্থই এই সকল মন্ত্রোক্ত ফল লাভ হয়—যদি সাধক দেবী যে দুইটী কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখে।

দেবী বলিলেন—'একচেতসঃ' এবং 'ভক্ত্যা'। প্রথমতঃ—এক যে বস্তু—যাঁহার কোনরূপ ভেদ নাই, চিত্তকে তাঁহার অভিমুখী করিয়া রাখিতে হইবে। আর দ্বিতীয়তঃ—ভক্তির সহিত স্তোত্রাদি পাঠ করিতে

হইবে। দেবীর বাক্যে অচল বিশ্বাস এবং দেবীর-অভিমুখে চিত্তবিন্যাস, এই দুইটী থাকিলেই দেবী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের বা শ্রবণের যাহা যথার্থ ফল, তাহা অবশ্যই লাভ হয়। দুষ্কৃতাদি যথার্থই দূরীভূত হইয়া যায়। বিশেষকথা—আমরা এযাবৎ দেবীর এই তিনটী চরিত্র যেরূপ ভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, সেই তত্ত্বটী স্থির রাখিয়া যদি কেহ চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণ করেন, তবে তাঁহার নিকট মায়ের যথার্থ স্বরূপটী নিশ্চয়ই উদ্ভাসিত হইবে। তাহার নিকট দুষ্কৃত বলিয়া কিছু থাকিবে না। সুতরাং দুষ্কৃত জন্য আপদেরও সম্ভাবনা থাকিবে না। তারপর দারিদ্র্যের কথা। অভাব বোধের নাম দারিদ্র্য। যিনি "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার অভাববোধ থাকিতেই পারে না। তাই মন্ত্রে "ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং" বলা হইয়াছে।

"ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্"—ইস্ট বস্তুর সহিত বিয়োগ হয় না। একমাত্র প্রিয়তম পরামাত্মাই ত যথার্থ ইষ্ট বস্তু। তাঁহার সহিত কখনও বিয়োগ সংঘটিত হয় না। আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরমাত্মার সহিত কাহারও ত বিয়োগ সম্ভাবনা নাই; তবে আবার দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণের ফলে ঐরূপ ইস্ট-বিয়োগের অভাব বলায় কি লাভ হইল? এ আপত্তি সত্য। উত্তর এই যে, পরমাত্মার সহিত যে কখনও কাহারও বিয়োগ সংঘটিত হইতে পারে না, ইহা কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, যাঁহারা সমাহিত চিত্তে ভক্তির সহিত দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করেন।

একমাত্র আত্মাই সকলের ইষ্ট! জ্ঞানী অজ্ঞান ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলেরই একমাত্র ইষ্ট বস্তু আত্মা। যাঁহারা মনে করেন, কামিনী কাঞ্চনই তাঁহাদের ইষ্ট, তাঁহারাও একটু ধীর চিত্তে বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন, একমাত্র আত্মার প্রীতি সাধনের জন্যই মানুষ কাম কাঞ্চনে আসক্ত হয়। এ জগতে কেহই পার্থিব বস্তুর জন্য আত্মাকে চাহে না, আত্মার জন্যই পার্থিব বিষয়ের অন্বেষণ করে। তাই, বলিতে ছিলাম—আত্মাই একমাত্র ইষ্টদেব। তাঁহার সহিত দেবীমাহাত্ম্য-তত্ত্বাধিগামী সাধকের কস্মিন্ কালেও বিয়োগ ঘটে না, ঘটিতে পারে না।

আর সাধারণ অর্থে ইষ্টবিয়োগ শব্দে, পার্থিব প্রিয়জন বা প্রিয় বস্তুর অভাব বুঝিয়া লইলেও কিছু ক্ষতি নাই। কারণ, দেবীমাহাত্ম্য-তত্ত্বাধিগামী সাধকগণ মৃত প্রিয়জন, অথবা বিনষ্ট প্রিয়বস্তুকে ইচ্ছা-মাত্রেই স্বকীয় হৃদয়-পুণ্ডরীক মধ্যে দেখিতে পান। ছান্দোগ্য উপনিষদেও একথা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং কার্য্যতঃ তত্ত্বদর্শী সাধকগণের কোন অবস্থায়ই ইষ্টবিয়োগ হয় না।

আর যদি "ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্" বাক্যটীর অর্থ করিতে গিয়া বল যে, ইষ্টবিয়োগ-জন্য দুঃখ হয় না, সে ত চমৎকার অর্থ। শ্রুতি বলেন "তরতি শোকমাত্মবিৎ" যাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারা শোক হইতে—ইষ্ট-বিয়োগজন্য দুঃখ হইতে চিরপরিত্রাণ লাভ করেন।

শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥৫॥

অনুবাদ। শত্রু দস্যু রাজা শস্ত্র অনল এবং জলপ্লাবন হইতে তাহার (দেবীমাহাত্ম্য-পাঠকের) কখনও কোন ভয় থাকে না।

ব্যাখ্যা। সাধারণ অর্থ ঐরূপই বটে। ভক্তির সহিত সমাহিত চিত্তে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে শত্রু-দমন হয়, দস্যু দলন হয়, শস্ত্র অগ্নি জলপ্লাবনাদি বিপদ্ বিদূরিত হইয়া যায়। আবার অন্যদিকে দেখ—দেবীমাহাত্ম্য ঐরূপ ভাবে পাঠ কিংবা শ্রবণ করিলে সাধকের আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তাহার ফলে কাম-ক্রোধাদি শত্রুগণ কোনরূপে অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না, বিবেক-ধনহরণকারী মোহরূপ দস্যুগণ বিপন্ন করিতে পারে না।

যতদিন আত্মসাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন প্রবল প্রারব্ধসংস্কারবশে সাধনা হইতে ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। অনেক সাধকই আশঙ্কা করেন—কবে কোন গুপ্ত সংস্কাররূপী দস্যু অতর্কিত আক্রমণে তাহার

অতি কঠোর সাধনা-লভ্য জ্ঞানটুকু ভক্তিটুকু কিংবা সিদ্ধিটুকু কাড়িয়া লইবে ; এই যে দস্যুভীতি, ইহা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারীর পক্ষে উপহাস-মাত্র। কারণ, তিনি দেখেন, আত্মা ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই। সত্যদর্শি-সাধকগণের আবার ভয়ই বা কি, আর পতনই বা কি ?

তারপর রাজভয়ের কথা। ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা মন, তাহা হইতেও কোন ভয় থাকে না। মনের চঞ্চলতা, বিষয়াভিমুখিতা আত্মবিদ্‌গণের নিকট অর্থহীন বাক্য-স্বরূপ। আরে, মন চঞ্চলই থাকুক বা স্থিরই থাকুক, আত্মাভিমুখীই থাকুক অথবা বিষয়াভিমুখীই থাকুক, তাহাতে আত্মার কি ? 'আমি' ত আত্মা মা। 'আমার' আবার রাজভয়—মনের চঞ্চলতার জন্য ভয় কি ? যাহারা 'আমাকে' চেনে নাই, ধরিতে পারে নাই, বুঝিতে পারে নাই, তাহারাই বলে—মনের চঞ্চলতার জন্যই সাধন ভজন হইল না। আরে চঞ্চলতার ভিতর দিয়াই একটু সময়ের জন্য মাকে—আত্মাকে দেখ না। সেই ক্ষণার্দ্ধকালেই যে জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

"ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ" এই বাক্যটী গীতার ঠিক সেই "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ" বাক্যের সহিত সমানার্থক। শস্ত্র অনল এবং জলৌঘ হইতে তাঁহার কোন ভয় নাই। গীতায় যাহা উপদেশ শিক্ষা ও শ্রবণ, দেবীমাহাত্ম্যে তাহারই প্রত্যক্ষতা উপলব্ধি এবং আনন্দ।

যস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ ॥৬॥

অনুবাদ। অতএব সমাহিত চিত্তে ভক্তির সহিত আমার এই মাহাত্ম্য সর্ব্বদা পাঠ ও শ্রবণ করিবে ; ইহাই পরম স্বস্ত্যয়ন—অতিশয় মঙ্গলজনক।

ব্যাখ্যা। অতএব কি ঐহিক সুখভোগার্থী, কি পারলৌকিক

স্বর্গ-ভোগার্থী, কি মুমুক্ষু, সকলেরই ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে এই দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ এবং শ্রবণ করা উচিত। একবার পড়িয়া "সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ" বলিয়া পুস্তক তুলিয়া রাখিলে চলিবে না। দেবী বলিলেন—"সদা পঠিতব্যং শ্রোতব্যঞ্চ" সর্ব্বদা পড়িবে এবং শ্রবণ করিবে। বারংবার পঠন এবং শ্রবণ করিতে করিতে এই চণ্ডীতত্ত্ব তোমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে সমন্বিত হইয়া যাইবে। তখন দেখিবে, তোমার জীবনের গতি আত্মাভিমুখী হইয়া, দেবীমাহাত্ম্য-প্রোক্ত সাধনাসকল তোমার জীবনেই অনুষ্ঠিত হইতেছে—দিনের পর দিন অসুরগণের সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। তখনই বুঝিবে—দেবী "সদা" শব্দের প্রয়োগ করিয়া সাধকদিগকে কোথায় যাইতে বলিয়াছেন। ইহাই পরম স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। জাগতিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ এই দেবীমাহাত্ম্যের পাঠ বা শ্রবণ হইতে লাভ করা যায়! তাই মা বলিতেছেন—ইহাই স্বস্তিলাভের একমাত্র উপায়। ইহাতে কোন পাঠক এমন বুঝিবেন না যে, বেদ বেদান্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেবী-মাহাত্ম্যেরই পাঠ ও শ্রবণ করিতে হইবে, নচেৎ কল্যাণ লাভ হইবে না; কথা কিন্তু তাহা নহে। যদি কেহ যথার্থ কল্যাণকামী হইয়া কোন শাস্ত্র গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সে শাস্ত্র বেদ বেদান্তই হউক, অথবা দর্শন পুরাণাদিই হউক, তাহাতে কিছু হানি নাই। সকল শাস্ত্রই যে এক কথা বলিয়াছেন, কোন শাস্ত্রের সঙ্গে কোন শাস্ত্রের যে কিছু মাত্র বিরোধ নাই, ইহা বুঝিতে পারিলেই শাস্ত্র পাঠের সার্থকতা হইয়া থাকে। বেদশাস্ত্র এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। তাই বেদেরও একটী নাম ব্রহ্ম। বেদাদি শাস্ত্রেরও ব্যক্তিত্ব আছে। উহা চৈতন্যময় একজন। শাস্ত্ররূপিণী মা কৃপা করিয়া যখন শ্রদ্ধাবান পাঠকের হৃদয়ে সত্যার্থের প্রকাশ করেন, তখনই পাঠক শাস্ত্ররহস্য অবধারণ করিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম যে, শাস্ত্রের সেই বিশিষ্ট কৃপালাভ করিতে হইলে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত পূজাদি করিয়া শাস্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র বলিতে প্রথমেই শ্রুতি উপনিষৎ এই সব বুঝিও। অন্যান্য

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যত বেশী শ্রুতির অনুগামী করিতে পারিবে, ততই সে সকল শাস্ত্রের গৌরব রক্ষিত হইবে। শ্রুতিবিরুদ্ধ বাক্য কখনও উপাদেয় নহে। যাহাতে আপাততঃ বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান শাস্ত্র-বাক্যগুলিকে শ্রুত্যনুযায়ী একার্থবাচী করিয়া লইতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টা সফল হওয়ার নামই পরম স্বস্ত্যয়ন—পরম কল্যাণ। শাস্ত্রবাক্য সমূহের একার্থ-বাচকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সংশয়চ্ছেদরূপ পরমকল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। এই দেবীমাহাত্ম্যে ঐরূপ সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয় বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। তাই, ইহার পাঠ ও শ্রবণ যথার্থই পরম স্বস্ত্যয়ন।

ব্যবহারিক জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়—গুরু পুরোহিতগণ শিষ্য যজমানের শান্তি ও পুষ্টি কার্য্যের জন্য দেবীমাহাত্ম্য-পাঠ-রূপ স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ॥৭॥
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্ নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্ ॥৮॥

অনুবাদ। আমার এই মহাত্ম্য মহামারীজনিত অশেষ উপসর্গ এবং ত্রিবিধ উৎপাতকে প্রশমিত করে। যে আয়তনে আমার এই মাহাত্ম্য নিত্য সম্যক্ পঠিত হয়, সে আয়তন আমি কদাচ পরিত্যাগ করি না। আমার সান্নিধ্য সেখানে সর্ব্বদাই থাকে।

ব্যাখ্যা। দেবীমাহাত্ম্য-পাঠে মহামারী এবং তজ্জন্য-উপসর্গসমূহ প্রশমিত হয়। মহামারী শব্দের সাধারণ অর্থ—জনপদ-উৎসাদক ব্যাধি। উৎপাত এবং উপসর্গের বিষয় নারায়ণী-স্তুতিতে বলা হইয়াছে। স্থূল কথা এই যে, সমাহিত চিত্তে ভক্তির সহিত দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে, ত্রিবিধ উৎপাত, ত্রিবিধ উপসর্গ এবং মহামারী প্রশমিত হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক অর্থে মহামারী শব্দে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু বুঝা যায়।

মৃত্যু-জন্য ভয় হইতেই নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়, এবং মৃত্যু হইলেই পুনরায় জন্মগ্রহণরূপ ভৌম-নরকভোগ—আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপ অবশ্যম্ভাবী ; দেবীমাহাত্ম্য-পাঠ এবং শ্রবণ (আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা) এই সকল উৎপাত-প্রশমের হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে।

যে আয়তনে অর্থাৎ গৃহে নিত্য এই চণ্ডীপাঠ হয়, সে গৃহে মা আমার নিত্যই সন্নিহিতা থাকেন। ইহা সাধারণ অর্থ। আধ্যাত্মিক ভাবে আয়তন শব্দের অর্থ ভোগায়তন ক্ষেত্র—দেহ। মা বলিলেন যে ভোগায়তন ক্ষেত্রে আমার মাহাত্ম্য সম্যক্ পঠিত হয় অর্থাৎ যে মানুষ সমাহিত চিত্তে ভক্তির সহিত দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করে আমি সে স্থান কখনও পরিত্যাগ করি না, আমার সান্নিধ্য সেখানে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ দেবী মাহাত্ম্য-পাঠকের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদাই মা বিরাজিত থাকেন। গীতার রাজগুহ্যযোগেও ঠিক এইরূপ কথাই আছে—"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপাহম্"।

আচ্ছা মা, তুমি বলিলে—যেখানে চণ্ডীপাঠ হয়, সেখানে তুমি নিত্য সন্নিহিতা ; আর যেখানে হয় না, তুমি কি সেখানে সন্নিহিতা নও ? শুন, আমি ছাড়া বাস্তবিক কোন আয়তনই নাই। সুতরাং কোন আয়তনই আমার অসন্নিহিত হইতে পারে না। তবে কথা এই যে, আমি যে সদা সন্নিহিত থাকি, ইহা তাহারাই বুঝিতে পারে, যাহারা ভক্তির সহিত আমার ভজনা করে, অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে। বুঝিতে পারিলে সাধক। এই মন্ত্রের রহস্য।

বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে।
সর্ব্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেব চ ॥৯॥
জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্।
প্রতিচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্ ॥১০॥

অনুবাদ। বলিদান পূজা যাগযজ্ঞাদি অগ্নিকার্য্য এবং মহোৎসব

প্রভৃতিতেও আমার এই সমস্ত চরিত-কথা পাঠ ও শ্রবণ করিবে। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বলি পূজা হোমাদি যদি পূর্ব্ববৎ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ আমার চরিতকথা পাঠ বা শ্রবণপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই আমি সেই সকল কার্য্য অতিশয় প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা। পূজা হোমাদি বৈধকার্য্যে এবং মহোৎসবাদি লৌকিক কার্য্যে এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ এবং শ্রবণ করা একান্ত কর্ত্তব্য! ঐরূপ করিলে বৈধ এবং লৌকিক কার্য্যসমূহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। ইহা এই মন্ত্রের সাধারণ অর্থ। অদ্যাপি ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে।

আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়—বলিপ্রদান পূজা হোম প্রভৃতি বৈধকার্য্য এবং মহোৎসবাদি লৌকিক কার্য্যগুলি যদি আমার দিকে—মায়ের দিকে—আত্মার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবেই উহা সুসম্পন্ন এবং শুভ ফলদায়ক হইয়া থাকে। কারণ, "অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ," আমিই সকল কর্ম্মযজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ও প্রভু। আমার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে, উহা শিবহীন যজ্ঞে পরিণত হয়। আমিই যে শিব। কর্ম্মরূপে অনুষ্ঠানরূপে কর্ম্মফলরূপে এবং কর্ত্তারূপে আমিই যে নিত্য প্রকাশিত, ইহা স্থির রাখিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সকল কার্য্যের মধ্য দিয়াই আমার চরিতকথার অনুশীলন হইয়া থাকে; এবং তাহারই ফলে কর্ম্মসকল সুসম্পন্ন হয়।

যাঁহারা জানেন যে, যাবতীয় কর্ম্মদ্বারা একমাত্র আমারই পূজা হইয়া থাকে, তাঁহারাই জ্ঞানী বা বিধিজ্ঞ। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে 'জানতা' পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে একটী আত্মসম্বেদনও আছে—"যোগধ্যানজপার্চ্চাদিনামসংকীর্ত্তনানি চ। অহংদেব-বিযুক্তাণি বিকলান্যাহ ব্রহ্মাবৎ॥" যোগ ধ্যান জপ পূজা নাম-সংকীর্ত্তন, এ সকলের সহিত যতক্ষণ অহংদেব যুক্ত না হন, ততক্ষণ উহা বিকল, অর্থাৎ

অতি সামান্য ফলদায়ক। আর বৈধ-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান-সময়ে যাঁহারা ঐরূপ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত থাকেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে "অজানতা" পদটীর প্রয়োগ হইয়াছে। দেবী বলিলেন—জানতা কিংবা অজানতা, এই উভয় অধিকারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ আমি প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। কারণ, আমি ব্যতীত আর কাহারও যজ্ঞভাগ গ্রহণের অধিকার নাই। আমিই সকলের সকল কর্ম্ম প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে। যাহারা জ্ঞানী, অর্থাৎ আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, মাত্র তাহারাই আমার এই প্রীতির সহিত যজ্ঞভাগ-গ্রহণ বুঝিতে পারেন। আর যাহারা অজ্ঞান, অর্থাৎ যাহারা আমার দিকে লক্ষ্যহীন হইয়া, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা আমার প্রীতিপূর্ব্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ দেখিতে পায় না। জ্ঞানিগণ যখন পত্র পুষ্প ফল জল হবিঃ প্রভৃতি আমার উদ্দেশ্যে অর্পণ করেন তখন—সেই অর্পণ-কালেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন যে, সত্য সত্যই আমি ঐ সকল প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতেছি। সুতরাং কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালেই তাঁহাদেরও তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। আর অজ্ঞানগণ সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হয়। সে যাহা হউক, উভয়ত্রই—আমার প্রীতির সহিত পরিগ্রহণ বিষয়ে কোন সংশয় নাই— "প্রতীচ্ছিষ্যামহং প্রীত্যা।

বলি-সম্বন্ধেও দুই একটী কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যাহারা মাংসপ্রিয়, তাহারা ছাগাদি বলি দিবে। তাহাদের পক্ষে উহাই বিহিত। উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বৃথা-মাংস-ভোজন হইতে সংযত করিবার জন্যই শাস্ত্র ঐরূপ বলিদানের বিধান করিয়াছেন। রাজসিক পূজায় বলিদান নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যাহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক, যাহারা মৎস্য-মাংস-পরিত্যাগী, যাহারা সর্ব্বজীবে একই প্রাণের বিদ্যমানতা দেখিতে পায়, তাহাদের পক্ষে ছাগাদি-পশু-বলিদান একান্ত অসম্ভব। পূজাতত্ত্ব নামক গ্রন্থে বলিদান রহস্য সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। আর এক শ্রেণীর সাধক নির্ব্বিচারে পশু বলিদান করিতে পারেন,

যাহারা নিজের পুত্রটীকেও নিষ্কম্প হৃদয়ে দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদানের সামর্থ্য রাখেন। সে যাহা হউক, এখানে মন্ত্রস্থ বলি শব্দের পূজোপহাররূপ অর্থ বুঝিয়া লইলেই সর্ব্ব সামঞ্জস্য হয়।

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ ॥১১॥
সর্ব্বাবাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্য-সুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১২॥

অনুবাদ। শরৎকালে আমার যে বার্ষিকী মহাপূজার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাতে ভক্তির সহিত আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ ও পাঠ করিয়া মনুষ্য আমার প্রসাদে সকল বাধা হইতে মুক্ত এবং ধনধান্য-সুতান্বিত হয়; ইহাতে কোন সংশয় নাই।

ব্যাখ্যা। এখনও ভারতের অধিকাংশ স্থানে শরৎকালে মহাপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্রকথিত ফললাভ খুব কম লোকেরই হয়। তাহার একমাত্র কারণ—ঐ সমাহিত ভাবে এবং ভক্তির সহিত যথাযথভাবে মহাপূজার অনুষ্ঠান হয় না। প্রধান কথা দেবীবাক্যেই সংশয় থাকে—সত্যই যে মহাপূজায় চণ্ডীপাঠের ফলে সকল বাধা বিপত্তি দূর হয়, সত্যই যে মানুষ ধনধান্যসুতান্বিত হয়, ইহা অনেকে বিশ্বাস করিতে পারে না। এইরূপ সংশয় এবং অবিশ্বাস থাকে বলিয়াই, এ যুগের বৈধ কর্ম্ম আশানুরূপ ফলদায়ক হয় না।

শরৎকাল—ক্ষিতিতত্ত্বের বিশেষ প্রকট-কাল। এ দেশের ঋতুগুলিও বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের প্রকটভাব সূচনা করে। প্রসঙ্গক্রমে তাহা এই স্থলে বলা হইতেছে। শরৎকাল—ক্ষিতিতত্ত্ব, বর্ষাকাল—অপ্‌তত্ত্ব, গ্রীষ্মকাল—তেজস্তত্ত্ব, বসন্তকাল—মরুৎতত্ত্ব এবং শীতকাল—ব্যোমতত্ত্ব। হেমন্ত ঋতুর কার্ত্তিক মাসটী শরৎ ঋতুর এবং অগ্রহায়ণ মাসটী শীতঋতুর অন্তর্গত। যখন যে তত্ত্বের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, বিশ্বপ্রকৃতিতে তখন

সেই তত্ত্বের ক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। সে যাহা হউক, আমরা এস্থলে শরৎকালের কথাই বলিতেছিলাম। এই সময়ে ক্ষিতিতত্ত্বের অর্থাৎ ঘনীভূত জড়ত্বের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়। যাঁহারা এই শরৎ-কালীয় মহাপূজার অনুষ্ঠান করেন অর্থাৎ জড়ত্বের আধিপত্যকালে চৈতন্যময়ী মায়ের বিশেষ প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান্ হন—(যে পূজায় স্নপন পূজন বলিদান এবং হোমরূপ চারিটি অঙ্গের অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে মহাপূজা কহে) মহাপূজার অঙ্গরূপে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা সর্ব্ববাধা হইতে অর্থাৎ আসুরিক বৃত্তির উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন ও ধনধান্য-সুতান্বিত হন। প্রেমরূপ ধন, বিশ্বাসরূপ ধান্য অর্থাৎ খাদ্যসম্ভার এবং নির্ম্মল বোধস্বরূপ পুত্র লাভ করেন। যাঁহারা মায়ের পূজা করিয়া সমাহিতচিত্তে চণ্ডী পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাঁহাদের প্রেমধনের অভাব হয় না। বিশ্বাসরূপ শস্যে বা খাদ্যসম্ভারে তাঁহাদের হৃদয়প্রাঙ্গন নিয়ত পরিপূর্ণ থাকে, এবং জ্ঞানময় পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ সংসার নরক হইতে তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করে।

শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্ ॥১৩॥
রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্ ॥১৪॥

অনুবাদ। আমার এই মাহাত্ম্য এবং শুভ আবির্ভাব-বিবরণ শ্রবণ করিয়া, মনুষ্য যুদ্ধে পরাক্রম লাভ করে ও নির্ভীক হয়। আমার এই মাহাত্ম্য-শ্রবণকারী জনগণের রিপুক্ষয় হয়, কল্যাণলাভ হয় এবং কুল আনন্দিত হয়।

ব্যাখ্যা। দেবীমাহাত্ম্যে দেবীর বিভিন্ন প্রকারের শুভ উৎপত্তি অর্থাৎ মঙ্গলজনক আবির্ভাব-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ সুরথ

"কথমুৎপন্না" বলিয়া প্রথমে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর দিতে গিয়া মহর্ষি মেধস্ নানারূপে দেবীর আবির্ভাব-বিবরণ বর্ণনা করিলেন। এই দেবীর উৎপত্তি-বিবরণ সমাহিত চিত্তে পাঠ অথবা শ্রবণ করিলে, যুদ্ধে পরাক্রম লাভ হয়, অর্থাৎ আসুরিক বৃত্তিদমনের উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ হয়। আর লাভ হয় নির্ভীকতা। আত্মাই একমাত্র অভয়। শ্রুতি পুনঃ পুনঃ এই অভয়-স্বরূপ আত্মাকে লাভ করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। "অভয়ং বৈ প্রতিপদ্যস্ব" "হে বৎস! তুমি অভয় অমৃতস্বরূপ আত্মাকে লাভ কর।" উপনিষৎকথিত এই অভয় বাণী দেবী-মাহাত্ম্যেও যে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে—এইটী দেখাইবার জন্যই লেখকের এত অধ্যবসায়।

সে যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—দেবী-মাহাত্ম্য-শ্রবণকারী জনগণের রিপুক্ষয় হয়। রিপুক্ষয় শব্দে কামক্রোধাদি রিপুগণের দমন বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে, ঐ সকল রিপুর প্রতি সাধকের যে স্বাভাবিক একটা বিদ্বেষভাব থাকে, তাহা দূরীভূত হয়। সর্ব্বত্র আত্ম-দর্শনের ফলে, রাগদ্বেষবিমুক্ত হইয়া বিষয়সমূহ নির্ব্বিচারে ভোগ করিবার সামর্থ্য জন্মে। "কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে"—কল্যাণ লাভ হয়। আত্মজ্ঞানই যথার্থ কল্যাণ। আত্মজ্ঞান-লাভ হইলে, জন্মমৃত্যুরূপ অকল্যাণ চিরতরে দূরীভূত হইয়া যায়।

"নন্দতে চ কুলং" কুল নন্দিত হয়। যে কুলে আত্মজ্ঞপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুলের ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। কারণ, তাঁহাদের মুক্তিমার্গ সুগম হয়। আর অধস্তন পুরুষগণ আত্মজ্ঞ পুরুষের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে পরমকল্যাণ লাভ করে। সাধারণের পক্ষে যাহা একান্ত দুর্ল্লভ, সে কুলের পক্ষে তাহা অযত্নলভ্য; তাই, আত্মজ্ঞ ব্যক্তির ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন কুলের পুরুষগণ সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকেন।

শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ॥১৫॥
উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দ্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥১৬॥

অনুবাদ। সর্ব্বপ্রকার শান্তি কার্য্যে দুঃস্বপ্নদর্শনে এবং উগ্র-পীড়া উপস্থিত হইলে, আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। তাহাতে উপসর্গ সকল উপশান্ত হয়, দারুণ গ্রহপীড়া বিদূরিত হয়, এবং মনুষ্যগণ দুঃস্বপ্ন দেখিলেও তাহা সুস্বপ্নরূপে পর্য্যবসিত হয়।

ব্যাখ্যা। দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণের ইহাই ফল। ইতিপূর্ব্বে দুইটী মন্ত্রেও 'শ্রুত্বা' ও 'শৃন্বতাং' শব্দে কেবল শ্রবণের কথাই বলা হইয়াছে। সাধক! শ্রবণই ত প্রথম এবং প্রধান সাধনা। যাহার শ্রবণ যত বিশুদ্ধ এবং সত্যাবগাহী, তাহার ফললাভও তত শীঘ্র এবং সুনিশ্চিত। শ্রুতিও শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়াছেন। শ্রবণ বিশুদ্ধ না হইলে, মনন বিশুদ্ধ হয় না, মনন ঠিক না হইলে, নিদিধ্যাসনের ফল ব্যর্থ হয়। সুতরাং শ্রবণ যাঁহার যত বিশুদ্ধ, ফলও তাঁহার তত সুনিশ্চিত। এই শ্রবণ ভাল হইবার উপায় কি? সর্ব্বপ্রথমেই শ্রোতার বিনীত ও শ্রদ্ধাবান্ হওয়া আবশ্যক, তারপর যিনি বক্তা অর্থাৎ যিনি আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা, তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য হওয়া আবশ্যক। যদি সৌভাগ্যবশে, বহু পুণ্যফলে এইরূপ যোগ্য বক্তা ও শ্রোতার মিলন সংঘটিত হয়, তবে সে স্থানে ফললাভ-বিষয়ে কোন সংশয়ই থাকে না। এই উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ যোগ্যতা না থাকিলে শ্রবণ বা সাধনা বিফল হইয়া থাকে। যেখানে বক্তা মূক এবং শ্রোতা বধির, সেখানে উভয়ই বিড়ম্বিত হয়।

সে যাহা হউক, মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, শান্তিকর্ম্মে দুঃস্বপ্ন-দর্শনে উগ্র গ্রহপীড়ায় এই দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে হয়। দেখ জীব, তোমার নিয়তই শান্তির অভাব রহিয়াছে, প্রতিনিয়ত বিষয়চিন্তারূপ

দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতেছ, এবং ইন্দ্রিয়রূপী বিষয়লোলুপ গ্রহগণ (১) তোমাকে অহর্নিশ উৎপীড়িত করিতেছে। যদি তুমি যথার্থ শান্তিলাভ করিতে চাও, যদি দুঃস্বপ্ন হইতে বিমুক্ত হইতে চাও, যদি দারুণ গ্রহপীড়া হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাও, তবে "মাহাত্ম্যং শৃণুয়াম্মম" আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। শ্রবণ করিলেই মনন ও নিদিধ্যাসন হইবে। তখন তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইবে, তোমার নিরবচ্ছিন্ন শান্তিলাভ হইবে, ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন এবং সংসারদুঃস্বপ্ন বিদূরিত হইবে। আমার মাহাত্ম্য শ্রবণের ইহাই ফল।

বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
সঙ্ঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্ ॥১৭॥
দুর্ব্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্।
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্ ॥১৮॥
সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্ ॥১৯॥

অনুবাদ। যেহেতু আমার এই সমস্ত মাহাত্ম্যপাঠ আমার সান্নিধ্য-সম্পাদক, সেই হেতুই ইহা বালগ্রহ কর্ত্তৃক অভিভূত বালকগণের শান্তি প্রদান করে, মনুষ্যগণের পরস্পর বিবাদ বিদূরিত করিয়া মিত্রতা সম্পাদন করে, দুর্ব্বৃত্তগণের বলহানি এবং রাক্ষস ভূত ও পিশাচগণের বিনাশ সাধন করে।

ব্যাখ্যা। এই তিনটী মন্ত্রের মধ্যে তৃতীয় মন্ত্রটী হেতুরূপে উক্ত হইয়াছে। সেই জন্য প্রথমেই উহার উল্লেখ আবশ্যক। মা বলিলেন

(১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে গ্রহশব্দে ইন্দ্রিয়গণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। রবি চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত গ্রহের সহিত ইহাদের বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। কারণ রবি চন্দ্রাদি গ্রহগণের অধিষ্ঠাতৃচৈতন্য এবং জীবদেহস্থ ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃচৈতন্য অভিন্ন।

আমার মাহাত্ম্য আমার সন্নিধিকারক। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—যেখানে দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ হয়, সেই খানেই মা সন্নিহিত হইয়া থাকেন। মায়ের সান্নিধ্য হইলেই অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রকাশ হইলেই যাবতীয় বিঘ্ন ও বিপদ বিদূরিত হয়। বাল শব্দের অর্থ শিশু অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহার প্রতি গ্রহগণের যে অভিভব বা আক্রমণ, তাহা প্রশমিত হইয়া যায়। বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকাশে অজ্ঞানজন্য যাবতীয় দুঃখ দূর হইয়া যায়।

"সঙ্ঘাতভেদে চ নৃণাং" জীবের যে পরস্পর ভেদজ্ঞান, তাহা দূর হয় এবং মৈত্রীভাব উৎপন্ন হয়। কারণ, মানুষ তখন দেখিতে পায়—এক আমিই ত সকলের মধ্যে সমভাবে বিরাজিত; আত্মা মানুষমাত্রেরই প্রিয়তম। তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত; সুতরাং ভেদজ্ঞান থাকিতে পারে না। পরস্পর মৈত্রীভাব স্বতঃই উৎপন্ন হয়।

তারপর দুর্ব্বৃত্তগণের—অসচ্চরিত্রদিগের বলহানি হয়, অর্থাৎ অসদ্-ভাবাপন্ন যে জীবপ্রকৃতি, তাহা একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যতদিন দেহ থাকে, ততদিন জীবপ্রকৃতি থাকিবেই; তবে বলহীন হইয়া যায়। আর রাক্ষসী বৃত্তি ও পৈশাচিক বৃত্তিসমূহ দূরীভূত হয়। ভূত-প্রকৃতি, অর্থাৎ ভূতের প্রতি যে আসক্তি—ভূত ও ভৌতিক পদার্থে যে নিত্যত্ব বোধ, তাহাও বিলয় প্রাপ্ত হয়। "রক্ষোভূত পিশাচানাং নাশনং" কথাটীর ইহাই তাৎপর্য্য।

পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ।
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্ ॥২০॥
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্ব্বৎসরেণ যা।
প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে ॥২১॥

অনুবাদ। উত্তম উত্তম পশু পুষ্প ধূপ গন্ধদ্রব্য এবং দীপাদি

দ্বারা পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন হোম অভিষেক এবং নানাবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান. এই সকল কার্য্য সংবৎসরকাল প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হইলে আমার যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, আমার এই সুচরিত একবারমাত্র শ্রবণ করিলে সেইরূপ প্রীতি হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। মা বলিতেছেন বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা শ্রবণের ফল বেশী। নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপচারের দ্বারা পূজা, ব্রাহ্মণভোজন, অভিষেক এবং ভূরিদান প্রভৃতি বৈধ কার্য্য নিয়মিতরূপে দীর্ঘকালব্যাপী অনুষ্ঠানের ফলে মানুষ যতটা শুদ্ধচিত্ত হয়—যতটা আমার স্বরূপ জানিতে পারে, যতটা আমার সমীপস্থ হইতে পারে, সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত আমার এই সুচরিত এই মাহাত্ম্য একবারমাত্র শ্রবণ করিলে মানুষ ততটা চিত্তশুদ্ধি, ততটা জ্ঞান ও ততটা সামীপ্য লাভ করিতে পারে। সদ্‌গুরুর মুখ হইতে অদ্বৈত জ্ঞানের রহস্য শ্রবণ করিলে অজ্ঞানান্ধ জীবের ক্ষণ-কালের জন্যও একটা প্রবুদ্ধ ভাব আসে। আমি কে, জগৎ কি, ঈশ্বর কাহাকে বলে, তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি, তাঁহাকে পাইলে আমার কি লাভ হইবে, ইত্যাদি তত্ত্ববিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান কেবল শ্রবণের ফলেই লাভ হয়। ঐ পরোক্ষ জ্ঞানই ত মাতৃপ্রীতির পরিচায়ক! মা যেখানে আত্মপ্রকাশ করেন, সেখানে এইরূপ ভাবেই তাঁহার প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পূজা হোমাদি কিংবা ভূরি দানাদি কার্য্য দীর্ঘকাল অনুষ্ঠানের ফলে যে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা শ্রদ্ধার সহিত একবারমাত্র সদ্‌গুরুবাক্য শ্রবণে সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে; ইহা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয়, আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান অপেক্ষা, শ্রবণ মননাদির উপর বেশী জোর দিয়াছেন। এখানে দেবী-বাক্য হইতেও সেই ভাবটীই প্রকাশ পাইতেছে। হ্যাঁ, তত্ত্বজ্ঞানশূন্য প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ডের দীর্ঘকাল অনুষ্ঠান অপেক্ষা, একবারমাত্র তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ শ্রবণের ফল যে অনেক বেশী, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তবে ইহাও খুবই সত্য যে, এই কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই শ্রদ্ধা ভক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান ধারণের

উপযোগিনী ধী'র বিকাশ হয়। জিজ্ঞাসা হইতে পারে—কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুধু শ্রবণ মনন করিলে হয় না কি? না, কর্ম্মকাণ্ডই ত শ্রবণ মননাদির সামর্থ্য জন্মায়। যখন কাহারও কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগের যথার্থ যোগ্যতা আসে, তখনও লোক-শিক্ষার জন্য তাঁহার যথাবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করা নিন্দনীয় ত নহেই, বরং একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, কর্ম্মকাণ্ডই এই হিন্দুজাতির একমাত্র বিশিষ্টতা। উহা বিলুপ্ত হইলে, অথবা উহার নিষ্প্রয়োজনীয়তা জনসমাজে পরিখ্যাপিত হইলে, অদূর ভবিষ্যতে এইদেশ যে ম্লেচ্ছদেশে পরিণত হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা করাও অন্যায় নহে। সাধক! যদিও তুমি যথার্থই কর্ম্মকাণ্ডের উপরে উঠিয়া থাক, তথাপি ঐ তত্ত্বজ্ঞানরূপ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই প্রাণময় কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। গীতায়ও ভগবান্ স্বয়ং ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। কর্ত্তব্যরূপে কিছু না থাকিলেও শুধু লোকস্থিতি রক্ষার জন্যও শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। দেশের পক্ষে উহাই যথার্থ মঙ্গলজনক। যাহা আছে, তাহাকে নষ্ট করিও না, রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। মৃতকর্ম্মগুলিকে প্রাণময় কর, সত্য সত্যই কল্যাণ লাভ হইবে। কিন্তু এ অন্য কথা ঃ—

এই মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—মা বলিলেন, "প্রীতির্ম্মেক্রিয়তে" আমার প্রীতি করা হয়। মায়ের ত অপ্রীতি কিছু নাই, তিনি নিত্য প্রীতা তাঁর আবার প্রীতি কি? বাস্তবিক তাঁহাতে অপ্রীতি কিছুই নাই ইহা সত্য হইলেও, তিনি যে নিত্য প্রীতা এই তত্ত্বটী মাত্র তাহারাই বুঝিতে পারে, যাহারা শ্রদ্ধার সহিত দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করে।

শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি।
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম ॥২২॥
যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্য-নিবর্হণম।
তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥২৩॥

যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।
ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্ ॥২৪॥

অনুবাদ। আমার জন্ম সমূহের অর্থাৎ আবির্ভাব-বিবরণ সমূহের শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করিলে (মনুষ্যের) পাপ দূর হয়, আরোগ্য লাভ হয়, এবং (মনুষ্যগণ) ভূতসমূহ হইতে রক্ষা পায়। যুদ্ধে দুষ্ট দৈত্যকুলের বিনাশবিষয়ক আমার চরিত-মহত্ত্ব শ্রবণ করিলে, মানুষের বৈরিকৃত ভয় থাকে না। (হে দেবতাগণ!) তোমরা আমার যে স্তব করিলে, ব্রহ্মর্ষিগণ এবং স্বয়ং ব্রহ্মা যে স্তব করিয়াছিল, সেই সকল স্তোত্রপাঠ মানুষকে শুভা মতি প্রদান করে।

ব্যাখ্যা। ফলশ্রুতি বাক্যে এক প্রকারের কথাই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি এবং সংশয়াপন্ন লোকের পক্ষে এইরূপ পুনরুক্তির বিশেষ প্রয়োজন। আমরা এস্থলে মন্ত্রের কয়েকটীমাত্র কথার অর্থ করিব। "পাপানি হরতি"—পাপ হরণ করে। অনাত্মবোধের নাম পাপ। যতক্ষণ আত্মাতিরিক্ত কোন কিছুর প্রতীতি থাকে, বুঝিতে হয়—ততক্ষণই পাপ আছে। এই মাতৃমহত্ত্ব এবং মাতৃ-স্বরূপ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও মনন করিলে সাধক "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" এই জ্ঞানে উপনীত হয়, সুতরাং তাহার সর্ব্ব পাপ দূর হয়।

"আরোগ্যং যচ্ছতি" পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপ এই ভবব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ হয়। "ভয়ং ন জায়তে," অভয় অমৃতস্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে মৃত্যুভয় চিরতরে বিদূরিত হয়। "রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যঃ" এই অংশের তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মা আরও বলিলেন—যদি কেহ সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিতে অসমর্থ হইয়া, মাত্র স্তোত্রগুলি পাঠ ও শ্রবণ করে, তবে তাহারও শুভা মতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-ধারণোপযোগিনী বুদ্ধি লাভ হয়।

অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নি-পরিবারিতঃ ।
দস্যুভির্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতোবাপি শত্রুভিঃ ॥২৫॥
সিংহ-ব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা ॥২৬॥
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে ।
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে ॥২৭॥
সর্ব্ববাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দ্দিতোঽপি বা ।
স্মরন্মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥২৮॥
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা ।
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥২৯॥

অনুবাদ। অরণ্যে কিংবা প্রান্তরে পতিত, দাবাগ্নি কর্ত্তৃক পরিবৃত, অসহায় অবস্থায় দস্যু অথবা শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত, বনমধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র বা বন্যহস্তী কর্ত্তৃক অনুধাবিত, ক্রুদ্ধ রাজার আদেশে বধ্য অথবা বন্ধনদশা প্রাপ্ত, মহাসমুদ্রমধ্যে পোতস্থ হইয়া ঝটিকা দ্বারা বিঘূর্ণিত, অত্যন্ত দারুণ সংগ্রামে শস্ত্রপাত মধ্যে নিপতিত, সর্ব্ববিধ ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত, এবং রোগযাতনায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মানুষ যদি আমার চরিত স্মরণ করে, তবে (পূর্ব্বোক্ত) সর্ব্ববিধ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পায়। (যেহেতু) আমার চরিত স্মরণ করিলে আমার প্রভাবে সিংহাদি হিংস্রজন্তুগণ, দস্যুগণ এবং বৈরিগণ দূর হইতেই পলায়ন করে।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে মায়ের চরিতকথা কীর্ত্তনের ও শ্রবণের ফল বর্ণিত হইয়াছে, এইবার স্মরণের ফল কথিত হইতেছে। শ্রবণ কীর্ত্তনে অসমর্থ হইয়া যথার্থ কাতর ভাবে মায়ের এই পবিত্র চরিত্র স্মরণ করিতে পারিলেও; মানুষ পূর্ব্বোক্ত বিপৎসমূহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। সংসারে যে যে কারণে মানুষের কাতরতা উপস্থিত হইতে পারে,

তাহা বলিতে গিয়া, মা এস্থলে অরণ্য প্রান্তর দাবাগ্নি দস্যু প্রভৃতি অনেক কথাই বলিয়াছেন। গীতায় ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"অনিত্যম-সুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্"। এই মনুষ্যলোক অনিত্য এবং অসুখময়। সংসারের অনিত্যতা এবং অসুখ প্রতিনিয়ত মনুষ্যগণকে কাতর করিয়া রাখে। সেই কাতর অবস্থায়ও যদি জীব ভগবান্‌কে স্মরণ করে, তবে সেই স্মরণের ফলে কাতরতার হেতুভূত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ ত অবশ্যম্ভাবী, অধিকন্তু ধীরে ধীরে জীব ভগবৎসত্তায়ও বিশ্বাসবান্ হয়। যেখানে এইরূপ আর্ত্তজীবের কাতর ক্রন্দন, সেইখানেই মায়ের আমার সুপ্রকট আবির্ভাব।

দেখ জীব, তুমি কি সুখে আছ! তোমার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়াই মা এস্থলে "অরণ্যে প্রান্তরে বাপি" ইত্যাদি বাক্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন! দেখ, তোমার সংসারটী অরণ্য কিংবা প্রান্তর সদৃশ কি না? অসংখ্য বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়াও যথার্থ ই তুমি একা এই সংসার-প্রান্তরে পড়িয়া, সুখের আশা-মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত প্রতারিত হইতেছ। তারপর দেখ, তোমার চারিদিকেই অশান্তির দাবাগ্নি জ্বলিতেছে কি না? যাহাকে তুমি শান্তি বলিয়া মনে করিয়া লও, একটু ধীর চিত্তে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে—তোমার সে শান্তিটুকুও অশান্তি-মিশ্রিত। দেখ, তোমার সাধুবৃত্তিগুলি বহির্ম্মুখ-বিষয়-লোলুপ বৃত্তিরূপী দস্যুগণ কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত কি না? দেখ, যাহা-দিগকে তুমি মিত্র বলিয়া মনে কর, সেই কাম ক্রোধাদি মিত্ররূপী বৈরিগণ তোমার শান্তিনদীর উপকূল ভাঙ্গিয়া দেয় কি না? দেখ, সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুরূপী দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি-নিচয় কর্ত্তৃক তুমি প্রতিনিয়ত আক্রান্ত কি না? দেখ, তুমি শূন্য—একা—অসহায় কি না? ইহার উপর দেখ—রাজার ক্রোধ। যিনি ঈশ্বর, যিনি এই বিশ্বের রাজা, সকল আদেশ পালন করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টিবিধান কিছুতেই করিতে পারিতেছ না; সুতরাং তাঁহার নিকট তোমার উপস্থিত হইবার উপায় নাই। তাঁহারই আদেশে তুমি বধ্য—মরণের পথে অগ্রসর এবং বদ্ধ—সংসারশৃঙ্খলে

আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ। আরও দেখ, এই সংসার-মহার্ণবে পতিত হইয়া তোমার জীবনপোত অদৃষ্টবায়ুদ্বারা নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে। দেখ, তুমি প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দারুণ সংগ্রামে প্রতিনিয়ত ক্ষত বিক্ষত হইতেছ। তারপর শারীরিক ব্যাধি এবং মানসিক আধি দ্বারা কতই যাতনা ভোগ করিতেছ। এইরূপে তুমি ঘোর সঙ্কটে নিপতিত। তোমার বর্ত্তমান জীবন বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, সত্য সত্যই তুমি ঘোর সঙ্কটে নিপতিত। দেখিয়া আর্ত্ত হও, কাতর হও, একবার আমাকে স্মরণ কর। যে মুহূর্ত্তে স্মরণ করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবে। পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর, পুনঃ পুনঃ এই সঙ্কট পরিত্রাণের আস্বাদ পাইবে। যাহাদের জীবনে এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সঙ্কটসমূহ উপস্থিত হয় নাই, তাহারা আমাকে স্মরণ করিবার সুযোগ পায় না। কিন্তু বৎস, আমি যে তোমাদিগকে বড় ভালবাসি; তোমাদিগকে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন করিয়া আমাকে স্মরণ করিবার সুযোগ প্রদান করি। আজ হউক, কাল হউক, কিছুদিন পরে হউক, নিশ্চয়ই তোমরা এই সুযোগ লাভ করিবে। সেই শুভ সুযোগ উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিতে ভুলিও না। স্মরণ করিতে পারিলেই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ ও ক্রমে আমার দেখা পাইবে, ইহাই আমার শেষ বাণী।

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩০॥
তেঽপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা।
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—চণ্ডবিক্রমশালিনী সেই ভগবতী চণ্ডিকা দেবী দেখিতে দেখিতে দেবতাগণের সম্মুখেই অন্তর্হিত হইলেন।

এবং অরিকুল নিহত হওয়ায়, দেবতাগণও নির্ভয়ে যথাপূর্ব্ব যজ্ঞভাগ-ভোগরূপ স্ব স্ব অধিকার লাভ করিলেন।

ব্যাখ্যা। সত্য সত্যই মা আমার এইরূপ দেখিতে দেখিতেই অন্তর্হিত হইয়া যান। মাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ধরিয়া রাখিবার অধিকার কাহারও নাই। তিনি আপন ইচ্ছায় প্রকাশিত হন, আবার আপন ইচ্ছায় অন্তর্হিত হইয়া যান। তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাবের উপর হস্তক্ষেপ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। তবে একটী কথা এই যে, মা যখন চণ্ডবিক্রমা চণ্ডিকা-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন, তখনই জীব যথার্থ ধন্য হয়, তাহার জীবত্বের অবসান হয়—বড় সাধের খেলার ঘর তিনখানি ভাঙ্গিয়া যায়, জীব তখন আপন স্বরূপের সন্ধান পাইয়া জীবত্বের মোহ হইতে চির পরিত্রাণ লাভ করে। তখন দেবতাগণও অসুর-উৎপীড়ন হইতে বিমুক্ত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণরূপ স্ব স্ব অধিকার লাভ করেন—পরমাত্ম-সম্ভোগ-জনিত বিশিষ্ট আনন্দ ভোগের সুযোগ পাইয়া থাকে।

দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি।
জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্ মহোগ্রেঽতুল-বিক্রমে।
নিশুম্ভে চ মহাবীর্য্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ ॥৩২॥

অনুবাদ। জগদ্বিধ্বংসী অতি উগ্র অতুলবিক্রমশালী দেবরিপু শুম্ভ এবং মহাবীর্য্য নিশুম্ভ যুদ্ধে দেবীকর্ত্তৃক নিহত হইলে, হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে প্রবেশ করিল।

ব্যাখ্যা। অনুচরবর্গের সহিত শুম্ভ ও নিশুম্ভ দেবীকর্ত্তৃক নিহত হইলে, হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বে দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে—সপ্ত অজ্ঞানভূমিকাই সপ্ত পাতাল। জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হইলে, অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হয়; সুতরাং আত্মস্বরূপ-বিষয়ক অজ্ঞানজন্য আসুরিক বৃত্তিসমূহ তৎসঙ্গে আপনা হইতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। এখানেও দেবী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে শুম্ভ নিশুম্ভরূপী অস্মিতা ও

মমতাকে বিলয় করিলেন, আর হতাবশিষ্ট আসুরিকভাব নিচয় আপনা হইতেই অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাধক! ঠিক এইরূপই হয়, যে মুহূর্ত্তে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মার প্রকাশ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানজন্য যাবতীয় দ্বৈত প্রপঞ্চ সম্যক্ তিরোহিত হইয়া যায়। তারপর ব্যুত্থিত অবস্থায় আবার পূর্ব্ববাধিত অজ্ঞানের এবং তৎকার্য্যের কথঞ্চিৎ অনুবর্ত্তন হয়। এইরূপ অনুবর্ত্তন হইলেও জীবন্মুক্ততার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না; জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে যেরূপ জ্ঞানের আভাসমাত্র লইয়া জীব জগদ্‌ভোগ করে, আত্মজ্ঞান লাভের পর সেইরূপ অজ্ঞানের আভাসমাত্র লইয়া সাধক পূর্ব্ববাধিত জগতে—অনাত্মবস্তুতে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকে। তারপর প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলে অর্থাৎ দেহাবসানে জীব কৈবল্য-মুক্তি লাভ করে, চিরতরে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, তাহাদের আর উৎক্রান্তি বা আবর্ত্তন হয় না। তাই শ্রুতি বলেন—"ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন স পুনবাবর্ত্ততে," তাঁহার পুনরাবর্ত্তন হয় না, তাঁহার পুনরাবর্ত্তন হয় না।

এই মন্ত্রে দেবরিপু মহোগ্র প্রভৃতি শুম্ভের যে কয়েকটী বিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে, ধীমান্ পাঠকদিগের নিকট ঐ সকল বিশেষণের ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন; কারণ, ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থানে এ সকলের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্ ॥৩৩॥

অনুবাদ। হে ভূপ! সেই ভগবতী দেবী নিত্যা হইয়াও এইরূপ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া জগতের পরিপালন করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। এইমন্ত্রে মহর্ষি মেধস মহারাজ সুরথকে অবতার-তত্ত্বের ইঙ্গিত করিলেন। যদিও ইতিপূর্ব্বে "ইত্থং যদা যদা" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর অবতরণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে বিশেষভাবে সুরথকে

বুঝাইয়া দিবার জন্যই ঋষি সেই দেবীবাক্যের পুনরুল্লেখ করিলেন—"জগৎ পরিপালনের জন্য দেবী পুনঃ পুনঃ সম্ভূত অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়া থাকেন"। অবতারবাদ সম্বন্ধে দুই একটী কথা এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অবতার শব্দের অর্থ অবতরণ। বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধিতে অবতরণ করেন। জীব যখন বিশুদ্ধ বুদ্ধিস্বরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়, তখন সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিতেই আত্মার স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। আত্মার এই বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হওয়াই যথার্থ অবতরণ বা অবতার। ইহাতে তাঁহার নির্গুণত্বের কিছুই হানি হয় না, তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ থাকিয়াও স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হইয়া থাকেন।

যিনি সমষ্টি বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত আত্মা, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর, যিনি সত্য-সঙ্কল্প সর্ব্বকাম আপ্ত-কাম, যিনি প্রেমময় স্নেহময় দয়াময়, যিনি প্রভু বিভু নিয়ন্তা, তিনি যখন কোন ব্যষ্টি বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হইয়া বিশ্বমঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন, তখনই তিনি অবতার আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। যখন কোন দেশের অধিকাংশ লোক আসুরিক বৃত্তিদ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, শান্তির আশায় জ্ঞানের পিপাসায় আকুল হইয়া, কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতে থাকে, তখন সেই প্রার্থনার ফলে দয়ার আধার পরমেশ্বর কোনও জীববুদ্ধিতে আত্মপ্রকাশ করেন, আর যথার্থ পিপাসু জনসংঘ সেই সত্যদর্শীর সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য কৃতকৃত্য হইয়া যায়। ইহাই অবতার-তত্ত্বের যথার্থ রহস্য।

এই অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে গীতা ও চণ্ডী উভয়ই প্রায় তুল্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। গীতা বলেন—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"। আর চণ্ডী বলেন—"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি, তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি-সংক্ষয়ম্"। দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন, ইহাই গীতাকথিত অবতারের কার্য্য; আর আত্মস্বরূপ-প্রকাশ ও অরিসংক্ষয়, ইহাই দেবী

মাহাত্ম্য-কথিত অবতারের কার্য্য। প্রথমোক্ত অবতার কর্ত্তৃক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়, আর দেবীকথিত অবতার কর্ত্তৃক আত্ম-প্রতিষ্ঠা হয়। আত্ম-প্রতিষ্ঠা হইলেই যথার্থ ধর্ম্মের রক্ষা ও জগতের পরিপালন হইয়া থাকে। যেখানে যত অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে, কোন না কোন রকমে তাঁহাদ্বারা এই সত্য রক্ষিত হইয়াছে। সকল অবতারই আমার চিন্ময়ী মা; মা ব্যতীত আর কাহারও অবতারের সম্ভাবনা নাই। চৈতন্যময়ী পরমেশ্বরীই ত মানবশরীরে অবতাররূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন! যিনি যথার্থ অহং, তিনিই ত অবতীর্ণ হন! তাই, ইতিপূর্ব্বে মা আমার নিজমুখে বলিয়াছেন—"অহং অবতীর্য্য" আমি অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞানরূপ অরিকুলের সংক্ষয় করিয়া থাকি।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটী কথা বলিয়া রাখিতেছি—যাহারা যথার্থ পিপাসু যথার্থ মুমুক্ষু তাহাদের হৃদয়ে মা আমার প্রথমেই অবতারে অবিচল বিশ্বাসরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

যদি কাহারও অবতারে দৃঢ় বিশ্বাস হয়,—অহৈতুক ভক্তি হয়, তবে তাহার শ্রেয়োলাভ সুনিশ্চিত। আচার্য্য শঙ্করেরও অবতারে বিশ্বাস ছিল, তিনি গীতাভাষ্যের ভূমিকায় অবতারের কথা বলিতে গিয়া "দেহবানিব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ ইব" কথাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি দেহাদি সংঘাতরহিত, তিনি—সেই শুদ্ধ বোধস্বরূপ পরমেশ্বর মায়া প্রভাবে দেহ বিশিষ্টের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। অন্যথা মায়িক জীববৃন্দ তাহার সন্নিহিতও হইতে পারে না। পরমাত্মাই জীবের কল্যাণের জন্য অবতার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইহা অস্বীকার করিতে না যাইয়া বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিলেই জীবের শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে একটী বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। অবতারের মূর্ত্তিটীই ঈশ্বর নহে, মূর্ত্তিমাত্র আশ্রয় করিয়াই পরমাত্মা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহা বুঝিতে হইবে। মূর্ত্তিমাত্রে যেন কাহারও অবতার নিশ্চয় না হয়! যাহা অবতারের যথার্থ স্বরূপ তাহা উপলব্ধি করিতে হয়।

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥৩৪॥

অনুবাদ। (হে সুরথ!) তিনি এই বিশ্বকে মোহিত করিতেছেন, তিনি এই বিশ্বের প্রসবকর্ত্রী, আবার প্রার্থনা করিলে তিনিই সন্তুষ্ট হইয়া (জীবকে) বিজ্ঞানরূপ ঋদ্ধি প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা। মেধস বলিলেন—হে সুরথ! মা এত সুপ্রকট হইয়াও যে অজ্ঞাত থাকেন, তাহার কারণ, "তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং"—তিনিই এই বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তবে কি তিনি জীবের শত্রু? মুক্তি-দানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যিনি স্বেচ্ছায় জীবগণকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, তাঁহাকে শত্রু ভিন্ন আর কি বলা যায়? না না, তিনি যে মা! "সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে"—তিনিই ত এই বিশ্বকে প্রসব করেন। মা কি কখনও সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন, বা করিতে পারেন! তবে তিনি জীবকে দেখা দেন না কেন? কেন দিবেন না? "সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি"—মা যাচিতা হইলেই, তিনি তুষ্ট হইয়া জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রদান করেন, অর্থাৎ মাকে চাহিলেই তিনি দেখা দেন। যদি বল—আমরা ত কত চাহিতেছি, কই দেখা ত দেন না! না, চাহিতেই পার না। আরও দুঃখের কথা এই চাহিতে যে পার না, এই কথাটীও বুঝিতে পার না। সত্যই বলছি—চাহিতে পারিলেই তিনি দেখা দেন। জীব যখন তুমি শুধু মায়ের জন্য মাকে চাহিতে পারিবে তখন সত্য সত্যই মায়ের দেখা পাইবে। মায়ের নিকট যাহা চাহিবে, মা নির্ব্বিচারে তাহাই দিবেন। যখন আর কিছু চাহিবে না, শুধু মাকে চাহিবে, তখনই তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তোমায় বিজ্ঞানরূপ পরম ঋদ্ধি—পরম সম্পৎ প্রদান করিবেন, যাহার প্রভাবে তুমি মাতৃলাভ করিবে, আত্মজ্ঞ হইবে, ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিবে। আবার বলি সাধক, শুধু চাহিতে পারিলেই মাকে পাওয়া যায়। ইহাই সুরথের প্রতি মহর্ষি মেধসের বিশেষ উপদেশ।

ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী-স্বরূপয়া ॥৩৫॥
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ॥৩৬॥

অনুবাদ। হে মনুজেশ্বর! প্রলয়কালে যিনি মহামারীস্বরূপা, সেই মহাকালী কর্তৃক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রলয়-কালে তিনিই মহামারী, সৃষ্টিকালে তিনিই সৃষ্টিস্বরূপা, আবার স্থিতিকালে তিনিই ভূতবর্গকে রক্ষণ ও পালন করিয়া থাকেন; অথচ তিনি স্বয়ং অজা (জন্মরহিতা) এবং সনাতনী (নিত্যা)।

ব্যাখ্যা। মেধস বলিতেছেন—হে মনুজেশ্বর সুরথ! দর্শন কর—একমাত্র প্রলয়ঙ্করী মহামৃত্যুস্বরূপা মহাকালী এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। প্রতিজীব, প্রতিপরমাণু প্রতিক্ষণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছায়ও মহামারীর দিকে—মৃত্যুর দিকে—ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখ—একটু জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখ, এই ব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট্ ধ্বংসযজ্ঞমাত্র। সূতিকা-গৃহস্থ-সদ্যোজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া মুমূর্ষু বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই মহামারীস্বরূপা মহাকালীর বিরাট্ ধ্বংসযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে। জীবের যে বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা বা বয়ঃপরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবার পরিচয়মাত্র; অর্থাৎ কে কতটা ধ্বংসপুরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই জানাইয়া দেয়। সৃষ্টি এবং স্থিতি, ধ্বংসেরই পূর্ব্বায়োজন মাত্র। তাই মহামারী স্বরূপিণী কালীকেই "সৈবসৃষ্টিঃ" এবং "সৈব স্থিতিং করোতি" বলা হইয়াছে।

জীব! তোমরা কে কোথায় মাকে অন্বেষণ করিতে যাও। দেখ, ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় শক্তিরূপে একই মহাকালী মূর্ত্তি নিত্য প্রকটিতা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও একদিন "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ" বলিয়া মহাকালরূপে অর্জ্জুনকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক এই কালরূপী ভগবানই জীবের সাধ্য এবং উপাস্য, কালাতীত স্বরূপ সাধ্য নহে, উহা বাক্য মনের অগোচর স্বতোগম্য। মানুষ এই কালের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই, কালবিজয়ী হয় কালাতীত সত্তায় উপনীত হয়। মৃতুঞ্জয় হয়। এস, আমরা সকলেই জয় মা কালী বলিয়া মহাকালের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ি, মা আমাদিকে বুকে করিয়া কালাতীত ক্ষেত্রে উপনীত হইবেন। আমরা মৃত্যুঞ্জয় হইব।

চিৎস্বরূপা মা সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়, এই ত্রিবিধ স্বরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াও স্বয়ং অজা—নিত্যা। এত বড় ব্যাপারের মধ্যেও তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্ষয়োদয় বা বিকার নাই। জীব! ইহাঁরই হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দাও, আমি-বোধটা মহাকালীর শ্রীচরণে অর্পণ কর। আরে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তুমি মহাকালীর অঙ্কেই ত নিয়ত অবস্থান করিতেছ! তবে আর নূতন কি করিবে! যাহা একান্ত সত্য, কেবল তাহাই স্বীকার করিতে ও বুঝিতে বলা হইতেছে। যদি পার—এইরূপ আত্মসমর্পণ করিতে, তবে নিশ্চয়ই তুমি কালাতীত স্বরূপের সন্ধান পাইবে। সাংখ্য যাঁহাকে জড়া প্রকৃতি বলেন, বেদান্ত যাঁহাকে মিথ্যা-ভূতা মায়া বলেন, বৈষ্ণব-শাস্ত্র যাঁহাকে লীলা-বিলাস বলেন, তন্ত্রশাস্ত্র যাঁহাকে মহাকালী বলেন, তিনি—সেই একজন, যিনি কেবল চিৎস্বরূপ—কেবলানুভবানন্দস্বরূপ, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলেই বুঝিতে পারিবে—কিরূপে তিনি অজা এবং সনাতনী হইয়া, বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপা হইয়াও সৃষ্টি স্থিতি এবং মহামারী স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মী র্বিনাশায়োপজায়তে ॥ ৩৭ ॥
স্তুতা সম্পূজিতা পুষ্পৈর্ধূপ-গন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাম্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়-পুরাণে সাবর্ণিক-মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
শুম্ভ-নিশুম্ভবধঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। মানুষের অভ্যুদয়কালে তিনিই গৃহে বৃদ্ধিপ্রদায়িনী লক্ষ্মী, আবার অভাবকালে তিনিই অলক্ষ্মীরূপে সর্ব্বস্বনাশিনী হইয়া থাকেন। তিনি স্তুতা এবং গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজিতা হইলে, বিত্ত পুত্র এবং মঙ্গলদায়িনী ধর্ম্মবুদ্ধি প্রদান করেন।

ইতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক-মন্বন্তরীয় দেবী-
মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। মানুষ যখন ঐহিক কিংবা পারলৌকিক অথবা উভয় প্রকারের অভ্যুদয় লাভ করে, তখনই বুঝিতে হয়—"সৈব"—তিনিই—সেই চৈতন্যরূপিণী মা-ই লক্ষ্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। যখন তিনি বৃদ্ধিপ্রদায়িনী লক্ষ্মী-মূর্ত্তিতে জীবসন্তানকে অঙ্কে ধারণ করেন, তখন অভাবনীয় উপায়ে চতুর্দ্দিক হইতে তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সম্পৎ কিংবা সাধন সামগ্রী উপস্থিত হইতে থাকে। আবার যখন অভাব উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বস্বনাশিনীমূর্ত্তিতে অলক্ষ্মীরূপে মানুষকে অঙ্কে ধারণ করেন তখন মানুষের চতুর্দ্দিক হইতে বিনাশ আসিয়া উপস্থিত হয়। সর্ব্বত্রই মায়ের আমার মহাকালী-মূর্ত্তি অব্যাহতা। অভ্যুদয়রূপেও মহাকালশক্তি, আবার বিনাশরূপেও তিনি। মহাকালচক্র যখন যেরূপ ভাবে আবর্ত্তিত হয়, জীব তখন সেইরূপ ভাবে ভাবান্বিত হইয়া থাকে; মা যখন যে মূর্ত্তিতে যাহাকে কোলে করিয়া বসেন, তখন সে সেইরূপ ভাবেরই অভিনয় করিয়া থাকে। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীব কালের—মহাকালীর অঙ্কেই অবস্থিত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি উপায়ে এই মহাকালশক্তির প্রসন্নতা লাভ করা যায়। তাহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—"স্তুতা সম্পূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা",—স্তব এবং পূজা, ইহাই মাতৃপ্রীতি লাভের অব্যর্থ উপায়। সকল উপাসনা-প্রণালীর মধ্যেই এই দুইটী অব্যাহতভাবে অবস্থিত। বৈষ্ণবশাস্ত্রসম্মত উপাসনা—উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন এই স্তব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যোগশাস্ত্র-কথিত ঈশ্বর প্রণিধান শব্দটী এই স্তব এবং পূজারই ইঙ্গিত

করিয়া থাকে। পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্র প্রত্যক্ষভাবেই ঐ দুইটীর উপদেশ করিয়াছেন। অপৌরুষেয় বেদসমূহও স্তুতি এবং হোমের আদেশ করিয়াছেন। উপনিষদের সারভূত গীতাশাস্ত্রেও স্বয়ং ভগবান্ স্তব এবং পত্রপুষ্পাদির অর্পণরূপ পূজার উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপে আমরা সর্ব্বশাস্ত্রে স্তব এবং পূজা, এই দুইটীই ঈশ্বরোপাসনার প্রধান অঙ্গরূপে দেখিতে পাই। শ্রবণ মননাদি এবং যম নিয়মাদি যাবতীয় অনুষ্ঠানই এই স্তব ও পূজার সম্যক্ সার্থকতা লাভের জন্য বিহিত এবং অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই ভারতবর্ষে যাহা আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে—সেই স্তুতি এবং পূজাকে সাধনার প্রধান অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিলেই মায়ের প্রীতি হয়, এবং সাধকও অভীষ্টলাভে ধন্য হয়। নিত্যতৃপ্তা মায়ের বিশেষ প্রীতি সম্পাদন করিতে হইলে, এই দেবী-মাহাত্ম্যকথিত স্তুতি এবং পূজাকেই বিশেষভাবে আশ্রয় করিতে হয়।

মায়ের প্রীতি হইলে কি লাভ হয়? ঋষি বলিলেন—বিত্ত পুত্র এবং ধর্ম্মে শুভামতি। ইহা ব্যবহারিক জগতের ফল। আর আধ্যাত্মিক জগতে ভক্তিসম্পৎরূপ বিত্ত, নির্ম্মল বোধরূপ পুত্র এবং ধর্ম্মে শুভা মতি অর্থাৎ ধী লাভ হয়—যাহার ফলে জীব অনাদিকালের জীবত্ববন্ধন হইতে চিরতরে বিমুক্ত হইয়া যায়। তাই বলি, জীব! তোমরা সকলে যথাশক্তি মায়ের স্তব এবং পূজা করিতে বিমুখ হইও না। জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম্মের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় আর কোন অনুষ্ঠানেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

"কলিযুগে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান বৃথা" এইরূপ আপাত লোভনীয় বাক্য দ্বারা যাহারা সাধারণ জনগণকে প্রতারিত ও মোহিত করিতে প্রয়াস পায়, মা তাহাদিগের এই আসুরিক আক্রমণ হইতে সন্তানগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।

ইতি সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায় ফলশ্রুতি সমাপ্ত।

———

সাধন-সমর

বা

দেবী-মাহাত্ম্য।
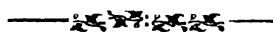
রুদ্রগ্রন্থি ভেদ।

উপসংহার।

ঋষিরুবাচ।

এতত্তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবংপ্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া ॥১॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন, হে মহারাজ! এই উত্তম দেবী-মাহাত্ম্য তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। যিনি এই জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই দেবী এইরূপ প্রভাব-সম্পন্নাই বটেন। সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়াই বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। এইবার গুরু ব্রহ্মর্ষি মেধস্ রাজা সুরথের নিকট দেবী-মাহাত্ম্যের উপসংহার করিতেছেন। তিনি বলিলেন—হে ভূপ! হে জড়ত্ববিজয়ী জীব! অতি পবিত্র—সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ এই উত্তম দেবীমাহাত্ম্য তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। বহুপুণ্যফলে ব্রহ্মর্ষিগণের আশীর্ব্বাদে তুমি এই ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণের উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও অধিকার লাভ করিয়াছ; তাই, তোমার নিকট দেবীর এই তিনটী চরিত যথাযথভাবে বর্ণনা করিলাম। যাহারা অনধিকারী, যাহাদের এখন পর্য্যন্ত গুরু-বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ়-প্রত্যয়রূপ শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহাদের নিকট ইহা বিশেষ

ফলদায়ক না হইলেও, তোমার নিকট ইহা সম্যক্ ফলদায়ক হইবে বলিয়াই আশা করি। তুমি দেবীর এই অপূর্ব্ব মহত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, ইহার কোন অংশে সংশয়ান্বিত হইও না। ইহাতে অতিরঞ্জিত বা কল্পিত কিছুই নাই; যাহা একান্ত সত্য, তাহাই যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যিনি এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী, যিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী বিষ্ণুমায়া; তিনি এইরূপ প্রভাব সম্পন্নাই বটেন; সুতরাং তাঁহার অলৌকিক চরিত-মাহাত্ম্য-বিষয়ে তুমি বিন্দুমাত্র সংশয়বুদ্ধি রাখিও না। এই ভগবতী বিষ্ণুমায়াই তোমাদের মত জীবকে বিদ্যা দান করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উপদেশ প্রদানে মুক্তিমার্গে উপনীত করেন। আবার মুমুক্ষুগণের একান্ত আশ্রয়ণীয় মুক্তিরূপেও ইনিই প্রকাশিত হন। "এবংপ্রভাবা সা দেবী"—দেবী মা আমার এইরূপ প্রভাব-সম্পন্নাই বটেন।

তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যেঽবিবেকিনঃ।
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে ॥২॥
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥৩॥

অনুবাদ। সেই দেবী কর্ত্তৃক তুমি, এই বৈশ্য এবং অন্যান্য বিবেকী অথবা অবিবেকী, সকলেই মোহিত হইতেছে, অতীত কালে হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। অতএব হে মহারাজ! তুমি সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও। তিনি আরাধিতা হইলেই মনুষ্যদিগের ভোগ স্বর্গ এবং অপবর্গ প্রদান করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। বৎস সুরথ! তুমি এবং এই বৈশ্য সমাধি, উভয়েই একদিন বলিয়াছিলে—"যন্মোহোজ্ঞানিনোরপি" "জ্ঞানী আমরা আমাদেরও মোহ কেন হয়!" কিন্তু আজ—এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলে যে, সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক কেবল তুমি এবং সমাধি নহে,

অন্যান্য বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণও মুগ্ধ হইয়া থাকে, অতীত কালেও এইরূপ মুগ্ধ হইত, এবং ভবিষ্যৎকালেও এইরূপই মুগ্ধ হইবে। মা যে আমার মহাকালী! ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, এই তিনটী যে মায়েরই মূর্ত্তি! মা আমার এই ত্রিমূর্ত্তিরূপে যতদিন আত্মপ্রকাশ করিবেন, অর্থাৎ স্মৃতি আশা ও কল্পনারূপে যতদিন জীব বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হইবেন, ততদিনই জীব মহামায়া কর্ত্তৃক এইরূপ মোহিত হইবে। যাঁহাতে কোন কল্পিত বিভাগ নাই, যিনি অখণ্ড, যিনি পূর্ণ, তাঁহাকে খণ্ডরূপে দর্শন করাই মোহের কার্য্য। এই মোহ তিনকালেই আছে, তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মোহন্তে মোহিতা মোহমেষ্যন্তি" এই মোহই জগৎপ্রপঞ্চের—সৃষ্টি বৈচিত্র্যের বীজ। "চক্ষু না বাঁধিলে লুকোচুরী খেলা চলে না" নিজস্বরূপের একটু বিস্মৃতিভাব না আসিলে, লীলাভিনয় সম্পন্ন হয় না; তাই, বিবেকী অবিবেকী সকলেরই এইরূপ মোহ অল্পাধিক আছে, ছিল এবং থাকিবে।

হে সুরথ! অমাত্য এবং স্বজনগণ কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও তাহাদের প্রতি তোমার এই যে প্রবল আকর্ষণ, অপহৃত রাজ্যের জন্য এখনও তোমার এই যে কাতরতা, ইহাই তোমার মোহ। যদি যথার্থই এই অজেয় মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে "তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্"—হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও; আর কোন উপায় নাই! শুধু মহামায়ার শরণ লও!

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন—"যদি আমার এই দুরত্যয়া মায়া হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে আমার শরণাপন্ন হও।" "আমার"—মায়ের, শরণে—আশ্রয়ে আগত হও। এইরূপ শরণাগত হইতে পারিলেই মা আমার আরাধিতা হইয়া থাকেন। মা আরাধিতা হইলেই মায়ের প্রীতি তোমার উপলব্ধিযোগ্য হইবে। তখন তিনি তোমাকে ভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গ এই তিনটী ফল প্রদান করিবেন। সৃষ্টি স্থিতি লয়রূপিণী মায়ের ত্রিবিধ মূর্ত্তির নিকট হইতে তুমি ত্রিবিধ ফললাভ করিবে। মা প্রথম মূর্ত্তিতে ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদ করিবেন, তাহার ফলে তোমার বিষয়াসক্তি দূর হইবে;

তখন পার্থিব ভোগ সকল আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকিবে; ইহাই মায়ের প্রথম দান। দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে তিনি বিষ্ণু-গ্রন্থি-ভেদ করিবেন, তাহার ফলে বিশ্বময় প্রিয়তম-প্রাণসত্তা দর্শন করিয়া তুমি স্বর্গ অর্থাৎ দেবলোক সম্ভোগের অধিকারী হইবে। আর তৃতীয় মূর্ত্তিতে তিনি রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া তোমাকে বিশুদ্ধবোধ-স্বরূপে—আত্মজ্ঞানে উপনীত করিবেন; তখন তুমি অপবর্গলাভ করিবে। এইরূপে কেবল তুমি নও, পরমেশ্বরী মায়ের চরণে একান্ত শরণাগত সন্তানমাত্রেই মায়ের নিকট হইতে ভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গরূপ তিনটী ফল লাভ করে।

শাস্ত্র যাহাকে চতুর্ব্বর্গ বলিয়াছেন, তাহা এই তিনটীরই অন্তর্গত। ধর্ম্ম এবং অর্থ ভোগের অন্তর্গত, কাম স্বর্গের অন্তর্গত, এবং অপবর্গ ও মোক্ষ একই কথা।

এই মন্ত্রে "নৃণাং" এই পদটীর প্রয়োগ দেখিয়া বুঝিতে হইবে—মনুষ্যমাত্রেই এই ভোগাপবর্গের অধিকারী। আশঙ্কা হইতে পারে—তবে সকলেই ভোগাপবর্গ লাভ করিতে পারে না কেন? ইহার উত্তর এই যে, সকলেই ত পরমেশ্বরীর চরণে শরণাগত হয় না! মনে রাখিও সাধক, মাতৃচরণে যথার্থ শরণাগত সন্তানের ভোগাপবর্গ অবশ্যম্ভাবী।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ।
প্রণিপত্য মহাভাগঃ তমৃষিং সংশিত-ব্রতম্ ॥৪॥
নির্ব্বিণ্ণোঽতি মমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ।
জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে ॥৫॥

অনুবাদ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহামুনে (ক্রৌষ্টুকি) এইরূপ তাঁহার (মেধসের) বাক্য শ্রবণ করিয়া, হৃতরাজ্য অত্যন্ত দুঃখিত সেই নরাধিপ সুরথ এবং মমত্বহেতু অতি নির্ব্বেদপ্রাপ্ত বৈশ্য, উভয়েই

তীব্র-ব্রতধারী সেই মহাভাগ ঋষিকে (মেধস্‌কে) প্রণিপাত পূর্ব্বক সদ্যঃ তপস্যা করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

ব্যাখ্যা। এইবার ব্রহ্মর্ষি গুরু মেধসের বাক্য শেষ হইল। প্রথমে "মার্কণ্ডেয় উবাচ" বলিয়া দেবীমাহাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছিল, এক্ষণে আবার উপসংহারেও "মার্কণ্ডেয় উবাচ" বলিয়া উপাখ্যান শেষ করা হইতেছে। এ পর্য্যন্ত প্রসঙ্গক্রমে সুরথ এবং মেধস ঋষির বাক্য চলিয়াছে; মূলে কিন্তু প্রজ্ঞাচক্ষুরূপী মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক স্থূলাভিমানী বিশ্বরূপী জৈমিনির নিকট দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, সুরথ হৃতরাজ্য, সুতরাং অতি নির্বিণ্ণ; বৈশ্য মমত্বাকৃষ্ট, সুতরাং তিনিও অতি নির্বিণ্ণ—অতিশয় নির্বেদপ্রাপ্ত দুঃখিত। একজন রাজ্যৈশ্বর্য্যকামী, আর একজন মমত্ব-পরিহারকামী অর্থাৎ বিবেকান্বেষী; উভয়েই গুরুবাক্যে পরম শ্রদ্ধাবান্। ঋষি যেমন বলিলেন "তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।" সদ্যঃ—অমনি—তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উভয়েই ঋষিচরণে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ পালনের জন্য, তপস্যা করিতে প্রস্থান করিলেন। আধ্যাত্মিক ভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়—সুরথরূপী জীব সমাধিকে সহায় করিয়া বিনীতভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, মনন এবং নিদিধ্যাসনের জন্য যথাশক্তি অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়া থাকে।

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখ, সুরথ রাজ্যার্থী অর্থাৎ কাঞ্চনাসক্ত, আর বৈশ্য স্ত্রীপুত্রাদির মমতায় আকৃষ্ট অর্থাৎ কামিনীতে আসক্ত। বর্ত্তমান জগৎ যে দুইটী বস্তুর প্রতি বিশেষ আসক্ত, সেই দুইটীই এই চণ্ডীর উপাখ্যান ভাগের প্রধান ভিত্তি। ঘটনাচক্রে উভয়ই বিতাড়িত, তথাপি সেই বিনষ্ট কাঞ্চন ও কামিনীর মোহে আচ্ছন্ন। সৌভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুলাভ, দেবী-মাহাত্ম্য-শ্রবণ এবং গুরুর আদেশানুসারে দেবীর চরণে সম্যক্ শরণাগত হইবার জন্য তপস্যা। ইহাই ধর্ম্মজীবন লাভের সাধারণ ক্রম। অধিকাংশ মানুষ এইভাবেই ধর্ম্মরাজ্যে উপনীত হয়। তবে যাঁহারা বাল্যকাল হইতেই বিষয় বিরক্ত এবং সাধক, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত।

সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদী-পুলিন-সংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্ ॥৬॥
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাং চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নি-তর্পণৈঃ ॥৭॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিং চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্ ॥৮॥
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা ॥৯॥

অনুবাদ। সেই রাজা এবং বৈশ্য, উভয়ে মাতৃদর্শনের জন্য নদীপুলিনে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠ-ফল-দায়ক দেবীসূক্ত জপ, মৃত্তিকানির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক পুষ্পধূপাদিদ্বারা দেবীর পূজা, অগ্নিতর্পণ (হোম), নিরাহারে ও অল্পাহারে তন্মনস্কভাবে (সমাহিত ভাবে) অবস্থান, এবং স্বগাত্র-রুধিরসিক্ত বলিপ্রদান; এইরূপভাবে তিন বৎসরকাল সংযতচিত্তে আরাধনা করিবার পর, জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকাদেবী পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন এবং বলিলেন।—

ব্যাখ্যা। এই চারিটী মন্ত্রে রাজা এবং বৈশ্যের তপস্যা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। "সন্দর্শনার্থমম্বায়াঃ," অম্বার—মায়ের দর্শন লাভ করিবার জন্য তাহারা উভয়েই লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, বিবিক্ত দেশে নদীপুলিনে অবস্থানপূর্ব্বক নিয়মিতভাবে দেবীসূক্ত (অহংরুদ্রেভির্বসুভিঃ ইত্যাদি) জপ, মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক পুষ্পধূপাদিদ্বারা পূজা, অগ্নিতর্পণ —হোম, অল্পাহারে কিংবা নিরাহারে সমাহিত ভাবে অবস্থান এবং স্বগাত্র-রুধিরসিক্ত উপহার প্রদান, ইত্যাদি নানারূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইরূপ একদিন দুইদিন নয়, নিয়মিত তিন বৎসর কাল প্রাণপণ তপস্যা করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষভাগে এইরূপ বাহ্যপূজা-বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এখানে কেবল মূর্ত্তি-গঠন সম্বন্ধে দুইএকটী কথা বলা আবশ্যক। পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে মূর্ত্তি পূজার বিধান বহুল পরিমাণে উক্ত আছে। আবার ঐ সকল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে, মৃৎ শিলা ধাতু দারু প্রভৃতি দ্বারা মূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক পূজা করিলে কখনও ঈশ্বরলাভ হয় না; কথাটা বিবেচ্য। যদি মাত্র মৃদাদি গঠিত মূর্ত্তিকেই ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানে পূজা করা হয়, তবে সত্য সত্যই যথার্থ ঈশ্বর-লাভ হয় না; কিন্তু মূর্ত্তিটিকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী মহতী শক্তির ঘনীভূত বিকাশরূপে বিরাট্ চৈতন্য সত্তার কেন্দ্ররূপে—আত্ম-প্রতিবিম্বরূপে পরিগ্রহপূর্ব্বক পূজা করিলে, উহা কখনও নিস্ফল হয় না। প্রাচীনকালের মনীষিগণ ঐরূপ ভাবে বিভিন্ন মূর্ত্তির পূজা করিয়াই অভিন্ন জ্ঞানে উপনীত হইতেন, এবং ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া জীবন্মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করিতেন।

কেহ কেহ বলেন, স্থূলবুদ্ধি মানবের জন্যই মূর্ত্তি পূজার বিধান। কথাটা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। মূর্ত্তির যথার্থ রহস্য অবগত হইয়া, সত্যে ও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজা করিতে একমাত্র আত্মজ্ঞ পুরুষগণই সমর্থ। তবে বর্ত্তমান কালে এদেশের অধিকাংশ স্থানে যেরূপ ভাবে পূজাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা স্থূলবুদ্ধি কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষেই উপযুক্ত বটে।

শুন, ধেনুর সর্ব্বাবয়বে দুগ্ধ থাকিলেও যেরূপ স্তন ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করা যায় না, সেইরূপ বিশ্বব্যাপী চৈতন্য সত্তার বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে, বিশিষ্ট মূর্ত্তির আশ্রয় ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব হয় না। যাঁহারা স্থূলাতিরিক্ত চৈতন্য-সত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাই মূর্ত্তিপূজার যথার্থ অধিকারী। যতদিন স্থূল দেহ আছে, যতদিন এই মাংসপিণ্ডের পূজার জন্য খাদ্য পানীয় বসন ভূষণাদির প্রয়োজন আছে, ততদিন মূর্ত্তিপূজা থাকিবেই। অহর্নিশ পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যোগবাশিষ্ঠপ্রোক্ত পদার্থাভাবিনী এবং তূর্য্যগা ভূমিকায় আরোহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলেই কোন না কোন প্রকারে মূর্ত্তিপূজা করিয়া থাকে; সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে হঠকারিতার

বশবর্ত্তী হইয়া মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করা, উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক। জড়জ্ঞানে পূজা করিয়াই কিছুদিন যাবৎ এদেশের জড়ত্ব আসিয়াছে। আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া মূর্ত্তিপূজা করিতে পারিলেই, দেশের এই জড়ত্বরূপ পাপ দূরীভূত হইয়া যাইবে। "পূজাতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে এবিষয় সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—সুরথ ও সমাধি কেবল মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহারা সংযতাহারে এবং নিরাহারে তন্মনস্কভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। আহার শব্দের অর্থ বিষয়গ্রহণ। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের আহরণ করার নাম আহার।" এইরূপ আহার যখন সংযত হয়, অর্থাৎ 'ঈশাবাস্য' করিয়া—সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া বিষয় গ্রহণ করা হয়, তখনই তাহাকে যতাহার—সংযতাহার বলা যায়। আর ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়াহরণ হইতে সম্যক্ নিবৃত্তির নাম নিরাহার। তন্মনস্ক শব্দের অর্থ সমাহিত ভাব। তৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। তাঁহাতে মনের সম্যক্ বিলয় হইলেই সাধকের তন্মনস্ক অবস্থা হয়। স্থূল কথা—সুরথ ও সমাধি দেবীসূক্তপাঠরূপ মন্ত্রজপ এবং প্রতিমাপূজারূপ বহিরঙ্গ সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান এবং সমাধিরও অনুশীলন করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, সাধনার যাহা প্রাণ, যাহা না থাকিলে সাধনাই হয় না, তাহারও সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছিলেন—"দদতুস্তৌ বলিং চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্"—স্বগাত্ররুধিরসিক্ত উপহার মাতৃচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। স্বগাত্ররুধির শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ প্রাণ। এইরূপ অর্থ আমাদের স্বকপোল-কল্পিত নহে। উপনিষৎও প্রাণকে আঙ্গিরস বলিয়াছেন। অঙ্গের রস বলিয়াই প্রাণের একটী নাম আঙ্গিরস। অঙ্গের রস এবং স্বগাত্ররুধির ঠিক একই অর্থের প্রকাশক। সে যাহা হউক, সুরথ ও সমাধি স্বকীয় বিশিষ্ট প্রাণটীকে ধরিয়া মাতৃচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। সাধক! যতদিন সম্যক্‌রূপে প্রাণসমর্পণ না হয়, ততদিন বলি অর্থাৎ পূজার উপহারগুলি ঠিক এইরূপ স্বগাত্ররুধিরসিক্ত করিয়া, অর্থাৎ প্রাণময় করিয়া—প্রাণের প্রতিনিধি

করিয়া মাতৃচরণে অর্পণ করিতে হয়। অদ্যাপি এতদ্দেশের পূজা প্রণালীতে একটী বিধান প্রচলিত আছে—"আর্চ্চতং অর্চ্চিতায় দদ্যাৎ"—পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি পূজার উপচারগুলিকে প্রথমে গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পরে অর্পণ করিতে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানকালে উহা একটী অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র কার্য্যটীর ভিতরে যে এত বড় একটা গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, ইহা হয়ত অনেকেই অনুধাবনা করেন না। উপচারগুলিকে নিজগাত্রাসৃগুক্ষিত করিবার জন্যই ঐরূপ বিধান। স্বগাত্র-অসৃক্ দ্বারা উক্ষিত (সিক্ত) না হইলে—অঙ্গের রসদ্বারা অর্থাৎ প্রাণদ্বারা সঞ্জীবিত না হইলে, উহা মাতৃচরণে সম্যক্ অর্পিত হয় না। দীয়মান পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি উপচারগুলিতে স্বকীয় প্রাণের সত্তা দর্শন করিয়া—সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তবে অর্পণ করিতে হয়। আরে, আমাদের ব্যষ্টি প্রাণ সমষ্টি মহাপ্রাণে সম্মিলিত হয় না বলিয়াই ত মাতৃ-সাক্ষাৎকার লাভ হয় না! সাধনা সফল হয় না! কিন্তু পত্রপুষ্পাদিরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপচারগুলিকে এইরূপ সত্যময় ও প্রাণময় করিয়া মহাপ্রাণরূপিণী মায়ের চরণে অর্পণ করিতে অভ্যস্ত হইলে, সত্য সত্যই একদিন জীবের ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটুকুই মহাপ্রাণে মিলাইয়া যায়; জীব তখন মাতৃলাভে ধন্য হয়। রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাণ-সমর্পণের অনুশীলনরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন। এইরূপ তিন বৎসর কাল সংযতভাবে তপস্যা করিবার পর জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকাদেবী বরদায়িনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন।

মন্ত্রে "ত্রিভির্বর্ষৈঃ" এইরূপ উল্লেখ আছে। আধ্যাত্মিকভাবে ইহার অপূর্ব্ব সমাধান পরিলক্ষিত হয়। বর্ষ শব্দের অর্থ কেবল সম্বৎসর পরিমিত কাল নহে, উহার অর্থ স্থানও হইতে পারে। ত্রিবর্ষে অর্থাৎ তিনটী স্থানে পূর্ব্বোক্তরূপ উপাসনা করিতে হয়। এক মনোময় ক্ষেত্রে, এক প্রাণময় ক্ষেত্রে এবং অন্য জ্ঞানময় ক্ষেত্রে। এই তিনটী ক্ষেত্রে উপাসনা করাই ত্রিবর্ষব্যাপক তপস্যা। ঐরূপভাবে আরাধিত হইলেই

মা আমার পরিতুষ্টা হইয়া জগদ্ধাত্রী ও চণ্ডিকারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাহার ফলে সাধকের ত্রিবিধ গ্রন্থিভেদ হইয়া যায়। কিরূপভাবে সাধনা করিলে অচিরে অভীষ্ট লাভ হয়, তাহা বিশেষভাবে দেখাইবার জন্য এস্থলে সুরথ ও সমাধির উপাসনা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

দেব্যুবাচ।

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ ॥১০॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—হে ভূপ! হে কুলনন্দন! তোমাদের যাহা প্রার্থনীয়, আমার নিকট হইতে সে সমস্তই প্রাপ্ত হইবে। আমি পরিতুষ্টা হইয়া তাহাই প্রদান করিতেছি।

ব্যাখ্যা। মা আজ বরদায়িনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সুরথ ও সমাধিকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। পরবর্ত্তি মন্ত্রে বরের বিষয় বর্ণিত হইবে। মা এস্থলে সুরথকে ভূপ এবং বৈশ্যকে কুলনন্দন বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ঐ দুইটী সম্বোধনের দ্বারাই উভয়ের অভীষ্ট সিদ্ধির পূর্ব্বসূচনা করিলেন। ভূ অর্থাৎ জড়পদার্থ সমূহের অধিষ্ঠাতা বলিয়াই সুরথকে ভূপ বলা হইল। আর বৈশ্যের সম্বোধন কুলনন্দন—কুলের আনন্দদায়ক। যে কুলে ব্রহ্মজ্ঞ সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সত্য সত্যই সেই কুলের ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন পুরুষগণ অচিরে মুক্তিলাভের আশায় আনন্দে বিহ্বল হইয়া থাকেন।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥১১॥
সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্ণমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ ॥১২॥

অনুবাদ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—তখন রাজা সুরথ জন্মান্তরে অস্খলিত রাজ্য, এবং ইহজন্মে স্বকীয় সামর্থ্যে শত্রুবল-নিধনপূর্ব্বক স্বরাজ্য-লাভ প্রার্থনা করিলেন। আর সেই প্রাজ্ঞ—বিষয়-বিরক্ত বৈশ্য পুত্রকলত্রাদির প্রতি মমত্ব এবং দেহাদিতে অহংবোধরূপ অজ্ঞানবিনাশক আত্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন।

ব্যাখ্যা। সুরথ—জীবাত্মা ; সে যতই জ্ঞান লাভ করুক, তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি ভোগাভিমুখেই থাকে। তাই, সে মায়ের নিকট বর্ত্তমান জীবনে শত্রুবল নিধনপূর্ব্বক অপহৃত রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তি, এবং জন্মান্তরেও নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রার্থনা করিল। ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্রিয় এবং বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তি কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া জীব আত্মরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, এইবার সে সেই ইন্দ্রিয় এবং বৃত্তিসমূহের উপর আধিপত্য প্রার্থনা করিল। আর যেন বিষয়েন্দ্রিয়কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে না হয়। উহারা সম্যক্ নির্জ্জিত হইয়া নিরঙ্কুশভাবে বিষয় ভোগের উপকরণস্বরূপ হইয়া থাকুক। এইরূপ কেবল ইহজন্মে নয়, জন্মান্তরেও যেন এইরূপ নিষ্কণ্টকভাবে আত্মরাজ্য ভোগ করিবার সামর্থ্য লাভ হয়। ইহাই সুরথের প্রার্থনা। আর সমাধি—সে পূর্ব্ব হইতেই "নির্ব্বিণ্ণ" বিষয়-বিরক্ত ; সুতরাং "জ্ঞানং বব্রে" আত্মজ্ঞান প্রার্থনা করিল। যাহার প্রভাবে অহং মমত্বরূপ সংসারাসক্তি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

ঠিক এইরূপই হয়। সাধক যখন মাকে পায়, তখন তাহার মন চায় অব্যাহত ভোগ ; আর প্রাণ চায় চিরশান্তিময় অপবর্গ—আত্মায় সম্যক্‌রূপ আত্মহারা হওয়া। মায়ের দর্শন পাইলে সাধকের এইরূপ ভোগ এবং অপবর্গ উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। এই কথাটী বুঝাইয়া দিবার জন্যই মন্ত্রে সুরথের রাজ্য প্রার্থনা, এবং সমাধির জ্ঞান-প্রার্থনা উক্ত হইয়াছে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের কপটনিদ্রা উপাখ্যানেও ঠিক এইরূপ ভাবটী দেখিতে পাওয়া যায়। মনোরূপী দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশে বসিয়া ভোগরূপ নারায়ণী সেনাদল লাভ করিয়াছিল, এবং প্রাণরূপী অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে উপবেশন করিয়া জীবনতরণীর কর্ণধাররূপে স্বয়ং

ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন। একজন ভগবৎ ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ, এবং আর এক জন ভগবৎ মাধুর্য্যে—প্রেমে মুগ্ধ। বাস্তবিক এই উভয় ভাব নিয়াই জীবত্ব। প্রেম এবং আত্মজ্ঞান যে একই কথা, ইহা পূর্ব্বেও অনেকবার বলা হইয়াছে। সে যাহা হউক, এস্থলে সুরথের যে পুনরায় জন্মান্তরের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ সংশয়ের অবসর নাই; কারণ, উহা স্থূলজন্ম নহে, সূর্য্য হইতে জন্ম গ্রহণ ও মনুত্ব লাভ। জীবমাত্রেরই উহা বাঞ্ছনীয়।

জীব! তুমিও এইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মায়ের নিকট ঐ দুইটীই প্রার্থনা করিতেছ। ঐশ্বর্য্য এবং জ্ঞান। ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব (সর্ব্বশক্তিমত্তা) এবং বিশুদ্ধবোধ, এই উভয়ই জীবমাত্রের অন্তর্নিহিত প্রার্থনা। সুতরাং তুমি বুঝিতে পার অথবা নাই পার, সকল অবস্থার ভিতর দিয়া তুমিও একটু একটু করিয়া মায়ের নিকট উহাই প্রার্থনা করিতেছ। মাও তোমাকে জন্মের পর জন্ম অতিক্রম করাইয়া, পবিত্র হইতে পবিত্রতর করিয়া সেই ঐশ্বর্য্য, এবং জ্ঞান লাভের যোগ্য অধিকারী করিয়া তুলিতেছেন।

সত্য সত্যই দেখ সাধক, তোমার অন্তরে মা বরাভয়দায়িনী রূপে স্মিতমুখে ভোগাপবর্গ দান করিবার জন্য আকুল-নয়নে অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি পুত্র, তুমি মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সরলপ্রাণে মা বলিয়া জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা কর, পুত্র যেমন করিয়া মায়ের নিকট প্রার্থনা করে, ঠিক তেমন করিয়া প্রার্থনা কর, তুমিও সুরথ-সমাধির ন্যায় ভোগাপবর্গ লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

দেব্যুবাচ।

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্।
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥১৩॥
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ্বিবস্বতঃ।
সাবর্ণিকোনাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি ॥১৪॥

অনুবাদ। দেবী বলিলেন—হে নৃপতে! অতি অল্প দিনের মধ্যেই তুমি স্বরাজ্য লাভ করিবে, এবং রিপুদিগকে নিহত করিয়া সেই রাজ্যটী অস্খলিতভাবে ভোগ করিতে পারিবে। আর মৃত্যুর পর সূর্য্যদেব হইতে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীতে সাবর্ণিক মনু নামে প্রসিদ্ধ হইবে।

ব্যাখ্যা। সাধক! একবার হৃতরাজ্য সুরথের অবস্থা স্মরণ কর, তিনি কত দুরবস্থার ভিতর দিয়া, কত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, গুরুর কৃপায় মাতৃ-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। মা তাহাকে অস্খলিত স্বরাজ্য-প্রাপ্তিরূপ বর প্রদান করিলেন। স্বরাজ্য অর্থে এখানে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির উপর আধিপত্য বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে "আমি" বলিতে—মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের দাস, দেহাভিমানবিশিষ্ট একটা 'আমি' বুঝাইত। এখন 'আমি' বলিলেই, মাকে মনে পড়িয়া যায়, সুতরাং ইন্দ্রিয়াদি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইহাই স্বরাজ্য লাভ। ইহাই মায়ের প্রথম দান। আর অতিরিক্ত দান মনুত্ব। তাই, মা বলিলেন—"হে সুরথ! তুমি ভবিষ্যতে সূর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণিক মনু নামে মন্বন্তরাধিপতি হইবে—সমষ্টি-মানব-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে।" এই মনুচৈতন্য লাভ করিতে হইলে সূর্য্যের পুত্র হইতে হয়, অর্থাৎ বিরাট্ প্রাণসত্তায় মিলাইয়া যাইতে হয়, এবং সবর্ণা শক্তির—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রীর অঙ্কস্থিত হইতে হয়। সাধকবৃন্দ এইরূপ মনুত্ব লাভ করিয়া মানব জাতির উপর যে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন, তাহার ফলেই মনুজগণ দিন দিন জ্ঞানৈশ্বর্য্য লাভের জন্য লালায়িত হয়। মনুষ্যগণের পিতৃস্থানীয় মনুর কৃপায়ই মনুষ্যজাতি উন্নতি লাভ করে! প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে একটী উদ্ভট শ্লোকের অবতারণা করা যাইতেছে।

উপাসনা চেন্মহতামুপাসনা, যয়া মনন্ত্যাধিকমেতি মানবঃ।
ধরার্থিনে যৎ সুরথায় তারিণী, মনুত্বমত্যন্তসুখং দদৌ স্বয়ম্॥

যদি উপাসনা করিতে হয়, তবে মহতের উপাসনা করাই উচিত। **(পক্ষান্তরে মহত্ত্বের অর্থাৎ ঈশ্বরের)** যে হেতু, **মহতের উপসনা করিলে মানুষ অভীষ্টের অতিরিক্ত বস্তুও লাভ করিতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত এই**

রাজা সুরথ। তিনি রাজ্যার্থী হইয়া মহামায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তারিণী—মা আমার তাঁহাকে প্রার্থিত রাজ্য ত প্রদান করিলেনই; অতিরিক্ত দিলেন মনুত্ব—অত্যন্ত সুখময় পদ।

এজগতেও দেখিতে পাওয়া যায়—মানুষ প্রথমতঃ কোন সাংসারিক অথবা দৈহিক কষ্ট হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হয়। তাহার ফলে মানুষের সেই তুচ্ছ অভাব অভিযোগগুলি ত দূরীভূত হয়ই, অধিকন্তু মায়ের কৃপায় জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি অনুত্তম বস্তু লাভের যোগ্যতাও অর্জ্জিত হয়। সাধনা-পথের ইহাই বিশেষত্ব। বালক-যোগী ধ্রুবের ঠিক এইরূপ অবস্থাই হইয়াছিল।

বৈশ্যবর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ ॥
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥১৫॥

অনুবাদ। হে বৈশ্যবর্য্য! তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাই দিলাম। তোমার জ্ঞানলাভ হইবে, তাহার ফলে তুমি সংসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা। মা সমাধিকে মোক্ষফলপ্রদ আত্মজ্ঞান লাভের বর প্রদান করিলেন। মা আমার কল্পতরু। তাঁহার নিকট সত্যজ্ঞানে যে যাহা প্রার্থনা করে, তিনি নির্ব্বিচারে তাহাই প্রদান করেন। সুরথকে রাজ্য এবং সমাধিকে জ্ঞান দান করিলেন।

নির্গুণ স্বরূপের উপলব্ধি এবং সগুণ ব্রহ্মে বিচরণ, এই উভয়ই জীবন্মুক্তির লক্ষণ। জীব ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম, এই তিনটী স্বরূপে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিবার সামর্থ্যকে জীবন্মুক্তি বলে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও "ত্রয়ং যদা বিন্দতে" ঠিক এইরূপ কথাই আছে। ক্ষর অক্ষর এবং পুরুষোত্তম, এই ত্রিবিধ স্বরূপে স্বৈর-বিচরণকারী মানুষকেই জীবন্মুক্ত বা ব্রহ্মবিদ্ বলা যায়। জীবন্মুক্ত পুরুষের যতদিন স্থূল দেহ থাকে, ততদিন তাঁহাতে কখনও জীবভাব, কখনও ঈশ্বরভাব আর কখনও বা

নিরঞ্জন-স্বরূপে স্থিতি, এই তিনটী লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা জীবন্মুক্তির বিশিষ্ট আনন্দে নিয়ত অবস্থান করিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত, অথবা ঐরূপ বিশিষ্ট আনন্দ ভোগের বিশেষ সামর্থ্য রাখেন, তাঁহারা জীবিত কালেও অধিকাংশ সময় কেবল নিরঞ্জন স্বরূপেই অবস্থান করিতে অর্থাৎ জ্ঞানের ষষ্ঠ সপ্তম ভূমিকায় অবস্থান করিতে যত্নবান্ হন।

এখানে একটী বিশেষ স্মরণীয় বিষয় এই যে— জীবন্মুক্ত পুরুষ-মাত্রই যে একান্ত নিবৃত্তি-পরায়ণ হইবেন, এরূপ কথা কোন শাস্ত্রে নাই; তাহা হইতেও পারে না। প্রারব্ধ-বৈচিত্র্য বশতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের কর্ম্ম-প্রণালী বিভিন্ন হইয়া থাকে, এবং তাহাই সম্ভব। বেদান্তশাস্ত্র সনক সনন্দাদি এবং জনক যাজ্ঞবল্ক্য বামদেবাদি ঋষির দৃষ্টান্ত দ্বারা এই নিবৃত্তি প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মবৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তবে শমদমাদিরূপ কতকগুলি বিষয়ে অধিকাংশ জীবন্মুক্তই প্রায় তুল্যরূপ হইয়া থাকেন।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলষিতং বরম্।
বভূবান্তর্হিতা সদ্যো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা ॥১৬॥
এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ॥১৭॥ ওঁ

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে
দেবীমাহাত্ম্যম্ সমাপ্তম্।

অনুবাদ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—এইরূপে দেবী তাহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া, সুরথ ও সমাধি কর্ত্তৃক ভক্তির সহিত সংস্তুত হইয়া, তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজা সুরথ দেবীর

নিকট এইরূপ বর লাভ করিয়া সূর্য্য হইতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভবিষ্যতে সাবর্ণিক নামক মনু হইবেন।

ইতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয়
দেবীমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে দেবীমহাত্ম্য সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ঠিক এইরূপই সমাধি-সহায় জীব সদ্‌গুরুর শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া, তাঁহার আদেশ অনুসারে স্তব পূজাদিরূপ এবং প্রত্যাহার ধারণা ধ্যানাদি সাধনার অনুষ্ঠান করিয়া, মাতৃসাক্ষাৎকার লাভ করে —সত্যে প্রাণে ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মা জীবকে ভোগাপবর্গরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হন। যতদিন স্থূলদেহ থাকে, ততদিন এইরূপই দেখিতে দেখিতে মা আমার অন্তর্হিত হইয়া যান; কিন্তু আবার ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার স্নেহময় আনন্দময় স্বরূপটী প্রত্যক্ষ করা যায়।

মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—দেবীর নিকট হইতে বরলাভ করিয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজা সুরথ সূর্য্যতনয় সাবর্ণিক মনুরূপে অষ্টম-মন্বন্তরের অধিপতি হইবেন। বর্ত্তমানে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। যখন সুরথ ও সমাধি মায়ের নিকট বর লাভ করিয়াছিলেন, তখন স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মন্বন্তর চলিতেছিল; তৎকাল অপেক্ষায় সেকাল সুদূর ভবিষ্যৎ বলিয়াই মন্ত্রে দেবীবাক্যে— "ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি" এই ভবিষ্যৎকাল বোধক ক্রিয়াপদের উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় মন্বন্তরে যিনি সুরথ ছিলেন, অষ্টম মন্বন্তরে তিনিই সাবর্ণিক মনুরূপে—স্নেহময় পিতৃরূপে তৎকালীন মানবজাতির কল্যাণ সাধনে নিরত থাকিবেন। অষ্টম মনু, সাবর্ণিক প্রভৃতিশব্দের আধ্যাত্মিক রহস্য গ্রন্থারম্ভেই বিবৃত হইয়াছে।

ইহা কেবল সুরথ সমাধির উপাখ্যান নহে। সাধকমাত্রই এইরূপে মাতৃসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। ইহাতে অসম্ভবতা কিংবা অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। বরং ইহাই একান্ত সম্ভব ও একান্ত স্বাভাবিক। মাকে লাভ কবিবার জন্য একমাত্র মাতৃকৃপাই প্রধান অবলম্বন। এখানে সংসারী বা সন্ন্যাসীর বিচার নাই। মায়ের রাজ্যে সকলেরই সমান অধিকার। অতি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভাক্ হইয়া

মাকে ভজনা করিতে পারে—শরণাগত হইতে পারে। মাতৃচরণে শরণাগত হইলে জীবের মাতৃলাভ অবশ্যম্ভাবী।

ভগবদ্গীতার যেখানে পরিসমাপ্তি, দেবীমাহাত্ম্যের সেইখানে আরম্ভ। সাধক সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ চরণে—এক অদ্বিতীয় অভয়পদে যথার্থ শরণাগত হইবার পর যে সকল অবস্থার ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই এই দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এইখানে সাধন-সমরের আরম্ভ, এবং "ন স পুনরাবর্ত্ততে" এইখানেই সাধন-সমরের শেষ।

এস, এইবার আমরা সকলে বৈদিক যুগের সত্যদর্শী ঋষি দিগের ন্যায় পবিত্রকণ্ঠে সরল-প্রাণে সমস্বরে গান করি।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥
ওঁ পূর্ণম্। ওঁ পূর্ণম্। ওঁ পূর্ণম্!

ইতি সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায়
রুদ্রগ্রন্থিভেদ নামক তৃতীয় খণ্ড
সমাপ্ত।

সাধন-সমর কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত অন্যান্য
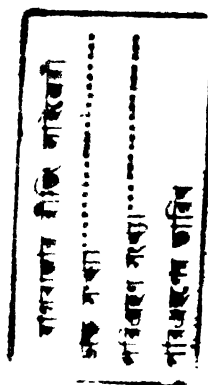
পুস্তকাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

•:)*(:•——

১। **সাধন-সমর**—প্রথম খণ্ড, মধুকৈটভ-বধ বা ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদ; দ্বিতীয় খণ্ড, মহিষাসুর-বধ বা বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ। মূল্য প্রতিখণ্ড—দুই টাকা।

২। **সত্যপ্রতিষ্ঠা**—তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য আট আনা। এই পুস্তকখানি সাধন-মন্দিরের সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তি। সর্ব্বপ্রথম কোন্ কেন্দ্র হইতে সাধনার সূত্রপাত করিলে সকল সম্প্রদায়ের সাধনাই অচিরে সফলতা-মণ্ডিত হয়, তাহা ইহাতে অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অতি উৎকৃষ্ট ইংরাজী, হিন্দী ও ডাচ্ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। **সত্যালোকম্**—তৃতীয় সংস্করণ মূল্য চারি আনা। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃত মোহমুদ্গরের ছন্দে, কতিপয় সুমধুর শ্লোক ও তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা। যাঁহারা মনে করেন—সংসারে থাকিয়া, কাম কাঞ্চনে জড়িত থাকিয়া ধর্ম্ম লাভ করা যায় না; তাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অবশ্য পড়িবেন। সাধনার প্রায় সকল কথাই ইহাতে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ইহারও হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। **শোক শান্তি**—দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য চারি আনা। এমন লোক সংসারে খুব কমই আছেন, যিনি কোনরূপ শোকের আঘাত পান নাই। এমন গৃহ খুব কমই আছে, যাহা শোকার্ত্তের করুণ ক্রন্দনে মুখরিত হয় নাই। যাঁহারা প্রিয় জনের বিরহে শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা পাঠ করিলে কেবল যে শোকেরই শান্তি হইবে, তাহা নহে; যথার্থ শান্তি লাভের সহজ ও

প্রকৃত উপায় যে কি, তাহাও জানিতে পারিবেন। সুতরাং প্রত্যেক গৃহেই ইহা সংগৃহীত থাকা একান্ত আবশ্যক।

৫। **পূজাতত্ত্ব**—এই পুস্তক খানিতে, পূজার স্বরূপ, পূজার রহস্য, মূর্ত্তিরহস্য, ঘটস্থাপনরহস্য, আচমন, আসনশুদ্ধি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ বিন্যস্ত আছে। মূল্য এক টাকা, সাধারণ সংস্করণ বার আনা।

৬। **উপাসনা**—মূল্য ছয় আনা মাত্র। ইহাতে বেদ পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে কতিপয় হৃদয়গ্রাহী স্তোত্র মন্ত্র এবং তাহার সুললিত যথার্থ ব্যাখ্যা আছে। পিপাসু সাধক মাত্রেরই এই পুস্তকখানি আদরের সামগ্রী হইয়াছে।

৭। **সত্যকথা**—ইহাতে দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতীকার-কল্পে একটী অব্যর্থ অথচ সহজ উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমগ্র জাতির যাহাতে যথার্থ কল্যাণ লাভ হয়, তাহাই ইহার প্রতিপাদ্য-বিষয়। মূল্য এক পয়সা।

৮। **জীবন লক্ষ্য**—শ্রীমদ্ বিশ্বরঞ্জন-ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত। মানুষ মাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য কি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার অপকারিতা কি, এবং কি উপায়ে জীবনের যথার্থ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়, তাহা এই পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

৯। **সাধনার গৃহে**—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত। কি ভাবে সাধনা পথে অগ্রসর হইতে হয়, কি ভাবে সাধনায় সফলতা লাভ হয় ইত্যাদি বিষয় এই পুস্তকে সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা।

১০। **দেশাত্মবোধ ও শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা পূজা** মূল্য চারি আনা মাত্র। কিরূপে মানুষ দেশাত্মবোধ লাভ করিতে পারে, কি উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি অকৃত্রিমভাবে

প্রকাশ পাইতে পারে, তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অব্যর্থ উপায় ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তকেরও হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

১১। **অমরপ্রাণ**—মূল্য দুই আনা মাত্র।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়—আদর্শ সাধক অমরেন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র জীবন বৃত্তান্ত এবং তাহার সাধনা সফলতার ডায়েরী। ইহা পড়িলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই কিছু লাভ করিতে পারিবেন।

উপরোক্ত পুস্তকগুলির বহুল প্রচারের জন্য এ পর্য্যন্ত বিশেষ চেষ্টা কিছুই হয় নাই, তথাপি অল্পকাল মধ্যেই এই পুস্তকগুলি ধর্ম্মপ্রাণ জন-সমাজে এক অভিনব জাগরণের সূচনা করিয়াছে। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য সমুজ্জ্বল জ্ঞান কিরূপে ভক্তিময় হইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে, তাহার সরল এবং সুনির্দ্দিষ্ট উপায় দেখিতে পাইয়া সাধকগণ যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন। ইহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনমার্গগুলির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিহিত হইয়াছে।

বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী, উৎসব, মানসী, উদ্‌বোধন আত্মশক্তি, অমৃতবাজার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রিকায় যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাধক মহাশয়গণ এই পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিযাছেন, তাহা "সাধন-সমর" বিবরণী নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন—"এই পুস্তকগুলি শুধু পড়িয়া গেলেও সাধনা হয়, জীবন পবিত্র হয়" তাঁহাদের সে বাক্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তক গুলির বহুল প্রচারে কৃতযত্ন হইয়া দেশে পুনরায় সত্য-ধর্ম্ম-প্রচারের সহায়তা করিবেন। ইতি।

বিনয়াবনত—কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রাপ্তিস্থান—

সাধনসমর-আশ্রম, বরাহনগর, কলিকাতা।